ভগবদ্‌গীতা

ও

বিশ্বজনীন বার্তা

(আধুনিক চিন্তাধারা ও চাহিদার আলোকে গীতাভাষ্য)

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক :

স্বামী মুমুক্ষানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা ৭০০ ০০৩

প্রথম প্রকাশ :
২৫ বৈশাখ, ১৪১৫
8 May 2008
2M2C

ISBN 978-81-8040-519-8 (set)
978-81-8040-520-4 (vol.II)

অক্ষরবিন্যাস : উদ্বোধন প্রকাশন বিভাগ

মুদ্রক :
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা ৭০০ ০৩০
দূরভাষ : ২৫৫৭ ৪৪১৯

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রকাশকালে পাঠকদের আমরা জানিয়েছিলাম যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ত্রয়োদশ সঙ্ঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ ১৯৮৮-১৯৯০ পর্যন্ত হায়দ্রাবাদ-স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে প্রতি রবিবার ন্যূনধিক দ্বাদশশত বিদ্বজ্জন ও যুবাবর্গের সম্মুখে বিবেকানন্দ প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিতভাবে গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনার ক্যাসেটের উপর ভিত্তি করেই মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কলকাতা-স্থিত অদ্বৈত আশ্রম (প্রকাশন বিভাগ) 'Universal Message of the Bhagavad Gita : An Exposition of the Gita in the Light of Modern Thought and Modern Needs' নামক তিন খণ্ডে সমাপ্ত গীতার একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন ২000-২০০১ সালে। গ্রন্থখানির জনপ্রিয়তা ও বাংলাভাষার অধ্যাত্ম-পিপাসু পাঠক-পাঠিকার প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে উহার প্রথম খণ্ডের বিদগ্ধ ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত, বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ২০০৫ সালে। শ্রীভগবানের কৃপায় এবার আমরা উহার দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদটি সুধী পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে কৃতার্থ বোধ করছি।

এই খণ্ডটির প্রাথমিক অনুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন বিদ্যানুরাগিণী শ্রীমতী গৌরী ভৌমিক। ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পাণ্ডুলিপিতে যৎকিঞ্চিৎ পরিমার্জনের কাজও করেছিলেন। এজন্য উভয়ের কাছে আমরা ঋণী। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে পূজ্যপাদ রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের সহজবোধ্য, সাবলীল কথনভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুবাদকে নবরূপ দেওয়ার প্রয়োজন একান্তভাবে অনুভূত হওয়ায়, সে দায়িত্ব অর্পিত হয় রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অফ্ কালচারের মাসিক 'বুলেটিন'-এর সহযোগী সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত স্বরাজ মজুমদারের উপর। দুই বৎসর পরিশ্রম করে তিনি কাজটি সুসম্পন্ন করায় "ভগবদ্‌গীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা : আধুনিক চিন্তাধারা ও চাহিদার আলোকে গীতাভাষ্য"—এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হতে পারল। শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয়ের নিকট এজন্য আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ।

গীতার উপর ভাষ্য জাতীয় বহু গ্রন্থের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-ধর্মগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত গীতাভাষ্য একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ভাষ্যগ্রন্থে যা করা হয় তিনি তা পূর্ণভাবেই করেছেন : তিনি কেবলমাত্র শব্দার্থ

বা বাক্যার্থ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁর পূর্বকালে ও সমকালে ভারতের সাধক ও বিদ্বৎ-সমাজে প্রচলিত প্রধান চিন্তাধারাগুলির পটভূমিতে তিনি মূলগ্রন্থের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। এর ফলে ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের বিদ্বৎ সমাজে তাঁর ভাষ্যগ্রন্থ সমুচ্চ সমাদর লাভ করেছে।

পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ এমন একজন দুর্লভ গীতা ব্যাখ্যাতা ছিলেন, যিনি একাধারে উপনিষদ-ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রাদির চিন্তাধারার সঙ্গে, প্রাচীন ও নবীন পাশ্চাত্যদর্শনের ভাবপ্রবাহের সঙ্গে এবং বর্তমান যুক্তিবিচারভিত্তিক বৈজ্ঞানিক যুগে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে উভয় ভূখণ্ডে উদ্ভূত সমস্ত আধুনিক ভাবনা চিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। সর্বোপরি তাঁর সমগ্র-ব্যক্তিত্ব ও সমস্ত কর্ম ছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ধ্যানধারণাময়। এ দৃষ্টিতে বিচার করে বলা যায় সমগ্র শিক্ষিত বিশ্বের চিন্তাধারার প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যাত হওয়ায় তাঁর গীতাব্যাখ্যান একটি সার্থকনামা 'গীতাভাষ্যে'র আকার ধারণ করেছে। অধিকন্তু মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষানৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনেক আধুনিক সমস্যাও গীতালোকে আলোচিত হওয়ায় আমাদের বিশ্বাস, এই পুস্তক কেবলমাত্র মানুষের তাত্ত্বিক কৌতূহল নিবৃত্ত করবে না—পরন্তু তার কর্মময় জীবনে সুপরামর্শদাতা মিত্রেরও ভূমিকা পালন করবে।

প্রথম খণ্ডটির ন্যায় এই খণ্ডটির প্রকাশনা-কার্যেও নানাভাবে সাহায্য করেছেন উদ্বোধনের স্বেচ্ছাব্রতী কর্মিবৃন্দ—বিশেষত সর্বশ্রী সুহাস রায়, উৎপল মুখোপাধ্যায় ও অজিতকুমার দাস। অনূদিত গ্রন্থের নির্দেশিকা প্রণয়নের কাজ করেছেন অন্য এক স্বেচ্ছাব্রতী শ্রীতারকনাথ দে। তাঁরা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত এই খণ্ডের প্রকাশনা যথেষ্ট দুঃসাধ্য হতো।

মহারাজজীর গীতাব্যাখ্যানের প্রথম ভাগ প্রকাশনের পর বহু জিজ্ঞাসু পাঠক দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশনার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থখানি তাঁদের জ্ঞানস্পৃহা পরিতৃপ্ত করুক এবং দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে শক্তি, সাহস প্রেরণা দান করুক—ভগবদসমীপে এই প্রার্থনা। ইতি—

নিবেদক
স্বামী মুমুক্ষানন্দ
প্রকাশক

৮ মে ২০০৮
অক্ষয় তৃতীয়া
কলকাতা—৭০০০০৩

সূচীপত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাসযোগ

ত্যাগের বা সন্ন্যাসের যোগ

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ। আজ সন্ধ্যায় আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। আমি পূর্বেই বলেছি যে, এই অধ্যায়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের জন্যই নয়, সমগ্র মানব সমাজের প্রতি সুগভীর বার্তা রয়েছে এই অধ্যায়গুলিতে। যেখানেই মানুষ পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করছে, সেখানেই নারী-পুরুষ সকলেরই দরকার একটি যুক্তিনির্ভর প্রত্যাশাপূরক দর্শনের নির্দেশনা। এই ধরনের দর্শনই গীতায় উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেই দর্শনের সারাংশ এই অধ্যায়গুলিতেই পাওয়া যাবে।

সন্ন্যাসযোগ শিরোনামযুক্ত এই পঞ্চম অধ্যায়টি শুরু হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল বিষয় আলোচনা করেছেন তার ওপর একটি প্রশ্ন করে। ঐ শিক্ষাগুলির মধ্যে কিছু কিছু বিষয় অর্জুনের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই তাই এটি উত্থাপিত হচ্ছে ঃ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

অর্জুন বললেন—'হে কৃষ্ণ, আপনি কর্মসন্ন্যাসের প্রশংসা করেছেন, আবার কর্মানুষ্ঠানকেও প্রশংসনীয় বলছেন; এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতর তা নিশ্চয় করে আমাকে বলুন।'

'হে কৃষ্ণ, আপনি *সন্ন্যাসের* বা কর্মসন্ন্যাসের প্রশংসা করেছেন—*সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ*—এটি করেছেন চতুর্থ অধ্যায়ে; *পুনর্যোগঞ্চ শংসসি,* আবার *কর্মযোগের,* কর্মসম্পাদনেরও প্রশংসা করছেন।' *যৎশ্রেয়ঃ এতয়োঃ একং,* 'এই দুটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি'; *তৎ মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্,* 'সেইটি আমাকে নিশ্চয় করে বলুন'। এই হচ্ছে অর্জুনের প্রশ্ন।

প্রায়শই অত্যন্ত স্পষ্ট উপদেশও মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। সমস্ত রকমের শিক্ষার ক্ষেত্রেই এটি হওয়া সম্ভব। আদি শঙ্করাচার্য তাঁর কেনোপনিষদের ভাষ্যে (২/১) একটি সুন্দর সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে এটির উল্লেখ করেছেন :

একস্মাদ্ গুরোঃ শৃণ্বতাম্ (শিষ্যাণাম্ মধ্যে), আচার্যের নিকট শিক্ষারত একটি শ্রেণির অনেকগুলি ছাত্রের মধ্যে, *কশ্চিদ্ যথাবৎ প্রতিপদ্যতে,* 'কয়েকজন তাঁর শিক্ষা ঠিক ঠিক বুঝতে পারে'; *কশ্চিদ্ অযথাবৎ প্রতিপদ্যতে,* 'কয়েকজন সেটি ভুল বোঝে'; *কশ্চিদ্ বিপরীতং প্রতিপদ্যতে,* 'কয়েকজন, যা বলা হয়েছে, তার ঠিক উল্টো বোঝে'; এবং *কশ্চিদ্ ন প্রতিপদ্যতে ইতি,* 'কেউ কেউ তার একটি শব্দও বুঝতে পারে না।'

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষককে এই চারপ্রকার ছাত্রের সম্মুখীন হতে হয়। অতএব, অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাষা ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও *গীতার* ক্ষেত্রেও এই সংশয়গুলি আসে। স্বভাবতই গত হাজার বছর ধরে সমগ্র ভারতীয় মনও এই প্রশ্নগুলি নিয়ে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে। মানুষ ভেবেছে : মনের উন্নতিই যদি শ্রেষ্ঠ হয় এবং যদি আমাকে মানসিক উন্নতিলাভই করতে হয়, তবে আমি চুপচাপ একান্তে বসে মনের উন্নতি ঘটাব; শুধু শুধু এখানে-ওখানে দৌড়াদৌড়ি করে খাটাখাটুনি করার কী প্রয়োজন? এই মনোভাব গ্রহণ করায় দেশে আলস্য এল এবং মনের অনুশীলনও লোপ পেল। দর্শনের এই অপব্যাখ্যা দেশের সর্বনাশ করেছিল।

চার বছর আমেরিকা ও ইংলন্ডের জনমানসের উপযোগী বেদান্ত চিন্তাসমূহের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে ভারতবর্ষে ফিরলেন এবং রামনাদে, ভারতভূমিতে প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতা সমাবেশেই তিনি দেশের মানুষকে জাগ্রত হতে আহ্বান জানিয়ে তাদের আধুনিক যুগের সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে বললেন :

'সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ...আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই

এখন আর ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না, যেন কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙিতেছে।'[১]

আমাদের দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ চাই; তবেই আমরা কর্মবীর হতে পারব। সেই শিক্ষা হলো তার পূর্ণমানবত্বের শিক্ষা, এটি যে শুধুমাত্র তার চিন্তাক্ষেত্র সম্পর্কে প্রযোজ্য, তা নয়। এই শিক্ষার অভাবে আমরা শুধুমাত্র পণ্ডিত হয়েছি, কিন্তু আমাদের অনুভূতিগুলিকে মানবমুখী করার বা মানবসেবার দিকে চালনা করতে ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের দেহ-মন ক্ষুদ্র আমিত্বের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল এবং আমাদের হাল আমলের ইতিহাস তার সাক্ষী। ভাগ্যক্রমে, এই আধুনিক যুগে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মতো আচার্যদের পেয়েছি। শঙ্করাচার্য আমাদের *সমাধি* শিখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার সঙ্গে তিনি অত্যন্ত কর্মময় জীবনও যাপন করে গেছেন। আমরা তাঁর কর্মের দিকটি বিস্মৃত হয়ে *সমাধিলাভের* চেষ্টায় মনোনিবেশ করেছি। ফলে আমাদের ক্ষেত্রে তার অর্থ দাঁড়িয়েছে গভীর নিদ্রা অথবা আলস্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের দেশ শুধু ঘুমিয়েছে। যখন আমি দেখি লোকে কাজ করছে, যেমন মাটি খোঁড়ার কাজ, তখন দেখি যে তারা অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় কোদাল তুলছে। আমাদের দেশের মানুষকে এখনও কর্মকুশলতা ও মানবিকতাবোধ শিক্ষা করতে হবে। কার্যকরী বৈদান্তিক চিন্তার বিস্ফোরণের দ্বারা, এই অর্ধ-নিদ্রিত ভারতকেই স্বামী বিবেকানন্দ জাগ্রত হয়ে আধুনিক যুগের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এবার শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে উত্তর আসছে সেই প্রশ্নের যা অর্জুনকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করেছে ও আমাদের গোটা দেশকে ক্রমাগত বিব্রত করেছে। এই আধুনিক যুগে শেষবারের মতো এই প্রশ্নের বিভ্রান্তি থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে।

শ্রীভগবান্ উবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান বললেন—'কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাস উভয়েই মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু কর্মযোগ কর্মসন্ন্যাসের চেয়ে উৎকৃষ্ট।'

এই বাক্যটির মধ্যে কোথাও দ্ব্যর্থপূর্ণ ভাব নেই, কিন্তু মানব গোষ্ঠীরূপে আমরা এখানে দুটি অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেছি। শ্রীকৃষ্ণ কী বলেছেন? *সন্ন্যাস*

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৮

ও কর্মযোগ, 'আত্মোপলব্ধির জন্য কর্মসন্ন্যাস ও যোগরূপ নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান', দুটিই মানুষকে *নিঃশ্রেয়স* বা 'উচ্চ আধ্যাত্মিকতা'র পথে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু *তয়োস্তু,* 'উভয়ের মধ্যে'; *কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে,* '*কর্মযোগ কর্মসন্ন্যাসের* চেয়ে শ্রেষ্ঠ'। কর্মত্যাগকে *সন্ন্যাস* বলা হয়। সেটি তত ভালো নয়। নিজেকে কর্মে নিযুক্ত রেখে, একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক সচেতনতা বিকাশের প্রচেষ্টা আরো উচ্চ পর্যায়ের সাধন, *বিশিষ্যতে,* 'অনেক বেশি উৎকৃষ্ট'। আপনি বনবাসী হয়ে শান্ত, ধ্যানমগ্ন জীবন যাপন করে আত্মোপলব্ধির চেষ্টা করলেন। সেটি অবশ্যই সুন্দর। অপর দিকে, শত সহস্র দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কান্না শুনে যদি তাদের সেবা করতে যান, তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে যান, তাহলেও আপনার অধ্যাত্মজীবন ব্যাহত হলো না। বরং এ কাজ প্রথমটির থেকে মহত্তর। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, বুদ্ধদেবও ঠিক এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন। মূলত তিনি *জ্ঞান* ও সন্ন্যাসের কথাই বলেছিলেন—সে কথা ঠিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও একদিন মঠ পরিক্রমাকালে উদরাময় রোগে পীড়িত এক ভিক্ষুকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন সাধুভাই আপনার দেখাশোনা বা সেবা করতে আসেননি?' ভিক্ষুটি উত্তর দিলেন, 'না মহাত্মন্, তাঁরা সকলে ধ্যান করছেন।' বুদ্ধ তখনই তাঁর সেবা শুরু করলেন; তাঁকে সেবা করতে দেখে তখন অন্যান্য সব সন্ন্যাসীরা ধীরে ধীরে এলেন। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি পীড়িত, কিন্তু তোমরা কেউ এঁর সেবা করতে এগিয়ে আসোনি কেন?' সাধুরা বললেন, 'প্রভু, আমরা সকলে ধ্যান করছিলাম। আপনিই তো আমাদের ধ্যান করতে শিখিয়েছেন।' বুদ্ধ বললেন, 'একি বোকামি! তোমাদের ধ্যান ছুঁড়ে ফেলে দাও। পীড়িত মানুষ দেখলে, যাও, আগে গিয়ে তার সেবা কর!'

এক বুদ্ধদেব যদি এই কথা বলে থাকেন তো শ্রীকৃষ্ণ আরো শতবার এই কথা বলেছেন, কারণ তাঁর শিক্ষা হচ্ছে মূলত ব্যবহারিক আধ্যাত্মিকতা, কর্মে পরিণত আধ্যাত্মিকতা। ভাষাটি লক্ষ্য করুন ঃ কর্মে পরিণত আধ্যাত্মিকতা। অর্থাৎ প্রত্যেকটি কর্মের পিছনে থাকবে আধ্যাত্মিকতা। তাতে দ্বিবিধ কল্যাণ। এক, আমি কিছু আধ্যাত্মিক শক্তি পাব; দুই, আমার চারপাশের মানুষ শান্তি ও সান্ত্বনা পাবে। 'অতি অবশ্যই এটি শ্রেয়', *তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে,* এইটিই হচ্ছে স্বচ্ছতম ব্যাখ্যা। তৃতীয় অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'কোন ব্যক্তিই কর্ম না করে থাকতে পারে না; প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বভাব দ্বারা চালিত হয়ে কিছু না কিছু কর্ম করে। এমনকি ধ্যান করাও একটি কর্ম।' সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাগুলি বলেছিলেন। অতএব, সকলের কল্যাণের জন্য কর্ম করাই

ভালো। যে কোন অজ্ঞান ব্যক্তিই নিজের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে কর্ম করে। কিন্তু বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ বা জ্ঞানী ব্যক্তি সকলের কল্যাণার্থে কর্ম করেন। তাহলে আপনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তির মতো আচরণ করবেন না কেন? এই প্রসঙ্গ এসেছিল তৃতীয় অধ্যায়ে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ *সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত; কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তঃ চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্*—অর্থাৎ, অবিদ্বানরা আসক্ত হয়ে যে ভাবে কাজ করে, বিদ্বানরা অনাসক্ত হয়ে লোককল্যাণের জন্য সেইভাবেই কাজ করেন। আপনার চারপাশে যে জগৎ রয়েছে, আপনি তারই একটি অংশ। আপনি তাকে অবহেলা করে নিজের ভাবে চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। সেটা অনুচিত। ওটি অজ্ঞ ব্যক্তির মনোভাব। কিন্তু *লোকসংগ্রহম্* বা লোককল্যাণ করা হচ্ছে জ্ঞানীর মনোভাব। অবিদ্বান ও বিদ্বান—এঁরা দুই ধরনের মানুষ। অবিদ্বান যিনি, তিনি আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রভূত চেষ্টা করবেন। অপরদিকে, বিদ্বানও প্রচুর পরিশ্রম করবেন; কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে লোককল্যাণ। শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়েছেন যে, এছাড়াও এক তৃতীয় শ্রেণির মানুষ আছেন, যাঁরা শুধু নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনেই ব্যস্ত, সংসারের কোন কর্ম করেন না, সর্বক্ষণই শুধু নিজের মুক্তিলাভ ও নিজের শান্তির কথাই ভাবছেন। চারপাশে শতশত মানুষ অনশন পীড়িত হলেও এঁরা উদ্বিগ্ন হন না। এঁদের জীবনদর্শনই আমাদের দেশের মানুষকে শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রভাবিত করে এসেছে। এর ফলেই দেশজুড়ে মানুষের আজ এত যন্ত্রণা। কারুর কোন সহানুভূতি নেই। সকলেই মন্দিরে গিয়ে শুধু নিজের জন্য প্রার্থনা করে, 'হে ঈশ্বর! আমাকে উদ্ধার কর!' আমাদের দেশবাসীরা একবারও অন্য কারোর জন্য ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করেনি। এটা কী রকম ধর্ম? কী ধরনের আধ্যাত্মিকতা? আধুনিক যুগে এই প্রশ্নটি প্রথম করেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তারপর স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না' এবং স্বামীজী বললেন[১] ঃ

'যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।'

আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়তই এই আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে। কেন, আমি কি গিয়ে তাদের সেবা করতে পারি না? আমি কি তাদের অশ্রু মুছে দিতে

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ, ১৭

পারি না? এটা কি ধর্ম নয়? এই প্রশ্নটি করুন। তার উত্তরে গীতা আপনাকে বলবে যে, এটাই প্রকৃত ধর্ম। উপনিষদ গীতার ভিত্তি। গীতা আপনাকে বলবে—কর্ম কর। কেন? কারণ, প্রার্থনা যেমন ধর্মের অঙ্গ, কর্মও তেমনি ধর্মের একটি অঙ্গ। কিন্তু আমরা কখনও উপনিষদের এই শিক্ষাটিকে বুঝতে পারিনি। আজ শ্রীরামকৃষ্ণ এসে আপনাদের কাছে এই শিক্ষাটি আবার তুলে ধরেছেন। বাস্তবিক, এই জগৎটি কী? আপনি হৃদয় মধ্যে যে ব্রহ্মের ধ্যান করছেন, তিনিই আবার এইসব কোটি কোটি রূপ ধরে আপনার সামনে বিরাজ করছেন। এই মহাবিশ্ব সেই ব্রহ্মের কাছ থেকেই এসেছে, ব্রহ্মেই স্থিত, আবার ব্রহ্মেই লয় হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, 'চোখ বুজে ভগবানের ধ্যান করবি, আর চোখ খুলে যখন দেখবি সেই একই ভগবান বহুরূপ ধরে তোর সামনে বিরাজ করছেন, তখন তুই তাঁদের সেবা করবি।' দুই নেই। এক ঈশ্বরই অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করছেন। *অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।* *মহানারায়ণ উপনিষদ*-এ এই শ্লোকটি আছে। এর অর্থ, 'নারায়ণ মানুষের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করছেন।' আমাদের ভারতীয় দর্শনে কোন শয়তানের ধারণা নেই। অন্তরে সবই ঈশ্বর, কিন্তু চোখ খুললেই সব শয়তান! এরকম কোন ধারণা আমাদের নেই। সকলের ভিতর সেই একই ঈশ্বর। অতএব মানুষের সেবা ঈশ্বরেরই পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণ এটি অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ 'প্রত্যেক *জীবই শিব*। *জীবের* সেবাই *শিবের* পূজা'। সুতরাং, আজকে আমরা এমন এক বিশুদ্ধ অদ্বৈত দর্শন পাচ্ছি, যা সেবা, দয়া ও প্রেমের পথে নিয়ে যায়। আগে অদ্বৈত বলতে বোঝাত '*নেতি, নেতি';* এটা নয়, ওটা নয়'; এসবই হলো *সংসার,* কিন্তু ব্রহ্ম সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে। শত শত বছর ধরে আমাদের দেশের মানুষ ঐ নেতিবাচক অদ্বৈতের অনুসরণ করে এসেছে। আমরা একা থাকতে চাই, সিদ্ধিলাভ করতে চাই। আমরা এই সংসার চাই না, এর ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে চাই না। এই ভাবটি পরের দিকে এসেছিল। পরবর্তী যুগে রচিত শাস্ত্রগুলির কোন কোনটিতে এই একই সুর। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলিতে একটা হিন্দি কথা চালু আছে ঃ দুনিয়া তিন কাল মে নেহি হ্যায়, 'তিনকালে, অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে, এই জগতের কোন অস্তিত্বই নেই'। শুধু শুধু এর জন্য দুশ্চিন্তা করে কী হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ এসে অদ্বৈত বেদান্তে এক নতুন মাত্রা, এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করে দিলেন। কোথাও কোন মানুষ দুর্দশায় পড়েছে। আপনি কী করে এই বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করবেন? সুতরাং, শ্রীরামকৃষ্ণের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে

অদ্বৈতবাদ আজ প্রকৃত অদ্বৈত দর্শনে পরিণত হয়েছে। এই দর্শন বলে যে, একটিমাত্র সত্তাই বিদ্যমান; চোখ বুজলে যেমন ব্রহ্ম আছেন, তেমনি চোখ খুললেও কেবল সেই এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন। এই শিক্ষাটি পেয়েছি *মুণ্ডকোপনিষদ্*-এ (২/২/১১), যা আমরা *গীতা* শুরু করবার আগে চর্চা করেছি। সেখানে বলা হয়েছে, *ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতম্*, 'এই সমগ্র ব্যক্ত জগৎই হলো এক অমৃত ব্রহ্ম'। শব্দগুলি লক্ষ্য করুন! *ইদং*, বেদান্তের একটি পারিভাষিক শব্দ, যার অর্থ হলো 'এই ব্যক্ত জগৎ'। জগৎ কী? জগৎ হচ্ছে ব্রহ্ম। কী রকম ব্রহ্ম? *অমৃতম্ ব্রহ্ম*, 'সেই অবিনাশী ব্রহ্ম'ই হচ্ছেন এই জগৎ। *পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম*, 'সামনে ব্রহ্ম'; *পশ্চাদ্ ব্রহ্ম*, 'পশ্চাতে ব্রহ্ম'; *দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ*, 'দক্ষিণে এবং উত্তরেও তিনি'; *অধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতং*, 'ঊর্ধ্ব এবং অধঃদেশেও বিস্তৃত তিনি।' পরিশেষে উচ্চারিত একটি অসাধারণ উক্তি ঃ ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্, 'এই বিশ্ব সেই পরম দিব্য ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।' গীতার শিক্ষা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অদ্বৈত শিক্ষার ভিত্তিও এই ভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা হলো—সমস্ত কিছুর অন্তরে সেই ঈশ্বরই বর্তমান। তাই প্রতিবেশী মানুষের সেবার মাধ্যমে আমাদের ঈশ্বরের আরাধনা করতে হবে। এই সমগ্র তত্ত্বটিকে একসময় আমরা সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছিলাম। আমাদের ভক্তিধর্মে ব্রহ্মকে শুধু মন্দিরের মধ্যেই দেখেছি এবং মন্দিরের বাইরে যা কিছু, তাকে কেবল *সংসার* বা পার্থিবতা বলেই ভেবে এসেছি । সেই কারণেই আপনি দেখবেন কেউ অত্যন্ত ভক্তিভরে মন্দির প্রাঙ্গণের ঘাস কাটছে, কারণ এই কর্মের পিছনে রয়েছে তার বিগ্রহের প্রতি ভালবাসা। আপনি মন্দিরের বাসন মাজলেন, ঘাস কাটলেন এবং বাড়ি ফিরে ভাবলেন যে পুণ্যকর্ম করেছি। কিন্তু মানুষের প্রতি আপনার এই সপ্রেম দৃষ্টিভঙ্গি নেই। ঈশ্বরকে মাত্র মন্দিরের বিগ্রহের মধ্যেই আপনি সীমাবদ্ধ করে রাখলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আপনি অন্যত্র উপলব্ধি করতে পারলেন না। সুতরাং, আপনি আপনার ধর্মকে অতি সঙ্কীর্ণ, অতি অমানবিক এবং প্রায়শই মানববিরোধী করে তুললেন। বিগত শতাব্দীগুলিতে আমাদের ধর্মীয় ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে ঠিক এমনটিই হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষার আলোয় এই ভুলভ্রান্তিগুলিই শুধরে যাচ্ছে। তাঁদের বিস্ময়কর শিক্ষা মানুষের জীবনে পূর্ণতা এনে দেবে। মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করতেই তাঁদের এই সংসারে আসা। জীবনের আর এক অর্থ হচ্ছে দুঃখ। কিন্তু এইসব দুঃখী মানুষদের সাহায্য করবার জন্যও লোক আছে। তাঁরা আছেন বলেই দুঃখ সহ্য করা যায়। যে কোন গ্রামে যান; সেখানকার

মানুষ যদি দেখে যে আপনি তাদের সাহায্য করতে এসেছেন, তবে তারা অত্যন্ত উৎসাহিত হবে। কারণ এযাবৎ কেউ তাদের উৎসাহ দেয়নি। সকলেই তাদের শুধু শোষণ করেছে। সেই উদ্দেশ্যেই তাদের কাছে গেছে। আদিবাসীদের কাছে যান, তাদের বলুন, 'আমি তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি'। কিন্তু শুধু বলাতেই কাজ হবে না। তারা আপনাকে সন্দেহ করবে। তাদের কাছে থেকে আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনি তাদের প্রকৃত বন্ধু। আর একবার যদি তা দেখাতে পারেন, তারা আপনার কাছে তাদের হৃদয় খুলে দেবে এবং আপনাকে তাদের প্রকৃত বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে। সুতরাং, এই ধরনের মনোভাব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, দুটি সমাজেই পরিব্যাপ্ত হওয়া দরকার। উন্নত রাষ্ট্রই হোক অথবা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রই হোক, বিশ্বের সর্বত্রই আমরা এক। এই অপূর্ব অদ্বৈতদর্শন আজকের পৃথিবীতে এক বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে।

গোটা বিশ্বকেই ওঠাতে হবে। পৃথিবীর একাংশকে ওঠালে চলবে না। কিন্তু তার জন্য আমাদের একটি দর্শন চাই। একটি বিশেষ আদর্শ চাই। শুধুমাত্র মানবিকতাবাদের কচকচি নয়, ওতে কিছু হবে না। তা আপনাকে পূর্ণত অনুপ্রাণিত করতে পারবে না। কাজের আগে সত্যের একটা ভিত্তি থাকতে হবে। অদ্বৈত দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা সেই সত্যই ঘোষণা করে বলছে, এক অনন্ত আত্মাই সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন। পার্থক্য যা কিছু, তা শুধু বাইরে, ইন্দ্রিয়ের স্তরে। অন্তরের গভীরে পূর্ণ একত্ব। আপনি এবং আমি এক। এই একত্ব উপলব্ধি করলে তবেই হৃদয় থেকে কেবল প্রেমই উৎসারিত হবে, জাগ্রত হবে সেবার মনোভাব। আমাদের প্রয়োজন মানুষের একত্বের এবং মানব-সেবার একটি প্রেরণাদায়ক দর্শন। বিবেকানন্দ এমনই একটি দর্শন প্রচার করে গেছেন যা আজ সারা পৃথিবীর মানুষ শুনতে চাইছে। এই কারণেই আজকাল তাঁর রচনাবলীর এত চাহিদা, এমনকি সোভিয়েট রাশিয়ার মতো দেশের মানুষদের কাছেও। সেখানে তাঁরা নিজেরাই 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' স্থাপন করেছেন। এবং এর উদ্যোক্তা একদল বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিজীবী। মস্কোয় এই সোসাইটি গড়ে উঠেছে। তাঁরা মনে করেন, এমন একটি দর্শন চাই, যা আজকের পৃথিবীকে নানাবিধ সমস্যার পীড়ন থেকে নিষ্কৃতি দেবে। বাস্তবিক, ভ্রান্ত দর্শনই আমাদের মুশকিলে ফেলেছে। আজ আমাদের একটি সুসংহত দর্শনের প্রয়োজন এবং বেদান্তই সেই দর্শন যাকে আমরা প্রয়াত ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী স্যার জুলিয়ান হাক্সলে (Julian Huxley)-র ভাষায় 'a science of human possibilities,' অথবা মানব সম্ভাবনা বিকাশের বিজ্ঞান বলতে পারি।

এই দর্শনের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের কারণ, এটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত। এতে আপনার প্রশ্নের স্বাধীনতা আছে; আপনি চাইলে এই দর্শনকে সম্পূর্ণ উল্টে দিতে পারেন। কিন্তু দর্শনটি একবার বোঝার চেষ্টা করুন, একে পরীক্ষা করে দেখুন, একে নিজে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। এই দর্শন বলে না আপনি সব কিছু বিশ্বাস করে নিন; এই দর্শন বলে, এই জন্মে, এই দেহে, পরম সত্য কী, তা অনুভব করুন। এই দর্শন স্বর্গে যাওয়ার ছাড়পত্র দেয় না। গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতমের বহু অংশে ও বুদ্ধের অভূতপূর্ব মৌলিক বাণীতে অদ্বৈতের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য যেরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে, সেই অদ্বৈত দৃষ্টি, একমাত্র যার থেকে পশুমনেও অনন্ত করুণার সৃষ্টি হয়, সেই অদ্বৈতবোধকে আজ বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অগ্রণী হতে হবে। যদি একবিংশ শতাব্দীতে আরো বেশি সংখ্যক মানুষ এই তত্ত্বটি বুঝতে পারে, তবে সত্যই এই শতাব্দী ধন্য হবে। সমস্তই প্রস্তুত আছে, কিন্তু এখনও প্রচুর বিকৃতি, হিংসা, দুষ্কর্ম ও মানবমনের দুর্বলতা রয়েছে। এগুলি শুধুমাত্র রাজনৈতিক উপায়ে দূরীভূত হবে না। এমনকি গণতন্ত্রও গুণ্ডাতন্ত্রে পরিণত হতে পারে। যে গণতন্ত্র এথেন্সে সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল, সেটি ছিল গুণ্ডাতন্ত্র। তখনকার এথেন্সবাসীরা জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তাই তারা এই মহান ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পেরেছিল। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা প্লেটোকে অতীব গণতন্ত্র-বিদ্বেষী করে তুলেছিল। তিনি বললেন, গণতন্ত্র হচ্ছে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাহীন জনতার শাসনতন্ত্র, এর মধ্যে উচ্চ কোন আদর্শ নেই। গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে তাই মানুষের মধ্যে নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ থাকা চাই। সুতরাং, আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক কলাকৌশল ও আজকের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পটভূমিকায়, বেদান্ত এক পরম আশীর্বাদ, কারণ তা মানুষের জীবন এবং বিকাশকে দিব্যায়িত করে তোলে। বেদান্তের সম্ভাবনা বিশ্বজুড়ে সমস্ত চিন্তাশীল মানুষের মর্মকে স্পর্শ করছে। এমনকি কমিউনিস্ট দেশগুলিতে যেখানে অধ্যাত্মচিন্তাভাবনা এতদিন অভিশপ্ত বিষয় বলে চিহ্নিত ছিল, সেখানেও দলে দলে মানুষ এই বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। কলকাতার সি.পি.এম-এর মতো ভারতীয় কমিউনিস্টরাও সম্প্রতি তাঁদের পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বিবেকানন্দের প্রশংসা করতে শুরু করেছেন। ইতঃপূর্বে কখনও তাঁরা একাজ করেননি। পৃথিবীর পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ এখন দার্শনিক পথনির্দেশ চাইছে, যা তারা সামান্য রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে পাচ্ছে না। রাজনৈতিক নেতারা আপনাকে কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে

যেতে পারেন, কিন্তু তার বেশি নয়। ঠিক যেমন অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লব পাশ্চাত্য দেশগুলিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারা দারিদ্র্য ও অন্যান্য অনেক সমস্যাই দূর করেছিল। তার ফলে কিছু অমঙ্গল লোপ পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার জায়গায় নতুন উৎপাত জুটেছে, যেগুলির ব্যাপ্তি অত্যন্ত গভীরে। পাশ্চাত্যে মানুষের মধ্যে যে বিকৃতি আজ চোখে পড়ছে, তা শুধু পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের অভাবের ফলে। ওখানে কেবল আংশিক জীবনদর্শন রয়েছে। সে দর্শন কাট-ছাঁট করা। এই জন্যই আজ পাশ্চাত্য সাহিত্যে 'হোলিস্টিক'[১] শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হচ্ছেঃ হোলিস্টিক ওষুধ, হোলিস্টিক জীবন, হোলিস্টিক স্বাস্থ্য, হোলিস্টিক এই, হোলিস্টিক সেই।

এইভাবে আজ ভারতবর্ষে আমাদের কাছে ও অন্যত্র বেদান্ত এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিদেশীরা এই দর্শনটির অন্বেষণে রত। একথা সত্য, তারা সহজে এর নাগাল পায় না; কিন্তু এও সত্য যে, আমাদের থেকে তারা অনেক বেশি বোঝে। ভারতবাসী আমরা এখনও ততটা ধারণা করতে পারি না কারণ অগ্রগতিহীন কয়েক শতাব্দীর পাষাণ-ভার এখনও আমাদের মনে চেপে রয়েছে এবং আমরা এখনও জীবনের সত্যকার সমস্যার সম্মুখীন হইনি। যখন সেই অভাববোধ এবং সমস্যার পীড়ন আসবে, তখনই আমরা গীতার ব্যবহারিক বেদান্তের আশ্রয় নেব। এখন আমরা মন্দিরে গিয়ে ঘণ্টা বাজিয়েই মনে করি সব করে ফেলেছি। কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানপালনকেই যথেষ্ট মনে করি। কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন। জীবন জটিলতর হচ্ছে, আরও সমস্যা আসছে। তখন, পাশ্চাত্যে যা ঘটেছে, সাবেকি ধর্মীয় ভাব কোনভাবেই এইসব কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে সাহায্য করবে না। তাই, আমাদের এমন কিছু দরকার, যা আরও গভীর, আরও শক্তিদায়ী, আরও বীর্যপ্রদ। সেই বীরবাণীই আমরা পাচ্ছি এই মহান গ্রন্থে যেখানে এক বীর আর এক বীরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। এই হচ্ছে গীতা।

অর্জুন বীর ছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বীরসিংহ। তাঁর এই শিক্ষাদান নেহাৎ ভালমানুষকে সস্তায় ধর্মলাভ করাবার জন্য নয়; ধর্ম বলতে তো আজ আমরা শুধু তাই বুঝি! ভারতবর্ষে, এমনকি পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও, ধর্ম সম্বন্ধে নিম্নতম ধারণা হলো এইঃ হরিদ্বারে যাও, গরুর ল্যাজ ধরে পুরোহিতকে পাঁচটা টাকা দাও, তাহলেই তুমি স্বর্গে যাবে। ঐ ধরনের মানুষের কাছে এই হচ্ছে ধর্মের শুরু ও শেষ। ঐটিই নিম্নতম পর্যায় এবং এই ধরনের

[১] Holistic শব্দটি এসেছে Holism থেকে। দর্শনটি কোন স্বতন্ত্র অংশের একক অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়।

সস্তা ভাব সারা ভারতে প্রচুর মিলবে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও এইসব করেন। সরকারের কিছু কিছু মন্ত্রীতো প্রায়ই এই জাতীয় ধর্মাচরণ করেন, যখন করবার মতো আরও অনেক কাজ তাঁদের আছে—যেমন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের উন্নতিসাধন, দেশের সেবা, মানুষকে শক্তিশালী করা, যাতে তারা দেশের আলোকপ্রাপ্ত নাগরিক হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়, ইত্যাদি। মানুষকেই গণতন্ত্রের কেন্দ্র করতে হবে। কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরা এই সস্তা ধর্ম পছন্দ করেন। কর্তব্যপালন করবার এবং দেশকে দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত করবার কোন ইচ্ছাই তাঁদের নেই। সেই কারণেই, প্রচুর রাজনৈতিক ডামাডোল সত্ত্বেও জনসাধারণের উন্নতি ও কল্যাণ এত অল্পমাত্রায় হয়েছে। প্রতিদিন আরও কত মানুষের বুক চিরেই না দুঃখের কাতর ক্রন্দন উঠছে! এ ব্যাপারে আমাদের কাছে গান্ধীজীর একটি নির্দেশ আছে যা তিনি কয়েকজন পরামর্শ-প্রার্থীকে দিয়েছিলেন। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ 'আমরা কি করব?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'কোন কিছু করবার আগে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে নিজেদের একটি প্রশ্ন কর ঃ আমি যা করব ভাবছি, তাতে কি আমার দেশের দুর্বলতম মানুষের কল্যাণ হবে? যদি সঠিক উত্তর পাও, তবে পরিকল্পনামাফিক কাজে লেগে যাও।' এইটিই আজকের দিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গান্ধীজী বলেছিলেন, যতদিন পর্যন্ত না আমি সর্বশেষ দুঃখী মানুষটির অশ্রু মুছিয়ে দিতে পারি, ততদিন আমার জীবন ও আমার কাজ চলতে থাকবে। উচ্চ আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ এই ভাব অতি সুন্দর। এই হলো সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ প্রকৃত রাজনীতি হলো তাই, যা মানুষকে নাগরিক হিসাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম করে তোলে। তারা অবশ্যই যেন হৃদয়ের অন্তস্তলে এই বাণীটি শুনতে পায় ঃ 'এই দেশ তোমার, তুমিই এই রাষ্ট্রের শক্তি'। আজ আমাদের রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতায় আসার জন্য মানুষকে *ব্যবহার* করতে চায়। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি মানুষকে গরু বাছুরের মতো কাজে *লাগাতে* ব্যস্ত। পাঁচ অথবা একশো টাকায় মানুষের ভোট কেনে তারা। এইখানেই গীতার শিক্ষা আমাদের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা সংশোধনের কাজে আমাদের সাহায্য করবে। কারণ এই শিক্ষার মধ্যে এমন শক্তি আছে যা রাজনীতি ও গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য।

বাস্তবিক, এই পঞ্চম অধ্যায়ে 'সাম্যদর্শন', অর্থাৎ *সমত্ব* বা *সমদর্শিত্বের* ব্যাখ্যা রয়েছে। আমরা সকলেই এক। এই সমন্বয়বোধ, এই একত্ববোধকে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কী চমৎকার ভাব! একটি সাধারণ মানুষ

একজন অসাধারণ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করছে না; কারণ তার মধ্যেও তো কিছু মহত্ত্ব আছে। এই আধুনিক যুগে, আমাদের দেশে এই ধরনের মানবীয় বিকাশ সম্ভব করে তুলতে হবে এবং সেটি সম্ভব করে তোলার জন্য যে দর্শন আমাদের সাহায্য করতে পারে, তা কর্মজীবনে বেদান্ত বা প্রায়োগিক অদ্বৈতবাদ রূপে এই গীতার শিক্ষায় বর্তমান। বিবেকানন্দ বলেছেন, ব্যবহারিক বেদান্তের জন্য কোন নতুন গ্রন্থের প্রয়োজন নেই, কারণ তার সর্বোৎকৃষ্ট বিন্যাস রয়েছে গীতায় এবং শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের মধ্যেও আপনি পাচ্ছেন ঃ *তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে*, '*কর্মযোগ কর্মসন্ন্যাসের চেয়ে শ্রেয়*'। আপনি হয়ত সুখে শান্তিতে আছেন। আপনার হয়ত কোনই ঝঞ্ঝাট নেই। কিন্তু তার মানে কি এই যে, চারপাশের দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করবার কোন দায়িত্ব আপনার নেই? কেন, আপনার কি হৃদয় নেই? অপরের দুঃখ-বেদনা অনুভব করার মতো ক্ষমতা নেই? হৃদয়ই যদি শুষ্ক হয়, তবে মনুষ্য-জীবন এবং ধর্মের প্রয়োজন কী? দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের মানুষদের হৃদয় যেন শুকিয়ে গেছে! প্রখর বুদ্ধি, অথচ শুষ্ক হৃদয়! বহু শতাব্দী আমাদের হৃদয় কোন কাজই করেনি। সাধারণত, আমরা ভাবি আর কারো না থাক, অন্তত নারীদের হৃদয় নামক বস্তুটি আছে। কিন্তু তারাও নিজের নিজের সন্তানের প্রতি আসক্তির গণ্ডিতে এমনভাবে আবদ্ধ, যে তাদের হৃদয় সেই সীমানা পেরিয়ে অন্য কারোর দিকে প্রসারিত হয় না। আমাদের দেশে এটিই হয়েছে। এই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, শঙ্করাচার্যের মস্তিষ্কের সঙ্গে বুদ্ধের হৃদয় সমন্বিত কর, তবে তুমি নিজেই একজন মহৎ ব্যক্তি হয়ে যাবে।

আধুনিক যুগে আমাদের এটাই কর্তব্য। আমাদের বুদ্ধি প্রখর, কিন্তু হৃদয় অত্যন্ত সংকীর্ণ। না হলে বধূদাহ এবং অনান্য পাপকর্ম আমাদের দেশে হয় কেন? কারণ একটাই—হৃদয়ের একান্ত অভাব। বুদ্ধি আছে। কিন্তু হৃদয় মৃতপ্রায়। আমাদের দেশের মানুষের এই হচ্ছে পরিস্থিতি। এইজন্যই বেদান্তের শিক্ষাটিকে কাজে পরিণত করার এত প্রয়োজন। এই শিক্ষার আলোকে আমাদের চরিত্রগঠন করতে হবে ও এক নতুন ধরনের মানবসমাজ গড়ে তুলতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, *সন্ন্যাসের* মাধ্যমে কর্মত্যাগ ও *কর্মযোগের* ভাবে কর্মানুষ্ঠান, উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি আরো ভালো, আরো উৎকৃষ্ট। পরের শ্লোকে তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছেন ঃ

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

—'তাঁকেই নিত্যসন্ন্যাসী বলে জানবে, যিনি রাগদ্বেষ রহিত, কারণ হে মহাবাহো, যিনি দ্বন্দ্বমুক্ত, তিনিই সহজে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হন।'

সেই ব্যক্তিকে নিত্যসন্ন্যাসী বলে জানবে। কোন্ ব্যক্তিকে? *যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি*, 'যাঁর কারুর প্রতি বিদ্বেষ নেই এবং যাঁর নিজের ভোগের প্রতি কোন লোভ নেই।' এই ধরনের মানুষ হচ্ছেন কর্মযোগী। *নির্দ্বন্দ্বো*, সংসারে ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখাদি যেসব বিপরীত অবস্থা বা দ্বন্দ্ব আছে, সেসব 'দ্বন্দ্ব থেকে তিনি মুক্ত'। *নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো*, 'এই সকল দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকেও তাঁর মন স্থির থাকে'। *সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে*, 'সেই পুরুষ অথবা নারী সহজেই সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হন,' যখন তিনি এই ধরনের মানসিক স্থিতি লাভ করেন। আপনি কাজের মধ্যে রয়েছেন, সমস্যার মধ্যে রয়েছেন, কিন্তু আপনার মন এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে সমস্ত সমস্যার সামনেও তা শান্ত ও অবিচলিত থাকতে সক্ষম! এই ধরনের ব্যক্তিকেই বলা হয় নিত্যসন্ন্যাসী। কী অপূর্ব অভিব্যক্তি! সন্দেহ নেই, সন্ন্যাস অত্যন্ত মহৎ, ভারতবর্ষে সকলেই সন্ন্যাসের প্রশংসা করে। কিন্তু 'সন্ন্যাসের' অর্থ কী? প্রথমে এর অর্থ ছিল স্ত্রীপুত্র অথবা স্বামী ও আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করে অরণ্যে যাওয়া এবং একাকী জীবনযাপন করা। রন্ধন করে নয়, ভিক্ষা করে খাওয়া। *নিরগ্নি*, 'যিনি অগ্নি স্পর্শ করেন না'; অর্থাৎ সন্ন্যাসী নিজের জন্য খাদ্যদ্রব্য তৈরি করেন না। মনে করুন তিনি একটি বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষা চাইলেন। গৃহবধূ যদি তাঁকে কাঁচা চাল ও আনাজ দেন, তিনি বলবেন, 'মা, আপনার কাছে কি একটু রান্না করা খাবার আছে?' বা হয়ত তাও বলবেন না। সাধারণত তিনি চুপ করেই থাকবেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং হিন্দু সন্ন্যাসীদের একই নিয়ম। কোন কিছু সঞ্চয় করা ও আহার্য প্রস্তুত করার দায় থেকে সন্ন্যাসীরা মুক্ত। তাঁরা কেবল ভিক্ষান্ন দ্বারাই জীবনধারণ করেন এবং প্রতি বাড়ি থেকে অল্প পরিমাণ ভিক্ষা নেন। তাঁরা এই প্রথাটির অপূর্ব একটি নাম দিয়েছেন—মাধুকরী। মৌমাছি যেমন মধু সঞ্চয় করতে নানা ফুলে বসে, একটি ফুলকে যেমন সে বেশি বিরক্ত করে না, তেমনই সন্ন্যাসী ভিক্ষা করবেন সাত-আট বাড়িতে ঘুরে ঘুরে, একটি বাড়ি থেকে নয়, যাতে একজন গৃহস্থের ওপর বেশি চাপ না পড়ে। এই হচ্ছে সন্ন্যাস আশ্রমের প্রচলিত ভাব।

এখন কথা হচ্ছে, সকলে তো *সন্ন্যাসী* হতে পারে না। তাহলে অন্যেরা কী?

তার উত্তরে অন্যরা হয়তো বলবেন—ওহো, আমরা ছাপোষা গৃহস্থমাত্র। এই হচ্ছে মনোভাব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকলকে বলবেন, না, তোমরাও সন্ন্যাসী। শ্লোকে যেসব গুণের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি যখনই আপনি আয়ত্ত করবেন, তখনই আপনি সন্ন্যাসী পদবাচ্য। আপনি বাড়িতে থাকুন, অথবা বাজারে কেনাবেচা করুন, তাতে কিছু আসে যায় না। সন্ন্যাসী হচ্ছে আপনার মনটি, যে মনোভাবটি আপনি গড়ে তুলেছেন। আপনি জগতের কল্যাণের জন্য যে কাজ করছেন, সেটি চলতেই থাকবে। কিন্তু আপনার মন মুক্ত। *সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে,* যাকে সংসার বন্ধন বলা হয়, 'সহজেই তুমি সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হবে'। ব্যঞ্জনার দিক থেকে এই শ্লোকটি আগের শ্লোক থেকে এক ধাপ এগিয়ে। কিন্তু এইটিই যথেষ্ট নয়। পরবর্তী শ্লোকটি এই তত্ত্বের সম্পূর্ণ মর্মার্থকে প্রকাশ করেছে।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌ ॥ ৪ ॥

—'বালসুলভ বা অপরিণত ব্যক্তিরাই সাংখ্য ও যোগকে স্বতন্ত্র পথরূপে বর্ণনা করে থাকেন, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তা করেন না; একটিতে সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে উভয়েরই ফল লাভ করা যায়।'

সাংখ্য ও *যোগ* হচ্ছে দুটি পথ। এই দুটির মধ্যে, সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে বনে গিয়ে আত্মোপলব্ধি করার প্রয়াসকে *সাংখ্য* নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এই পথটির উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, *যোগ* বা *কর্মযোগ* নামে আরো একটি পথ আছে। কিন্তু এখানে বলছেন যে, শুধুমাত্র অপরিণতবুদ্ধি যাঁদের, তাঁরাই বলেন যে 'এই দুটি পথ পৃথক'। যাঁদের বুদ্ধি অপরিণত সংস্কৃতে তাঁদের বলা হয় *বালাঃ,* 'ছেলেমানুষ', শিশু। এই দুটি পথ যে পৃথক, 'তা ছেলেমানুষি কথা'। ছেলেমানুষরা এইরকমই বলে থাকে : *বালাঃ প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ,* কিন্তু যাঁরা পণ্ডিত, যাঁরা প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন ও জ্ঞানী, তাঁরা কখনও বলবেন না যে এই দুটি পথ ভিন্ন। কেন? *একম্‌ অপি আস্থিতঃ সম্যক্‌ উভয়োঃ বিন্দতে ফলম্‌,* 'যদি কেউ একটিতে সম্যকরূপে স্থিত হন, তবে তিনি উভয়ের ফল লাভ করেন।' এইটিই হচ্ছে কথা। আপনি কর্মযোগ করছেন, তাই ঠিক ঠিক ভাবে করুন। তাহলে যে সন্ন্যাসী সর্বত্যাগ করে বনে গেছেন, আপনি তাঁরই সমকক্ষ হবেন। যে গৃহী কর্মযোগী রূপে কাজ করছেন, যিনি সংসার নির্বাহ ও মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করছেন, শ্রীকৃষ্ণ

তাঁকে এতটাই উচ্চ স্থান দিয়েছেন। কিন্তু আমরা তাঁর এই শিক্ষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি। আজকের অন্যতম প্রধান দোষ হলো গৃহস্থদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা ঃ 'আমি সংসারী, গৃহস্থমাত্র, আমার কোন মূল্যই নেই, আমি কোন কিছুর যোগ্য নই।' নিজের সম্বন্ধে এই ধরনের অমর্যাদাসূচক ভাব আজ মানুষের মনে এসেছে। নিজের প্রতি, নিজের জীবনযাত্রা-প্রণালীর প্রতি বিশ্বাস হারানো অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখুন। আমি আদর্শ গৃহস্থ না হতে পারি, কিন্তু আমি ভালো গৃহস্থ, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব আমি সঠিকভাবেই পালন করি। যে গৃহস্থরা দেশের জনসংখ্যার ৯৯.৯ শতাংশ, তাঁদের মনে এই আত্মপ্রত্যয় আসুক। যেসব মানুষকে প্রাত্যহিক জীবনে কঠিন পরীক্ষা ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়, তাঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আত্মমর্যাদা, আত্মশ্রদ্ধা জাগাতে চান। গৃহস্থ সম্বন্ধে এই হচ্ছে মহান ভারতীয় চিন্তা; কিন্তু আজ আমরা অনেক নিচে নেমে এসেছি, এই ধারণা থেকে বহু দূরে সরে এসেছি। এখন আমরা ভাবি, 'আমরা কেউ নই, কিছু নই'। আমি অনেক জায়গায় আমাদের গৃহীদের দুর্বল শ্রেণির প্রতি আরো সাহায্যপরায়ণ হতে বলেছি। কিন্তু তাদের কাছ থেকে সচরাচর যে উত্তরটি এসেছে তা এই—'আমরা তো *সন্ন্যাসী* নই, আমরা গৃহস্থ'। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছি, 'সেকি! কী বলতে চান আপনারা? মানুষের সেবা করে আপনারা আনন্দ পান না?' *মনুস্মৃতি* দেখুন। ঐ বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রটি থেকে আমি প্রায়ই একটি শ্লোক উদ্ধৃত করি, যেখানে গৃহস্থকে অতি উচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে। সেখানে মনুমহারাজ বলছেন যে, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই হচ্ছে জ্যেষ্ঠাশ্রম (৩.৭৮) ঃ

যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্যন্তে তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী ॥

—'কারণ গৃহস্থরাই অন্য তিনটি আশ্রমকে অন্ন ও শিক্ষাদান করে থাকেন। গৃহস্থাশ্রমই হচ্ছে জ্যেষ্ঠাশ্রম।'

ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী, তিনজনের একজনও উপার্জন করেন না। তাহলে সমস্ত সমাজটিকে কে চালনা করে? এই একটি মাত্র শ্রেণি যাকে গৃহস্থ বলা হয়। *তস্মাৎ*, 'সেইজন্য', *জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী*, 'গৃহস্থাশ্রমকেই বলা হয় জ্যেষ্ঠাশ্রম', অর্থাৎ কিনা বিশিষ্টতম *আশ্রম*। গৃহীদের কী উচ্চ মর্যাদাই না দেওয়া হয়েছে! কিন্তু এই গৃহস্থের চরিত্র কী রকম? আজ সেই গৃহস্থের তুল্য হচ্ছেন

গণতন্ত্রের স্বাধীন ও দায়িত্বশীল নাগরিক। নাগরিক শুধু নিজেরই নয়, সমস্ত দেশের দায়িত্ব বহন করেন। এইখানেই শ্রীকৃষ্ণের যোগদর্শনের উপযোগিতা এসে পড়ে। 'আমি সামান্য *সংসারী,* জাগতিক কাজকর্মে লিপ্ত, আমার কোন মর্যাদা নেই'—এই ধরনের হীন মনোভাব প্রাচীন বিধানকর্তা মনু-র দেওয়া উচ্চাসনের একেবারে বিপরীত। আজকে আমাদের *গৃহস্থদের* এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে। সাংখ্যযোগের *সন্ন্যাস* ও *জ্ঞান* দ্বারা যা লাভ করা যায়, সেই একই ফল লাভ করা যায় কর্মযোগ ও প্রাত্যহিক কর্মে আত্মোৎসর্গের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন—*যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে,* 'সাংখ্য বা আত্মজ্ঞানলাভের স্বতন্ত্র পথ দিয়ে যে মোক্ষলাভ করা যায়, যোগের অনুষ্ঠান করেও তুমি সেই একই মোক্ষলাভ করবে।' এই উক্তিটি *মহাভারত* ও অন্যত্র বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু আমরা এ সমস্তই বিস্মৃত হয়েছি। কেন? কারণ জাতির অধঃপতন ঘটেছিল, আমাদের শরীর, মন ও ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বলতা গ্রাস করেছিল। একগুঁয়েমিকে আমরা প্রবল ইচ্ছাশক্তি বলে ভুল করেছিলাম। সত্যি বলতে কি, আমাদের প্রচুর একগুঁয়েমি আছে। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি ও গোঁয়ার্তুমি এক জিনিস নয়। ইচ্ছাকে সংশোধন করা যায়, যদি একবার বোঝা যায় যে সেটি ঠিক নয়। কিন্তু গোঁয়ার্তুমি পাল্টানো যায় না। আমরা প্রায়ই গোঁয়ার্তুমিকে ইচ্ছা বলে ভুল করি। আমরা যখন বলি, 'অমুক ব্যক্তির খুব দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি' তখন কথাটির অর্থ দাঁড়ায় ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত একগুঁয়ে। এ ধরনের মানুষ কখনই পাল্টাবে না। আপনি যদি তাকে বলেন, যে খরগোশটি সে ধরেছে, তার শিং নেই, কেবল দুটি কান আছে, সে জোর দিয়ে বলবে, 'না, তার দুটি শিং আছে; এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত'। এই হচ্ছে একগুঁয়েমির অভিব্যক্তি। অতএব, নির্ভুল ও যথার্থ হতে গেলে চাই দৃঢ় ইচ্ছা ও স্বচ্ছ চিন্তা। আমাদের কথায়, চিন্তায় ও কর্মে এই যথার্থতার অভাব। এই যথার্থতা ও বাহুল্যহীনতাকে আমরা অনেকদিন আগেই নির্মূল করেছি। যে কথা দুটি বাক্যে ব্যক্ত করা যায়, তার জন্য আমরা দুশো বাক্য ব্যয় করি এবং শেষকালে কি বলেছি তার খেই হারিয়ে ফেলি। অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন যে দু'ঘণ্টা বক্তৃতা শোনার পরেও বক্তা কী যে বললেন তার মাথামুণ্ডু আপনি কিছুই বুঝতে পারেননি। তার কারণ বক্তব্যটি স্পষ্টভাবে, যথাযথভাবে পেশ করা হয়নি। এসব গুণ গভীর বৌদ্ধিক অনুশীলনের ফল যা আমাদের দেশের মানুষ ধীরে ধীরে আয়ত্ত করতে শুরু করেছে। সুতরাং, আজ যদি আমরা আমাদের দেশকে ক্ষমতাশালী করে গড়তে চাই, তবে মানুষের মনে পরিবর্তন আনতে হবে—তাদের মস্তিষ্কে তথ্য ঠেসে

দিয়ে নয়, মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের দেশের লোক অধিকাংশই ঠাসা মস্তিষ্কের। তাদের মতামত অনেক, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রত্যয় নেই। কাজে কাজেই, আমাদের সব পঞ্চায়েতে, জেলা পরিষদে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে ও বিধানসভায়, আপনি দেখবেন, প্রচুর বক্তৃতা হচ্ছে; কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। এটি হওয়ার কারণ মানুষের দুরবস্থা তাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। কোন মানুষকে বিপর্যস্ত দেখলে আপনি নিশ্চয় তাঁকে বক্তৃতা শোনাতে যাবেন না। বরং তাঁর দুঃখ দূর করতে তৎপর হবেন। সেইটিই আপনার প্রথম কাজ। ভগবান বুদ্ধ একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি তীরবিদ্ধ হয়েছেন। শরীরে তাঁর ক্ষত। এমন সময়ে একজন তাঁকে সাহায্য করতে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, 'বলতে পারেন, কে আমাকে তীর মেরেছে? কোন্ গাছের কাঠ দিয়ে তীরখানি তৈরি হয়েছে?' আহত ব্যক্তি এইরকম প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছেন। এই উদাহরণটি দিয়ে বুদ্ধ বলছেন, 'এইরকম দু-তিনটি প্রশ্নের উত্তর শুনতে শুনতেই তো শরাহত ব্যক্তিটি মারা যাবেন। সুতরাং প্রথমেই তীরটিকে তুলে ফেল।' বাস্তবিক, প্রথম কাজটি হলো তীরোৎপাটন। তারপর যতখুশি তীরের তত্ত্বনিরূপণ করুন। এটি একটি অসাধারণ উদাহরণ। ভারতবর্ষে আজ আমাদের এই শিক্ষাটিরই একান্ত প্রয়োজন। দেশের মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত, যন্ত্রণাপীড়িত। সেই যন্ত্রণা ও দুর্দশা আগে নির্মূল করুন; তারপর অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

—'জ্ঞানিরা যে পরমপদ লাভ করেন, কর্মযোগিরাও সেই একই পদলাভ করেন। সাংখ্য ও যোগকে যিনি অভিন্ন দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন।'

যোগ কী? সাংখ্য কী? প্রকৃতপক্ষে এই দুটি অভিন্ন। এইটিই যথার্থ উপলব্ধি। এইটিই সত্যদৃষ্টি। এখানে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলছেন।

সুতরাং, যিনি গৃহী, তিনি যদি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা করতে চান তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি যেন নিজেকে ছোট না করেন। অন্যকে সম্মান দেখাতে গিয়ে নিজেকে হীন প্রতিপন্ন করা উচিত নয়। এইটিই আমাদের প্রথমে শিক্ষা করতে হবে। আমাদের আত্মমর্যাদা অটুট রাখতে হবে। তবেই অপরকে শ্রদ্ধা করা সার্থক। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে, এমনকি

রাজনীতির ক্ষেত্রেও যখন দেখা যায় যে মন্ত্রিত্বের অভিলাষে মানুষ গিয়ে কোন সাধুর পায়ে পড়ছে, তখন তার আত্মমর্যাদা কোথায় দাঁড়ায়? গীতা কখনই এহেন আচরণ সমর্থন করে না। আপনি যদি অপরের পাদস্পর্শ করতে চান করুন, কিন্তু সে ইচ্ছা যেন আত্মশ্রদ্ধা এবং আত্মমর্যাদা থেকে উদ্ভূত হয়। অপরকে প্রণাম করে যে আপনার সম্মান বেড়েছে, এটি বোধ হওয়া উচিত। কিন্তু যাঁকে প্রণাম করছেন তিনি যদি সৎ ও নৈতিক মূল্যবোধ বিশিষ্ট মানুষ না হন, তাহলে সেটি অনুভব করা কখনই সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে আপনার আত্মমর্যাদার হানি হবে।

একবার মনে আছে, চণ্ডীগড়ে ও অমৃতসরে মেডিক্যাল কলেজে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এক শিখ ভদ্রলোক। অতি চমৎকার মানুষ এবং অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, যে কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর গোলমাল লেগেই থাকত। তাতে অবশ্য তিনি কিছু মনে করতেন না। তাঁর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয় কাবুলে। সেখানে তিনি শিশুদের জন্য নির্মিত একটি হসপিটালের দায়িত্বে ছিলেন। হসপিটালটি ভারত সরকার কাবুলকে দান করেন এবং ভারতীয় কর্মী ও ভারতীয় অনুদানের দ্বারাই সেটি পরিচালিত হতো। আমাকে ঐ হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঐ সময়ে কাবুলে আমি যতগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলাম, সবগুলিই শিখ ভদ্রলোক শুনেছিলেন। আমি কাবুল ছাড়ার কিছুদিন আগে তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'দেখুন, আমি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, কাউকে প্রণাম করি না, কিন্তু আপনাকে প্রণাম করার অনুমতি চাইছি'। বললাম, 'আমাকে প্রণাম করে যদি মনে হয় আপনার আত্মসম্মান বেড়েছে, তবেই প্রণাম করতে পারেন; নচেৎ নয়।' একথা শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। এমনিতেই তিনি প্রচণ্ড আত্মশ্রদ্ধার অধিকারী ছিলেন। তাঁর হারাবার কিছুই ছিল না; অতএব প্রণাম করে তিনি আনন্দিত হলেন।

এই সত্যটির দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। যা-কিছু অপরকে হীন প্রতিপন্ন করে, তা করা উচিত নয়; এবং যা নিজেকে ছোট করে, তাও করা উচিত নয়। আত্মশ্রদ্ধা জাগিয়ে সকলকেই ওপরে তুলতে হবে। তবেই আমরা একটি সুস্থ মানবসমাজ পেতে পারি। সমাজে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়েরই উচ্চ স্থান আছে। এই ভাবটি স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত বই *'কর্মযোগ'*-এ পাবেন। আমেরিকায় স্বামীজী কিছু বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বইটি ঐ বক্তৃতাগুলির সঙ্কলন। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়টির শিরোনাম 'নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়'।

সন্ন্যাসী বড় না গৃহস্থ বড়? তার উত্তরে স্বামীজী বলছেন, নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়। একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন, কিভাবে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে একজন বড় হয়। বাস্তবিক, প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা মহিমা আছে। ভারতবাসীকে আজ এইটি বেশ ভালো করে শিখতে হবে।

এরপর পাচ্ছি একটি চমৎকার উক্তি ঃ *একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি,* 'যোগ এবং সাংখ্য এক ও অভিন্ন'। কর্মসন্ন্যাস দ্বারা কোন পর্বতগুহায় গিয়ে *সমাধি* লাভের চেষ্টা এবং যোগের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে অনাসক্তি ও সেবাব্রতে ব্রতী হয়ে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করা, দুই-ই সমান। দুই-ই আপনাকে এক লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। কী অনবদ্য ভাব! মূলত এই সত্যটির ওপরেই গীতায় জোর দেওয়া হয়েছে। অন্য কোন গ্রন্থে এই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এবং সাধারণ মানুষের জীবনকে এত উন্নত করার প্রচেষ্টাও দেখা যায় না। একমাত্র গীতাতেই বলা হয়েছে—মনকে সর্বদা *যোগযুক্ত* রাখলে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিকতা ইহজন্মে ও ইহলোকেই, এই কর্মময়, সংঘর্ষময় জীবনেই লাভ করা যায়।

'হিতোপদেশ'-এর দ্বিতীয় ভাগে একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোক পাওয়া যায় (সন্ধি, ৯০)। শ্লোকটি হলো ঃ

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেষু সর্বেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্মণি যঃ প্রবর্ততে
নিবৃত্ত রাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥

'বনে বাস করেও যদি কেউ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি কামনা করেন, তবে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন বিঘ্নিত হবে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ-সুখের প্রতি আসক্ত মানুষ অরণ্যে ধ্যানের জীবন কাটাতে গেলেও উৎকট সমস্যার সম্মুখীন হবেন।' *গৃহেষু সর্বেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ,* 'কিন্তু ইন্দ্রিয় সংযত করে গৃহে থাকাই হচ্ছে তপস্যা।' তারপর আসছে, *অকুৎসিতে কর্মণি যঃ প্রবর্ততে নিবৃত্ত রাগস্য গৃহং তপোবনম্* । এটি একটি অত্যন্ত দৃঢ় ও স্পষ্ট ঘোষণা। *অকুৎসিতে কর্মণি যঃ প্রবর্ততে,* 'যাঁরা অনিন্দনীয় কর্মে রত'; *নিবৃত্ত রাগস্য,* 'যাঁরা ইন্দ্রিয়ের প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত'; *গৃহং তপোবনম্,* 'তাঁদের গৃহ তপোবনের সমান। সেই গৃহ তপোবন হয়ে যায়।'

লক্ষ্য করুন, আপনি কোথায় বাস করছেন তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি,

আপনি কিভাবে আপনার মনটিকে শিক্ষিত করে তুলছেন, কিভাবে তাকে গঠন করছেন, জোর দেওয়া হচ্ছে তার উপর। আপনি সেটি এখানে, অর্থাৎ গৃহেও করতে পারেন, আবার ওখানে, অর্থাৎ বনেও করতে পারেন। বস্তুত, মনকে সংযত করার কাজটি এখানে করতে পারলেই আপনি অধিক সফলকাম হবেন, কারণ প্রবল প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও আপনি মনকে দৃঢ় করে তুলছেন। বিঘ্ন না থাকলে প্রতিকূলতা অতিক্রম করার শক্তিও জাগে না। মন যদি কোন কিছুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত না হয়, তবে সেখানে মনের শক্তিপরীক্ষার কোন অবকাশই থাকে না। সেই অবস্থায় যা লাভ করবেন, তাও সামান্য হতে বাধ্য।

যাই হোক, বাধাবিঘ্নের মধ্যেও যদি আপনি মনকে শান্ত রাখতে পারেন, তবে আপনি ধন্য। একটা দৃষ্টান্ত দিই ঃ সন্ন্যাসীরা টাকা সঙ্গে রাখবেন না, সেইটিই নিয়ম। স্বামী বিবেকানন্দ কোন অর্থ সঙ্গে না নিয়েই সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছিলেন। ঐটি ছিল পুরাতন রীতি—অর্থ স্পর্শ না করে অর্থের প্রতি বৈরাগ্যভাব আনা। কিন্তু অর্থ ঘাঁটাঘাটি করেও কি আপনি অর্থের প্রতি অনাসক্ত থাকতে পারেন? তা যদি পারেন, বুঝতে হবে আপনি বাহাদুর! সেটি হবে অনেক বড় কৃতিত্ব। ব্যাঙ্কের একজন অফিসারকে কোটি কোটি টাকা সামলাতে হয়। তাঁর হাত দিয়েই সেগুলি আসে, যায়; সেখানে আটকে থাকে না। কিন্তু প্রায়শই আটকে যায়! একেই বলা হয় দুর্নীতি। কিন্তু নিয়ম হলো, টাকাগুলি আপনার হাত দিয়ে যথাস্থানে পৌঁছবে, কারণ ওগুলি আপনার নয়, জনসাধারণের। ঐগুলি আপনি নাড়াচাড়া করছেন মাত্র। গৃহী ভক্তের পক্ষেও এই সত্য প্রযোজ্য। ভক্ত পুরুষ বা নারী অনাসক্ত হয়ে টাকাকড়ি সামলাবেন এবং কেউ যদি এটা করতে পারেন তো যে মানুষটি বলছেন, 'আমি টাকা স্পর্শ করি না, অতএব আমি শুদ্ধ ও পবিত্র'—তাঁর থেকে তিনি অনেক ভালো। আপনি টাকাকড়ি ঘাঁটছেন, তবু আপনি শুদ্ধ ও নির্মল। কী অপূর্ব ভাব! আপনার সামনে এইরকম আরো অনেক পরীক্ষা আসবে। আপনাকে সবগুলিই উত্তীর্ণ হতে হবে। এই ভাবগুলি 'শ্রীমদ্ভাগবতম্', 'মহাভারত' ও 'গীতা'য় বারবার ব্যক্ত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে এই অনাসক্ত সংগ্রামের ওপরই জোর দিচ্ছেন, কারণ এভাবে আধ্যাত্মিকতার শিখরে ওঠা প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই সম্ভব। শুধু দরকার দৈনন্দিন কর্মজীবনে এই বিশেষ তত্ত্বটিকে মনে রেখে চলা। প্রাত্যহিক কর্ম ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে মনকে সংযত করে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে ওঠাতে যেন আমরা না ভুলি।

অতএব, প্রত্যেক অধ্যাত্মপিপাসুর প্রতি বেদান্তের উদাত্ত আহ্বানটি হলো, *ইন্দ্রিয়ের স্তরে ও দেহের স্তরেই আবদ্ধ হয়ে থেকো না।* সেটি হলো পশুর জীবন। জীবনের এই স্তরটি অতিক্রম করবার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। অতএব, এগিয়ে যাও; এক জায়গায় থেমে থেকো না। এইটিই বেদান্তের একমাত্র বার্তা। বেদান্ত ভোগের জীবনকে নিন্দা করে না; আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অর্থোপার্জন ও সংসার প্রতিপালনকে কখনই হেয় করে না। কারণ বেদান্তে শয়তানের কোন স্থান নেই। আমরা সকলেই মহৎ, সকলেই ভালো, কিন্তু বদ্ধ হবেন না। বদ্ধ জীবনকেই *সংসার* বলে। *সংসারী* হবেন না। যখন আপনি ইন্দ্রিয়ের স্তরে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন, তখনই আপনি *সংসারী*। নতুবা, আপনি সংসারে রয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কঠোর সংগ্রাম করছেন ও ক্রমশ উন্নত হচ্ছেন— ঠিক একটি শিশুর মতো। খাদ্য, পানীয় ও আরাম পেলেই শিশু সন্তুষ্ট। কিন্তু সেও ধীরে ধীরে বিদ্যোৎসাহী হয়, স্কুলে যায়, বই পড়ে এবং জ্ঞান ও উৎকর্ষের উচ্চ উচ্চ স্তরগুলির দিকে অগ্রসর হয়। জীবনের পথে এইভাবে চলতে চলতে এমন একটি পর্যায় আসবে, যখন দেখবেন আপনি কখন যেন ইন্দ্রিয়সীমার ঊর্ধ্বে, *সংসারের* পারে বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বদ্ধ জীবনের পারে চলে গেছেন। তখন আপনি আপনার স্বরূপ ও আপনার মধ্যে যে প্রচণ্ড সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তা উপলব্ধি করতে শুরু করবেন। ঈশ্বরই যে আপনার অন্তরে লুকিয়ে আছেন, সেই জ্ঞান আপনার হবে।

উন্নতির এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় *তপস্* বা তপস্যা। গার্হস্থ্য জীবনেও এই তপস্যা সম্ভব। তার অর্থ এই নয় যে আপনাকে শুষ্ক তপস্বী হতে হবে; মোটেই নয়। আপনি আপনার দৈনন্দিন জীবন উপভোগ করতে পারেন, হাসতে পারেন, সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন। কিন্তু এই স্তরেই আপনি আবদ্ধ নন। আপনি ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চস্তরে আরোহন করছেন। আপনি শিক্ষিত ব্যক্তি হলেও শিশুদের সঙ্গে খেলনা নিয়ে খেলতে পারেন; এতে কোন ক্ষতি নেই। আপনি একদিকে যেমন তাদের মনে উৎসাহ দিচ্ছেন তেমনি নিজেও কখনও শুষ্ক তপস্বীতে পরিণত হচ্ছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা বলতেন, 'শুষ্ক জ্ঞানী হয়ো না'। জগজ্জননীকে বলতেন, 'মা, আমাকে শুকনো সাধু করিসনি।' সেই ধরনের কঠোর তপশ্চর্যা, একদা যার সাধারণ লক্ষণ ছিল নীরস, নিরানন্দ, গম্ভীর, গোমড়া মুখ যা সামনে শিশু দেখলেও প্রসন্ন হতো না, এই ধরনের তপশ্চর্যার কোন স্থান বেদান্তে নেই। তাই বলছি, শুষ্ক তপস্বী হবেন না। এইখানেই বেদান্ত শিক্ষার প্রচণ্ড গুরুত্ব। বেদান্ত

বলে, এগিয়ে যান, এগিয়ে যান; নিরুদ্যম, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন না, এগিয়ে যান। উন্নতির অনেক শিখর আপনাকে জয় করতে হবে।

এই হচ্ছে কঠোপনিষদের (১.৩.১৪) সিংহগর্জন : *উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।* স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, 'ওঠো, জাগো, যতক্ষণ না লক্ষ্যে উপনীত হচ্ছ ততক্ষণ থেমো না।' লক্ষ্যটি কী? সেই লক্ষ্যটি হলো আমাদের অন্তঃস্থিত আত্মার যথার্থ অনুভূতি। আমার মধ্যে যে আত্মা, আপনার মধ্যেও সেই একই আত্মা। এক অবিভক্ত আত্মাই বর্তমান, আপাতদৃষ্টিতে যেন বিভিন্ন আধারে বিভক্ত হয়ে রয়েছেন। গীতার পরবর্তী এক অধ্যায়ে ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে (১৩.১৭; ১৮.২০ দেখুন) : *অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তম্ ইব চ স্থিতম্,* 'সেই অনন্ত আত্মা এক ও অভিন্ন, *অবিভক্তম্,* কিন্তু যেন বিভক্ত হয়ে আপনার মধ্যে, আমার মধ্যে, সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন।' অবশেষে আপনার এই জ্ঞান হবে, 'আমি সকলের সঙ্গে এক। আমিই সকলের মধ্যে। আমিই অনন্ত আত্মা।' আমি আকাশের মতো অখণ্ড; যদিও প্রাচীর তুলে আপাতদৃষ্টিতে আকাশকে বিভক্ত করা হয়, আকাশের কিন্তু এই সীমার জ্ঞান নেই। সেইজন্যই আত্মাকে আকাশের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কী অপূর্ব উদাহরণ! আকাশ সদানির্মল, সদাপবিত্র; কোনকিছুই তাকে কলুষিত করতে পারে না। আত্মাও সেইরকম। এইজন্য উপনিষদে আকাশ হচ্ছে আত্মার প্রতীক। চৈতন্য ছাড়া আকাশের অন্য সমস্ত গুণই আছে। আকাশকে চৈতন্যযুক্ত করলে তা হয় ব্রহ্ম। সেইজন্য অনেক জায়গায় দেখবেন বলা হয়েছে, ব্রহ্মই আকাশ, আকাশই ব্রহ্ম।

বেদান্তে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী দু'রকম আদর্শই আছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আমরা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করি; কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের জীবনের জন্য পাঁচশো বছরের একটি পরিকল্পনারও প্রয়োজন। ভেবে দেখুন, আমাদের যেসব পরিকল্পনা, তা থেকে কী ধরনের মানুষ তৈরি হচ্ছে? সে কি স্বার্থপর, অর্থ-উন্মাদ ও দুর্নীতিগ্রস্ত হবে? তা যদি হয়, তবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি যে কোন দেশের পক্ষেই অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের এমন সুন্দর মানুষ গড়ে তুলতে হবে, যারা নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে, যারা অপরকে ভালবাসবে, যারা সাধারণ লোককে ওঠাবার চেষ্টা করবে—এইটি হবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। সমস্ত গীতা জুড়েই এই শিক্ষা। গীতা বলে, মুক্তি পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরই

জন্মগত অধিকার। আজ হোক কিংবা কাল হোক, আপনার এই বিরাট সংগ্রাম, এই বিশাল অভিযান শেষ হবেই হবে এবং ইহজন্মেই, ইহলোকেই আপনি মুক্ত হবেন। হয়ত আপনাকে অনেক জন্মের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনার অনুভব হওয়া চাই যে আপনি মুক্তির পথে চলেছেন। এই রোমাঞ্চকর আধ্যাত্মিক অভিযানের তুলনায় জন্ম-মৃত্যু কী? ওগুলো তো যতিচিহ্ন মাত্র। বাক্যরচনার সময় যেমন আপনি কমা, সেমিকোলন দেন, ঠিক সেইরকম, কিন্তু দাঁড়ি নয়। দাঁড়ি হলেই সবকিছু শেষ। সেটিই হচ্ছে *মোক্ষ*, পূর্ণ আধ্যাত্মিক মুক্তি। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, যাত্রা চলতেই থাকবে এবং আমি আনন্দের সঙ্গে ভাবব যে, আমি মোক্ষপথের তীর্থযাত্রীর মহান সারির একজন হয়ে চলেছি। তাই আমাদের পাঠ্য পরের শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬॥

—'হে মহাবাহো, কর্মযোগ বিনা কর্মসন্ন্যাস লাভ করা অত্যন্ত কঠিন; যে ধ্যাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর চিত্ত কর্মযোগ দ্বারা শুদ্ধ হয়েছে, তিনি অচিরেই ব্রহ্মলাভ করেন।'

প্রকৃত *সন্ন্যাস*, কর্মসন্ন্যাস, বিশুদ্ধ *যোগ* বা *কর্মযোগ* ছাড়া লাভ করা যায় না। এই হচ্ছে গীতার ভাষা। প্রকৃত *সন্ন্যাস। কপট সন্ন্যাস* আপনি পেতে পারেন; কিন্তু প্রকৃত *সন্ন্যাস* নয়। *দুঃখম্ আপ্তুম্*, 'লাভ করা কঠিন'; *অযোগতঃ*, 'তার পক্ষে, যে *কর্মযোগ* অভ্যাস করেনি।' প্রথম হচ্ছে যোগাভ্যাস। তারপরে জানতে পারবেন কেমন করে কর্মত্যাগ করতে হয়। সেই ত্যাগটি হবে আধ্যাত্মিক; দৈহিক নয়। নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব পালন না করে আপনি কী করে প্রকৃত *সন্ন্যাস* লাভ করবেন? সমাজের প্রতি আপনার দায়িত্ব আছে। সেকথা কখনও ভুলবেন না। স্বামী বিবেকানন্দ 'মনুষ্যত্ব' ও 'সাধুত্ব' এই শব্দ দুটি ব্যবহার করে বলেছিলেন ঃ 'যথার্থ মানুষ না হয়ে সাধু হওয়ার চেষ্টা কোরো না'। মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপর সন্ন্যাস প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই তা খাঁটি হবে। সন্ন্যাস যদি পৌরুষের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে সে সন্ন্যাস ভান মাত্র। আর এদেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা এই ধরনের সন্ন্যাসের পিছনেই ছুটেছি। কপট সন্ন্যাস ঃ গেরুয়া ধারণ করে সাধু হওয়া! কিন্তু গীতার শিক্ষা অন্যরকম। আপনি যদি কঠোর শ্রম ও সংগ্রাম করে চরিত্র উন্নত করেন, জনগণকে সাহায্য

করেন, নাগরিকত্বের দায়িত্ব পালন করেন, তবেই আপনি প্রকৃত মহাত্মা হতে পারবেন। আপনার 'আমি'-কে বিকশিত করুন, বিস্তৃত করুন, সকলের মধ্যে নিজেকে অনুভব করুন। মানবিক উন্নতির সেটিই হলো প্রথম সোপান। এবং শেষ পর্যায়ে আপনি সেই 'আমি'-কে চিরতরে ত্যাগ করুন। একমাত্র ঈশ্বরই আছেন; 'আমি' বলে কোথাও কিছু নেই। সুতরাং, অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বারা প্রথমে আমাদের কাঁচা আমিকে সম্প্রসারিত না করে 'আমিত্ব' ত্যাগ সম্ভব নয় এবং আমিত্ব ত্যাগ না হলে সে ত্যাগ ত্যাগই নয়। সে লোকদেখানো ত্যাগ।

আমাদের দেশের কিছু মানুষ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন ঃ ভারতে সবাই সাধু হতে চায়, কিন্তু সকলের সঙ্গে সু-সম্পর্কযুক্ত মানুষ কেউই হতে চায় না। তিনি বলেছিলেন, ''আমার কাছে একটি গরিব লোক এসে বলে, 'স্বামীজী, আমি সংসার ত্যাগ করতে চাই'। আমি তাকে বলি, 'তোমার কী আছে যে ত্যাগ করবে? না আছে শক্তসবল শরীর, না আছে পরিশীলিত মন, না আছে পকেটে পয়সা। তুমি কী ত্যাগ করবে? ত্যাগ করার মতো কিছু তো থাকা চাই। যখন তোমার ত্যাগ করার মতো কিছু থাকবে, তখনই প্রকৃত ত্যাগ সম্ভব'।'' তাই এখানে বলা হচ্ছে, *সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখম্ আপ্তুম্ অযোগতঃ*, 'এই যোগ বা কর্মযোগ-এর অনুশীলন না করে, চারিত্রিক যোগ্যতা ও লোকহিতকর মনোবৃত্তি, সেবা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব অর্জন না করে, কেউই প্রকৃত *সন্ন্যাস* লাভ করতে পারে না।'

ভাস কালিদাসের মতোই মহান কবি ছিলেন। তাঁর 'অভিমার' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকটি অতি সুন্দর। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

প্রাজ্ঞস্য মূর্খস্য চ কার্যযোগে
সমত্বম্ অভ্যেতি তনুঃ ন বুদ্ধিঃ—

—'প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে ও মূর্খ ব্যক্তিকে কর্মরত অবস্থায় একই রকম দেখায়; কিন্তু মনের দিক থেকে তারা ভিন্ন গোত্রের মানুষ।'

দু-তিন বছর আগে, হায়দ্রাবাদে অন্ধ্র সরকারের সচিবালয়ে এক বক্তৃতায় বলেছিলাম, 'কেরানীর কাজ কর, কিন্তু কেরানীর মন নিয়ে নয়, স্বাধীন ভারতীয় নাগরিকের মন নিয়ে।' প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই উক্তিটি প্রযোজ্য। কোন কাজ মহৎ হয় তখনই, যখন মহৎ মনের দ্বারা তা সম্পাদিত হয়। ক্ষুদ্র মনের সাহায্যে কাজ করলে তা ক্ষুদ্রই হয়। কাজটি বড় নয়, কাজের পেছনে যে মন রয়েছে, সেইটিই কাজটিকে বড় করে তোলে। মা আপনার জন্য রান্না করেন, আর

মাইনে করা রাঁধুনিও আপনাকে রেঁধে দেয়। রান্নার কাজটা একই, কিন্তু দুজনের মনোভাবের কত তফাৎ। সুতরাং, মানুষের ক্ষেত্রে, এই মানসিক দিকটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কী করে এই মনকে সমৃদ্ধ করা যায়? শুদ্ধ করা যায়? অসীম করা যায়? এর উত্তর কর্মযোগে আছে। মনকে ঠিক মতো তৈরি করার এই কাজটি আমাদেরই করতে হবে। আপনি যখন কাজ করেন, দেখতে হবে আপনি কিভাবে মনকে কাজে লাগাচ্ছেন। সাধারণত কেউই মন নিয়ে মাথা ঘামায় না। যখন আমরা কাজ করি, তখন কাজটি নিয়েই ব্যস্ত থাকি। মনের কথা চিন্তা করি না। কিন্তু না, তা করলে হবে না। কারণ কাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য আপনাকে শিক্ষিত করা, আলোকপ্রাপ্ত করে তোলা।

কর্ম কেবল কর্ম নয়, কর্মই শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। আহা, কী চমৎকার চিন্তা বলুন তো! বাস্তবিক, কর্মকে শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে দেখতে হবে। শিক্ষা মানে শুধু বই পড়া নয়। আপনি যে কাজ করছেন, আপনার সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক, সব কিছু থেকেই আপনি শিখছেন। তার দ্বারাই আপনার বিকাশ হচ্ছে। এইটিই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা যা সকলের প্রয়োজন—ছোট, বড়, প্রাচ্যদেশীয়, পাশ্চাত্যদেশীয়, অজ্ঞেয়বাদী, নাস্তিক, ধার্মিক—সকলের। মানুষ হিসাবে কীভাবে আপনি বেড়ে ওঠেন? কীভাবে আপনি আপনার সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে বিকশিত করবেন? এই সব প্রশ্ন মনে উঠলে গীতা পড়ুন; দেখবেন, তার মধ্যে পথনির্দেশ পাবেন। জীবনের সব পরিস্থিতিকে—শারীরিক, বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক—এক কথায়, সর্বাত্মক শিক্ষালাভের কাজে নিয়োজিত করুন। কর্ম ও দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে কাজে লাগাবার কৌশলটি যদি আপনার জানা থাকে, তবে সব শিক্ষাই আপনার করতলগত হবে। পরিস্থিতি যেন আপনাকে না চালায়। আপনিই আপনার জীবন ও কর্মের নিয়ামক হোন। তা যদি হন, তবেই আপনি মুক্ত। নতুবা আপনি জন্তুমাত্র। পশু কখনও তার জীবনের পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। পরিস্থিতিই তাকে চালায়। লাঙ্গলের সঙ্গে যে বলদকে জুতে দেওয়া হয়েছে, সে কীই বা করতে পারে? যতক্ষণ না কেউ তাকে থামাচ্ছে, সে কর্মই করে যায়। মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সে কাজ করে ঠিকই, কিন্তু সে আরও বেশি কিছু করে। সে আপন আত্মার অনন্ত নিত্যমুক্ত স্বরূপটিকে উপলব্ধি করার জন্য মনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে, অন্তর্জীবনকে সমৃদ্ধ করে নিজের ভিতরে ডুব দেয়। এইভাবেই আপাতক্ষুদ্র মানুষের ভিতর থেকে একটি মহৎ মানুষের অভ্যুদয় ঘটে। আমাদের প্রাকৃত ব্যক্তিত্বের উপরেই উচ্চতর ব্যক্তিত্বটিকে গড়ে তুলতে হবে।

এই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা, যা শুধু স্কুল, কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমিত নয়। সমগ্র জীবন থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। এই হচ্ছে গীতার মূল শিক্ষা। আপনি নিজের উপরেই নিজেকে গড়ে তুলুন। অর্থাৎ, এখন যা আছেন, তাকেও ছাড়িয়ে যান। বর্তমান জীবনটি যেন কাঁচামাল, অপরিমার্জিত বস্তু! বিশেষ প্রক্রিয়ায় শোধন করলে এর থেকেই সুন্দর কোন বস্তুর বিকাশ হবে। অল্প বয়সে শরীর ও মন নিয়ে আমাদের যে সত্তা, সেটি কাঁচা উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। এটিকে আমাদের রূপান্তরিত করতে হবে। এই সমগ্র রূপান্তরণ প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে শিক্ষা। এর মধ্যে ধর্ম বা আধ্যাত্মিক উন্নতি হলো একটি উচ্চতর পর্যায়। সমগ্র শিক্ষা প্রক্রিয়াটি অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে এবং এ ব্যাপারে প্রত্যেকেরই দায়িত্ব রয়েছে, প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে। কেউ যদি এই সুযোগ ও দায়িত্বকে অবহেলা করে পশুর স্তরে পড়ে থাকে, তবে সেটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। সমস্ত দুঃখ ও দুর্দশার উৎসই ঐ নিম্নস্তরের জীবনযাপন। সাহিত্য পড়ুন। দেখবেন, যত বিয়োগান্তক নাটক বা উপাখ্যান রচিত হয়েছে, সব ঐ জৈব স্তরে আবদ্ধ কোন না কোন চরিত্রকে কেন্দ্র করে। এটি হওয়া উচিত নয়। মহৎ হন। চেষ্টা করুন উন্নত হতে, বড় হতে। বিস্তার এবং বিকাশই হলো আসল কথা। সংস্কৃতে আমরা বলি *আত্মবিকাশ।* আমি কি উন্নত হয়েছি, আমার কি আধ্যাত্মিক বিকাশ হয়েছে? নিজেকে এই প্রশ্নটি প্রত্যেকেরই করা দরকার। প্রথমে দৈহিক বিকাশ, দেহের শক্তি বাড়ানো। তারপর মানসিক বিকাশ, জ্ঞানের শক্তি বাড়ানো। সবশেষে আধ্যাত্মিক বিকাশ, আমাদের অনন্ত স্বরূপের উপলব্ধি অর্থাৎ সকলের সঙ্গে নিজের একত্ব অনুভব করা। যখন অধিকাংশ মানুষ দৈহিক বিকাশ থেকে আধ্যাত্মিক বিকাশের পথে এগিয়ে যাবে, সেদিন কী সুন্দর সমাজই না সৃষ্টি হবে। সেইটিই হবে প্রকৃত উন্নত সমাজ। স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন[১] : '...সত্য প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান করে না, সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে, নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক।'

এবার শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

—'নিষ্কাম কর্মযোগ সহায়ে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে, যিনি সংযত দেহ ও জিতেন্দ্রিয়

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭

হন ও সর্বভূতস্থ আত্মাকে নিজের আত্মারূপে উপলব্ধি করেন, তিনি কর্ম করেও লিপ্ত, অর্থাৎ বদ্ধ হন না।'

যোগযুক্তো, 'যিনি কর্মযোগে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত'; *বিশুদ্ধাত্মা,* 'বিশুদ্ধচিত্ত'; *বিজিতাত্মা,* 'যিনি দেহভাব জয় করেছেন' এবং *জিতেন্দ্রিয়,* 'যিনি ইন্দ্রিয় জয়ী'। এই রকম উচ্চ অবস্থা লাভ করার জন্য যিনি জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়েছেন, *সর্বভূতাত্মভূতাত্মা,* 'যিনি নিজ আত্মার সঙ্গে সকলের আত্মার একত্ব অনুভব করেন, তিনি কখনও মনে করেন না যে, তিনি তাঁর ক্ষুদ্র জৈব অস্তিত্বের মধ্যেই সীমিত; তাঁর চেতনা তখন এমন বিস্তার লাভ করে যে, সর্বভূতের সঙ্গে এক হয়ে তিনি অসীম আত্মাই হয়ে যান।' *সর্বভূতাত্মভূতাত্মা,* এখানে *সর্ব* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সর্ব অর্থাৎ সমগ্র। এতদিন আপনি ছিলেন বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তি। একটু আধ্যাত্মিক বিকাশ হলেই আপনি অন্যান্যদের সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করবেন, মানুষের সেবা করবার আগ্রহ জাগবে এবং আপনি একজন সৎ নাগরিক হয়ে উঠবেন। কিন্তু হৃদয়ের সর্বোচ্চ বিকাশটি তখনই হবে, যখন আপনি সবার সঙ্গে একত্ব বোধ করবেন। তখন আপনি সকলের দুঃখে দুখী এবং সকলের সুখে সুখী হবেন। কেননা তখন আপনি বুঝেছেন যে, এক অনন্ত আত্মাই বর্তমান। *সর্বভূতাত্মভূতাত্মা,* যিনি সর্বভূতের আত্মা বলে নিজেকে উপলব্ধি করেছেন, এই ধরনের ব্যক্তি, *কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে,* 'সর্বদা কাজ করলেও কখনও বদ্ধ হন না'। অনুপম এই ব্যক্তি! বেদান্তের দৃষ্টিতে এই হলো মানুষের ক্রমবিকাশ, ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে, অংশ থেকে পূর্ণতায়, বিশেষ থেকে বিশ্বায়নে। জীবনের শুরুতে শিশুর কাছে নিজের দেহই তার সম্পূর্ণ পরিচয়। সে আর অন্য কিছুই ভাবতে পারে না। নিজের দেহটিকে সে সুরক্ষিত রাখতে চায়। মায়ের দেহের উষ্ণতা, মায়ের ত্বকের স্পর্শ সে পেতে চায়; এটি তার নিরাপত্তাবোধ ও বড় হওয়ার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিশুর ক্ষেত্রে এই আচরণ খুবই সঙ্গত। কিন্তু তার পক্ষে এইভাবে বেশিদিন থাকা উচিত নয়। সে যতই বড় হয়, ততই সে বুঝতে পারে কি করে দেহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে হয়, বড় হতে হয়, অপরকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে হয় এবং ভালবাসতে হয়। এই হলো তার ক্রমবিকাশ।

এই বিকাশের প্রকৃতি কী? তার উত্তরে সাধারণভাবে বলতে হয়, এটি মানসিক বিকাশ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিকাশ অথবা *অধ্যাত্ম বিকাশ,* যা মানসিক প্রসারতার মাধ্যমে সম্ভব হয়। একজন সদ্‌গুণসম্পন্ন নাগরিক অবশ্যই আধ্যাত্মিকভাবে বিকশিত হয়েছেন, কারণ জানবেন তিনি তাঁর দেশবাসীর দুঃখ অনুভব

করতে শিখেছেন এবং তিনি ভাবেন 'আমাকে তাদের কাছে গিয়ে সাহায্য করতে হবে।' সীমিত স্বাদেশিকতাবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে একেই বলা হয় নাগরিকত্ব। কিন্তু আজ নাগরিকত্বের ধারণা ব্যাপক, নাগরিক বলতে এখন বিশ্বনাগরিককেই বোঝায়। বাস্তবিক, সমগ্র বিশ্ব তো এক ও অবিভক্ত। এই যে অখণ্ড চেতনা, একেই আজ আমরা মানবিক সচেতনতা বলে থাকি। এই ভাবে, আপনি যখন আপনার ক্ষুদ্র অহং এবং জৈব সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারেন, তখনই আপনার 'আমিত্ব'-র ধারণাটি বিস্তৃত হয়। বিকাশের এই প্রথম পর্যায়টি হলো সামাজিক সচেতনতা, অন্যের প্রতি দরদ। আপনার আধ্যাত্মিক বিকাশ যে শুরু হয়েছে, অন্যের প্রতি এই সহানুভূতিই তার প্রমাণ। জীবনের পথে চলতে চলতে এই ভাবটি যখন গাঢ় হয়, তখনই তা হয়ে দাঁড়ায় *সর্বভূতাত্মভূতাত্মা,* অর্থাৎ 'আমিই সর্বভূতের আত্মা'। এই চরম বিকাশটি অনন্যসাধারণ; যিশু বা বুদ্ধের মতো মাত্র অল্প কয়েকজনই এই পরম একত্ব অনুভব করেছেন। সর্বজীবের প্রতি তাঁদের যে অকৃপণ করুণা, তার মূলে ছিল এই তত্ত্ব বা ভাবটি। আমাদের পুরাণের শিবও ঠিক এই প্রকৃতির। তিনি সকলের সঙ্গে এক। দয়ায় পরিপূর্ণ তাঁর হৃদয়। অতএব, *কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে,* 'কর্ম করলেও এই ব্যক্তি কখনও কর্মে লিপ্ত হন না।'। মন শুদ্ধ, তাই এই পথে অগ্রসর হতে হতে এই উপলব্ধি গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকবে। পরবর্তী দুটি শ্লোকে এই ভাবটিকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

—'(আত্মায়) প্রতিষ্ঠিত (হয়ে) সত্যদ্রষ্টা চিন্তা করবেন, "আমি কিছুই করি না"—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ, কথন, মলমূত্রাদি ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুরুন্মীলন ও নিমীলন—এই কর্মগুলি করেও তাঁর নিশ্চিত ধারণা হবে এগুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইন্দ্রিয়দের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত থাকার কারণে।'

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ, 'তত্ত্বজ্ঞানী, *তত্ত্ববিৎ,* এইভাবে চিন্তা করবেন যে, "আমি কিছুই করি না"। অনেক কাজ করছি অথচ প্রকৃতপক্ষে

'আমি' কিছুই করছি না। *যুক্তো,* 'একজন যোগী'; *মন্যেত তত্ত্ববিৎ,* 'একজন তত্ত্বদর্শী' তাঁর সমস্ত কর্ম সম্বন্ধে 'অবশ্যই এরকম ধারণা পোষণ করবেন।' এই কর্মে কী কী অন্তর্ভুক্ত? সমস্ত কিছুই। তিন পংক্তিতে গীতা এর নমুনা দিচ্ছেন। নমুনাটি কী? *পশ্যন্,* 'দেখা', *শৃণ্বন্,* 'শোনা'; *স্পৃশন্,* 'ছোঁয়া'; *জিঘ্রন্,* 'ঘ্রাণ নেওয়া'; *অশ্নন্,* 'খাওয়া'; *গচ্ছন্,* 'যাওয়া'; *স্বপন্,* 'ঘুমানো'; *শ্বসন্,* 'শ্বাস নেওয়া'; *প্রলপন্,* 'কথা বলা'; *বিসৃজন,* 'মলমূত্রাদিত্যাগ করা'; *গৃহ্নন্,* 'গ্রহণ করা'; *উন্মিষন্,* '(চোখ) খোলা'; *নিমিষন্,* 'চোখ বোঁজা'; *অপি; ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্,* 'ইন্দ্রিয়গুলি নিজের নিজের বিষয়ে লিপ্ত হয়ে তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করছে, "আমি কিছুই করছি না", এবিষয়ে নিশ্চিত ধারণা'। যে ব্যক্তির এই ধারণা আছে, তিনি ইচ্ছামাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতে পারেন, আবার সংযুক্তও করতে পারেন। আসক্ত হওয়ার শক্তি এবং অনাসক্ত হওয়ার শক্তি, প্রত্যেককেই এই যুগ্ম ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। তাকেই মুক্তি বলে। শুধু একটি থাকলে তা মুক্তি নয়। দুটি থাকলে তবেই মুক্তি। যেমন ধরুন, বাড়িতে বয়োজ্যেষ্ঠ এক ব্যক্তি রয়েছেন। তিনি এমনিতে অত্যন্ত অনাসক্ত, কিন্তু তিনি শিশুদের সঙ্গে খেলতে পারেন, মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, সমস্ত কিছু উপভোগ করতে পারেন। এতসব করেও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অনাসক্ত এবং মুক্ত। এইটিই হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন। নতুবা, কেবল তপস্বীর মনোভাব নিয়ে 'আমি মুক্ত, আমি অনাসক্ত' বলছি, অথচ অপরে হাসলে মুখ গোমড়া করে আছি, এটি প্রকৃত মুক্তি নয়। এটি আর এক ধরনের বদ্ধাবস্থা। সুতরাং এইখানে বলা হচ্ছে, *যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে,* 'কর্ম করা সত্ত্বেও তুমি ঐ কর্মে লিপ্ত হচ্ছ না।' *লেপন* অর্থাৎ 'কলঙ্কিত করা' বা দেহে কোন ময়লা লাগা। মানুষ তার আত্মাকে ইন্দ্রিয়গুলির কাজকর্ম থেকে আলাদা করতে পারে, সেই শক্তি তার আছে। সেখানেই মুক্তির অনুভূতি। এই স্তর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কর্ম থেকে পৃথক থাকার শক্তি থেকেই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি শুরু হয়। কোন পশুর দ্বারাই এ কাজ সম্ভব নয়, এমনকি শিম্পাঞ্জিও পারে না। কিন্তু মানুষ এই ক্ষমতার সামান্য বিকাশ ঘটিয়েছে বলেই সে অন্যান্য পশুর উপর প্রভুত্ব করতে পারে। স্নায়ুবিজ্ঞানে এই কথাই বলা হয়েছে। গ্রে ওয়ালটার-এর (Gray Walter) 'দ্য লিভিং ব্রেন' নামক গ্রন্থে এই তথ্য আছে। সেখানে মানুষের চিত্রকল্প রচনার ক্ষমতা বা কল্পনাশক্তির কথা বলা হয়েছে। তিনি বলছেন, কোন কাজ করার আগে পরিস্থিতি কী দাঁড়াতে পারে তা কল্পনা করে নিয়ে *তারপর* আপনি কাজ

করতে পারেন। আবার বাহ্যত কাজটি করার আগেই কল্পনায় আপনি কাজের ধারাটি বদলে নিতে পারেন। একমাত্র মানুষেরই এই ক্ষমতা আছে এবং এই দিয়েই সে সমগ্র প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করছে। গ্রে ওয়ালটার বলছেন যে, 'আমার কথা যদি গ্রহণযোগ্য মনে না করেন, তবে আমি শুধু আপনাকে একটি কথাই জিজ্ঞাসা করব। ধরুন, বাঘ বা সিংহ এই ক্ষমতা লাভ করলো। তার পরিণতি কী হবে? [তার উত্তরে বলা যায়] সে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমরা কেউ আর এখানে থাকব না।' কারণ, যে পশু এই ক্ষমতার অধিকারী হবে, সেই সকলকে শাসন করবে। কল্পনার এতই শক্তি। ইন্দ্রিয়তন্ত্রের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, কোন্‌টি কি তা নির্ণয় করে, অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ বিচার করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক আচরণ করা, এ শুধু সাধারণ প্রণালীতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্রমানুসরণ নয়। এখানে আগাম চিন্তা (input) ও কাজ (output)—এই দুয়ের মাঝখানে রয়েছে কল্পনা। কল্পনার ছোঁয়ায় সম্পূর্ণ চিত্রটাই বদলে যায়। এখানেই অনাসক্তির প্রারম্ভিক প্রকাশ। একে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে যেতে হবে। অধিকাংশ মানুষই প্রাথমিক পর্যায়ে থেমে যান। তাই তাঁদের দুঃখও পেতে হয়। এই সম্পূর্ণ ভাবটি অপূর্ব এই উক্তিটির ভিতর নিহিত—*কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে,* 'কর্ম করা সত্ত্বেও তুমি কর্ম বা কর্মফল দ্বারা মলিন হও না।' এই অধ্যায়ে এযাবৎ আমরা যা অধ্যয়ন করেছি, তার পরিপূর্ণতা দেখি পরের শ্লোকটিতে।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

—'যিনি সমস্ত কর্মফল ব্রহ্মে অর্পণ করে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করেন, পদ্মপত্র যেমন জলের দ্বারা সিক্ত হয় না, তিনিও তেমন পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না।'

এটি এই অধ্যায়ের অতি পরিচিত একটি শ্লোক। *ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি,* 'সকল কর্মফল ব্রহ্মে অর্পণ করে'। চতুর্থ অধ্যায়ের ২৪তম শ্লোকে আমরা পেয়েছি এই শ্লোকটি যেটি ভোজনের আগে প্রার্থনামন্ত্র হিসাবে আমরা উচ্চারণ করে থাকি :

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা ॥

—'হবনীয় দ্রব্য যা অর্পিত হয়েছে, হোমাগ্নি, যজ্ঞে যিনি আহুতি দিচ্ছেন ও যজ্ঞফল, সমস্তই ব্রহ্ম।'

এখানে দশম শ্লোকটিতে বলা হয়েছে তোমার সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ কর। কারণ, সমস্ত কিছুই এসেছে, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ শাশ্বত আধ্যাত্মিক উৎস ব্রহ্ম থেকে। সব কিছুকে তাই ব্রহ্মে ফিরিয়ে দিতে হবে। *ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা,* 'সকল আসক্তি ত্যাগ করে ও সমস্ত কর্ম ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে অর্পণ করে'; *করোতি যঃ,* 'যিনি এরকম করেন'; *লিপ্যতে ন স পাপেন,* 'তিনি কখনও পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না'; *পদ্মপত্রম্ ইব অম্ভসা,* 'পদ্মপাতার মতো, যা জলে থেকেও জলের দ্বারা সিক্ত হয় না।' আমাদের সমগ্র সাহিত্যে এটি এক বিখ্যাত উপমা। *পদ্মপত্রম্ ইব অম্ভসা; অম্ভস্* অর্থাৎ জল; *পদ্মপত্রম্,* 'পদ্ম ফুলের পাতা'। অতএব, পদ্মপাতা সর্বদা জলে থাকা সত্ত্বেও ভেজে না। জল থেকে তুলে নিন, সমস্ত জল ঝরে যাবে। অনুরূপভাবে, নিষ্কাম কর্মযোগী দিনরাত কাজ করছেন, কিন্তু কাজ তাঁকে স্পর্শ করে না, তাঁকে মলিন করে না। কী সুন্দর ভাব! যে কেউ নিজের জীবনে এই কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, কারণ এগুলি সব এমন সত্য যা যাচাই করে নেওয়া যায়। অতএব এটি পুরোপুরি বিজ্ঞান, মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার বিজ্ঞান। যা কিছু আপনি যাচাই করে নিতে পারেন, তাই-ই বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু কোন বিশ্বাস, যার যথার্থতা যাচাই করা হয়নি, তা বিজ্ঞান হতে পারে না। আবার সেই বিশ্বাস যখন সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তখন তা বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা পাবে। গীতা মানুষ সম্পর্কে এই জাতীয় অনেক সত্য উন্মোচিত করেছে, যা বহু মানুষ বারবার যাচাই করেছেন এবং এখনও করা যেতে পারে। গীতা সত্যগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে যাতে সেগুলিকে আমরা যাচাই করে নিতে পারি; মুখ বুজে বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে না। একপা, দু'পা করে এগিয়ে দেখুন, কতদূর এই বিশেষ সত্যকে আপনি বাজিয়ে নিতে পারেন। অতএব, *ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি,* 'সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করে'; *সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ,* 'যিনি অনাসক্ত হয়ে কর্ম করেন'; *লিপ্যতে ন স পাপেন,* 'এরকম মানুষকে পাপ কখনও স্পর্শ করে না'; *পদ্মপত্রম্ ইব অম্ভসা,* 'যেমন পদ্মপাতাকে জল ভেজাতে পারে না'। এটি মনের অতি উচ্চ অবস্থা। এইটিই হচ্ছে এই অদ্ভুত আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকৃতি। তাৎপর্যের দিক থেকে এই বিখ্যাত ১০ম শ্লোকটিকেও ছাড়িয়ে গেছে ১১শ শ্লোকটি, যেখানে বলা হচ্ছে ঃ

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

—'নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন করে, আসক্তি ত্যাগ করে, যোগিরা কেবল কায়, মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন।'

'যোগিরা কর্ম করেন', *যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি; সঙ্গং ত্যক্ত্বা,* 'আসক্তি ত্যাগ করে'; *আত্মশুদ্ধয়ে,* 'আত্মশুদ্ধির জন্য'। এখানে আত্মশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধির ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে কর্মের একটি দিক; এর অন্য দিকটি হলো অন্তরশুদ্ধি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫০শৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যোগ-এর সংজ্ঞা দিয়ে বলেছিলেন, কর্মের কৌশলই হলো যোগ। এখানে, এই শ্লোকে কী ধরনের কাজের কথা বলা হচ্ছে? *কায়েন,* 'দেহের দ্বারা'; *মনসা,* 'মনের দ্বারা', অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা; *বুদ্ধ্যা,* 'বিবেক বুদ্ধির দ্বারা'; এবং শুধু তাই নয়, *কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি,* 'এমনকি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও'। লক্ষ্যটি হলো *আত্মশুদ্ধয়ে,* 'চিত্তশুদ্ধি', যাতে আপন দিব্যস্বরূপ প্রকাশিত হতে পারে। আত্মা সর্বদাই আছেন। তাঁর বিনাশ নেই। এই অনন্ত আত্মাই হচ্ছেন মানুষের অবিনশ্বর স্বরূপ এবং এইটিই বেদান্তের সর্বোচ্চ প্রেরণাদায়ক বাণী। আত্মা চিরমুক্ত, চিরপবিত্র, চিরজাগ্রত। কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা তাঁকে অবহেলা করি; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকি। কিন্তু আর অবহেলা নয়। এবার 'আমার ব্যক্তিত্বের গভীরতম দিকটিকে আমি চিনে নিতে চাই'। বেদান্তে এই ভাবটির উপর অনবরত জোর দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে, আমি সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ হলেও, সত্য ঠিকই আছে। অজ্ঞানতার জন্য সত্য লুপ্ত হয় না। লক্ষ্য করুন—ঠিক যেন বিজ্ঞানের ভাষা : অজ্ঞতা সত্যের বিলোপ ঘটায় না। এমনকি সামাজিক জীবনেও আমরা বলি যে, আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতা কোন অজুহাত নয়। মনে করুন, আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে আপনি একটি অপরাধ করেছেন। আপনি যদি বলেন, 'আমি ঐ আইনটি জানতাম না', তাতে কিছু আসে যায় না। যে কর্ম করেছেন তার সাজা আপনাকে পেতেই হবে। সেইরকম, মানুষ সম্পর্কেও কিছু গভীর সত্য আছে এবং গভীরতম সত্যটি হলো, আপনি সদামুক্ত, সদাপবিত্র, সদাজাগ্রত, শাশ্বত আত্মা। শঙ্করাচার্য তাঁর *ব্রহ্মসূত্র* ভাষ্যে এই বাক্যটি সন্নিবেশিত করেছেন : *নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, পরমাত্মন্'। নিত্যশুদ্ধ* অর্থাৎ চিরপবিত্র। আপনার ভিতর মলিনতা থাকতে পারে, কিন্তু তা আত্মাকে স্পর্শ করে না। স্পর্শ করে শুধু দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে। তার বেশি কিছু নয়। তাই বলা হচ্ছে, *নিত্যশুদ্ধ,* 'যিনি সর্বদাই শুদ্ধ' এবং *নিত্যবুদ্ধ,* 'সদা জাগ্রত', কোন মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, ক্ষণিক মেঘের আবরণ যেমন চির উজ্জ্বল সূর্যের কোন ক্ষতি করে না।

এরপর বলা হয়েছে *নিত্যমুক্ত*, 'যিনি চিরমুক্ত'। আমি যে নিত্যমুক্ত, আমি যে সর্বদা মুক্তই আছি, এই বোধ আমার হয় না, কারণ এই বিষয়টি নিয়ে আমি চিন্তা করিনি। এই সত্য অনুভব করার কোন চেষ্টাই আমি করিনি। এই সত্য আমি ভুলে গেছি। এই তো আমাদের অবস্থা! কিন্তু ভুললে কি হবে, ঐটিই আপনার প্রকৃত স্বরূপ। আপনি আত্মা। অন্য কোন সাহিত্যে মানুষকে এই অসাধারণ মর্যাদা দেওয়া হয় নি। আপনি যখন নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ, শত বন্ধনে বদ্ধ, সেই অবস্থাতেও কিন্তু আপনি চিরবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। ঐটিই আপনার প্রকৃত পরিচয়। মানুষ যদি এই সত্যের কিঞ্চিৎ আভাসও পায়, তবে তার জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে!

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের শাঙ্করভাষ্যে একটি গভীর উক্তি আছে ঃ *প্রাগ্‌ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি সর্বো জন্তুঃ ব্রহ্মত্বাৎ নিত্যমেব সর্বভাবাপন্নঃ পরমার্থতঃ,* (১/৪/১০) 'ব্রহ্মোপলব্ধির পূর্বেই প্রত্যেক জীব স্বরূপত ব্রহ্ম। অতএব, সর্বভূতের সঙ্গে সে একাত্ম।' অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার আগে থেকে আপনি সেই ব্রহ্মই আছেন। এই হচ্ছে সত্যের স্বরূপ। উপনিষদ বারবার বলবেন *তত্ত্বমসি, তত্ত্বমসি,* 'তুমিই সেই, তুমিই সেই'। কয়েকজন আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মতেও, মানুষ সম্বন্ধে এইটিই গূঢ় সত্য। বাস্তবিক, আপনি তো মুক্ত। আপনি যদি স্বভাবত মুক্ত না হন তবে কখনই মুক্ত হতে পারবেন না। কারণ আপনি যা নন, তা কখনই হতে পারেন না। আপনি শুধু নিজের সম্বন্ধে এই সত্যটি ভুলে, তাকে অবহেলা করেছেন। এই সত্যটিকে ভুলবেন না, অবহেলা করবেন না। একে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। বেদান্তে এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি উপলব্ধি করার ওপর প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং একমাত্র বেদান্তেই এই ভাব পাবেন। 'আমি স্বরূপত মুক্ত'—এই অসাধারণ ঘোষণার তাৎপর্য আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ সাতটি শ্লোকে দেখেছি। সেখানে বলা হয়েছে—পাপ ও অসৎভাব দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকেই কলুষিত করে, আত্মাকে কখনও নয়। সুতরাং আত্মাকে প্রকাশ করে, যে মন্দভাব আপনার দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে উৎপীড়ন করছে, তাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করুন। সেই মুক্তি বা মোক্ষ আপনার স্বরূপেই রয়েছে। এটি লাভ করার জন্য আপনাকে অন্য কারো ওপর নির্ভর করতে হবে না বা স্বর্গেও যেতে হবে না। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে বলা হয়েছে ঃ

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥

—'এইভাবে, বুদ্ধির অতীত আত্মাকে উপলব্ধি করে এবং দেহ ও মনকে সংযত করে, এই দুর্জয় কামরূপ শত্রুকে বিনষ্ট কর।' সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে এই হলো তৃতীয় অধ্যায়ের মহান বাণী।

অতএব, এই পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখলাম যে, মহান মুনি ও ঋষিরাও এই শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই কাজ করেন। কর্মযোগীও কর্ম করেন, কিন্তু তাঁর কর্মের উদ্দেশ্য চিত্তকে শুদ্ধ করা, যাতে আত্মার প্রকাশ হতে পারে। অস্বচ্ছ, ঈষদচ্ছ অর্থাৎ কিছুটা স্বচ্ছ এবং স্বচ্ছ—এই তিনটি আবরণ আমাদের আত্মাকে যেন আবৃত করে রেখেছে। ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ হলো ধর্ম। দেশলাইকাঠির মধ্যেই তো আগুন আছে, কিন্তু স্পর্শ করলে সেটি ঠাণ্ডা বোধ হবে; দেশলাইয়ের বাক্সে ঘষুন, দেখবেন তার থেকে আগুন বেরিয়ে আসবে। কিন্তু দেশলাই কাঠিটি শুকনো হওয়া চাই। ভিজে দেশলাই যতই ঘষুন না কেন, জ্বলবে না। অতএব, অন্তর্নিহিত দেবতা যাতে নিজে প্রকাশিত হতে পারেন, তার জন্য অবশ্যপালনীয় কিছু শর্ত আছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সেই শর্তগুলির কথাই বলেছেন। অতএব, অন্তর্নিহিত দিব্যতাকে প্রকাশ করার সুযোগ প্রত্যেক মানুষেরই আছে এবং সেটিই ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। মানুষ তার প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি করবে, তাকে বিকশিত করবে ও সেই উপলব্ধিকে ভিত্তি করে জীবনযাপন করবে। সবই এইখানে, আমরা যা পেতে চাই তা এখনই পেতে পারি। তার জন্য হেথা কিংবা হোথা, অথবা বিশেষ কোন স্বর্গলোকে যাওয়ার দরকার নেই। সবই ইহজন্মে, ইহলোকে। এই অধ্যায়ে, কয়েকটি শ্লোক পরে একটি শব্দ পাবেন, ইহৈব, 'এখানেই'। এখানেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। এর থেকে যুক্তিসংগত, বাস্তব এবং বিশ্বজনীন শিক্ষা আর কী হতে পারে?

এই গতকাল একটি যুবক এসেছিল। তার বাবা-মা কিছুতেই তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না, কারণ সে তাঁদের অমতে একজনকে বিয়ে করেছে। ছেলেটি এখন তাঁদের সাহায্য চাইছে, কিন্তু তাঁরা কোনরকম সাহায্য করবেন না। দেখুন, এই হচ্ছে আসক্তির ফল। আসক্তি মানুষকে অন্ধ করে তার সহানুভূতির ক্ষেত্রটি সঙ্কীর্ণ করে তোলে। শ্রীকৃষ্ণ তাই শুধু অনাসক্তির উপদেশ দিচ্ছেন। আপনি ঠিক ঠিক অনাসক্ত হলে তবেই আপনার হৃদয় থেকে প্রেম উৎসারিত হবে। এই শিক্ষাটি আমাদের ব্যাপকভাবে আয়ত্ত করতে হবে। তাহলে আমরা প্রত্যেকেই মুক্ত হবো। আমাদের আর কারো দাসত্ব করতে হবে না। কী সুন্দর

জীবনের এই ভাবটি—মুক্ত হওয়া! *সঙ্গং ত্যক্ত্বা,* 'আসক্তি ত্যাগ করে', তাঁদের কর্ম করতে হবে শরীর, মন, *বুদ্ধি* দিয়ে। কী উদ্দেশ্যে? *আত্মশুদ্ধয়ে,* 'নিজের অন্তরকে শুদ্ধ করার জন্য'। কারণ একমাত্র এই শুদ্ধ মনের দ্বারাই পরম সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। তাই আসুন, আমরা চিত্তকে শুদ্ধ করে তুলি। মনই একমাত্র যন্ত্র, যা নিয়ে সংসারক্ষেত্রে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে আমাদের চলতে হয়। সেই মনকে শুদ্ধ, সতেজ, শক্তিশালী রাখুন। এই মহৎ শিক্ষাটির ওপর বেদান্ত বারবার জোর দিচ্ছে। আমি আগেই বলেছি কি করে আমরা প্রতিদিন প্রত্যেকটি কাজে, প্রত্যেক পরিস্থিতিতে, মনকে আরও মুক্ত, আরও শুদ্ধ, আরও মহৎ করে গড়ে তুলতে পারি। জীবনকে এইভাবে কাজে লাগাতে হবে, যাতে জীবনের শেষে আমাদের অবস্থা রস নিঙড়ানো কমলালেবুর মতো না হয়। তাহলেই আমরা পূর্ণ হবো, পরিপূর্ণতা লাভ করবো। এবারে পরের শ্লোকটিতে আসছি।

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

—'সুস্থিরচিত্ত যোগী কর্মফল ত্যাগ করে, দৃঢ় নিষ্ঠা-প্রসূত শান্তির অধিকারী হন; অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি বাসনাচালিত হয়ে, (কর্ম)-ফলে আসক্তি হেতু সংসারে আবদ্ধ হন।'

এখানে দু'ধরনের মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে : *যুক্ত* ও *অযুক্ত*। যাঁরা *যোগমার্গ* অবলম্বন করে, আত্মসংযম অভ্যাসের দ্বারা গূঢ় সত্যকে লাভ করার পথে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের বলা হয় 'যুক্ত'। অন্যান্যদের বলা হয় 'অযুক্ত'। এখন, যিনি যুক্ত, এই পথে তাঁর কী প্রাপ্তি হয়? *যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা,* 'যোগী কর্মফল ত্যাগ করে'; *শান্তিম্ আপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্,* 'এই নিয়মনিষ্ঠ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শান্তিলাভ করেন।' অন্যজন, *অযুক্তঃ কামকারেণ,* 'যিনি যোগী নন, তিনি ইন্দ্রিয়গত বিষয়-বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়ে'; *ফলে সক্তো,* 'কর্মফলে আসক্ত হয়ে'; *নিবধ্যতে,* 'সংসারে আবদ্ধ হন।' সুতরাং, দু'ধরনের মানুষ জগতে আছেন—মুক্ত ও বদ্ধ। কাউকেই জোর করে বন্ধন অথবা মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ যারা, যারা *অযোগী, অযুক্তঃ,* সারা পৃথিবীতেই তাদের সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে ভারতেও। *কর্মফলে সক্তঃ,* 'কর্মফলে আসক্ত' হয়ে; *নিবধ্যতে,* 'আবদ্ধ হয়ে পড়েন'। সেই পুরুষ বা নারী বুঝতে পারেন না যে তিনি বদ্ধ। সেটাই দুঃখের বিষয়। যাঁরা বদ্ধ, তাঁরা বোঝেন

না যে তাঁরা বদ্ধ। এটি বোধ হলে তবেই তাঁরা দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তা হয় না; ঐ দাসত্বেই তাঁদের আনন্দ। তাঁরা মনে করেন এটিই তো স্বাভাবিক। অধিকাংশ মানুষই এই শ্রেণির।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর একটি উপদেশাত্মক গল্পের মাধ্যমে এই বিষয়টিকে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জীব চারপ্রকার : *বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত, নিত্যমুক্ত। বদ্ধ* হচ্ছে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ। যে *মুমুক্ষু* সেও বদ্ধ, কিন্তু মুক্ত হতে সচেষ্ট। এটি দ্বিতীয় শ্রেণির জীব। তারপর *মুক্ত*, অর্থাৎ সংসারপাশ থেকে মুক্ত। সংগ্রাম করে তিনি মুক্তিলাভ করেছেন। যাঁরা নিত্যমুক্ত তাঁরা চতুর্থ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, তাঁরা কখনও বন্ধনে পড়েননি। এই হচ্ছে চার রকমের জীব। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, জেলেরা যখন মাছ ধরার জন্য নদীতে জাল ফেলে, তখন সেয়ানা কিছু মাছ আছে, যারা কখনও জালে পড়ে না। এরা হলো *নিত্যমুক্ত।* কিন্তু অনেক মাছ আছে যারা ধরা পড়ে। এদের মধ্যে কেবল কয়েকটি মাছ পালাবার চেষ্টা করে। তারা বোঝে যে তারা জালে জড়িয়ে পড়েছে। তাই দেখা যাবে যে, ঐ মাছগুলো ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট করছে। যে ছাড়া পেতে চাইছে সে *মুমুক্ষু*, 'সে মুক্তি কামনা করছে'। এদের মধ্যে কয়েকটি মাছ জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়, আর জেলেরা তা দেখে আক্ষেপ করে বলে, 'যাঃ, ঐগুলো বেরিয়ে গেল'। এরা *মুক্ত*, মুক্ত স্বভাবের। কিন্তু আর এক ধরনের মাছ আছে, যারা কখনও মনে করে না যে তারা জালে আবদ্ধ। তারা জাল কামড়ে নিশ্চিন্তে পাঁকের মধ্যে বাস করে, ভাবে যে তারা নিরাপদে আছে। জানে না যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই জেলে তাদের টেনে তুলে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করবে। এরাই হচ্ছে *বদ্ধ*, 'সংসারাবদ্ধ' জীব। এই হলো চার প্রকৃতির মানুষ : *বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত, নিত্যমুক্ত।* সেখানে উপবিষ্ট নরেন্দ্রনাথ বা পরবর্তী কালের বিবেকানন্দকে দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে তিনি *নিত্যমুক্ত* শ্রেণির মানুষ। *মায়া* তাঁকে বাঁধতে পারেনি। তিনি চিরমুক্ত। জগন্মাতা মানুষকে বাঁধবার জন্য মায়াজাল বিস্তার করেন এবং কয়েকটি নিত্যমুক্ত ছাড়া বাকি সমস্ত জীবকেই তিনি তাঁর জালে আবদ্ধ করেন। বদ্ধ জীবদের কেউ কেউ নিজেদের মায়াজাল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে এবং সেটিই আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষণ।

'যুক্ত' ও 'অযুক্ত' প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া এই দৃষ্টান্তটি অমোঘ। *যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিম্ আপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্*, 'কর্মফল ত্যাগ করার জন্য যোগী

প্রকৃত শান্তি লাভ করেন'; পক্ষান্তরে *অযুক্ত* বা 'সকাম ব্যক্তি', *কামকারেণ,* 'ইন্দ্রিয়জ বাসনা দ্বারা তাড়িত হয়ে'; *ফলে সক্তঃ,* 'কর্মফলে আসক্তি হেতু'; *নিবধ্যতে,* 'সংসারে আবদ্ধ হয়'। তার দৃষ্টি সীমিত, সে কিছু দূর পর্যন্ত দেখতে পায়। ইংরেজিতে এঁদের সম্পর্কেই বলা হয় 'বর্তমান নিয়ে ব্যতিব্যস্ত মানুষ।' যখন কোন সমাজে এই ধরনের মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তখন সেই সমাজের অবনতি ঘটে। সমাজ থেকে সমস্ত মূল্যবোধ লোপ পায়। আমাদের দেশ এখন এই দুরবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে। কিন্তু এই স্রোতটিকে আমাদের বিপরীতমুখী করতে হবে। যদি *গীতা*-র মর্মবাণী সর্বসাধারণ উপলব্ধি করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করার জন্য আমরা সচেষ্ট সংগ্রাম করি, তবে বহু মানুষ এই মুক্ত অবস্থার অধিকারী হবে; 'যোগী' হয়ে যাব আমরা। আমাদের সমাজে এই ধরনের কর্মযোগীর সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। কর্মত্যাগী হিমালয়বাসী অল্পসংখ্যক তপস্বী যে সমাজের মূল্যবান সম্পদ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এঁদের সংখ্যাধিক্য হলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নাগরিকত্বও এক ধরনের 'যোগ'। আজ নাগরিক যোগীর খুব প্রয়োজন। লক্ষ লক্ষ নাগরিক যোগী চাই। নাগরিক যোগীরা কর্ম করেন, প্রতিষ্ঠান চালান, অফিসে, কলকারখানাতেও কাজ করেন এবং এভাবেই তাঁদের মন ধীরে ধীরে যোগের উপযুক্ত হচ্ছে। এই সমস্ত কর্মের মধ্য দিয়েই তাঁরা পায়ে পায়ে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য এবং পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এই হচ্ছে ঠিক ঠিক মানব প্রগতি, যা বাহ্যজগতের অভ্যুদয়কে সুনিশ্চিত করেও মানুষকে তার দিব্য স্বরূপ উপলব্ধির পথে টেনে নিয়ে যায়। এই ধরনের মানব প্রকৃতিই মহান সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে, সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করতে পারে। এইরকম নাগরিক যোগীর সংখ্যা বাড়লেই সমাজে অপরাধ, কর্তব্যে অবহেলা ও শোষণ কমতে থাকে। একেই প্রকৃত সামাজিক প্রগতি বলা হয়। শুধুমাত্র ভালো খাওয়া দাওয়া, ভালো পোশাক, ভালো গাড়ি, ভালো বাড়িঘর ইত্যাদির দ্বারা সামাজিক প্রগতির মূল্যায়ন করে এ যাবৎ আমরা বিরাট ভুল করে এসেছি। কিন্তু ভালো নরনারী? তার কী হবে? একথা আমরা ভেবেও দেখি না। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি অলিভার গোল্ডস্মিথ্ (Oliver Goldsmith), এই কারণেই বলেছিলেন ঃ

> Ill fares the land, to hastening ills a prey,
> Where wealth accumulates and men decay.

অর্থাৎ, যে-দেশে জমেছে টাকার পাহাড়, মানুষ হয়েছে নষ্ট,
দুর্দশা তার ললাটলিখন কে নেবে তাহার কষ্ট!

ভারতবর্ষে আজ টাকার অভাব নেই। এখানে ওখানে টাকার ছড়াছড়ি—অধিকাংশই অবশ্য কালো টাকা। কিন্তু ঐশ্বর্য আর প্রগতি এক জিনিস নয়। দেশের প্রকৃত প্রগতি আসতে পারে শিক্ষা থেকে এবং শিক্ষার সেই আলো তাঁরাই পেতে পারেন, যাঁরা সেবাপরায়ণ ও মানবিকতাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। প্রতিটি বক্তৃতার প্রারম্ভে যে শ্লোকটি আপনারা আবৃত্তি করেন, সেটি শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ প্রগতির উৎস হিসাবে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্লোকে বলা হয়েছে, *সহ বীর্যং করবাবহৈ,* 'শিক্ষা থেকে আমাদের সকলের শক্তিলাভ হোক'। শুধু তাই নয়, *তেজস্বি নাবধীতমস্তু।* 'এই শিক্ষা দ্বারা আমাদের (আচার্য এবং বিদ্যার্থী) উভয়েরই জ্ঞানলাভ হোক'। অতএব, শিক্ষার মাধ্যমে শক্তি ও জ্ঞান দুইই লাভ করতে হবে। তবেই একটি দেশ মহান হতে পারে। সুতরাং, আমাদের বর্তমান জীবনের সঙ্গে এই সনাতন ভাবগুলির নিবিড় প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। কিছু ভ্রান্তি অবশ্যই ঘটেছে, যার ফলে মানুষ আজ দিশাহারা। এই পথভ্রান্ত মানবসমাজকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে চলো। কঠোপনিষদের ভাষায়, *উত্তিষ্ঠত জাগ্রত,* 'ওঠো, জাগো'। একবার ঘুম ভাঙলে প্রত্যেকে নিজে নিজেই এই জাগরণের বাণী উচ্চারণ করতে পারবে। স্বামী বিবেকানন্দ, 'আমার সমরনীতি' শীর্ষক মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতায় ভারতবর্ষকে জাতীয় অর্ণবপোত রূপে বর্ণনা করেছেন[১] ঃ

'...আমাদের এই জাতীয় অর্ণবপোত লক্ষ লক্ষ মানবাত্মাকে জীবন-সমুদ্রের পারে লইয়া যাইতেছে। ইহার সহায়তায় অনেক শতাব্দী যাবৎ লক্ষ লক্ষ মানব জীবন-সমুদ্রের পারে অমৃতধামে নীত হইয়াছে। আজ হয়তো .... উহাতে দু-একটি ছিদ্র হইয়াছে, উহা একটু খারাপও হইয়া গিয়াছে। তোমরা কি এখন উহার নিন্দা করিবে? জগতের সকল জিনিস অপেক্ষা যে-জিনিস আমাদের অধিক কাজে আসিয়াছে, এখন কি তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা উচিত? যদি এই জাতীয় অর্ণবপোতে—আমাদের এই সমাজে ছিদ্র হইয়া থাকে, তথাপি আমরা তো এই সমাজেরই সন্তান। আমাদিগকেই ঐ ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে। আনন্দের সহিত আমাদের হৃদয়ের শোণিত দিয়াও বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; যদি আমরা বন্ধ করিতে না পারি, তবে মরিতে হইবে। আমরা আমাদের বুদ্ধিসহায়ে ঐ অর্ণবপোতের ছিদ্রগুলি বন্ধ করিব, কিন্তু কখনই উহার নিন্দা করিব না।'

---

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৯০

এই কথা বলে স্বামীজী ১৮৯৭ সালে দেওয়া ঐ অসাধারণ মাদ্রাজ বক্তৃতাটি সমাপ্ত করেন। কী অলৌকিক দূরদৃষ্টি ছিল তাঁর! আগামী দিনের নতুন সম্ভাবনাগুলি মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করে, সেগুলিকে সঠিক পথে চালিত করার পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন তিনি। গীতাতেও আমরা সেই কর্ম, প্রচেষ্টা ও সমষ্টিগত জীবনের দর্শন পাই। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যে ভারতবর্ষকে পেয়েছি, তাকে কী করে নতুনভাবে গড়ে তোলা যায়, কীভাবে তাকে আরও শক্তিশালী, আরও পবিত্র করা যায়? গীতার নির্দেশ ঃ

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩॥

—'জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বিবেকবুদ্ধি সহায়ে সকল কর্ম ত্যাগ করে, নিজে কিছু না করে এবং অন্যের কর্মের নিমিত্তস্বরূপ না হয়েও নয়টি দ্বারবিশিষ্ট দেহপুরীতে সুখে বসবাস করেন।'

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্য, 'মনে মনে সকল কর্ম ত্যাগ করে'। অর্থাৎ বাস্তবে আপনি বহু কর্মই করছেন, কিন্তু মন থেকে সেগুলি সবই ত্যাগ করেছেন। এই হচ্ছে অনাসক্তির অর্থ। অনাসক্ত অবস্থায় আপনি সমস্ত কাজই করছেন, কিন্তু কর্মরত হয়েও আপনি সেগুলিকে মন থেকে ত্যাগ করেছেন। *আস্তে,* 'তিনি অবস্থান করেন'; *সুখং,* 'অত্যন্ত সুখে'; *বশী,* 'যিনি জিতেন্দ্রিয়'। যিনি সত্য সত্যই বলতে পারেন, 'আমি ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করেছি', তাঁকেই *বশী* বলা হয়। সব মানুষকেই *বশী* হতে হবে। পশুরাই কেবল বশী নয়। কিন্তু আমাদের তো কিছুটা ইন্দ্রিয়সংযম আছে। ঐ সংযম আরও একটু বাড়াতে হবে, যাতে আমরা বুঝতে পারি কখন 'হ্যাঁ' বলতে হবে, আর কখন 'না' বলতে হবে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ফলেই ঐ ধরনের বিচার আসে। এবং এইরকম বিবেকী ব্যক্তি *সুখং,* অর্থাৎ 'সুখে, অশান্তি ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে' অবস্থান করেন।' কোথায়? এই শরীরে। সেই পুরুষ বা নারী তাঁর শরীরেই অবস্থান করেন। কীভাবে? *নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্,* 'নিজে কর্ম না করে ও অন্যদের কর্ম না করিয়ে, তিনি 'নবদ্বারযুক্ত দেহনগরে অবস্থান করেন'। মানুষের দেহ যেন একটি নগর, যার মধ্যে আত্মা বা দেহী পূর্ণ শান্তিতে বসবাস করছেন, সব কাজকর্ম করছেন; কোনও দুশ্চিন্তা ভয় ও অপূর্ণতা নেই তাঁর। মনুষ্যদেহকে আবাস, গৃহ বা নগররূপে চিন্তা করার কথা উপনিষদেই আছে। গীতা এখানে

সেই ভাবনারই পুনরুল্লেখ করেছেন। বোঝাতে চাইছেন, আমরা দেহ নই, আমরা দেহে *বাস* করি, এই যা। *নবদ্বারে পুরে দেহী,* এই পুরীতে যাতায়াতের জন্য নটি *দ্বার* আছে—মাথায় বা মুখমণ্ডলে সাতটি এবং নিচে দুটি। গীতা-র মতে, দেহের নটি *দ্বার*। উপনিষদ অনুযায়ী কিন্তু নাভি ও ব্রহ্মরন্ধ্রসমেত এগারটি *দ্বার*। *নবদ্বারে পুরে দেহী; দেহী,* অর্থাৎ যিনি দেহে অবস্থান করেন, 'দেহস্থিত পুরুষ'। ভাবটি এই যে, আমি দেহ নই, আমি দেহে থাকি। আমি গৃহ নই, আমি গৃহে বাস করি। এই শরীরটি যেন আমাদের গৃহ। এই কারণেই এটিকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু ভুল ধারণা থাকলেও, দেহের অবহেলা বেদান্ত কখনই সমর্থন করে না, কারণ তা নিজের ঘরবাড়িকে অবহেলা করার মতোই গর্হিত কাজ হবে। আপনি যদি আপনার গৃহটিকে পরিচ্ছন্ন না রাখেন, তার রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, তবে অচিরেই ওটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। শরীরও তাই। শরীরের যত্ন নিন। এই গৃহে যেহেতু আপনি বাস করেন, তাই এটিকে পরিচ্ছন্ন রাখুন। কিন্তু ভুল করেও ঐ দেহে আসক্ত হবেন না। শরীর একটি সুবিধাজনক আশ্রয় মাত্র, যেখান থেকে বেরিয়ে আপনি আপনার কাজকর্ম করতে পারেন, আবার কাজ চুকে গেলে ফিরে আসতে পারেন, ঠিক যে গৃহে আপনি বাস করেন, তারই মতো। গৃহে বাঁধা পড়বেন না। গৃহে যদি আপনি বাঁধা পড়েন, তাহলে আপনার ঐ গৃহই কারাগারে পরিণত হবে। আপনি স্বাধীনভাবে আসতে অথবা যেতে পারবেন না। যে সব মানুষ জেলখানায় বাস করে, তাদের আসা-যাওয়ার স্বাধীনতা নেই। আমরাও যদি দেহ-গৃহকে, কারাগার করে তুলি, তবে তা অত্যন্ত দুঃখজনক হবে। দেহকে কারাগার করে তুলবেন না। মুক্ত হোন; দেহ-নগরীতে স্বাধীনভাবে আসা-যাওয়া করুন। মানুষের জীবন এবং তার স্বাধীনতা সম্বন্ধে কী অপূর্ব চিন্তা!

আগেই বলেছি, প্রাচীন চীনদেশীয় চিন্তাভাবনাতেও এই বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাহ্যত কোন কর্ম না করলেও আপনাকে কর্মফল ভোগ করতে হতে পারে, কারণ হয়তো মানসিকভাবে আপনি ঐ কর্ম করেছেন। কিন্তু যিনি মানসিকভাবে কর্মত্যাগ করেছেন, তিনি দৈহিকভাবে প্রচুর কর্ম করলেও মুক্ত—অর্থাৎ তিনি কর্ম থেকে মুক্ত। চীন ও জাপানে এই উচ্চ অতীন্দ্রিয়বাদী চিন্তা সুপ্রচলিত। আপনি যখন উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা, গোলমাল, অকারণ হৈ চৈ না করে শান্তচিত্তে কর্ম করেন, তখন তা অকর্ম, অর্থাৎ কর্ম না করারই সমান হয়। এটি করা সম্ভব এবং কর্ম সম্বন্ধে গীতার সমগ্র শিক্ষাই তাই। গীতা বলছেন : নিঃশব্দে কাজ করুন। অনাবশ্যক হৈ চৈ না করে শান্তভাবে জীবন

অতিবাহিত করুন। হাঁকডাক করে কাজ এবং হট্টগোলের জীবন জীবনই নয়। কিন্তু এই উত্তেজনামুক্ত জীবনযাপন তখনই করা যায়, যখন অভ্যাসের দ্বারা মনটি শান্ত, সুসংযত ও আত্মাভিমুখী হয়। কারণ এই আত্মাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, যিনি সর্বদা নিষ্ক্রিয় ও সর্ব শক্তিমান হয়েও সমস্ত কর্ম সম্পাদন করছেন। সমস্ত শ্লোকগুলিই বারবার এই ইঙ্গিতই দিচ্ছে যে গীতার শিক্ষানুযায়ী মনকে নিয়ন্ত্রণ করলে আমাদের সকলের মধ্যে নিহিত এই বিরাট সম্ভাবনাটির বিকাশ ঘটানো সম্ভব। *কর্মযোগ,* যোগের আলোকে কর্ম—সেই কারণে এটির নাম *কর্মযোগ।* যোগবিহীন কর্ম সব পশুই করে; নারী-পুরুষও করে; কিন্তু একমাত্র মানুষই যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে। এই শিক্ষা শুরু হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ এই অভূতপূর্ব 'নিষ্কাম কর্ম'-এর দার্শনিক ব্যাখ্যা শুরু করেছেন। নিষ্কাম কর্মের জন্য প্রয়োজন সেই মানসিকতা যাকে *বুদ্ধিযোগ* বলা হয়। কী ধরনের বুদ্ধি? যা *সম,* সমান, যা অচঞ্চল, যার মধ্যে ওঠাপড়া নেই। কর্মে প্রচুর আলোড়ন আছে, কিন্তু *বুদ্ধি* সেসব থেকে মুক্ত, সম্পূর্ণ স্থির ও স্বতন্ত্র। এটি হওয়া সম্ভব। অতএব *বুদ্ধিযুক্ত,* 'এই *বুদ্ধি* যাঁর আছে', তিনি অবশ্যই কর্মযোগী। এবার পরবর্তী শ্লোকে আমরা বেদান্তের একটি অত্যন্ত সুন্দর ভাব পাচ্ছি।

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥

—'পরমাত্মা বা ঈশ্বর মানুষের জন্য কর্তৃত্ব, কর্ম অথবা কর্মফলপ্রাপ্তি কোন কিছুরই সৃষ্টি করেন না। স্বভাব বা প্রকৃতিই এগুলির প্রবর্তন করে।'

পরমাত্মা বা পরমেশ্বর 'কোন কর্তৃত্বের বিধান দেননি', *ন কর্তৃত্বং। ন কর্মাণি,* 'কিংবা কোনও কর্মের'। *লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ,* 'ঈশ্বর দুটির কোনটিকেই মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি'। তাহলে কীভাবে সব কাজকর্ম হচ্ছে? *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে,* 'প্রকৃতি দ্বারাই সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হচ্ছে'। পশুদের মতো আমাদেরও সেই প্রকৃতিই সক্রিয় হতে বাধ্য করছে। বাহ্য প্রকৃতি আমাদের ভিতরেও নিজের স্থান করে নিয়েছে। অনেক বিষয়েই মানুষ বাহ্য প্রকৃতির একটা জবরদস্ত ঘাঁটি। আমাদের হজম প্রক্রিয়া এবং আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলি, সমস্তই প্রকৃতির কর্ম। অতএব, *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে,* 'আপনার ও আমার মধ্যে স্বভাব বা প্রকৃতিই কাজ করছে।' বাহ্য জগতেও ঠিক তাই হচ্ছে। এখানে *স্বভাব* মানে প্রকৃতি। ঐ সাধারণ বহিঃপ্রকৃতিই আমাদের খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে, সন্তান পালনে

বাধ্য করছে। মানুষের মাধ্যমে প্রকৃতিই ঐ সব কাজ করছে। আসল কথাটি হলো, ঈশ্বর আমাকে এটা-ওটা কিছুই করতে বলেননি। *স্বভাব* বা প্রকৃতিই আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের অঙ্গীভূত হয়েছে। তার দ্বারা চালিত হয়েই আমরা সমস্ত কিছু করছি। মানুষ সম্পর্কে এইটিই হলো সার সত্য।

জুরিখের প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ কার্ল য়ুং-এর 'Modern Man in Search of a Soul' বইটির উল্লেখ আমি আগেই করেছি। প্রকৃতির বশীভূত হয়ে আমরা যা করি এবং আমাদের উচ্চতর প্রকৃতির প্রেরণায় আমাদের যে কর্ম, এই দুইয়ের মধ্যে তিনিও পার্থক্য করেছেন। বাস্তবিক, একমাত্র বেদান্তই *পরা প্রকৃতি* বা প্রকৃতির একটি উচ্চতর মাত্রার কথা বলে, যা *অপরা প্রকৃতি* বা সাধারণ প্রকৃতি থেকে পৃথক। প্রথমটি হচ্ছে চৈতন্যময়, কিন্তু দ্বিতীয়টি অচেতন। বেদান্ত বলে, *অপরা প্রকৃতি* বা স্বভাবের উপর *পরা প্রকৃতি* বা চৈতন্যময় সত্তার প্রভুত্বই মানুষের মুক্তির উপায় এবং মানবিক বিকাশের লক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণও এখানে স্পষ্টই বলেছেন, *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, '*স্বভাব* বা সাধারণ প্রকৃতিই আমাদের সকলের মধ্যে কাজ করছে।' দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় ঃ মনে করুন কেউ আমাকে গালিগালাজ করল তো সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাকে একটি চড় কষিয়ে দিলাম। এখানে কী ঘটল? *স্বভাব* কর্তা সেজে আমার মধ্যে কাজ করল। কিন্তু আমার আরও একটি *স্বভাব* আছে, চেতন স্বভাব বা *পরা প্রকৃতি*, যার দ্বারা আমি এটি রোধ করতে পারি। সেই *স্বভাবটি* নীরব, এখনও সক্রিয় নয়। এই মুহূর্তে যা কিছু ঘটছে, সবই হচ্ছে *স্বভাব বা অপরা প্রকৃতি-র* প্রভাবে।

অপরিমার্জিত প্রকৃতিই এখন আপনার ও আমার মধ্যে সক্রিয়। কিন্তু এছাড়াও আরও একটি প্রকৃতি আছে। সেটি আমার উচ্চতর প্রকৃতি, আত্মারূপে আমার সত্য প্রকৃতি, যা আমাকে সংযত করে উন্নত আচরণ করতে সাহায্য করে। এই উচ্চতর বা পরা প্রকৃতির প্রকাশ অত্যন্ত বিরল। অধিকাংশ মানুষের মধ্যে শুধু নিম্ন প্রকৃতি বা *অপরা প্রকৃতি* বা *স্বভাব*-এর অভিব্যক্তিই লক্ষ্য করা যায়। আমাদের চেহারা, দেহের গঠন, স্নায়ু, এমনকি মনোভাবের মধ্য দিয়েও কেবল ঐ বাহ্য প্রকৃতিই প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের মনের অনেকটাই এই বহিঃপ্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতএব, এই বাস্তব সত্যটি বুঝতে হবে যে, মানুষ দুটি প্রকৃতির মিশ্রণ—বাহ্য প্রকৃতি এবং উচ্চতর চেতন প্রকৃতি। অধিকাংশ মানুষের মধ্যে উচ্চতর প্রকৃতিটি বাহ্য প্রকৃতির অধীনে কাজ করে। এটি নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, কারণ অধিকাংশ মানুষের মধ্যে *অপরা প্রকৃতিটি* অত্যন্ত

প্রভাবশালী। এই হচ্ছে সাধারণ মনুষ্য জীবনের চিত্র। এই নিম্ন প্রকৃতিটিই নানা অপরাধ ও পাপের উৎস। কিন্তু যখনই নিম্ন প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে সংযত করা হয় ও উচ্চতর স্বভাবটি প্রকাশ পেতে থাকে, তখনই আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির অরুণোদয় হয়। আমরা উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাই। প্রকৃত সভ্যতা আর কিছুই নয়—তা নিম্নতর প্রকৃতির ওপর উচ্চতর প্রকৃতির সামান্য আধিপত্যের ফল। শ্রীকৃষ্ণ এখানে আমাদের যা বলছেন তার তাৎপর্য এইটিই। *ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।* '*প্রভু*, জগদীশ্বর, কোন ব্যক্তির জন্য কর্তৃত্ব বা কর্মের বিধান দেননি।' এরপর তিনি বলছেন, *ন কর্মফল সংযোগং*, 'অথবা কর্মফলের প্রাপ্তিও না'। তবে জীবন কী করে চলছে? তার উত্তর এই, *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, '*স্বভাবই* কর্ম করছে'।

একথার পর, আমাদের এই শিক্ষাই নিতে হবে যে, ওই স্বভাব বা বাহ্য *অপরা প্রকৃতি*, যা আমাদের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে, তাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করব ও আমাদের শুদ্ধবুদ্ধি-রূপ চেতনসত্তাকে প্রকাশ করে তাকে অতিক্রম করে যাব, কারণ আমরা উভয় প্রকৃতির সংমিশ্রণ, যাকে বৈদান্তিক ভাষায় বলা হয় *চিৎ-জড়-গ্রন্থি।* প্রত্যেক মানুষই *চিৎ ও জড়-এর* একটি গ্রন্থি। *চিৎ* অর্থাৎ চৈতন্য। *জড়* অর্থাৎ অচেতন প্রকৃতি। মানুষের মধ্যে দুটিই আছে। বহিঃপ্রকৃতির সবটাই জড়। কিন্তু জীবের সান্নিধ্যে এলে আপনি চেতনার রাজ্যে উপস্থিত হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, মানুষের ক্ষেত্রে আবার একটি উচ্চতর চেতনা—যার নাম আত্মচেতনা—অর্থাৎ 'আমি, আমি, আমি', নিজের সম্বন্ধে এই চেতনাটি নিত্যই অভিব্যক্ত হচ্ছে। কোন পশুর এই 'আমিত্বের' চেতনা নেই; একমাত্র মানুষই উপলব্ধি করে যে, সে বিষয় নয়, সে বিষয়ী। এই কারণেই প্রত্যেক মানুষকে বিষয়রূপে নয়,, বিষয়িরূপে দেখতে বলা হয়। সাধারণত অন্যদের যখন আমরা শোষণ করি, তখন আমরা তাদের বিষয়রূপেই দেখি। কিন্তু যখন নীতিবোধ আসে তখন ভাবি, 'না, বিষয়ী জ্ঞানে সকলের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। আমি বিষয়ী, আপনিও বিষয়ী। বস্তু হিসাবে নয়, ব্যক্তি হিসাবে আপনার সঙ্গে আচরণ করতে হবে'। একেই বলা হয় নীতিবোধ। *সামাজিক বিষয়বস্তুর মধ্যে বিষয়ীকে দর্শন করবার নামই নীতিবোধ।* মানুষ একটি সামাজিক বিষয়বস্তু, চেয়ার টেবিলের মতো জড় পদার্থ নয়। এই কারণেই সে অতুলনীয়। তার একটি মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিকও আছে। এই কারণে আমরা মানুষকে সর্বদা বিষয়িরূপে দেখি, বিষয়রূপে নয়। এই ভাবটি পাবেন জার্মান দার্শনিক কান্ট-এর নীতিশাস্ত্র আলোচনায়। এই হচ্ছে নীতিবোধ—কান্টের মতে, বেদান্তের

মতেও। তাই আসুন, আমরা আমাদের উচ্চতর প্রকৃতির প্রকাশ ঘটিয়ে ঐ *স্বভাব* বা নিম্নতর প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত করি। *চিৎ স্বভাব* দ্বারা *জড় স্বভাবকে* নিয়ন্ত্রণ করতে হবে—এই হচ্ছে পথ।

এরই নাম মানুষের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ। তার থেকেই জগতে প্রভূত শান্তি ও সমন্বয়ের ভাব আসবে। মানুষই হবে সমগ্র জগতের রক্ষাকর্তা। অন্যথায়, সে যদি *জড় স্বভাবের* অধীন হয়, তবে সে সমগ্র প্রকৃতির ও মানবজাতির বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পৃথিবীতে আজ এই রকমই পরিস্থিতি। অধিকাংশ মানুষই *জড় স্বভাবের* দাস। তারা ঐ স্বভাব অনুযায়ী বাঁচতে চায়, যে স্বভাবকে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে, আমেরিকান যুব-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি 'আবেগমুক্তির দর্শন'রূপে উল্লেখ করেছি। এই দর্শনের মূল কথা, যখনই কোন আবেগ আসবে, তখনই তাকে প্রকাশ করবে। তাকে সংযত করবে না, তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না। *ঐ জড় স্বভাবকে* অবাধে কাজ করতে দাও। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক দর্শন যার ঢেউ প্রায় সারা বিশ্বকে প্লাবিত করেছে। এই *স্রোতকে* আমাদের বিপরীতমুখে চালিত করতে হবে। উচ্চ *স্বভাবটিকে* আপনার মধ্যে কাজ করতে দিন। আপনার মধ্যে অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু আছে। আপনি মুক্ত, আপনি মুক্ত। *জড় স্বভাবটি* মুক্ত নয়, কিন্তু আপনি মুক্ত। আপনি হচ্ছেন মুক্তি ও বন্ধনের সংমিশ্রণ। আপনার ভিতর মুক্তির যে ভাবটি রয়েছে, দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে ব্যক্ত করুন।

এই প্রসঙ্গে ১৯৬৮-৬৯ সালে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় আমার ১৮ মাস ব্যাপী বক্তৃতা সফরের একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ করতে চাই। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬৯ সালের ৩১ জানুয়ারি। আমেরিকায় তখন হিপি ও ড্রপ-আউট আন্দোলন চলছিল। ড্রপ-আউট আন্দোলন হলো স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনায় ইতি দেওয়ার আন্দোলন। যিনি স্বয়ং ড্রপ-আউট শ্রেণিভুক্ত, সেই মিঃ ফেনউইক পোর্টল্যাণ্ড রেডিওর হয়ে আমার সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন। এই চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার বর্ণনা আমি আমার A Pilgrim Looks at the World নামক গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭-২৯, ভারতীয় বিদ্যাভবন, মুম্বাই) দিয়েছি। সেখান থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

'[মিঃ ফেনউইক] শ্রোতাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েই সাক্ষাৎকার শুরু করলেন। কোন যোগী বা আধ্যাত্মিক আচার্যের, বিশেষত ভারতীয় আচার্যের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় যা হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তাই হলো; সাক্ষাৎকারটির

সূচনা হলো অত্যন্ত লঘুভাবে। মিঃ ফেনউইক তাই শ্রোতাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন ঃ আমার সামনে আজ আর একজন সন্ন্যাসী উপস্থিত। ইনি হচ্ছেন স্বামী অমুক, ইনি হেন তেন ইত্যাদি। কিন্তু যেই আমি কথার মোড় আধুনিক সভ্যতায় মানুষের সমস্যা ও অন্যান্য গাম্ভীর্যপূর্ণ বিষয়ের দিকে ঘুরিয়ে দিলাম, অমনি এক লহমায় সমস্ত পরিবেশটি পালটে গেল। মিঃ ফেনউইক সঙ্গে সঙ্গে নতুন পরিস্থিতির প্রেরণা অনুভব করে মাইক্রোফোনে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন ঃ "ওহো, ইনি দেখছি একজন নতুন ধরনের সন্ন্যাসী। দয়া করে এঁর কথা শুনুন!" সমস্ত হাল্কা কথাবার্তা মুহূর্তে উবে গেল এবং তখন থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই চলল।

'পরবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যে আধুনিক মানুষের আত্ম-সংযমের প্রয়োজনীয়তার কথাটি উল্লেখ করার সুযোগ পেলাম। কিন্তু যেই সংযম শব্দটি উচ্চারণ করেছি, অমনি মিঃ ফেনউইক আমাকে থামিয়ে দিয়ে প্রতিবাদের সুরে জোর গলায় বলে উঠলেন ঃ "স্বামীজী, আমরা এইসব সংযমে বিশ্বাস করি না! আর সংযমে আছেই বা কী? আমরা *স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক* হওয়ায় বিশ্বাস করি।"

'মিঃ ফেনউইক বেশ বিজয়োল্লাসের সঙ্গে এই কথাগুলি বললেন। কিন্তু আমি দমে না গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন্তব্যের পিছনে যে মনোভাবটি সক্রিয় তা উপলব্ধি করতে পারলাম এবং বললাম ঃ "মিঃ ফেনউইক, এই একটু আগেই আপনি পণ্ডিত রবিশঙ্করের সেতারবাদনের খুব প্রশংসা করছিলেন। বলছিলেন—কী মনোমুগ্ধকর, কী স্বতঃস্ফূর্ত, কী স্বাভাবিকই না তাঁর বাজনা। খুব ভালো কথা। কিন্তু মিঃ ফেনউইক, আপনি কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে রবিশঙ্করের এই স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক সুরসৃষ্টির পিছনে বছরের পর বছরের কঠোর সংযম ও সাধনা রয়েছে? আপনি কী কখনও এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছেন?"

'এইভাবে বলামাত্র মিঃ ফেনউইক উত্তেজিত হয়ে প্রায় মাইক ফাটিয়ে বলে উঠলেন ঃ "কী চমৎকার চিন্তা! আমি কখনও এভাবে চিন্তা করিনি তো! এটি আমার কাছে একেবারেই নতুন বিষয়! হ্যাঁ, এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি অবশ্যই সংযমের গুরুত্ব স্বীকার করি।" এরপর আবার মাইকে তাঁর সবিস্ময় ঘোষণা ঃ "আপনারা সকলে শুনুন, ভারতবর্ষের স্বামীজী কী বলতে চান!"

'সাক্ষাৎকারের জন্য সময় বেঁধে দেওয়া ছিল কুড়ি মিনিট। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, সময় ফুরিয়ে এলেও মিঃ ফেনউইকের আগ্রহ ক্রমশই বাড়ছে। অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছিল। তাই শ্রোতাদের সামনেই মধুরভাবে

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "স্বামীজী, আপনি কি ক্লান্ত? আমরা কি সাক্ষাৎকারটি চালিয়ে যেতে পারি?" "না, আমি একটুও ক্লান্ত নই। আপনি যতক্ষণ চান ততক্ষণই আমি চালিয়ে যেতে পারি, আমি উত্তর দিলাম।" একথায় তিনি খুব খুশি। মাইকে তা ঘোষণা করে দিলেন এবং ইন্টারভিউ চলল মাঝরাত পর্যন্ত!

'পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বললাম ঃ "মিঃ ফেনউইক, আমিও স্বাভাবিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা পছন্দ করি। মানুষের জীবন স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকই হওয়া উচিত। কিন্তু আমি দু-ধরনের বা দুটি স্তরের স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বাভাবিকতার কথা জানি; একটি সংযমের নিচে, অন্যটি সংযমের উপরে।" এর পর যতক্ষণ আমি বিষয়টিকে বেদান্ত ও বিশ শতকের জীববিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করছিলাম, মাঝেমধ্যে দুটি-একটি প্রশ্ন করা বা আমার কোন একটি বক্তব্য বিষয়বস্তুর গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া ছাড়া তিনি ছিলেন নিবিষ্ট শ্রোতা।

'আমি আরও বললাম, "পশু হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। গরু বা ঘোড়া যেখানেই থাকুক বা চলে বেড়াক, সেখানেই মলমূত্র ত্যাগ করে। ওটি এক ধরনের স্বাভাবিকতা। কিন্তু মানবশিশুকে কি আমরা শৌচের অভ্যাস করাই না? সব শিশুকে আমরা প্রথমে এই শিক্ষাটিই দিয়ে থাকি, এরপর তারা বাবা-মায়ের কাছ থেকে সংযমের অন্যান্য শিক্ষা পায় এবং নিজের থেকেও অনেক কিছু শেখে যার ফলে তারা *মনুষ্য প্রকৃতির* স্তরে উন্নীত হয়ে মানুষের রীতিনীতি অনুযায়ী বড় হতে পারে। বস্তুত সব সংস্কৃতিই প্রবৃত্তি বা আবেগকে সংযত করার ফল এবং সংস্কৃতি মানেই মানবীয় সংস্কৃতি; পশুদের কোন সভ্যতা বা সংস্কৃতি নেই। বিবেক ও সংযমের সাহায্য নিয়ে এবং যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা পরিচালিত হয়ে তবেই *মানুষ তার অন্তঃপ্রকৃতির মহৎ দিকগুলি প্রকাশিত করে—প্রথমে মানবিক, তারপর দিব্যগুণগুলি স্ফুরিত হয়।* মনের ঝোঁক ও বেপরোয়া আবেগ সংযত করে অন্তরের ঈশ্বরকে প্রকাশ করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি জৈবস্তরে উত্তেজনা প্রকাশের মতোই *স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে,* যদি আমরা 'স্বভাব' ও 'স্বাভাবিক' শব্দগুলির ব্যাপক অর্থ উপলব্ধি করতে পারি।"

'এরপর আমি বলি, "দুধরনের মানুষের কোনরকম সংযমের প্রয়োজন হয় না। তাদের না আছে উদ্বেগ, না কোন মানসিক সংগ্রাম। ওসবের প্রয়োজন তারা অনুভব করে না। তারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত"। বিষয়টিকে স্পষ্টতর করার জন্য আমি ভারতীয় ভাবধারার সর্বোত্তম ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতম্ থেকে সুপরিচিত নিচের শ্লোকটি উদ্ধৃত করলাম (৩,৭,১৭) ঃ

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ ॥

—"'দু'ধরনের মানুষ সুখী এবং সবরকম উদ্বেগ থেকে মুক্ত। প্রথম জন নিতান্তই নির্বোধ (যার মধ্যে মনুষ্যত্বলাভের সংগ্রাম এখনও শুরু হয়নি)। দ্বিতীয়জন হলেন তিনি, যিনি (আত্মা বা অনন্ত দিব্যস্বরূপকে *উপলব্ধি* করে পশু ও মানবীয় প্রকৃতির পারে গিয়ে) *বুদ্ধি* এবং যুক্তিকে অতিক্রম করে গেছেন। এই দুই স্তরের মাঝামাঝি অন্যান্য সকলকেই মানসিক সংগ্রাম করতে হয় এবং কিছু না কিছু উদ্বেগ ভোগ করতে হয়"।'

এইভাবেই বেদান্ত মানুষকে বলছে যে, যা-কিছু যেরকম অবস্থায় রয়েছে, তাকে সেভাবে মেনে নিও না। তুমি তাকে উন্নত থেকে উন্নততর করতে পার। একটি অবস্থা থেকে আর একটি উন্নত অবস্থায় অগ্রসর হতে পারো। তুমি নিজেই তোমার ভাগ্যরচনা করতে পারো। কোন পশুর পক্ষে কিন্তু এটি করা সম্ভব নয়। সেখানে ভাগ্যরচয়িতা হলো প্রকৃতি। আমাদের ক্ষেত্রে *স্বভাব* বা প্রকৃতি ভাগ্যনির্ণয় করে না। *আমরাই* আমাদের ভাগ্যনির্ণয় করি, *আমরাই* আমাদের জীবন পুনর্গঠিত করি। এটি সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে। স্বাধীনতালাভের পর আমরা এই সত্যটি ভুলে যাওয়ায় *জড় প্রকৃতি* এখন ভারতে নিজের খেয়ালখুশি মতো কাজ করে চলেছে। অমার্জিত মানুষ স্বার্থপর; ঝগড়া, মারামারি, কাটাকাটি করতেই ব্যস্ত, বন্য পশু যেমন করে থাকে। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি, কারণ এসবের মধ্য দিয়ে মানুষের যথার্থ মহিমা প্রকাশিত হচ্ছে না। আমি অতি সহজেই কাউকে হত্যা করতে পারি; আর যদি নরখাদক হই তো তাকে খেয়েও ফেলতে পারি। তবে সভ্যজগতে অন্তত মানুষ মানুষকে খায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে, আগেকার দিনে নরমাংস খাওয়ার রেওয়াজ ছিল; আমরা আজ সেটা করি না। কিন্তু একে অপরকে *প্রতারণা* করি। একই স্বগোত্রভোজন, কেবল নূতনরূপে। এটিকে বন্ধ করতে হবে। যে জড় *স্বভাব* আপনার দেহ-মনে প্রবেশ করে তাদের গ্রাস করে রেখেছে, আপনি যখন নিজেকে ঐ *স্বভাব* থেকে মুক্ত করবেন, তখন ঐ স্বভাবের ঊর্ধ্বে অবস্থিত আত্মা আপনার মধ্যে প্রকাশ পেতে শুরু করবে। আত্মার প্রকাশ অনুসন্ধান করুন। আত্মাকে ব্যক্ত করুন। শিশুর মধ্যে যখন আমিত্ব-বোধ জাগে, যখন সে বলে, 'আমি এটা চাই, আমি ওটা চাই', তখন আত্মার সামান্য একটু প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। শিশুর ঐ 'আমি'টি জলের তলায় লুকিয়ে থাকা বিশাল পাহাড়ের চূড়াটির মতো। আপনি শুধু ঐ চূড়াটিই দেখছেন। আর ঐ পাথরের টুকরোটাকেই আমরা 'আমি' বলছি।

কিন্তু ঐটুকুই তার সত্তার প্রকৃত পরিচয় নয়। তার ব্যাপ্তি সীমাহীন। ঐ যে 'আমি', প্রকৃতপক্ষে তা সকলের সঙ্গে অভিন্ন। কয়েকটি শ্লোক পরে গীতা এই সত্যটিকেই ব্যক্ত করবেন এবং বলবেন যে, যোগের এই ধারণাটি এক সময় আপনাকে ঐ উপলব্ধিতে পৌঁছে দেবে। আমরা স্বরূপত এক। আমাদের মধ্যে কেবল এক আত্মাই বিরাজমান। সুতরাং, এই 'আমি'টিকে জলের ওপর দৃশ্যমান বিরাট পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ চূড়ার মতো বিবেচনা করুন। যতক্ষণ না গভীরে ডুব দিচ্ছেন, ততক্ষণ এর বিশালতা সম্বন্ধে ধারণা হবে না। ঐ ক্ষুদ্র 'অহং'-টিই অনন্ত, অবিনশ্বর আত্মার দৃশ্যমান অংশ। ঐ ক্ষুদ্র চূড়াটির উপর নির্ভর করেই মানুষের জীবনে যত গোলমাল। ওটিকে একটি তথ্য, সংকেত বা প্রাথমিক উপাত্তরূপে দেখুন। ওর প্রকৃত ব্যাপ্তি খুঁজে বার করার চেষ্টা করুন। যতই ওর মধ্যে ডুব দেবেন, দেখতে পাবেন যে, এই অহং বিশাল থেকে বিশালতর হচ্ছে এবং পরিশেষে উপলব্ধি হবে যে 'আমি সকলের সঙ্গে এক। স্বরূপত আমরা অভিন্ন'। একত্বের এই অনুভূতি যখন হবে, তখনই বিস্ময়কর কিছু একটা ঘটে যাবে। এইভাবেই বর্তমান এই অধ্যায়টি একত্ব ও সাম্যের গভীর বাণীটি আমাদের মর্মমূলে প্রবেশ করিতে দেওয়ার চেষ্টা করছে, জানাতে চাইছে সকলের সমান হয়ে কী করে আমরা সমাজে বাস করব। কী অনবদ্য চিন্তা! সাম্যের তত্ত্বটি বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। আমরা সকলে এক, আমরা সমান। এই অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক পরে এই সত্যই আমাদের বলা হবে।

এসব শিক্ষা কেবল বিশ্বাসের বস্তু নয়। এগুলি নিয়ে চিন্তা করতে হবে, পরখ করে দেখতে হবে, জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। গীতায় যে যোগের কথা বলা হচ্ছে তা রীতিমতো একটি বিজ্ঞান, যা সত্য কি না হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখা যায়। আমাদের এইটিই করতে বলা হচ্ছে, বলা হচ্ছে—দেখো তোমার ক্ষেত্রে এটি কীভাবে খাটে। এখানে কোন ধোঁয়াটে ব্যাপার নেই। স্বচ্ছ ও স্পষ্টভাবে মানুষকে নিয়ে, তার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে কীভাবে সে এই সম্ভাবনাগুলির বিকাশ ঘটাতে পারে। পরবর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই ধারণাটির জের টেনেছেন।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

—'সর্বত্র বিরাজমান পরমাত্মা কারো পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়ে আছে, এই কারণেই জীব মোহগ্রস্ত হয়।'

কী চমৎকার ভাব! এই *বিভুঃ,* পরমাত্মা, কারো পাপ অথবা পুণ্য গ্রহণ করেন না। *নাদত্তে কস্যচিৎ পাপম্,* 'কারো দুষ্কৃতি গ্রহণ করেন না'; *ন চৈব সুকৃতং,* 'অথবা কারো সুকৃতি'। তাহলে বাস্তব পরিস্থিতিটা কী? *অজ্ঞানেন আবৃতং জ্ঞানম্, 'অজ্ঞান* দ্বারা *জ্ঞান* আবৃত রয়েছে'; *তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ,* 'সেই কারণে জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে'। এই হচ্ছে পরিস্থিতি।

অজ্ঞান দ্বারা আমাদের *জ্ঞান* আবৃত হয়ে আছে বলেই আমরা মোহগ্রস্ত এবং এই মোহাচ্ছন্ন অবস্থাতেই প্রতিদিন কাজ করে চলেছি। সমাজে দুষ্কৃতির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষদিকে বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছিল (৩,৩৮)। সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, ভস্ম যেমন আগুনকে ঢেকে রাখে, *অজ্ঞান* বা অবিদ্যাও তেমনি *জ্ঞানকে* আচ্ছন্ন করে রাখে। ভস্মের নিচে আগুন থাকলেও তাকে দেখা যায় না। কিন্তু ভস্মগুলি সরিয়ে সেখানে কয়েকটি কাঠের টুকরো দিন, দেখবেন আবার অগ্নিশিখা উঠছে। ঠিক সেইরকম *অজ্ঞানও জ্ঞানকে* ঢেকে রেখেছে। এর ফলে পশুদের মতো আমরাও *স্বভাব* বা *প্রকৃতির* দাসত্ব করছি, যে কথা আগেই বলেছি। অথচ আমরা এই *স্বভাবের* কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারি। কী ভাবে? আমাদের উচ্চতর *স্বভাবের* শক্তি দিয়ে, যাকে এখানে *জ্ঞান* অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলা হয়েছে। কিন্তু এখন, *অজ্ঞানেনাবৃতম্ জ্ঞানং, 'অজ্ঞান* দ্বারা *জ্ঞান আচ্ছাদিত'। তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ,* 'তার ফলে জীব মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে'। যেখানেই *অজ্ঞান* সেখানেই মোহ। যেখানে *জ্ঞান,* সেখানে কোন মোহ নেই। তখন আমরা সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাই। আপনি যখন কুয়াশার মধ্য দিয়ে গাড়ি চালান, তখন ঠিক ঠিক পথ দেখতে পান না। এই হচ্ছে অজ্ঞান বা মোহগ্রস্ত অবস্থা। এ অবস্থায় কত দুর্ঘটনাই না ঘটতে পারে। মনে আছে ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্যারিস বিমানবন্দর থেকে গ্রেটৎস-এ আমাদের বেদান্ত আশ্রমে যাচ্ছি। ২৯ কিলোমিটার সরু, কুয়াশাচ্ছন্ন পথ দিয়ে গাড়ি চলেছে। কুয়াশা এতই ঘন যে এক ইঞ্চি সামনে কী আছে, তাও দেখা যাচ্ছে না। দুর্ঘটনা এড়াতে কত ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে আমাদের যেতে হচ্ছিল! অজ্ঞান ঐ কুয়াশার মতো যা পথ দেখতে দেয় না। *তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ,* 'এর ফলে জীব মোহগ্রস্ত হয়'। কিন্তু এই দুর্দশা কি চিরকাল থাকবে? না। আমরা কুয়াশা সরিয়ে দিতে পারি, অজ্ঞানকে আমরা অপসারিত করতে পারি। এইটিই হচ্ছে পরবর্তী শ্লোকের বিষয়বস্তু।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥ ১৬ ॥

—'কিন্তু আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁর অজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব বিনষ্ট হয়—সূর্যের মতো তাঁদের সেই জ্ঞান পরম ব্রহ্মকে প্রকাশিত করে।'

কী অনন্যসুন্দর ভাব, কী সুন্দর দৃষ্টান্ত এখানে পাচ্ছি! *জ্ঞানেন তু তৎ অজ্ঞানং যেষাং নাশিতম্‌,* 'যাঁর *অজ্ঞান* বা আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব *জ্ঞান* দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে'; *আত্মনঃ,* 'আত্মার'; অর্থাৎ 'আমি জ্ঞান দ্বারা আমার অজ্ঞানকে বিনষ্ট করেছি'; সেটি যখন হয়, *তেষাম্‌,* 'তাঁদের'; *আদিত্যবৎ তৎ জ্ঞানং পরম্‌ প্রকাশয়তি,* '(তাঁদের) সেই জ্ঞান আকাশের সূর্যের মতো পরম ব্রহ্মকে প্রকাশিত করে'। যে-সূর্য আগে ঘন মেঘে ঢাকা ছিল, মেঘ সরে যেতেই তা এখন আবার দেদীপ্যমান। সূর্য সর্বদাই ছিল, কিন্তু মেঘে ঢাকা ছিল। আপনার ক্ষেত্রেও তাই। *জ্ঞান* আপনার কাছে আপনারই অনন্ত সত্তাকে প্রকাশ করে। যখন জ্ঞানের দ্বারা আপনার অজ্ঞানতা বিদূরিত হয়, কেবল তখনই আপনি বুঝতে পারেন যে, আপনি ওই জড় *স্বভাবের* একটি ক্ষুদ্র অংশ নন, আপনার মধ্যে নিহিত এক অসীম সত্তা, এক গভীরতম সত্য, যে-সত্য আগেও জাজ্বল্যমান ছিল, এখনও আছে। মেঘ সূর্যের জ্যোতি বিনষ্ট করতে পারেনি; কেবল সে সূর্যকে কিছু সময়ের জন্য আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে পেরেছিল। *প্রকাশ* মানে দীপ্তি। বেদান্ত বলে, সব মানুষই স্বরূপত পবিত্র ও মুক্ত। আমরা চৈতন্যস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ। চৈতন্যের জ্যোতিই আমাদের স্বরূপ। কিন্তু যখন আমরা মোহাচ্ছন্ন হই, তখন সেই আলো ম্লান হয়ে আসে এবং আমরা নানা অসৎ কর্মে লিপ্ত হই। ওই মোহ, ওই *অজ্ঞান* দূর করে দিন, তাহলেই দেখবেন *জ্ঞান* আপন জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে উঠবে। ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং (Robert Browning), তাঁর 'Paracelsus' কবিতায় একেই 'অবরুদ্ধ জ্যোতি' (The Imprisoned Splendour) বলেছেন। সেই অদ্ভুত আলো আপনার মধ্যে, আমার মধ্যে, সকলের মধ্যে, এমনকি পশুদের মধ্যেও রয়েছে। বেদান্ত বলে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটের মধ্যেও সেই এক আত্মা বিরাজ করছেন। কিন্তু কীট সেই সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। একমাত্র মনুষ্যদেহেই এই সত্যের সন্ধান করা যায় এবং তা আবিষ্কার করা যায়।

এইখানেই মানুষের পরম অনন্যতা। আমরা যে স্বরূপত অনন্ত আত্মা, এই নিত্য সত্যটিকে আমরা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু *স্বভাব* বা বহিঃপ্রকৃতি

আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। *স্বভাবের* এই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের আরও বেশি শক্তিসঞ্চয় করতে হবে। তা যদি করতে পারি, তখনই আমরা উপলব্ধি করব যে *অজ্ঞান* অপসারিত হয়ে *জ্ঞানের* উদয় হয়েছে, যেমন মেঘের আবরণ সরে গেলে সূর্য প্রকাশিত হয়। এইটিই আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে ঘটে চলেছে। *তৎপরম্*, 'যখন আমরা তাঁর সঙ্গে এক সুরে ঝঙ্কৃত হই', অর্থাৎ আমাদের মনটিকে অন্তরস্থিত আত্মার সঙ্গে একসুরে বেঁধে নিই—তখনই আমরা *অজ্ঞানের* নাশ করে নিজের প্রকৃত দিব্য স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। এই ১৬তম শ্লোকটি অতি সুন্দর।

মানুষ সম্বন্ধে এইটিই মহান সত্য। যেমন 'ভৌত প্রকৃতির সম্ভাবনা বিকাশের বিজ্ঞান' আছে, তেমনি এই পরম আধ্যাত্মিক সত্যকে পরিস্ফুট করে তোলার প্রণালীটিও একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান। আমরা এর নাম দিতে পারি 'মানব সম্ভাবনা বিকাশের বিজ্ঞান' (Science of Human Possibilities)। বাস্তবিক, এই মানুষ কত উঁচুতেই না উঠতে পারে! আজকে যে শিশু, কাল সে একজন মহম্মদ আলি বা আইনস্টাইন বা বুদ্ধ হতে পারে। এই সকল সম্ভাবনা প্রত্যেক মানবশিশুর মধ্যেই সুপ্ত আছে। আমাদের কর্তব্য ঐ শিশুটিকে সাহায্য করা যাতে তার সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি বিকশিত হতে পারে। *জ্ঞান* বলতে এটিই বোঝানো হয়েছে। একমাত্র মানুষেরই *জ্ঞানলাভের* ক্ষমতা আছে; পশুর মধ্যে এই *জ্ঞান* শুধু ইন্দ্রিয়স্তরেই কেন্দ্রীভূত এবং সীমাবদ্ধ। পশুদের আচরণ লক্ষ্য করলেই এটি বুঝতে পারবেন। *দেবীমাহাত্ম্যে* বলা হয়েছে (১, ৪৭) ঃ

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে

সমস্তস্য জন্তোঃ, 'সমস্ত জন্তু', তাদের *জ্ঞান* কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের স্তরেই কাজ করে। মনে করুন একটি পাখী। সে দেখতে পায় এবং তার শিকার খুঁজে নিতে পারে। অন্যান্য জন্তুরাও তাই করে থাকে—সবই কিন্তু ইন্দ্রিয়ের স্তরে, তার ঊর্ধ্বে তাদের দৃষ্টি যায় না। ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে। এই *জ্ঞান* বৈজ্ঞানিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক—সবরকমেরই হতে পারে। কয়েকটি শ্লোক পরে এই ভাবটিকে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হবে এবং সেই সঙ্গে আরও একটি নূতন সত্য যুক্ত হবে। সেই সত্যের নাম সাম্য, সম-মনস্কতা এবং সমদৃষ্টি, যে-ভাবটিকে পঞ্চম অধ্যায়ের মহান বাণীরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

স্বভাব বা *প্রকৃতি* শব্দটির তাৎপর্য কী? একাধিক স্থানে গীতা শব্দটির উল্লেখ

করেছেন। সাধারণত—এবং পাশ্চাত্যের পরিপ্রেক্ষিতেও—এর অর্থ হচ্ছে শুধুই ভৌতপ্রকৃতি বা বহিঃপ্রকৃতি। কিন্তু অন্য আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয়রা এই *স্বভাব* শব্দটির বিশ্লেষণ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সমগ্র সত্তাটিই হলো *স্বভাব*। কিন্তু তার দুটি দিক আছে। সাধারণ *স্বভাব* হচ্ছে *অপরা প্রকৃতি* এবং মহত্তর *স্বভাব* হচ্ছে *পরা প্রকৃতি।* সপ্তম অধ্যায়ে বিষয়টিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। *প্রকৃতি* ও *স্বভাব*—দুটিরই এক অর্থ। অতএব, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রকৃতির দুটি দিক নিয়েই আলোচনা করব।

ভারতীয় পুরাণে ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় এই *প্রকৃতিকে* জগন্মাতা, দেবী শক্তি বা *পরাশক্তি* বলা হয়েছে। যা কিছু জড় ও অচেতন প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত, সেগুলিই চিৎ-শক্তি, চৈতন্য শক্তি, *পরাশক্তি* বা জগন্মাতার অভিব্যক্তি। *গীতা* এই সত্য বহুবার উল্লেখ করলেও *দেবীমাহাত্ম্যের* এইটিই হলো মূল বিষয়। চিন্ময়ী মা-ই সমস্ত কিছু হয়েছেন। জগতের সকল শক্তি, তা সে দৈহিক, বুদ্ধিগত বা আধ্যাত্মিক, যে শক্তিই হোক না কেন, তা সেই এক দৈবীশক্তি বা *আদ্যাশক্তির* প্রকাশ। সেই পরমা শক্তিই জগৎরূপে প্রকাশিত। তিনিই জগতকে প্রকাশ করছেন, আবার নিজের ভিতর টেনে নিচ্ছেন, আবার একসময় তাকে প্রকাশ করছেন। এই মাতৃশক্তিকে *দেবীমাহাত্ম্যে* এইভাবে বন্দনা করা হয়েছে ঃ *প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্বস্য,* 'তুমিই সর্বভূতের প্রকৃতি'; *গুণত্রয়বিভাবিনী,* 'সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিনগুণ নিয়ে তোমার প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা'; *কালরাত্রিঃ মহারাত্রিঃ মোহরাত্রিশ্চ দারুণা,* 'সেই প্রকৃতিই *মোহরাত্রি,* অর্থাৎ মোহগ্রস্ত ভয়ানক রজনী সৃষ্টি করেন'; সৃষ্টি করেন *কালরাত্রি,* 'তমসাবৃত নিশা' এবং *মহারাত্রি,* 'অজ্ঞানের নিবিড় নিশা'। আমরা প্রত্যেকেই এই *পরা প্রকৃতি* ও *অপরা প্রকৃতির* লীলাক্ষেত্র। যখন আমরা স্বার্থপর, হিংস্র ও নিষ্ঠুর, তখন আমাদের মধ্যে *অপরা প্রকৃতি* সক্রিয়। আবার যখন আমরা করুণাপূর্ণ, স্নেহশীল ও শান্ত, তখন আমাদের মধ্যে *পরা প্রকৃতি* কাজ করেন। একটি থেকে আরেকটিতে পরিবর্তিত হওয়া আমাদেরই হাতে। *এখানেই মানুষের স্বাধীনতা।* কোন পশু কিন্তু এ কাজ করতে পারে না, সাধারণ কোন প্রকৃতিও নয়। একমাত্র মানুষের ভিতর যে উচ্চতর প্রকৃতি বর্তমান, সেটিই স্বভাবের ক্রিয়াকে সাধারণ থেকে অসাধারণে রূপান্তরিত করতে পারে। এখানেই মানুষের অনন্যতা। তা যদি করা যায়—এবং সেটি করার দায়িত্ব আমাদেরই—তাহলে এই দেহ ও মন শুধু *পরা প্রকৃতিরই* লীলাক্ষেত্র হবে, *অপরা প্রকৃতির* নয়। *দেবীমাহাত্ম্যের* নানা স্থানে এই ভাবটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। জগন্মাতাকে বলা হয়েছে সেই *আদ্যাপ্রকৃতি* বা *পরাপ্রকৃতি* এবং সমগ্র বিশ্ব হচ্ছে তাঁর শক্তির প্রকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যতক্ষণ আপনার অহংবোধ ও বাহ্যজগতের বোধ আছে, ততক্ষণ আপনি এই *আদ্যাশক্তি বা পরমা প্রকৃতির* এলাকাভুক্ত। একমাত্র গভীর সমাধি হলে তবেই আপনি শক্তির এলাকা ছেড়ে বেরোতে পারবেন। অতএব, শক্তির এলাকা সর্বত্র বিস্তৃত—সমগ্র বিশ্বে, বাহ্য প্রকৃতিতে ও মানুষের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে তা ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু *নির্বিকল্প সমাধি* অবস্থায়, সমস্ত দ্বৈতজ্ঞানের উর্ধ্বে উঠলে আমরা *শক্তির সীমানা* ছাড়িয়ে *শিব-প্রকৃতিতে* উপনীত হই, যা অনন্ত, অপরিবর্তনীয় ও নিত্য। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা সকলেই *শক্তি, আদ্যাশক্তি* বা *পরাশক্তির* অধীনে। তাই, এখানে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—*কালরাত্রি, মহারাত্রি ও মোহরাত্রি*। এখানে *রাত্রি* অর্থে রাতের অন্ধকার। রাতের অন্ধকারটি কী? মোহ। *মোহরাত্রি,* 'মোহের অন্ধকারজনিত রাত্রি' এবং *মহারাত্রি,* 'অজ্ঞান বা ভ্রান্তির নিবিড় অন্ধকার'। সবশেষে, *কালরাত্রি,* 'ভয়াবহ রাত্রি'। কোন কোন সময়ে আমরা ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাই, সমস্তই কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে। এসব ঘটে কারণ আমরা আলোকহীন, জ্ঞানহীন, জ্যোতিহীন রাতের অন্ধকারে বাস করছি। এই যে অন্ধকার, সেও কিন্তু একই *প্রকৃতি*। একটা পাথরের দিকে তাকান, দেখবেন তার ভিতর জমাট অন্ধকার, কারণ তার মধ্যে কোন চেতনা নেই। যেন মোহের অন্ধকারে সেটি আবৃত। আমাদেরও কখনও কখনও এই মোহান্ধকার গ্রাস করে এবং সেই অবস্থায় আমরা নানা পাপকর্মে লিপ্ত হই। আসলে, জগন্মাতা ঐভাবে তখন আপনার ও আমার মধ্যে খেলছেন। তাহলে কি আমাদের কিছুই করার নেই? অবশ্যই আছে। বলা হচ্ছে—খেলার মোড় ঘুরিয়ে দাও। বলা হচ্ছে, তোমার মধ্যে মায়ের মহৎ শক্তিকে বা *পরা প্রকৃতিকে* প্রকাশিত হতে দাও। এটি আমাদের করতে হবে কারণ সেই স্বাধীনতা আমাদের আছে। মানুষকে এই মহান সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের মধ্যে *অপরা প্রকৃতি* খেলা করবে না *পরা প্রকৃতি,* সেই সিদ্ধান্ত আমাদেরই নিতে হবে। সবটাই অদৃষ্ট, একথা বলবেন না। আমি নিজেকে অবশ্যই বদলাতে পারি, একটি খেলাকে আর একটি খেলায় পরিবর্তিত করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় *বিদ্যামায়া* ও *অবিদ্যামায়া*—দুটিই *মায়ার* রূপ। কিন্তু *বিদ্যামায়া*-কেই যেন আমরা বরণ করি। বিদ্যামায়াই আমাদের ভিতর খেলতে থাকুন। যখন আপনি মানুষকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেন, তখন আপনি *বিদ্যামায়া* দ্বারা প্রভাবিত; আর যখন আঘাত করবার চেষ্টা করেন, তখন *অবিদ্যা মায়া* দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের হৃদয় উভয়েরই লীলাক্ষেত্র এবং এর জন্য আমরাই দায়ী।

মানুষের একটা নৈতিক দায়িত্ববোধ আছে। পশুদের মধ্যে সেটি নেই। তারা নৈতিক বিচারের ধার ধারে না। আপনি যদি একটি গর্দভের কাছে যান ও সে যদি আপনাকে লাথি মারে, তবে আপনি কখনই বলবেন না যে, "তুই একটা খারাপ গাধা"। কারণ ওটি গর্দভ ছাড়া আর কিছুই নয়। ওর মধ্যে ভালোও নেই, খারাপও নেই, ঐটিই ওর প্রকৃতি। ওর প্রকৃতিকে ব্যক্ত করবার জন্যই সে পা ছোঁড়ে। আমাদের মধ্যেও ওই গর্দভ-প্রকৃতি আছে, কিন্তু একই সঙ্গে একটা মহৎ প্রকৃতিও আছে। ঐ গদর্ভ-প্রকৃতিকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। কোন ব্যক্তি আমার কাছে এলেই তাঁকে ধাক্কা দেবার দরকার পড়ে না। আমি তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে পারি, হাসতেও তো পারি। কীভাবে ব্যবহার করব তা সম্পূর্ণ আমার ওপরই নির্ভর করছে। *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, এক্ষেত্রে *স্বভাব* মানে নিম্নতর প্রকৃতি। সেটিই আমাদের এটা-ওটা করতে প্রবৃত্ত করছে। কিন্তু *স্বভাবের* উচ্চতর ভাবটিও আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করে। যখন তা করে, তখন মহৎ চরিত্রের ও বিরাট আধ্যাত্মিক উন্নতির অভ্যুদয় হয়।

প্রকৃতি বা *স্বভাব* শব্দটি এইভাবেই *দেবীমাহাত্ম্য*-এ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অধিকাংশ শিক্ষার মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রহ্ম ও *শক্তি*, ব্রহ্ম ও *মায়া*, শিব ও *শক্তি*, এঁরা এক ও অভেদ। কিন্তু শক্তি থেকেই জগৎ প্রকাশিত হয়। শক্তি যখন স্পন্দিত হন, তখন জগৎ প্রকাশ পায়, ব্যক্ত হয়। *শক্তি* যখন নিশ্চল ও স্থির, তখন জগতের প্রলয় হয়। বাস্তবিক, সাংখ্য দর্শনের অনবদ্য সত্যটি এই যে, তিনগুণের (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) পূর্ণ সাম্যাবস্থায় কোন জগৎ থাকে না। এটি আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যার State of Singularity বা একত্বাবস্থা তত্ত্বটির অনুরূপ। এরই নাম *প্রলয়*। সমগ্র জগৎ তখন তার আদি প্রকৃতিতে লয় হয়ে যায়। কী সুন্দর ভাব! কিন্তু প্রকাশ বা সৃষ্টি কখন শুরু হয়? যখন তিনগুণের সাম্যাবস্থায় ঈষৎ চাঞ্চল্য বা তারতম্য দেখা দেয়, তখনই সৃষ্টি প্রক্রিয়া বা জগৎ প্রকাশের কাজ শুরু হয়। তখন আগের একত্ব বা একরূপতা চলে গিয়ে বৈচিত্র্যের প্রকাশ হয়। এক বহুতে পরিণত হয়। ধরুন ওই আদি সত্তা, যাকে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যায় Background Material বা পটভূমির মৌলিক পদার্থ বলা হয়েছে, তাকে যদি তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে হতো, তাহলে সেই ভাষাটি কেমন হতো? উপনিষদে এইভাবে সেটি অভিব্যক্ত হয়েছে : *একোঽহম্ বহুস্যাম্*, 'আমি এক, আমি বহু হব'। সেই আদি মৌলিক পদার্থটি, যা বিস্ফোরণের পর বিশ্বে পরিণত হয়েছে, আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে যাকে বিগ ব্যাং (Big Bang) তত্ত্ব বলা হয়, তা উপনিষদীয় ধারণাটির অনেকটা কাছাকাছি।

আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বের এই সুন্দর চিন্তাগুলো ঠিক যেন আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিধ্বনি। শুধু ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব এক ধাপ এগিয়ে আছে, কারণ পটভূমির মৌলিক পদার্থের পিছনে বিরাজমান যে চৈতন্য, তাকে সে উচ্চস্থান দিয়েছে যা আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যায় দেওয়া হয়নি। কিছু কিছু পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ অবশ্য চৈতন্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং এই প্রচেষ্টার ফলে তাঁরা ক্রমশ প্রাচীন ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্বের দিকে এগিয়ে আসছেন। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle)-এর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'The Intelligent Universe'-এর কথা আমি প্রথম খণ্ডেই উল্লেখ করেছি। এতদিন পর্যন্ত আমরা জগৎকে অচেতন ভেবেই অনুসন্ধান করছিলাম। এখন আমরা কাজ করছি সচেতন জগৎ নিয়ে। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা যদি এই চিন্তায় আরও অগ্রসর হয়, তবে তা সাংখ্যবাদী ও বেদান্তবাদীরা যে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, ঠিক সেই তত্ত্বেই পৌঁছবে। সেই আদি অবস্থায় বহুর অস্তিত্ব নেই, কেবল এক ও অদ্বৈত আছেন—*একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম*, 'সেই পরম ব্রহ্ম হলেন এক ও অদ্বিতীয়'। ব্রহ্মাই শক্তির সাহায্যে এই জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, একই পরমাত্মার নির্গুণ ও সগুণ রূপ। বেদান্ত এঁকেই *পরা প্রকৃতি, পরা শক্তি* বা পরম সত্য বলেছেন। পরম তত্ত্বে *পরা ও অপরা প্রকৃতি* মিলেমিশে আছে। এই বিষয়টি সপ্তম অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অতএব, *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, '*স্বভাবই* কর্ম করছে'। ১৪শ শ্লোকের এই উক্তিতে *স্বভাবের* ঐশী বা দিব্য মাত্রাটিকে আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। যে-*স্বভাব* সাধারণ ভৌতিকদৃষ্টিতে নিতান্তই জড় ও মৃত, *শক্তিরূপে* তাই হলো সক্রিয় শুদ্ধচৈতন্য। একদিকে তিনি জড়, অচেতন পদার্থ, অন্যদিকে তিনি চৈতন্যময় সত্তা ও সচেতন জীব। অতএব, প্রকৃতির দুটি দিক—চেতন ও অচেতন, *চিৎ* ও *জড়*। দুটিই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের কর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে *গীতা ঐ জড় প্রকৃতি* বা *স্বভাব*-এর উল্লেখই করেছেন। বলেছেন, *স্বভাবই* আপনার ও আমার মধ্যে কাজ করছে। কিন্তু *গীতা* এও বলছেন যে, ঐ স্বভাবের কারণে ভীত হয়ো না। কারণ ওটি হচ্ছে নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট প্রকৃতিরূপে শক্তিরূপা জগন্মাতারই প্রকাশ। ভারতে এইভাবেই আমরা ঈশ্বরের নারীরূপ বা দেবীশক্তির চিন্তা করেছি। তাঁর থেকেই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, তাঁর দ্বারাই জগৎ পালিত হচ্ছে। এই ভাবগুলি *দেবীমাহাত্ম্যের* অনেক শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে। জার্মান কবি ও নাট্যকার গ্যেটে (Goethe) তাঁর 'The Faust' গ্রন্থে দুটি সুললিত শব্দ ব্যবহার

করেছেন—'Eternal Feminine' বা চিরন্তনী নারী। 'The Faust'-এর সর্বশেষ পংক্তিটি সত্যিই অসাধারণ ঃ 'The Eternal Feminine leads us on and on', অর্থাৎ 'সেই চিরন্তন নারীসত্তা আমাদের নিরন্তর এগিয়ে নিয়ে চলেছেন'। গ্যেটে নিশ্চয়ই ভারতীয় দর্শন পড়েছিলেন, কারণ তখন অনেক ভারতীয় বই ইউরোপে যেতে শুরু করেছিল। কালিদাসের 'শকুন্তলা' যে তাঁকে অত্যন্ত মুগ্ধ করত, সে কথাও আমরা জানি। সে যাই হোক, এই যে চিরন্তনী নারীসত্তা যিনি আমাদের ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি আর কেউ নন, তিনিই সমগ্র জগতের অন্তরালে অবস্থিত ঈশ্বরীয় শক্তি বা পরাশক্তি। কী সুন্দর ভাব! এঁকেই শ্রীরামকৃষ্ণ 'আমার চিন্ময়ী মা' বলতেন। সবকিছুই এই জগন্মাতার অধীনে। তাঁকেই আমরা 'কালী' নামে ডাকি। তাঁর অবশ্য অনেক নাম। নামগুলি গৌণ।

আমেরিকান কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান (Walt Whitman) লিখেছেন, 'O Black Mother! Have none sung Thy praise? I shall sing Thy praise, O Mother'—'আমার আঁধাররূপা জননী! তোমার স্তুতি কেউ করেনি? মাগো, আমি তোমার সন্তান, গাইব তোমার স্তুতিগান।' আমরাও এইরকম গান করি। আঁধাররূপা মা—এ আর কিছুই নয়, স্রেফ কালীতত্ত্ব।

অতএব, জগৎকে আপনি *ব্রহ্ম* ও *শক্তি*, *শিব* ও *শক্তির* যুগ্মপ্রকাশ হিসাবে দেখতে পারেন। *শক্তি* হচ্ছেন নারী। সেই হেতু, যাঁর থেকে সমগ্র জগৎ সৃষ্ট হচ্ছে ও যাঁর মধ্যে তা পুনরায় বিলীন হচ্ছে, তাঁকে আমরা 'মা' বলে ডাকি। এইভাবেই ভারতীয় চিন্তায় ঈশ্বরকে মাতৃরূপে দেখার প্রচলন হয় এবং এই ধারণাটি খ্রিস্টপূর্ব ইউরোপে এবং অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেও ছিল। কিন্তু তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরকে মাতৃরূপে দেখার ভাবটি একমাত্র ভারতীয় চিন্তাতেই পুষ্টি ও পরিণতিলাভ করেছে এবং বেদান্ত সেই কাজে প্রভূত সাহায্য করেছে। এই কারণেই শঙ্করাচার্যের মতো দিকপাল মহাজ্ঞানী দার্শনিকও তাঁর স্তোত্র ও স্তবগুলিতে জগন্মাতৃকার শ্রেষ্ঠত্ব বন্দনা করেছেন। *গীতা*-ও এখানে এই বিশেষ ভাবটির উল্লেখ করে বলছেন ঃ ঈশ্বর আপনার জন্য কোন কর্ম নির্দিষ্ট করেননি, কোন কর্মফলও নয়। কিন্তু *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।* যে *স্বভাব* আপনার মধ্যে রয়েছে, তাই আপনাকে নানাভাবে কর্ম করতে বাধ্য করছে। এই স্বভাব হচ্ছে প্রকৃতির সাধারণ রূপ। আমাদের কর্তব্য, এই সাধারণ প্রকৃতিকে অতিক্রম করে, প্রকাশের অপেক্ষায় রত উচ্চতর বা *পরা প্রকৃতিকে* বিকশিত করা। দুইয়ে মিলে প্রকৃতির যে সামগ্রিক রূপ, সেটিই জগতের কারণ।

সপ্তম অধ্যায়ে *গীতা* এই কথা বলবেন। ১৫শ শ্লোকে বলা হয়েছে, ঈশ্বর কারো পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, *অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্*, 'অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়ে আছে', যার ফলে *তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ*, 'জীব মোহাচ্ছন্ন হয়' এবং এই মোহের কারণেই আমরা যত পাপকর্ম করি। এই মোহকে জয় করতে হবে। কীভাবে? এই ১৬শ শ্লোকটিতে তা বলা হয়েছে ঃ

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥

—'জ্ঞান দ্বারা যখন কেউ অন্তরস্থ অজ্ঞান অতিক্রম করেন, তখন সেই ব্যক্তির মধ্যে পরম সত্য উদ্ভাসিত হয়, যেমন সূর্য আকাশে উদিত হলে সমগ্র জগৎ আলোকিত হয়।'

এখানে *জ্ঞানের* প্রসঙ্গ হচ্ছে। চতুর্থ অধ্যায়েও তাই হয়েছিল। কিন্তু এখানে জ্ঞান বলতে পুঁথিগত জ্ঞান বোঝাচ্ছে না। এখানে মুক্তিদায়ী আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথাই বলা হচ্ছে। আমাদের প্রচুর পাণ্ডিত্য থাকতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা দিব্য জ্ঞানের কণামাত্র লাভ করা যাবে না। ওটা কেতাবি পাণ্ডিত্যমাত্র, তার বেশি কিছুই নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি রূপক কাহিনীর মাধ্যমে বলতেন যে শুধু এই ধরনের বৌদ্ধিক জ্ঞানের সাহায্যে মোহান্ধকারময় জীবন থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। গল্পটি এই ঃ কয়েকজন নদী পার হওয়ার জন্য একটি নৌকায় উঠেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। নৌকা যখন চলতে লাগল, তিনি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে মাঝি, তুমি কি মনস্তত্ত্ব পড়েছ?' মাঝি বললে, 'না, মশায়'। 'তবে তোমার জীবনের ২৫ শতাংশ বৃথা গেল।' কিছুক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'জীববিজ্ঞান পড়েছ?' মাঝির উত্তর ঃ 'না মশায়'। 'তবে তোমার জীবনের ৫০ শতাংশ বৃথা', পণ্ডিত বললেন। এভাবে একের পর এক তিনি নানান প্রশ্ন করে চললেন। কিছু পরে আবার প্রশ্ন, 'দর্শন-টর্শন কিছু পড়া হয়েছে নাকি?' 'না মশায়'। সে কথা শুনে পণ্ডিত বললেন, 'ওহে, তবে তো তোমার ৭৫ শতাংশ জীবনই জলে গেল।' যাত্রীরা তাকিয়ে তাকিয়ে ব্যাপারটি দেখছে। হঠাৎ ঝড়। নৌকা দুলে উঠল। পণ্ডিত ভয় পেলেন। তাঁর ভাবগতিক দেখে 'মূর্খ' মাঝি তাঁকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি সাঁতার জানেন তো?' পণ্ডিত বললেন, 'না ভাই, তা তো জানি না'! তখন মাঝি বললে, 'তবে আপনার জীবনের একশো ভাগই তো জলে গেল'। বাস্তবিক, শুকনো পাণ্ডিত্যের মধ্যে কোন ধর্ম নেই। সত্য আপনাকেই উপলব্ধি করতে হবে।

এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের চিল-শকুনির সঙ্গে তুলনা করতেন। তারা আকাশের অনেক উঁচুতে ওড়ে বটে, কিন্তু তাদের নজর কোথায় থাকে? ভাগাড়ে পড়ে থাকা কোন মড়ার ওপর। এই হচ্ছে শুকনো পাণ্ডিত্যের প্রকৃতি। কিন্তু যথার্থ *জ্ঞান* হচ্ছে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, আত্মজাগরণ। একমাত্র এই জ্ঞানই মোহ নিশ্চিহ্ন করতে পারে। বই পড়ে বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা মোহকে আদৌ দূর করা যায় না। বরং এগুলি মোহ বাড়িয়ে দিতে পারে, কারণ পাণ্ডিত্যের সাথে সাথে আবার পাণ্ডিত্যের অহংকার ও অভিমান এসে জুটতে পারে। অতএব, সত্যকে উপলব্ধি বা *অনুভব* করার চেষ্টা করুন। তার জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিকে অতিক্রম করে অনুভূতিতে পৌঁছান। বুদ্ধির দৌলতে হয়তো আমি প্রেম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানি, আমি তার ওপর বই লিখে Ph.D. উপাধি পেতে পারি। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি ভালবাসতে জানেন?' তাহলে আমি বলবো, 'ওসব আমি জানি না'। ভালবাসা সম্বন্ধে আমি অনেককিছু জানি, ঐ নিয়ে অনেক কিছু লিখতেও পারি, কিন্তু ভালবাসার অভিজ্ঞতা আমার মোটেই নেই'। শুকনো পাণ্ডিত্যও এইরকম। তাহলে ওই পাণ্ডিত্যের কী প্রয়োজন? একথা জীবনের সব ক্ষেত্রেই সত্য। নাগরিকত্বের ওপর আপনি একটি বই লিখলেন, কিন্তু নিজে একজন নাগরিকের মতো ব্যবহার করেন না। তাহলে ঐ জ্ঞানের কী প্রয়োজন? আপনি আইন সম্বন্ধে অনেক জানেন, কিন্তু সর্বদাই বেআইনি আচরণ করছেন। আপনার এই আইনজ্ঞানের মূল্য কী? আপনি বিজ্ঞানচর্চা করছেন, কিন্তু আপনার বৈজ্ঞানিক চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গি নেই। ঐ বিজ্ঞানের উপযোগিতা কোথায়? সব ব্যাপারেই 'জানা'র থেকে 'হওয়া' তাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে, ধর্ম হলো 'being and becoming', '*হওয়া* এবং *হয়ে-যাওয়া*'। সূর্য যেমন অন্ধকার বিদূরিত করে বিশ্বকে আলোকিত করে, তেমনি *জ্ঞান*, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান *অজ্ঞানকে* দূর করে; জ্ঞানের দ্বারাই আপনার কাছে পরম সত্যটি উদ্ভাসিত হবে। এইটিই ১৬শ শ্লোকের মহতী ঘোষণা। এরপর আসছে ১৭শ শ্লোক, যা অত্যন্ত অর্থবহ এবং অতি চমৎকার।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

—যাঁদের বুদ্ধি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মে যাঁদের আত্মভাব, ব্রহ্মে যাঁদের অবিচল

নিষ্ঠা, ব্রহ্মেই যাঁদের পরিপূর্ণতা সিদ্ধ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা যাঁদের সকল কলুষ ধুয়ে গেছে, তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না। তাঁরা মোক্ষলাভ করেন।'

এটি অসাধারণ শ্লোক। তৎ *বুদ্ধয়ঃ,* 'যাঁদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ', অর্থাৎ সেই পরমসত্তার কাছে উৎসর্গীকৃত। তৎ *আত্মানঃ,* 'সেই ব্রহ্মই যাঁর আত্মা'। তৎ *নিষ্ঠাঃ,* 'যিনি সতত ব্রহ্মচিন্তায় সংযত'। তৎ *পরায়ণাঃ,* 'সেই ব্রহ্মই যাঁর চরম লক্ষ্য'। এই শ্লোকটিতে তৎ শব্দটি সবশুদ্ধ চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। *গচ্ছন্তি অপুনরাবৃত্তিং,* 'তাঁরা সেই অবস্থা লাভ করবেন, যেখান থেকে আর পুনর্জন্ম হয় না'। তাঁদের আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না। *জ্ঞান-নির্ধূত-কল্মষাঃ,* 'যাঁদের মনের সমস্ত অসৎ চিন্তা, পাপ ও অশুদ্ধি জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে।' *কল্মষাঃ,* 'পাপ'; *নির্ধূত,* 'ধ্বংস' হয়ে গেছে বা ধুয়ে গেছে। এই কারণেই তাঁরা সেই পরম পদ লাভ করেন, যেখান থেকে আর পুনর্জন্ম হয় না। এই নিয়ত জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আমরা যারা অসহায়ভাবে ঘুরপাক খাচ্ছি, তাঁদের ক্ষেত্রে আর সেটি ঘটে না; তাঁরা মুক্ত হয়ে যান। এটি প্রারম্ভিক উক্তি। পরবর্তী একটি শ্লোকে এই সিদ্ধিলাভের মাহাত্ম্য দেখিয়ে বলা হয়েছে যে, এই মোক্ষ আমরা ইহলোকেই এবং এখনই পেতে পারি; তার জন্য ভবিষ্যতে জন্ম নেওয়া বা কোন সুদূর স্বর্গে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এই জগতে, এই জন্মে, এই দেহেই আমরা উপলব্ধির এই অবস্থাটি, অপুনর্জন্মের এই অবস্থাটি লাভ করতে পারি, যে অবস্থায় আমরা সত্যসত্যই মুক্ত। নিরন্তর জন্ম ও মৃত্যু হতে থাকলে আমরা মুক্ত হলাম না। কুমোর তার চাকে মাটি ফেলে কুম্ভ তৈরি করে ও এইভাবে গড়নের কাজ চলতেই থাকে। এ ব্যাপারে মাটির কোন মতামত নেই। আমরাও প্রকৃতির হাতে এইরকম অসহায় মাটির তালের মতো, যাকে তিনি ইচ্ছামতো গড়ছেন, ভাঙছেন। কিন্তু মুক্তিলাভ করলে এই দশা আপনার থাকবে না। তখন কেউ আর আপনাকে টলাতে পারবে না। তখন আপনি নিজেই নিজের প্রভু হবেন—যাকে বলা হয় *স্বারাজ্য,* আপনি তারই অধিকারী হবেন।

বেদান্তের এই ভাবটি অতি চমৎকার! শঙ্করাচার্য একেই *স্বারাজ্য-সিদ্ধি* বলে উল্লেখ করেছেন। তখন 'আপনি নিজেই নিজের কর্তা।' তখন বাইরের কারো হুকুম আপনাকে শুনতে হবে না। এইটি হচ্ছে পরম আধ্যাত্মিক মুক্তি, আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং এর উপায় হচ্ছে এই ঃ *তদ্‌বুদ্ধয়ঃ,* 'বুদ্ধি ব্রহ্মে নিবদ্ধ'; *তদাত্মানঃ, তন্নিষ্ঠাঃ, তৎপরায়ণাঃ।* আমি অবিরাম সেই ব্রহ্ম-চেতনায় ডুবে আছি। ঐটিই হচ্ছে লক্ষ্য, দৈনন্দিন ছোটখাট সফলতা নয়। এই ধরনের ব্যক্তিরা, *গচ্ছন্তি,*

'লাভ করেন', *অপুনরাবৃত্তিম্*, 'অপুনর্জন্মমৃত্যু' অবস্থা। সংসারের অর্থ হলো, যা চলেছে, চক্রের মতো যা সতত জন্মমৃত্যুর প্রবাহরূপে চলছে। মুক্ত পুরুষের সে দুরবস্থা হয় না। *অপুনরাবৃত্তি-র* আর এক অর্থ *মোক্ষ*, প্রকৃত আধ্যাত্মিক মুক্তি। বেদান্ত অনুযায়ী এইটিই মানুষের ক্রমবিকাশের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। একমাত্র মানুষই সম্পূর্ণ মুক্তি বা আত্মমুক্তি লাভ করতে পারে। আমরা অনেক প্রকার মুক্তির সন্ধান করি। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিরক্ষরতা থেকে আমরা মুক্তি খুঁজি। এগুলি আমাদের সাধারণ জীবনের স্তরে প্রয়োজন। কিন্তু সেখানেও শ্রেষ্ঠ মুক্তি হচ্ছে আত্মার স্বাধীনতা। ধরুন আপনাকে ভাল খাওয়া-পরা দেওয়া হচ্ছে, থাকার জন্য সুন্দর বাড়ি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি একজন মনিবের ক্রীতদাস। এর মধ্যে কী মজা আছে? ওই সব বস্তুর কোন মূল্যই নেই। সবচেয়ে মহার্ঘ বস্তুটি হলো মুক্তি। আমি মুক্তি চাই। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এই যে অনন্ত আকূতি, তার চরম পরিপূর্ণতা এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে : আমি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত আত্মা, এটিই আমার প্রকৃতস্বরূপ। কোন মোহই আমাকে ঐ অবস্থা থেকে টেনে নামাতে পারে না। জ্ঞানাগ্নিতে যত কিছু মোহ তা দগ্ধ হয়েছে বা ধুয়ে গেছে, *জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ*। *কল্মষাঃ* বা সমস্ত পাপ জ্ঞানের দ্বারা ধৌত বা ভস্মীভূত হয়েছে। যখন এমন হয়, তখনই মুক্তি বাস্তব সত্য হয়ে ওঠে। এখন এটি শুধুই একটি আদর্শ : 'আমি মুক্ত হতে *চাই*'। কিন্তু ঐ অবস্থায় এটি বাস্তব অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। আমি অনুভব করি যে আমি মুক্ত। বেদান্ত উদ্ধারের কথা বলে না। বলে মুক্তির কথা। আপনি কি মুক্ত? আপনি কি মুক্ত? মুক্ত হতে শিখুন। দৈনন্দিন জীবনের গণ্ডির মধ্যে থেকেও আপনি মুক্ত হতে পারেন, সেই মুক্তিকে ব্যক্ত করতে পারেন। কী সুন্দর ভাব! এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, ঠিক ঠিক স্বাধীন মন এবং স্বাধীন জীবন কখনওই অপরের স্বাধীনতা খর্ব করে না। যদি স্বাধীনতা খাঁটি না হয়, তবে অবশ্য অন্যরকম হবে। কিন্তু সেটিই প্রকৃত স্বাধীনতা যা অন্যকে স্বাধীন হতে সাহায্য করে। মানবজাতির প্রতি বেদান্তের এই একটিই প্রেরণাদায়ক বাণী—'মুক্ত হও, মুক্ত হও'। সুতরাং, এই হচ্ছে সেই তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকটি, যার বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি আমি পছন্দ করি :

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥

—জ্ঞানাগ্নি সমস্ত *কল্মষাঃ* বা পাপ নষ্ট করে দেয়। গতকাল আমি একটি

পাপকাজ করেছি। দশ বছর আগেও একটি পাপ করেছিলাম। কিন্তু দিব্যজ্ঞানের সামান্য একটু স্ফুরণ হলেই এই সমস্ত পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন, ঘরে যদি হাজার বছরের অন্ধকার থাকে, তবে কি তা দূর করতে আরও হাজার বছর লাগবে? শুধু একটা দেশলাইকাঠি জ্বালুন। দেখবেন মুহূর্তেই হাজার বছরের অন্ধকার দূর হয়ে ঘর আলোকিত হয়ে উঠেছে। এই হচ্ছে জ্ঞানের স্বরূপ এবং এই কারণেই সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে জ্ঞানের এত কদর। বাস্তবিক, ভারত এককালে অত্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠ ছিল। জাগতিক বা আধ্যাত্মিক সবরকমের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষ অসাধারণ উন্নতি করেছিল। ১০০০ খ্রিঃ পর্যন্ত এই দেশ সমস্ত প্রকার জ্ঞানার্জনে ও মনুষ্যজীবনের সম্প্রসারণে ব্রতী ছিল। পরে এল সঙ্কোচনের যুগ। আঠারো এবং উনিশ শতকের প্রথমে এই সঙ্কোচন মানুষকে, তথা সমগ্র দেশকে একেবারে মৃত্যুর দোরগোড়ায় নিয়ে যায়। সেই মুমূর্ষা কাটিয়ে এখন আমরা আবার সম্প্রসারণের যুগে এসে পড়েছি। প্রসারণের বিপুল সংগ্রামে এই দর্শনটি আমাদের প্রভূত শক্তি যোগাবে। জ্ঞান, আরও জ্ঞান, সমস্ত স্তরের আরও বেশি জ্ঞান চাই। তার থেকেই আসবে চরিত্রের, কর্মের ও আচরণের উৎকর্ষ। এইভাবেই আমরা নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারব। উপরের অপূর্ব উক্তিটির গুরুত্ব এইখানেই। এখানে হয়ত মহান সাধক, যোগী অথবা উপলব্ধিবান মানুষকে লক্ষ্য করেই কথাটা বলা হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে আপনি বা আমি যে স্তরে আছি, সেখান থেকেই আমরা এই শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করতে পারি। প্রত্যেক স্তরে, যে কোন ক্ষেত্রের যে কোন মহত্ত্বকেই, এই শ্লোকের ভাবটির ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। *তদ্বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাঃ।* আপনি যদি একটি ভর্জিত বা পোড়া বীজ বপন করেন, তা থেকে অঙ্কুর উদ্‌গত হবে না। সেইরকম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আগুন দেহ-মন-তন্ত্রের সমস্ত *কল্মষাঃ* বা পাপ, সমস্ত অসৎ প্রবণতা, এমনভাবে দগ্ধ করে দেয় যে তখন সেই জীবের আর জন্ম হয় না। এই ভাবটির ওপর বেদান্ত বার বার গুরুত্ব আরোপ করে বলেছে, মুক্তি এখানেই পেতে হবে— কোন ভবিষ্যৎ জীবনে নয়। আমাদের পূর্ব পূর্ব বহু ধর্মোপদেশে প্রায়ই বলা হয়েছে যে মৃত্যুর পর কোন এক ভবিষ্যৎ জীবনে আপনি মুক্ত হবেন। তার ফলে হয়ত আপনার বিশ্বাস হয়েছে যে, এই জন্মে আপনার কিছুটা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃত মুক্তির জন্য আপনাকে ভবিষ্যৎ কোন জন্মের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। উপনিষদে ও গীতায় কিন্তু এই ধারণাটি পাল্টে গেছে। বেদান্তে জীবন্মুক্তি অর্থাৎ 'জীবন্ত অবস্থায় মুক্তি'-র কথা

বলা হয়েছে। মুক্তির সেই বাণীই গীতায়, উপনিষদে, শঙ্করাচার্যের রচনায় এবং আজকের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে ঝংকৃত হচ্ছে। ইহজগতে দুর্গতিগ্রস্ত ও হতভাগ্য জীবন কাটিয়ে ভবিষ্যতে স্বর্গসুখ লাভ করায় কী সার্থকতা? শ্রেষ্ঠ জীবনের সেই সুখ এখানে, এখনই কেন ভোগ করব না? মৃত্যুহীন আত্মাই তো আমাদের যথার্থ স্বরূপ। মহত্তম এই উপলব্ধিই ঋষিদের অনুপ্রাণিত করেছে। পরবর্তী শ্লোকটি যথার্থই গীতার আত্মাস্বরূপ, কারণ এখানে প্রশ্ন উঠেছে— আমরা কখন জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ করি এবং কীভাবে ঐ অবস্থাটি জীবনে ব্যক্ত হয়? এই শ্লোকটিতে তার উত্তর মেলে।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

—'পণ্ডিত বা আত্মজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বিদ্বান ও বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গরু, হাতি, কুকুর ও কুকুরমাংসভোজী চণ্ডাল (নীচ জাতি) সকলেই সমান।'

যিনি আত্মসত্যকে, অর্থাৎ আত্মার সত্যতাকে উপলব্ধি করেছেন, তিনিই *পণ্ডিত*। যিনি *পণ্ডিত* তিনি *সমদর্শী*—'তাঁর চোখে সকলেই সমান।' তাঁর চোখে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই। কারণ প্রত্যেকের মধ্যেই তিনি এক আত্মাকে দেখে থাকেন। এই ভাবটিকেই আরো বিস্তৃত করা হয়েছে এই বর্ণনায়, *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে,* 'বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে'; *গাভী,* 'গরুতে'; *হস্তিনি,* 'হাতিতে'; *শুনি,* 'কুকুরে'; *শ্বপাকে,* 'যে এই কুকুর খায়, তার মধ্যে', আগে ভারতীয় সমাজে যাকে *চণ্ডাল* বলা হতো; *পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ,* এদের সকলকেই 'পণ্ডিত সমদৃষ্টিতে দেখেন।' ব্রাহ্মণে বা কুকুরে সেই পুরুষ বা নারী কোন তফাৎ করেন না। কেন? কারণ একই আত্মা সকলের মধ্যে আছেন। সুতরাং সকল ভেদাভেদ অর্থহীন। অজ্ঞানে পার্থক্যের বোধ হয়, জ্ঞানে ঐক্য বোধ আসে। এই হচ্ছে বেদান্তের মহান সত্য। অজ্ঞানে নানাত্বের বা বৈচিত্র্যের বোধ হয়। জ্ঞান আমাদের একত্বের দিকে নিয়ে যায়। এ বিষয়টি ১৭শ ও ১৮শ অধ্যায়ে *সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক* জ্ঞান নিয়ে আলোচনার সময় ব্যাখ্যা করা হবে। এখানে শুধু এটুকুই স্মরণ রাখতে হবে যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির জন্যই আমরা বহু বা বৈচিত্র্য দেখি, কিন্তু জ্ঞান কেবল একত্বকেই প্রকাশ করে। জড়বিজ্ঞানের দিকেই তাকান। সেখানে একটি বিশেষ বিষয়ে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা! প্রথমে প্রত্যেকটি বিষয় এবং অভিজ্ঞতা অন্য বিষয় ও অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক বোধ হয়। কিন্তু অনুসন্ধান যতই চলতে থাকে, ততই

দেখা যায় যে বিষয়গুলির মধ্যে যে মৌলিক একত্ব রয়েছে, তা ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। তেমনি, ব্রহ্ম থেকে জগৎ উদ্ভূত হয়েছে; যখন কোন ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে বাইরে দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি সর্বত্র সেই এক ব্রহ্মকেই দেখতে পান।

আলোচ্য শ্লোকটিতে বলা হয়েছে ঃ *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে।* ধার্মিক ও শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা সহজ। কিন্তু কী করে তাঁকে কুকুর, সাধারণ মানুষ, এমনকি অপরাধী বা বেশ্যার মধ্যেও দেখা যায়? কীভাবে তা সম্ভব? হ্যাঁ, যাঁর ব্রহ্মোপলব্ধি হয়েছে, এটি তাঁর পক্ষে সম্ভব, কেননা তিনি সমদর্শিতা লাভ করেছেন, সর্বাত্মক দৃষ্টি লাভ করেছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়বেন। সেখানে দেখবেন, তিনি কুকুর, বেড়াল, মানুষ, পথের পতিতা—প্রত্যেকের মধ্যেই ব্রহ্মদর্শন করেছেন এবং সকলকেই প্রণাম করেছেন; এটি আমাদের যুগেই ঘটেছে। এগুলি শুধু কথার কথা বা তত্ত্বকথা নয়, এই সত্য বার বার মহাপুরুষদের জীবনে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং, *সমদর্শিত্ব,* 'সকলকে সমানভাবে দেখা', গীতার একটি অসাধারণ বাণী। এই সত্য গণতন্ত্রেরও প্রাণ। কোনরকম বৈষ্যমের ভাব গণতন্ত্রের বিরোধী। বৈষম্যের বদলে সমদর্শিত্ব থাকা উচিত। বেদান্তে ও গীতার এই অধ্যায়ে এটি একটি প্রধান বিষয়বস্তু। বাইরের চোখ দিয়ে দেখলে এই সমদর্শিত্ব বা সমত্ব ধরা পড়ে না। চোখ শুধু পার্থক্যই দেখে। কিন্তু মন যখন শুদ্ধ হয়, তখন তা বাহ্যরূপ ভেদ করে বহুত্বের পিছনে যে একত্ব স্পন্দিত হচ্ছে তা আবিষ্কার করতে পারে। এটি কেবল মানুষই পারে। এটি মানুষের একটি দুর্লভ ক্ষমতা। যাঁরা তা পারেন, তাঁদের শঙ্করাচার্যের ভাষায় *পণ্ডিত* বলা হয়। *পণ্ডা* মানে *আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ,* 'যে বুদ্ধি আত্মাকে জ্ঞাতব্য বিষয় করেছে'। এই *বুদ্ধি* যাঁর আছে, তাঁকেই বলা হয় *পণ্ডিত।* শব্দটির কী গভীর ব্যঞ্জনা! কিন্তু আজ এই শব্দটি কৌলিন্য হারিয়েছে। পণ্ডিত বলতে এখন বোঝায় একজন ভাষা-শিক্ষককে অথবা সামান্য পাচককে। এই *সমদর্শী* শব্দটি স্বামী বিবেকানন্দের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। পরিব্রাজক জীবনে যখন তিনি রাজস্থানের খেতড়ির মহারাজার প্রাসাদে ছিলেন, তখন মহারাজা একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সুগায়িকা হলেও শিল্পী ছিলেন এক বাইজী। মহারাজা স্বামীজীকে বলে পাঠালেন, 'দয়া করে আসুন, মেয়েটি খুব ভাল গান করে; আপনার শুনতে খুব ভালো লাগবে।' স্বামীজী বললেন, 'আমি সন্ন্যাসী, বাইজীর গান আমি কেন শুনব?' এই ছিল স্বামীজীর প্রথম প্রতিক্রিয়া। স্বামীজীর মনোভাবের কথা শুনে বাইজীর মনে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং যেন একথার উত্তর

দেবার জন্যই সে অন্ধ বৈষ্ণব-কবি সন্ত্ সুরদাসের একটি গান গাইল। গানটির উপজীব্য ছিল এই *সমদর্শিত্ব*। প্রথম পংক্তিটি এইরকম ঃ "প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো। সমদরশী হৈ নাম তিহারো"—'হে প্রভু, সমদর্শী তোমার নাম, আমার দোষগুলি তুমি দেখো না।'

[দূর থেকে] গানটি শুনে স্বামীজীর হৃদয় মথিত হলো এবং তিনি ভাবলেন, 'আমি *সন্ন্যাসী* হয়ে মানুষে মানুষে ভেদ-দর্শন করেছি; এটি বাইজী, ওটি অন্য কেউ, এই ভাবছি! মেয়েটি আজ আমাকে প্রকৃত বেদান্ত শিখিয়েছে।' তিনি তৎক্ষণাৎ সঙ্গীতের আসরে গিয়ে সকলের মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন। গান শেষ হলে বাইজী স্বামীজীর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন ও তিনিও তাকে আশীর্বাদ করলেন। স্বামীজী স্বয়ং এই ঘটনাটি বলেছেন। আমাদের সমগ্র দেশকে এই সমদর্শিত্বের সত্যটি বুঝতে হবে, কারণ আমাদের সমাজ এর বিপরীত ভাবের দ্বারা জর্জরিত। সমদর্শিত্ব আমাদের কখনই ছিল না, ছিল শুধু অসমদর্শিত্ব, ভেদদৃষ্টি এবং নানা ধরনের বৈষ্যমের উৎপাত।

যাই হোক, স্বামীজী আশা করেছিলেন যে এই আধুনিক যুগে আমরা বেদান্ত-ভিত্তিক সমাজ গঠন করব; এমন এক নূতন সমাজ গড়ে তুলব যেখানে *সমদর্শিত্ব* থাকবে। স্বাধীন হবার পর ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক তথা প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হয়েছে, যার ভিত্তি এই সমদর্শিত্ব। নাগরিক হিসাবে একজনের সঙ্গে আরেকজনের ভেদ লুপ্ত হলো। প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের চোখে সমান। এটিই হওয়া উচিত। প্রতিটি নাগরিককে একত্বের দৃষ্টিতেই আমাদের দেখতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত আমরা এটি করি কেবল নির্বাচনের সময়। নির্বাচনের পরেই আমরা এই সত্যটি ভুলে যাই। একজন ভোটপ্রার্থী তথাকথিত একটি নীচু জাতের দরিদ্র বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বলবে, 'মা, দয়া করে আমাকে ভোট দেবেন। আপনারা সকলেই তো এই গণতন্ত্রের শরিক, আমরা সকলেই সমান।' এইভাবেই আমাদের গণতন্ত্র কাজ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ কাজ কালে একবারই হয়। ভোটের পরে ভোল একেবারে পাল্টে যায়। তখনকার মনোভাবটি হলো—আমি হচ্ছি আমি, তুমি হচ্ছ তুমি। এই দৃষ্টিভঙ্গি তখনই পাল্টাবে, যখন বেদান্তের মহান আধ্যাত্মিক শিক্ষা রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে সঞ্জীবিত করবে। মানুষ যখন এই শিক্ষা পাবে, তখন সে বুঝতে পারবে যে গণতন্ত্র শুধু একটা রাজনৈতিক সমঝোতা নয়। এটি এক স্থায়ী আধ্যাত্মিক মনোভাব। এই মনোভাবটিকে আমাদের ধরে রাখতে হবে, একে পরিপুষ্ট করতে হবে। আমার

আশা, বেদান্তের মহান দর্শন ও তার ব্যাখ্যাতা স্বামী বিবেকানন্দের কর্মজীবনে প্রযোজ্য বেদান্তবাণীকে সহায় করে আমাদের গণতন্ত্র সেই আত্মবোধরূপ উচ্চভাব, সেই আধ্যাত্মিক সম্পদ আয়ত্ত করবে, যা পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক গণতন্ত্রেরই আছে। এবার আমাদের সামনে এই মস্ত সুযোগ।

গীতার এই শ্লোকটি *সমদর্শিত্ব* বিষয়ক। *পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ,* পণ্ডিতেরা সমদর্শী। *সমদর্শিত্বের* তাৎপর্যটি বোঝাবার ও সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করার ক্ষমতা আমাদের সকলেরই আছে। সমাজ অনুকরণপ্রিয়। যদি একজন নেতা কোন পথ অবলম্বন করেন, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে সেই পথ অনুসরণ করব। মহৎ ব্যক্তিরা যা করেন, আমরাও তা করতে অনুপ্রাণিত হই। যেহেতু আমাদের নেতারা এতকাল ধরে শুধু বৈষম্যমূলক আচরণই করে এসেছেন, সেহেতু আমরাও সকলে ঐ কাজে লিপ্ত। ব্রাহ্মণরা সকলের সঙ্গে ভেদাভেদ করতেন। কিন্তু তার ফল কী হয়েছে? ব্রাহ্মণের দেখাদেখি চণ্ডালও তার চেয়ে নীচু জাতের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ করছে।

ব্যাঙ্গালোরে, ১৯৩০-এর দশকে আমি দুই শ্রেণির চণ্ডাল দেখেছিলাম ঃ *এড়াকাই মাডিগা,* 'বাঁহাতি মাডিগা' ও *বালাকাই মাডিগা,* 'ডানহাতি মাডিগা'। একে অপরকে স্পর্শ করবে না, কারণ উচ্চ বর্ণের দেওয়া দীর্ঘকালের শিক্ষা ও প্রথা তারা নির্বিচারে মেনে এসেছে। এখন, ওপর তলার আচরণ যদি পাল্টায়, তাহলে যারা নিচে আছে, তাদেরও সবকিছু পাল্টাবে এবং সর্বত্র সাম্য বিরাজ করবে। জনতার সম্মতি ছাড়া কেউই বিশেষ সুবিধা ও প্রাধান্য পাবেন না। মন্ত্রীর একটি নির্দিষ্ট পদমর্যাদা আছে। প্রধানমন্ত্রীরও তাই। কিন্তু দুটিই দেওয়া হয়েছে সংবিধান ও জনতার নির্দেশে। এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু তা হলেও প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীর ভাবা উচিত নয় যে, তিনি অন্যের চেয়ে বড়। তাঁদের উচিত মানুষের কাছে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিশে যাওয়া। সেটিই প্রকৃত গণতন্ত্র। এ ব্যাপারে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলি সবচেয়ে উন্নত। ১৯৬১ সালে যখন আমি ১৭টি ইউরোপীয় দেশে চারমাসের বক্তৃতা সফরে যাই, তখন লক্ষ্য করি যে নরওয়ে বা সুইডেনের রাজাও বাজার করতে বেরিয়েছেন, কিন্তু কোনরকম ট্র্যাফিক জ্যাম নেই। তাঁরাও যেন আর পাঁচজন নাগরিকের মতো। ঐখানে আপনি গণতন্ত্রের বাস্তব রূপ দেখতে পাবেন। ভারতবর্ষের ঐখানে পৌছতে এখনও অনেক দেরি। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ভারতীয় ইতিহাসের নবীন অধ্যায়ে এইটিই হচ্ছে লক্ষ্য। পরের শ্লোকটিতে এই ভাবটি আরও জোরালো ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে ঃ

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

—'যেহেতু একই ব্রহ্ম সকলের মধ্যে রয়েছেন এবং তিনি নির্দোষ, যাঁদের মন সাম্যে প্রতিষ্ঠিত, এই জগতে থেকেও তাঁরা এই (আপেক্ষিক) অস্তিত্বকে জয় করেন; অতএব তাঁরা সত্যসত্যই ব্রহ্মে অবস্থান করেন।'

এটি এই অধ্যায়ের আর একটি অসাধারণ শ্লোক। *ইহৈব,* 'এখানেই', এই জগতেই, এই দেহেই; *তৈর্জিতঃ সর্গো,* 'তাঁরা আপেক্ষিকতাকে জয় করেছেন'; *যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ,* 'যাঁদের মন এই *সাম্যস্থিতিতে,* এই সমদৃষ্টিতে, এই ঐক্যভাবে প্রতিষ্ঠিত'। *নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম,* 'ব্রহ্ম সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত', এবং সকলের মধ্যে সমভাবে বিরাজমান। *তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ,* 'অতএব, তাঁরা ব্রহ্মেই অধিষ্ঠিত'। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো,* 'এখানেই তাঁরা আপেক্ষিকতাকে, জন্মমৃত্যুকে জয় করেছেন।'

সর্গ অর্থাৎ 'আমাদের সম্মতি ছাড়াই আমাদের দেহ-মন-বিশিষ্ট একটি খাঁচায় আবদ্ধ করা হয়েছে'। এই বিষয়ে আমাদের পছন্দ-অপছন্দের কোন মূল্য নেই, কোন স্বাধীনতা নেই। আমরা জীবমাত্র। ঠিক একজন বন্দির মতো, যার কোন স্বাধীনতা নেই। কারাগারে আবদ্ধ, বেরোতে পারে না, কারণ সেখানে সে মুক্ত নয়। আমাদের জন্মও সেই রকম; আমরা এ অবস্থা বেছে নিইনি, তা আমাদের কাছে আপনিই এসেছে। এখন, এটি আমাদের কাছে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। এইভাবে জন্মানো—*সর্গ* মানে এমন জন্ম যেখানে মানুষ অসহায়—তখনই বন্ধ হবে যখন আপনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবেন। এইটিই এই শ্লোকের মূল ভাব। আপনি যদি স্বাধীনভাবে জন্ম নেন, তবে সেটি সুন্দর। না হলে, নয়। যখন কোন অপরাধের জন্য কাউকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তার গতায়াতের কোন স্বাধীনতা থাকে না। কিন্তু কেউ যদি অপরের উপকার হবে বলে স্বেচ্ছায় জেলে যায় তবে তা খুব ভালো। গান্ধীজীও জেলে গিয়েছিলেন। কেন? লক্ষ লক্ষ মানুষকে রাজনৈতিক পরাধীনতার কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য। উনিশ শতকের এক ইংরেজ নাগরিক, যতদূর মনে পড়ছে, ক্যানন উইলবার ফোর্স, সামান্য কোন অপরাধ করে জেলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি অসহায় বন্দিদের শোচনীয় অবস্থা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি এই দুরবস্থার কথা সকলের সামনে এমনভাবে তুলে ধরেন যার ফলে ব্রিটেনে কারাসংস্কার করা হয়।

এই ধরনের *সর্গ* কাম্য। কিন্তু এই *সর্গ*, যেখানে আমরা অসহায়, তা আমাদের কাছে কঠিন বোঝা। আমরা এখানে কেন এসেছি? কী করে আমরা এই বন্দিদশা থেকে মুক্ত হব? এটিই আমাদের প্রধান চিন্তা। এবং এই সংগ্রামে আমাদের অবতীর্ণ হতেই হবে। বেদান্ত এভাবেই মানবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বলে। এই শ্লোকটি তাই বলছে যে, আপনি এইভাবে সংগ্রাম করে জন্মমৃত্যুর আবর্তে আবদ্ধ জীবাবস্থা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করলে একদিন আপনি অবশ্যই এই ব্রহ্ম-উপলব্ধিতে পৌঁছাবেন। 'যার মন সাম্যে, সমদর্শিত্বে প্রতিষ্ঠিত', তিনি এই জন্মেই ব্রহ্মানুভূতি লাভ করবেন। কেন? কারণ 'নিত্যচৈতন্য ব্রহ্ম সব দোষ থেকে মুক্ত ও সমস্ত বস্তুতে সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত।' ব্রহ্ম সমস্ত জীবের মধ্যেই *সম*, অর্থাৎ সমান। অতএব, যাঁরা এই সত্যলাভ করেন, 'তাঁরা ব্রহ্মেই অবস্থান করেন।' বেদান্তের মহত্তম শব্দ হলো ব্রহ্ম। বেদান্ত বলে, কোন শব্দের দ্বারাই পরম সত্যকে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু ধারণা দিতে গেলে কোন না কোন শব্দ তো আমাদের ব্যবহার করতেই হবে। এই জন্য উপনিষদ দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেঃ ব্রহ্ম ও আত্মা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য ঋষিরা খুঁজে পেয়েছিলেন ব্রহ্মে এবং মানবসত্তার যে প্রকৃত স্বরূপ তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন, সেটি হলো আত্মা, অনন্ত শুদ্ধ চৈতন্য। পরবর্তী যে বিরাট আবিষ্কারটি তাঁরা করেছিলেন তা এই যে, ব্রহ্ম ও আত্মা দুটি পৃথক বস্তু নয়, দুটিই শুদ্ধ চৈতন্য; তাই এক ও অভিন্ন। উপনিষদের মহান ঋষিরা এই অসাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, চৈতন্যের মধ্যে বহুত্ব থাকতে পারে না। চৈতন্যে বহুত্ব থাকা অসম্ভব। সেই কারণেই আধুনিক যুগে পরমাণু বিজ্ঞানী শ্রোডিংগার (Schrodinger) বিশেষ করে এই বিষয়টির উপর জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, চৈতন্য এমন একটি একক বস্তু, যার বহুত্ব কল্পনা করা যায় না। চৈতন্য বিভিন্ন দেহ ও মনের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয় বলেই আমরা তাতে বহুত্ব আরোপ করি। চৈতন্য বহু নয়, কিন্তু যে আধারে তা অভিব্যক্ত হয়, তা বহু। বাস্তবিক, আকাশের মতো চৈতন্যও এক ও অভেদ।

এই হলো বেদান্তের মহান সিদ্ধান্ত। এক ও অদ্বিতীয় এই অনন্ত চৈতন্য যা জগতের সমগ্র বস্তুকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে রেখেছে, তার ব্যাখ্যা আজ ধীরে ধীরে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকরাও করতে শুরু করেছেন। পদার্থবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা ও যাঁরা পরিবেশসংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কাজ করেন, সকলেই ধীরে ধীরে বহুত্বের পিছনে এই একত্বে উপনীত হচ্ছেন। তাঁরা স্বীকার করছেন যে, প্রত্যেক বস্তুই অপর বস্তুর সঙ্গে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ

এবং এই সম্পর্কটি আধ্যাত্মিক। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য, ব্রহ্মও শুদ্ধচৈতন্য। তাই উপনিষদ কোথাও বলেছেন যে, জগৎ ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত, আবার কোথাও বলেছেন তা আত্মা থেকে উদ্ভূত। তিনি আপনার মধ্যে, আমার মধ্যে, সকলের মধ্যেই সমানভাবে রয়েছেন। পাশ্চাত্যের বহু পর্যাবরণ বিশেষজ্ঞ আজ এই সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তাঁরা ক্রমশ এই বাহ্যিক বহুত্বের মধ্যে একটি নিগূঢ় একত্ব দেখতে পাচ্ছেন এবং স্বীকার করছেন যে, এই একত্বটি আধ্যাত্মিক বা আত্মিক। এই সব মনীষীদের বহু গ্রন্থে 'আধ্যাত্মিক' শব্দটি বার বার উঁকি দিচ্ছে। সুতরাং উপনিষদের মহান ঋষিরা যে পথে গিয়েছিলেন, তাঁরাও আজ সেই পথে গিয়ে সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন।

ব্রহ্মের সঠিক সংজ্ঞা কী হতে পারে? *তৈত্তিরীয় উপনিষদ* এই প্রশ্নটি উত্থাপন করে নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন এই বলে (২,১,১) : *সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম,* 'ব্রহ্ম হচ্ছেন সত্যস্বরূপ, জ্ঞান বা চৈতন্যস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ।' ব্রহ্মে দুই নেই। তিনি অনন্ত ও অদ্বৈত। আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তা এখন এই সিদ্ধান্তের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। এঁরা প্রগতিবাদী চিন্তাবিদ, জড় বিজ্ঞানের গোঁড়ামির মধ্যে আবদ্ধ নন এবং এঁদের সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান শ্লোকটির প্রচণ্ড তাৎপর্য রয়েছে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করলেই আপনি মুক্ত। তখন আর আপনি আর সামান্য জীব নন। ব্রহ্মজ্ঞানের এটিই তাৎপর্য। 'ব্রহ্মজ্ঞান' শব্দটি—বেদান্তের চূড়ামণি। এই শব্দটি উপনিষদের কয়েকটি মহাবাক্যে উল্লিখিত হয়েছে, যার মধ্যে নিহিত আছে পরম সত্যের ব্যঞ্জনা। এই সত্য উপলব্ধি করার পর আনন্দের আবেশে *মুণ্ডকোপনিষদ*-এর (২.২.১১) এই শ্লোকটি উচ্চারিত হয়েছে : *ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতম্,* 'এই ব্যক্ত জগৎ অবিনাশী ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়'। জীব ও অন্যান্য যা কিছু সবই মরণশীল, কিন্তু তাদের ভিতরে সুপ্ত যে ব্রহ্ম, তিনি মরণহীন। *ইদম্* শব্দের অর্থ 'এই ব্যক্ত জগৎ'। এরপর উপনিষদ আরও বিশদ বর্ণনা দিয়ে বলছেন, *পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম,* 'সামনে ব্রহ্ম'; *পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম,* 'পিছনে ব্রহ্ম'; *দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ,* 'দক্ষিণে এবং উত্তর দিকেও'; *অধশ্চোর্ধ্বম্ চ প্রসৃতম্,* 'তিনি উপরে ও নিচেও প্রসারিত'। এবং পরিশেষে একটি অপূর্ব মন্তব্য দিয়ে শ্লোকটি সমাপ্ত হয়েছে : ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্—'এই সমগ্র বিশ্ব শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।'

গীতার আলোচ্য ১৯তম শ্লোকে এই ব্রহ্মেরই উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁরা

ব্রহ্ম উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা একত্ব ও সমন্বয়ের ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। যতক্ষণ আমরা দেহের দিকে দৃষ্টি দিই, ততক্ষণ নানা পার্থক্য আমাদের চোখে ধরা পড়ে, কারণ কোন দুজন মানুষই তো একরকম দেখতে নয়। এই বিশ্ব সম্বন্ধে বেদান্তের সত্যানুসন্ধান শুরু হয়েছিল এই ইন্দ্রিয়ের স্তর থেকেই এবং ইন্দ্রিয়স্তরে আমরা পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই দেখি না। প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে এতটাই পার্থক্য যে, ইন্দ্রিয়ের স্তর থেকে জগৎকে দেখলে মনে হবে বহুত্ব বা বৈচিত্র্যই সত্য। এবং এই বহুত্বের ধারণা থেকেই সৃষ্ট হয় সমাজের যত পাপ, হিংসা ও অপরাধ এবং যে-দোষটি আজও সমাজকে পীড়ন করে চলেছে—বর্ণবৈষম্য ও জাতিভেদের মনোভাব, যার ভেতর দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ জাতির উন্নাসিকতাও পড়ে। কিন্তু সুখের কথা এই, এসবের মধ্য থেকেই ধীরে ধীরে মানুষের ভিতর একত্বের ভাবটি দানা বাঁধছে। জাগছে মানবীয় সচেতনতা, যা পার্থক্যগুলিকে মুছে দিচ্ছে। পার্থক্য যে আছে, সে কথা অস্বীকার করা হচ্ছে না, কেবল বলা হচ্ছে যে পার্থক্যগুলি বাহ্যিক; ভিতরে শুধুই একত্ব। বাইরের নানা পার্থক্য, এমনকি পুরুষ ও নারীর মধ্যেও যে পার্থক্য, তা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু দুটি রূপের আড়ালে সেই এক অনন্ত পরমাত্মা। সেইটিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*-এর ভাষায় ঃ *তৎ ত্বম্ অসি*, 'তুমিই সেই'। যখন এই সত্যটি সমাজে রূপায়িত হবে, তখন মানুষে-মানুষে ও মানুষে-প্রকৃতিতে একটি বৃহত্তর ঐক্যের ভাব জাগ্রত হবে এবং যে-ঐক্য বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রসারিত হবে। বস্তুত আমরা সকলে এক। একবার ভাবুন তো, মানুষ পঞ্চাশ বছর আগে কী চিন্তা করত ও এখন কী চিন্তা করছে! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে মানুষের চিন্তা ও যুদ্ধোত্তর যুগের চিন্তার মধ্যে কত তফাৎ! যুদ্ধের আগের যুগটি ছিল পার্থক্য, বৈষম্য, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ও শোষণে পরিপূর্ণ। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে সেসব পাল্টে গেছে। জাতিভিত্তিক তথা সবরকম শ্রেষ্ঠত্ব বিসর্জন দিয়ে এখন চলেছে একত্বের সন্ধান। এমনকি নারীর ওপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বও এখন স্বীকার করা হচ্ছে না। এসব তুচ্ছ ভেদাভেদ ও বৈষম্য একে একে দূর করে আমরা কোথায় যাচ্ছি? কোন্ লক্ষ্যের দিকে যাচ্ছি?

এক কথায়, ঐক্যের দিকে, যে ঐক্যের বাণী দিয়ে আধুনিক যুগের সমগ্র চিন্তাপ্রবাহকে বেদান্ত সঞ্জীবিত করেছে। গীতা ও উপনিষদের ভাবনায় ডুব দিলে দেখতে পাবেন আপনারা মহান ঋষিদের সান্নিধ্যে রয়েছেন, এমন সব ঋষি, যাঁরা তিন চার-হাজার বছর আগে এই সমস্যাটির সমাধান খুঁজতে গিয়ে চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক ঐক্যের গূঢ় সত্যটি আবিষ্কার করেন। যত বেশি আপনি এই

একত্বের সত্যটি উপলব্ধি করবেন, ততই আনন্দ পাবেন, ততই পূর্ণতা লাভ করবেন। আর যত বেশি পার্থক্যের উপর জোর দেবেন, তত বেশি দুঃখকষ্ট পাবেন। তাই মানুষের জীবনের গতি এই পরম সত্যের দিকে ফেরাতে হবে। *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।* 'কোন পুরুষ বা নারী যদি সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হন, তিনি এখানেই (জন্মমৃত্যুরূপ) আপেক্ষিকতাকে জয় করেন'; কোন স্বর্গে নয়, এই জগতেই। আমরা সকলেই এক; আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ। আজ আমরা Homo-sapiens বা এক মানবগোষ্ঠীর কথা বলি। জীববিজ্ঞানের দিক দিয়ে সমস্ত মানুষই এক। আধুনিক জীববিদ্যা বলে যে, চিন্তা ও জন্মসূত্রে মানবজাতি একটি একক প্রজাতি। সুতরাং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও আমরা সকলেই মূলত এক। তাই *সাম্য* ভাব গড়ে তুলুন। ধনদৌলত, ক্ষমতা ও পদমর্যাদার পার্থক্যগুলির দিকে নজর দেবেন না। এটি এখনও হয়তো অবাস্তব কল্পনা বলেই অনেকের কাছে মনে হতে পারে, কিন্তু এর পশ্চাতে যে সত্যটি বর্তমান, তাই আপনাকে ব্রহ্ম বা আত্মার চিন্তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই দেহ-মন রূপ যন্ত্রের পিছনে রয়েছেন এক শাশ্বত আধ্যাত্মিক সত্তা বা আত্মা যিনি আমাদের সকলের মধ্যেই বিরাজমান। দেহগুলি সব আলাদা আলাদা, কিন্তু আত্মা অবিভক্ত। কয়েকটি অধ্যায় পরে আত্মার বর্ণনা দিতে গিয়ে গীতা বলছেন, 'তিনি খণ্ড খণ্ড আপাত-প্রতীয়মান বস্তুর মধ্যে অখণ্ডরূপে বিরাজ করছেন।' আমরা সকলে এক ও অভিন্ন। এই একত্বের ভাব থেকেই ভালবাসা আসে। যেখানে বিচ্ছিন্নতাবোধ, সেখানে প্রেম সঞ্চারিত হওয়া কঠিন। অতএব, প্রেম, দয়া ও এই ধরনের ইতিবাচক গুণগুলি কেবল তখনই প্রকাশিত হতে পারে যখন বাহ্যিক পার্থক্যগুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে সবকিছুর পশ্চাতে মূল যে একত্বটি রয়েছে, তার ওপর আমরা জোর দিই। এই হচ্ছে বর্তমান শ্লোকটির অর্থ এবং পৃথিবী আজ এই দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। ব্রহ্ম হচ্ছেন *সম*—সকল বস্তুতে তিনি 'সমপরিমাণে' বিরাজিত। কোন ব্যক্তিতে যে তিনি বেশি অথবা কম, তা নয়। এই অপূর্ব ভাবটি স্মরণে রাখা দরকার ঃ এই অসামান্য সত্যটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। *ব্রহ্ম নির্দোষম্,* 'ব্রহ্ম হচ্ছেন সকল দোষ থেকে মুক্ত'। তিনি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত এবং সকল বস্তুতে সমভাবে বিদ্যমান। এই নিগূঢ়তম সত্যটিই বেদান্ত আমাদের সকলের কাছে ব্যক্ত করে বলে যে, মানুষ, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, এমনকি পাথর ও খনিজ পদার্থ, যা-ই হোক না কেন, সেই অনন্ত চৈতন্য সর্বভূতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। উপনিষদ এই পরম সত্যটি আবিষ্কার করেছে এবং সকলেই তা আবিষ্কার করতে পারেন। এই

আবিষ্কারের মাধ্যমেই তারা মানবীয় ক্রমবিকাশের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেন। এই দীর্ঘমেয়াদী ক্রমবিকাশের একটি লক্ষ্য আছে এবং এই হচ্ছে সেই লক্ষ্য। এই ব্রহ্ম, যিনি সমস্ত জীবে *নির্দোষম্*, 'সকল দোষমুক্ত' ও *সম*, 'সমান', তাঁকে সর্বজীবে উপলব্ধি করে প্রকৃত বিশ্বজনীনতা অর্জন করুন। *তস্মাৎ*, 'অতএব'; *তে*, 'যাঁরা এই সত্যকে উপলব্ধি করেন'; *ব্রহ্মণি স্থিতাঃ*, 'তাঁরা ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত হন।'

কী অসাধারণ চিন্তা! সাধারণত আমরা প্রত্যেকে এখন পৃথক পৃথক দেহবোধে প্রতিষ্ঠিত। মাত্র বিরল কিছু মানুষ, যাঁরা দেহ-মনের স্তর অতিক্রম করে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁরা সকলের সঙ্গে নিজেদের অভিন্নতা উপলব্ধি করেন। সাধারণ জীবন ও সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যে এখানেই পার্থক্য। গীতায় অনেক জায়গাতেই এই ভাবটি নানা দিক থেকে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হবে। অতএব, এই শ্লোকটি আধুনিক সভ্যতার অভীপ্সা বা অভিরুচির সঙ্গে যেন একসুরে বাজছে। আগেই বলেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা ঐ একত্ববোধের দিকেই যেন অগ্রসর হচ্ছি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উনিশ ও বিশ শতকের মধ্যে কতটাই না পার্থক্য! উনবিংশ শতকে আমরা মানুষে-মানুষে কী পার্থক্যই না করতাম, একের দ্বারা অপরের শোষণ কতভাবেই না চলত! সেই কারণেই হয়তো, সম্ভবত যুদ্ধবিগ্রহের যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই নতুন এই শুভ চিন্তার উদয় হয়েছে এবং আমরা মানবজাতি ঐক্য ও সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছি।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

—'ব্রহ্মে স্থিত, স্থিরবুদ্ধি ও মোহশূন্য হয়ে ব্রহ্মবিদ প্রিয়বস্তু পেয়ে উৎফুল্ল বা অপ্রিয় বস্তু পেয়ে উদ্বিগ্ন হন না'।

এই পুরুষ বা নারী ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, কারণ তিনি সর্বদাই সমভাবাপন্ন। *ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য*, 'কোন প্রিয় বস্তু পেয়ে তিনি অতি-আহ্লাদিত হন না।' *নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্*, 'কোন অপ্রিয় বা প্রতিকূল বস্তু পেলেও তিনি বিষণ্ণচিত্ত হন না'। *ন উদ্বিজেৎ*, 'উদ্বিগ্ন হন না।' *স্থিরবুদ্ধিঃ*, 'তাঁর বুদ্ধি অবিচলিত থাকে'। *অসংমূঢ়ঃ*, 'মোহগ্রস্ত নন'; *ব্রহ্মবিৎ*, 'সেই ব্রহ্মজ্ঞ'; *ব্রহ্মণি স্থিতঃ*, 'ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।' ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মনুষ্য জন্মের মহত্তম লক্ষ্য। একমাত্র

সেই অবস্থাতেই আপনি স্থির, আপনি মুক্ত ও আপনি পূর্ণ। একমাত্র ঐ অবস্থাতেই আপনি আপ্তকাম ও পরিপূর্ণ। অন্য সমস্ত অবস্থায় আপনি হয় অপূর্ণ, নয় আংশিকভাবে পূর্ণ; অনেককিছুই আপনার অপূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু একবার ব্রহ্মে অর্থাৎ পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিত হলে, আপনিও পূর্ণ। এই হলো পূর্ণত্বপ্রাপ্তি। আমি এখানে পূর্ণত্ব (Fulfilment) শব্দটি ব্যবহার করছি, কারণ এটি বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধোত্তর জীববিদ্যায় প্রবেশ করেছে। স্যার জুলিয়ান হাক্সলে (Sir Julian Huxley) স্বীকার করেছেন যে, মানবীয় ক্রমবিকাশের লক্ষ্য পূর্ণতাপ্রাপ্তি, শুধু জৈব পরিতৃপ্তি নয়, যা পশুজীবনের লক্ষ্য। মনুষ্য স্তরে, জৈব পরিতৃপ্তি হচ্ছে গৌণ; মুখ্য পূর্ণতাপ্রাপ্তি। আপনি কি পূর্ণ, কৃতকৃত্য? যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবেন, তখনই আপনি বলতে পারবেন যে, 'হ্যাঁ, আমি পূর্ণ। আমি আপ্তকাম। আমার আর কিছু লাভ করবার নেই।' 'কৃতকৃত্য' ও 'কৃতার্থ' এই দুটি সংস্কৃত শব্দ ব্রহ্মজ্ঞের মনোভাবটি ঠিক ঠিক ব্যক্ত করে। মানুষ হয়ে জন্মে যা করা দরকার ছিল, তা করা হয়ে গেছে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—এই হলো 'কৃতকৃত্য' ও 'কৃতার্থ'র অর্থ। ভগবান বুদ্ধ যখন *বোধি* বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করলেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে উঠে সেই একই কথা বললেন, 'আমি কৃতকৃত্য, আমি সিদ্ধ, আমি পূর্ণ মনোরথ'। অর্থাৎ তিনি নিজে পূর্ণ হয়ে তাঁর সেই পূর্ণতা থেকে পৃথিবীর মানুষকে যা দান করলেন, তা কোটি কোটি মানুষের জীবনকে সার্থক ও ধন্য করে দিল। সুতরাং, এই হচ্ছে মানবিক ক্রমবিকাশের মহান পথনির্দেশ। *ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ,* 'ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।' ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, আহা! কী চমৎকার ভাব! আমরা নানারকম প্রতিষ্ঠাই লাভ করতে পারি, তবে সবই অনিশ্চিত ও নড়বড়ে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন সেইরকমই, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর তা নয়, তিনি দৃঢ়ভাবে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত।

New Testament-এর রূপক কাহিনীটি অতি চমৎকার। সেখানে যিশু বলছেন : 'একজন নির্বোধ বালির ওপর তার বাড়ি তৈরি করেছিল। তুমুল বৃষ্টি, বন্যা এবং সবশেষে ঝড়ের ধাক্কায় বাড়িটি হুড়মুড় করে পড়ে গেল।' একেই বলে বালির ওপর *প্রতিষ্ঠা।* বালি আলগা, ঝুরঝুরে; বাড়িকে শক্তভাবে ধরে রাখার ক্ষমতা তার নেই। 'কিন্তু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর বাড়ি তৈরি করলেন পাথরের ওপর। বৃষ্টি, বন্যা, ঝড়, সবই এল এবং বাড়িটিতে আছড়েও পড়ল, কিন্তু বাড়িটি পড়ে গেল না। কারণ তার ভিত ছিল শক্ত পাথরের ওপর।' এই মনুষ্যজীবনকে কি পাথরের মতো কোনও দৃঢ় বস্তুর ওপর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যা কখনও টলবে না, ভাঙবে না? হ্যাঁ, তা সম্ভব ও এই অবস্থার নাম

ব্রাহ্মীস্থিতি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ ১৯টি শ্লোকে *স্থিতপ্রজ্ঞ*-এর উল্লেখ করা হয়েছে । স্থিতপ্রজ্ঞ, অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধির ফলে 'যাঁর মন অবিচলিত ও স্থির' হয়েছে। অসাধারণ সেই শ্লোকগুলি। সেই ভাবটি আমরা এখানেও পাচ্ছি। *ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ,* 'একজন ব্রহ্মজ্ঞানী পূর্ণরূপে ও অবিচলভাবে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত।' এই সর্বোচ্চ অবস্থার চিন্তা এবং ধ্যানও অতীব প্রেরণাদায়ক। হতে পারে, আমরা এই অবস্থা থেকে এখনও অনেক দূরে। কিন্তু তাতে কী যায় আসে? ঐটিই তো আদর্শ। মানুষ আজ নানাবিধ যন্ত্রণায় ভুগছে, কারণ তার সামনে কোন লক্ষ্য নেই, কোন আদর্শ নেই। সে কেবলই ইতস্তত ঘুরে মরছে। কিন্তু গীতার শিক্ষায় এইখানে এমন এক পথনির্দেশ পাচ্ছি যা আমাদের পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। অতএব আমি অবশ্যই ঐ পথে যাব, এক পা দু'পা করে যতটা পারব এগিয়ে যাব। শুধু তাই নয়, এই আদর্শগুলি সকলের সামনে তুলে ধরতে হবে। হৃদয় প্রসারিত করুন। সকলের সঙ্গে একত্ব অনুভব করুন। একত্বের এই জ্ঞান যখন আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে স্ফুরিত হবে, তখন কী করে আর অসৎকর্ম, অপরাধ, উদ্বেগ বা হতাশায় ভেঙে পড়া সম্ভব হবে? তাই আজকের মানবসমাজের কাছে বেদান্তের আহ্বান ঃ জীবনকে সর্বোচ্চ ও বাস্তবমুখী এই দর্শনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে, যথাসম্ভব সেই আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করে, ধাপে ধাপে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকুন।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, কোটি কোটি সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়ের স্তরেই বাস করছে এবং ইন্দ্রিয়গুলিই তাদের চালিত করছে, সীমিত করছে ও একজনকে অন্যের থেকে পৃথক করছে। তাই সংগ্রামের মনোভাব নিয়ে এই ইন্দ্রিয়গুলির মোকাবিলা করতে হবে।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

—'বাহ্য বিষয়াদিতে অনাসক্ত হয়ে যিনি আত্মসুখ অনুভব করেন, ব্রহ্মে যাঁর চিত্ত সমাহিত, তিনি অক্ষয় আনন্দ লাভ করেন।'

২১তম এই শ্লোকটির উপদেশ হচ্ছে ঃ *বাহ্য স্পর্শেষু অসক্তাত্মা,* 'বাহ্য বিষয়াদিতে অনাসক্তচিত্ত হয়ে'। বাহ্য বিষয়গুলি আমার ওপর প্রভুত্ব করবে কেন? এই প্রশ্নটি করুন। পশুরা নিরুপায়, কারণ তারা পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠতে

পারে না। কিন্তু মানুষ তো পারে। তাকে প্রতিটি বাহ্যবিষয়ের ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে কেন? তার অন্তরে যে আত্মা আছেন তিনি বাহ্যজগতের সমস্ত বস্তুর চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান। যুদ্ধের সময় মানুষ এই সত্যটি বুঝতে পারে। উদ্বাস্তুরা যখন যুদ্ধাঞ্চল ছেড়ে পালায়, তখন তারা কী করে, জানেন? কোনরকমে দেহ-মনটিকে বাঁচাবার জন্য তারা একে একে তাদের সমস্ত দামি দামি জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তখন তারা উপলব্ধি করে যে সম্পত্তির চেয়ে জীবনের গুরুত্ব অনেক বেশি। কিন্তু শান্তির সময়ে মানুষ এই সত্য ভুলে যায়। *বাহ্য স্পর্শেষু অসক্তাত্মা,* 'বাহ্যবিষয়ের প্রতি যিনি আসক্তিশূন্য।' *স্পর্শ* একটি অসাধারণ শব্দ যার অর্থ ছোঁয়া। মানুষের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। একটি দর্শনের, একটি শ্রবণের, একটি ঘ্রাণের, একটি আস্বাদনের এবং শেষেরটি স্পর্শের। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি ধরা-ছোঁয়ার অনুভূতি দেয়, তা হলো স্পর্শেন্দ্রিয়। ইংরেজি 'tangible' শব্দটি এসেছে 'touch' বা স্পর্শ থেকে। যখন আপনি কোন কিছু স্পর্শ করতে পারেন, তখন সেটি tangible বা অনুভবনীয় এবং কোন বস্তুকে আমরা কেবল তখনই সত্য মনে করি, যখন তা tangible হয়। আমি কোন কিছুকে স্পর্শ করতে পারছি, অতএব সেটি বাস্তব। তাই, সাধারণ মানুষের মন শারীরিক স্পর্শ দিয়েই বাস্তবতার পরিমাপ করে। যেসব বস্তু স্পর্শ করা যায় না, তা অধিকাংশ মানুষের কাছেই অবাস্তব। কাজে কাজেই, অত্যধিক স্থূল প্রকৃতির মানুষ স্পর্শসুখের দ্বারাই প্রভাবিত। এই কারণেই এখানে *বাহ্যস্পর্শ,* 'বাহ্যিক স্পর্শ'-এর কথা বলা হয়েছে। নিজের শরীরকে স্পর্শ করলে হবে না। আমি বাইরের বস্তুকেও স্পর্শ করতে চাই; এই হচ্ছে *বাহ্য* শব্দটির অর্থ।

শিশু অবস্থায় *বাহ্যস্পর্শ*-এর আনন্দ উপভোগ করা চলে, কারণ তা সুখদায়ক। শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য তার প্রয়োজন আছে। শিশুর নিরাপত্তাবোধ ও মানসিক বিকাশের জন্য মায়ের ত্বকের স্পর্শ একান্তই আবশ্যক। কিন্তু শৈশব পার হয়ে গেলে নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে : আর কতদিন আমি ইন্দ্রিয়ের সর্বনিম্ন স্তরে, স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্তরে পড়ে থাকব? স্পর্শ ছাড়াও তো আমার কান, নাক বা চোখ দিয়ে ভাবের আদান প্রদান করে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। স্পর্শ কি একান্তই অপরিহার্য? তা তো নয়। এইভাবেই আমরা মানসিক উন্নতির এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে এগিয়ে যাই, যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়ের প্রভুত্বের সীমানা ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে না আসি। বাস্তবিক, আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই অতিক্রম করতে সক্ষম। এই হচ্ছে মানবীয় ক্রমবিকাশের উচ্চতর

পর্যায়। ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে বিভিন্ন দ্বার। তাদের সঙ্গে এখন আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হলেও তাদের অতিক্রম করে যাবার ক্ষমতা আমাদের আছে এবং এই ইন্দ্রিয়স্তর অতিক্রম করাই হলো আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা। যতদিন ইন্দ্রিয়স্তরে বদ্ধ থাকব, ততদিন আমরা পশু ছাড়া কিছুই নই; চেহারায় মানুষ হলেও কার্যত পশু। অতএব, *বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা,* 'যিনি বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত'; *বিন্দতি আত্মনি যৎ সুখম্,* 'সেই ব্যক্তি নিজের আত্মায় কী পরম সুখই না অনুভব করেন'; স্পর্শ দ্বারা যত সুখ আশা করা যায়, তার থেকে কোটিগুণ বেশি সুখ আমি অন্তর থেকে লাভ করব। এ সত্যটি এতদিন জানতাম না, এখন তা উপলব্ধি করছি। সুতরাং গীতা বলছেন যে, বাহ্যস্পর্শ থেকে আপনি যত আনন্দ পাবেন, তার থেকে অনেক বেশি পাবেন নিজের আত্মা থেকে। আত্মানন্দের সঙ্গে স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদি থেকে আহৃত তুচ্ছ আনন্দের কোন তুলনাই চলে না। যতই আমরা পরিণত হব, ততই আমরা এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারব। শিশু একথা বুঝবে না, কারণ তার জীবন সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়স্তরেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিশু অবস্থা থেকে আপনি যত ঊর্ধ্বে উঠবেন, ততই এই সত্যটি আপনাকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। বাহ্য বস্তুর সঙ্গ ছাড়া যদি আমার মন সে বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করতে পারে, তবে আমি আমার নিজের ভিতরেই যে বিমল আনন্দ উপভোগ করব, তা অতুলনীয়। সে কথাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন। আত্মা হলো অনন্ত আনন্দস্বরূপ। এমনকি বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে যে সুখ আসে তাও আত্মানন্দেরই এক একটি কণা। তৈত্তিরীয় উপনিষদ-এ একথা বলা হয়েছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ 'ব্রহ্মানন্দবল্লী'তে বলছেন ঃ তোমার জীবনের প্রতিটি আনন্দই তোমার সেই আত্মার অনন্ত আনন্দের এক একটি কণামাত্র। আত্মাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ এবং আত্মার স্বরূপ আনন্দ। আমরা ছোটখাট সাধারণ আনন্দগুলির নিন্দা করি না; শুধু এগুলিকে আত্মানন্দের খণ্ডিত ভগ্নাংশ মনে করি। *বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা বিন্দতি আত্মনি যৎ সুখম্,* 'বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে মানুষ নিজের ভিতরে যে-সুখ অনুভব করে'; *স ব্রহ্ম যোগযুক্তাত্মা,* 'সেই ব্যক্তি সকল আনন্দের উৎস, অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন'; এই রকম ব্যক্তি কী নিয়ে বেঁচে থাকেন? *সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে,* 'এই ব্যক্তি অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন'। সমস্ত ইন্দ্রিয়জ সুখই নশ্বর, তারা আসে ও যায়। কিন্তু এই সুখ চিরস্থায়ী। এই আনন্দই আপনার প্রকৃত স্বরূপ। অতএব, *সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে। সুখম্* অর্থাৎ 'আনন্দ'; *অক্ষয়ম্* অর্থাৎ অক্ষয়, অবিনাশী; *অশ্নুতে,* উপলব্ধি করেন। এই হচ্ছে

মানবীয় ক্রমবিকাশের প্রকৃত উর্ধ্বগতি। আমরা জাগতিক আনন্দ দিয়েই যাত্রা শুরু করি, কিন্তু যখন নিত্য পবিত্র আত্মানন্দ অনুভব করতে শুরু করি তখন ক্রমে ক্রমে সেগুলির উপর নির্ভরতা কমিয়ে দিই। সকল ধর্মের মহান মরমী সাধকদের মধ্যে, এমনকি কিছু সাধারণ মানুষের মধ্যেও এরকম দেখা যায়। ভগবান বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের তলায় বুদ্ধত্ব লাভ করার পর অনেকদিন ধরে এই আনন্দসাগরে ভেসেছিলেন। মুক্তি বলতে আর কী বোঝায়? বাহ্য পরিবেশের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের নামই মুক্তি। ধরুন, আমি নিজেকে মুক্ত মনে করি। কিন্তু কেউ আমাকে গালমন্দ করলে আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ হই ও পীড়িত বোধ করি। তাহলে আমার মুক্তির কী হলো? আমার মুক্তি তো অন্যের পকেটে! সেখানে তা বন্ধক আছে। সে দুটো কথা বললে, আর অমনি আমাকে দুঃখিত ও ব্যথিত হতে হলো? মুক্তি হচ্ছে বাহ্যিক পরিবেশের পীড়ন থেকে মুক্তি। আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারলে তবেই আপনি মুক্ত। তাই গীতা এখানে বলছেন : *স ব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা,* 'তিনি নিজ আত্মা তথা ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত।' এই ধরনের ব্যক্তি, *সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে,* 'অক্ষয় আনন্দের অধিকারী হন।'

ভগবান বুদ্ধ বা শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহান আচার্যরা সর্বদা নিজেদের অন্তরে আনন্দের কী হিল্লোলই না অনুভব করতেন! তাঁরা তো কোনরকম বাহ্যসুখ উপভোগ করতেন না। তাহলে কোথা থেকে তাঁদের এত আনন্দ আসত? যদি কেউ একাদশীর দিন উপবাস করেও সারাদিন আনন্দে থাকে, তবে বুঝতে হবে, সে নিশ্চয় একটু আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ লাভ করেছে। কেউ যদি উপবাস করে সারাদিন ধরে শুধু নালিশ করতে থাকে যে, সে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তবে তার কিছুই লাভ হলো না। অতএব, আপনি বাইরে কিছু ত্যাগ করা সত্ত্বেও যদি আনন্দে থাকেন তার অর্থ হচ্ছে এই যে, আপনার অন্তরে সকল আনন্দের উৎসস্বরূপ যে গভীরতর সত্তা বর্তমান, আপনি তার সঙ্গে যুক্ত আছেন। সেইজন্য এটি সন্ন্যাসের দর্শন নয়। এটি পূর্ণতার, আনন্দের, সার্থকতার দর্শন। হয়তো আপনি ক্ষুদ্র কিছু ত্যাগ করেছেন আরও ভালো, আরও মূল্যবান কোন বস্তুর জন্য। কিন্তু সব থেকে মূল্যবান বস্তুটি কী? সেটি আপনার আত্মা, যিনি অনন্ত । তাঁর সঙ্গে কোনকিছুর তুলনা চলে না। দুঃখের বিষয় আমরা এই সত্যটিই বারবার ভুলে যাই। আজকের ভোগসর্বস্ব সভ্যতায় এই সত্যের উপলব্ধি একান্তই প্রয়োজন। আমরা সর্বদাই সভ্যতার পরিমাপ করি ভোগের উপকরণের পরিমাণ দিয়ে; এই উপকরণ ও ভোগ যত বেশি, আমরা মনে করি আমরা ততই সভ্য। কিন্তু এই মনোভাবটি আজ

সমালোচিত হচ্ছে, কারণ 'কনজুমারিজম্‌' বা পণ্যগ্রাহিতা সমগ্র প্রকৃতিকে ধ্বংস করবে এবং অবমানিত প্রকৃতি তখন অবজ্ঞাকারী মনুষ্যজাতিকেও বিনাশ করবে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মানুষের সামনে এই সত্যগুলি তুলে ধরছেন এবং ভোগমুখী এই দর্শনের প্রবল পাগলামি থেকে নিষ্কৃতির উপায় খুঁজছেন। এটি সত্যই পাগলামি এবং টি.ভি-র বিজ্ঞাপনগুলি এই উন্মাদনা বা বাতিক বাড়িয়ে দিচ্ছে। টি.ভিতে কোন জিনিসের বিজ্ঞাপন দেখলেই পরিবারশুদ্ধ লোক বলবে, 'ওটি আমাদের চাই'। সারা বিশ্বেই এটি ঘটছে, সুতরাং এটি এখন গোটা বিশ্বের সমস্যা। ভোগ্যপণ্যের ক্রমবর্ধমান ক্ষুধার জন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য ধ্বংস হতে চলেছে। এতে একদিকে যেমন দুঃখ-কষ্ট বাড়ছে, তেমনি অন্যদিকে মহাজাগতিক দুর্ঘটনার আশঙ্কাও করা হচ্ছে। যেভাবে ওজোন (ozone) স্তরের ক্ষয় হচ্ছে সমগ্র জীবজগৎ তাতে ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আজকের তাবড় তাবড় চিন্তাবিদরা এই বিপদ-সংকেত দিচ্ছেন।

যাই হোক, কীভাবে এই বিষয়-তৃষ্ণার উন্মাদনাকে সংযত করা যায়? প্রশ্ন হতে পারে, বিষয়ভোগ সংযত করলে তো আমি শুষ্ক যোগীতে পরিণত হব। না, বেদান্ত সেটা চায় না। বেদান্ত আপনাকে শুকনো যোগী হতে বলে না। বেদান্ত শুধু বলে, আপনার বিষয়-নিরপেক্ষ একটি আনন্দের উৎস থাকা দরকার। কিন্তু এই ধরনের উৎস কি আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। কিন্তু আপনি কখনও সে বিষয়ে চিন্তা করেননি। আপনার মধ্যে এমন একটি বস্তু আছে যা অনন্ত। অন্তরের সেই উৎস থেকে যে আনন্দ আসে তার তুলনা নেই। সেই হচ্ছে প্রকৃত আনন্দ। মানুষ যখন এই আনন্দের স্বাদ পাবে, তখন তার পণ্যদ্রব্য ভোগের বাতিক আপনা হতেই কমে যাবে।

বেদান্তে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই নিয়ে মানুষের মোট পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হয়েছে। বশে রাখলে তারা ভালো, আপনাকে সাহায্য করবে। তা না হলে তারা ক্ষতিকারক। আদি শঙ্করাচার্য তাঁর *বিবেকচূড়ামণি-র* একটি তেজোময় শ্লোকে (শ্লোক নং ৭৬) বলেছেন ঃ

শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ
পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।
কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভৃঙ্গা
নরঃ পঞ্চভিরঞ্চিতঃ কিম্‌॥

—'হরিণ, হাতি, পতঙ্গ, মাছ ও ভ্রমরের মতো পাঁচ প্রাণী, শব্দ ও অন্য চারটি

ইন্দ্রিয়ের এক একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের আসক্তিরূপ রজ্জুতে আবদ্ধ হয়ে মরে; তাহলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সব কটিতে আসক্ত মানুষের কথা কী আর বলা যেতে পারে!'

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের আনন্দকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছিলেন ঃ *বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ। আনন্দ* অর্থে 'আনন্দ বা শান্তি'। *বিষয়* মানে 'ইন্দ্রিয়ের বিষয়'। পণ্যগ্রাহিতা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। 'ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগ থেকে যে আনন্দ হয়', তাকে *বিষয়ানন্দ* বলে। বেদান্ত এই বিষয়ানন্দের নিন্দা করে না। এটি বৈধ। কিন্তু এই ভোগ মাত্রাতিরিক্ত হলে তা আপনাকেও যেমন, পৃথিবীকেও তেমনি ধ্বংস করে ফেলতে পারে। আজ আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি। *আজকের জড়বাদ যেহেতু বলছে যে, বিষয়ভোগের চেয়ে বড় আর কিছু নেই, সেইহেতু আমরা এই স্তরেই আটকে গেছি। কিন্তু বেদান্ত দর্শন সকলকে বলছে যে আনন্দের আরও সব উচ্চতর স্তর আছে। সেই স্তরগুলিকে জানার চেষ্টা করুন।* আমি যদি কিছু ইন্দ্রিয় বিষয়ভোগ ত্যাগ করি, তার অর্থ এই নয় আমি নিরানন্দ। আমি শুধু আনন্দের গভীরতর স্তরগুলির অন্বেষণ করছি। এই দ্বিতীয় আনন্দটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, *ভজনানন্দ,* 'ভজন করে যে আনন্দ পাওয়া যায়'। বাস্তবিক, ঈশ্বরের নাম জপ করে, ঈশ্বরের নামগুণগান করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, বিষয়ানন্দের চেয়ে তা আরও শুদ্ধ । এইদিকে এগোতে থাকলে মানুষ একদিন উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছায়; হৃদয়ে *ব্রহ্মানন্দের* যে নিত্য নির্ঝর আছে, তখন সে তাতে অবগাহন করে। বিষয়ানন্দসহ অন্য যতরকমের আনন্দ আছে, তার থেকেও ব্রহ্মানন্দ কোটিগুণে প্রগাঢ়। যাঁরা এই আনন্দ অনুভব করেছেন একমাত্র তাঁরাই বলতে পারবেন সমস্ত *বিষয়ানন্দের* থেকে এর পার্থক্য কোথায় এবং কতটা। ব্রহ্মানন্দ ও বিষয়ানন্দের মাঝের অবস্থায় *ভজনানন্দ*—যা অতি চমৎকার। ভজনানন্দের আসর থেকে আপনি সতেজ হয়ে ফিরবেন, বিষয়ানন্দ থেকে ফিরবেন খুশি মন ও সতেজ শরীর নিয়ে, যদি অবশ্য তা পরিমিত মাত্রায় হয়। যদি তা মাত্রাছাড়া হয়, তবে তা ক্লান্তিতে পর্যবসিত হবে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকায় মাঝে মাঝেই এই লাগামছাড়া বিষয়ানন্দের কুফল চোখে পড়ে। শুক্রবার সমুদ্রতটে প্রমোদ ভ্রমণে গিয়ে যখন রবিবার সন্ধ্যায় বা সোমবার বাড়ি ফেরেন, তখন দেখবেন আপনি আগের চেয়ে আরও ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার অনেক পত্রিকাতেই এই সমস্যাটি আজ আলোচিত হচ্ছে। সমুদ্রতটে তিলধারণের স্থান নেই এবং

রাস্তায় ঘাটে বিদ্ঘুটে ট্র্যাফিক জ্যাম, এই তো অবস্থা! এইভাবে আজ *বিষয়ানন্দ* বিষয়-দুঃখে পরিণত হচ্ছে।

কিন্তু সামান্য একটু *ভজনানন্দ* -ও আপনাকে অনেক বেশি তরতাজা করবে, আনন্দ দেবে। কেন আমি সর্বক্ষণ বাইরে যাব? আপন মনে শান্ত হয়ে নিজের কাছে একটু বসি না কেন। না হয় একটা কোন ভালো বই পড়ি। আজকাল অনেক মানুষই চুপচাপ বসে শান্তি উপভোগ করার ক্ষমতাটি হারিয়ে ফেলেছেন, নিবিষ্ট হয়ে বই পড়া তো দূরের কথা! আচ্ছা, বই না হয় নাই পড়লাম। ঈশ্বরের নামগুণগান তো একটু করতে পারি, ভালো ভালো গানও তো শুনতে পারি। এতে তো বেশি পয়সা খরচ হয় না। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন তো ! কত আনন্দ পাওয়া যায়! সর্বোপরি, কোন ভক্ত যখন ভজন করেন, তার থেকে তখন কী আনন্দই না পাওয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায়, *বিষয়ানন্দ* ভোগ করতে না পেয়েও অনেকে ভজনানন্দের জোরেই বেশ আনন্দে আছেন। একটু ভজনানন্দই আমাদের উজ্জীবিত করে তোলে। মানুষ এই সত্যটি আজ ভুলে যাচ্ছে। সুতরাং এই *ভজনানন্দ* হচ্ছে দ্বিতীয় আনন্দ। এ প্রসঙ্গে বলি, আমাদের দেশে মদ্যপানের সমস্যা কোনকালে ছিল না। মাদকদ্রব্য সম্পর্কে অধিকাংশ লোকের কোন ধারণাই ছিল না। অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতালাভের পর আমরা এই বদভ্যাসটিকে বেশ চটপট আয়ত্ত করছি। এর একটা কারণ এই, *ভজনানন্দ* -এর ভাবটি আমরা ভুলতে বসেছি। আগে সারাদিন কাজের পর বাড়ি ফিরে আমরা ঈশ্বরের নাম করতাম, *রামনাম সংকীর্তন* গাইতাম। সাধারণ মানুষের তখন মদ বা অন্যান্য মাদকদ্রব্যের প্রয়োজন ছিল না। আজ ঐ *ভজনানন্দটি* তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাই তারা এখন বাইরের আনন্দের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এর ফল কী দাঁড়িয়েছে? নিরানন্দ গৃহ, বিবাহবিচ্ছেদ, ইত্যাদি। সুতরাং, মানুষকে আজ বুঝতে হবে কী করে নিজের ভিতরের আনন্দ উপভোগ করতে হয়। যাঁরা নির্জনতা উপভোগ করতে পারেন, আপনমনে বসে থাকাটাই তাঁদের কাছে মহা আনন্দের ব্যাপার। নির্জনতা আর নিঃসঙ্গতা এক জিনিস নয়। নির্জনতায় রুচি থাকলে আপনাতে আপনি থাকেন। এটি উচ্চ অবস্থা। কেন আমি দিবারাত্র ছুটে বেড়াব? বরং আপন মনে কিছুক্ষণ বসে থাকি, একটু ধ্যান করি, একটু ভগবানের কথা ভাবি, একটু ভজন গাই। এই সমস্তই *ভজনানন্দের* অন্তর্ভুক্ত। এই আনন্দ পেতে পয়সা লাগে না, কিন্তু এ আমাদের ভিতর প্রতিবার নতুন শক্তির সঞ্চার করে।

এই শ্লোকে যে *ব্রহ্মানন্দ*-এর কথা বলা হয়েছে, তা হলো তৃতীয় ধরনের আনন্দ। যখন আপনি সত্যিই সেই অনন্ত ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবেন, তখন কী অনন্ত আনন্দই না আপনার করায়ত্ত হবে! সেই আনন্দের পরিমাপ করা যায় না। *গীতার* ভাষায় এই আনন্দটি হচ্ছে *অক্ষয়ম্*, অক্ষয় ও অপরিমেয়। আনন্দের শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণও সেই কথা বলেছেন। সব আনন্দই গ্রহণীয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দও। বেদান্ত কোন আনন্দকেই খাটো করছে না, শুধু বলছে, তারও বাড়া আছে, তারও বাড়া আছে। নিম্নস্তরের আনন্দ থেকে উচ্চস্তরের আনন্দে উত্তরণ আছে। সেটি ভুলে গেলে চলবে না। অতএব, *বিষয়ানন্দ* থেকে *ভজনানন্দ*-এ উত্তরণের চেষ্টা করুন। আর কেউ যদি আরও ভাগ্যবান হন, যদি তাঁর ওপর ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা থাকে, তবে তাঁর পক্ষে *ব্রহ্মানন্দলাভও* কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের আগে *ভজনানন্দ* অনুভব করা চাই। ভজনানন্দ অতি মধুর! গভীর আস্বাদনের বস্তু। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ এই ভজনানন্দের জন্য তৃষ্ণার্ত। বিদেশভ্রমণকালে দেখলাম ভারতীয় *ভজন* বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর যে কোন অংশে যান, দেখবেন মানুষ ভজন শুনতে চাইছেন। সর্বত্র ভজনের ক্যাসেট বিক্রি হচ্ছে। ঈশ্বরীয় গান গাওয়া আর তা থেকে নির্মল আনন্দ পাওয়া, এটি একটি নতুন ব্যাপার। পণ্যগ্রাহিতার স্রোত থেকে বাঁচার জন্য আজ ভারতবর্ষে এটির অত্যন্ত প্রয়োজন। আগ্রাসী বিষয় ভোগের প্রবণতা মানুষ ও প্রকৃতি, উভয়কেই ধ্বংস করবে। এটি হওয়া অনুচিত এবং এই কারণেই এই শিক্ষাটির আজ এতো প্রয়োজন। এই শ্লোকে সেই শিক্ষার কথাই বলা হয়েছে। *বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্। আত্মনি* মানে, 'নিজের আত্মাতে'। *যৎ সুখম্*, 'যে আনন্দ' আপনি অনুভব করেন। *স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা*, 'যিনি ব্রহ্মের সঙ্গে একত্বলাভ করেছেন'। *সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে*, 'তিনি অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন।' স্পর্শেন্দ্রিয় থেকে আমরা নানারকম সুখানুভূতি ও আনন্দ লাভ করি। কিন্তু মানুষের পরিণতির প্রকৃত পরীক্ষা হচ্ছে, সে কেবল স্পর্শসুখের মুখ চেয়েই বসে থাকবে না, তার প্রয়োজন থেকে ধীরে ধীরে সে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে। অতএব, উচ্চ থেকে ক্রমশ আরও উচ্চ স্তরে উঠুন। মানুষে মানুষে তো আরও অনেক সূক্ষ্ম সম্পর্ক আছে। মনে করুন, দু-ধরনের ব্যক্তি একসঙ্গে বসে আছেন; এক ধরনের মানুষ সমানে কথা বলে যাবেন। কথা না হলে তাঁদের কাছে সবটাই নীরস। আর এক ধরনের ব্যক্তি আছেন, যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একসঙ্গে থেকেও কোন বাক্যবিনিময় করেন না, অথচ তাঁদের হৃদয় নিবিড় সান্নিধ্যের আনন্দে যুগপৎ

স্পন্দিত। এ সবই মানুষের জীবনে ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু আমরা মানব-সম্ভাবনার এইসব উচ্চতর মাত্রাগুলি ভুলে গেছি।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জীবনীতে আছে যে, তিনি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আর একজন শিষ্য বৃন্দাবনে মাসের পর মাস একসঙ্গে ছিলেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটিও কথা হয়নি। অথচ দুজন দুজনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; একজনের হৃদস্পন্দন যেন আর একজন শুনতে পেতেন। বাস্তবিক, এমন একটি অবস্থা হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। অল্প বয়সে আমরা অন্যের সঙ্গে খুব কথাবার্তা বলি এবং তার দরকারও আছে। বিবাহের পর প্রথম কয়েকমাস স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোরকম কথাবার্তা হওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু বিবাহিত জীবন একবার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তখন আর অত কথার প্রয়োজন হয় না। বিবাহিত জীবনের ওই পর্যায়ে, এটি তাদের মানসিক গভীরতারই পরিচয়।

সুখের বিভিন্ন স্তর আছে। কী করে পরবর্তী স্তরে ওঠা যায়, সে প্রয়াস সর্বদা করতে হবে। বেদান্ত আমোদ-আহ্লাদের বিরোধী নয়। সে শুধু বলে যে, আরও উচ্চস্তরের আনন্দ আছে। আপনি যদি এক ধরনের আনন্দ নিয়েই মেতে থাকেন, তবে আপনার জন্য অপেক্ষারত উচ্চ পর্যায়ের আনন্দগুলি থেকে আপনি নিজেকে বঞ্চিত করছেন। এই হলো বেদান্তের ভাষা, যা বলিষ্ঠভাবে ব্যক্ত হয়েছে *কঠোপনিষদ*-এর এক প্রেরণাদায়ী আহ্বানে, স্বামী বিবেকানন্দ যার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করছেন এই ভাষায়, 'Arise, awake and stop not till the goal is reached'। (ওঠো, জাগো এবং যতক্ষণ না লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছ, থেমো না)। লাভ করার মতো বহু বস্তু রয়েছে। কিছু যদি লাভ করেও থাকেন, এগিয়ে যান; আরও বড় কিছু আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। শিশু বয়সে আমি খেলনা নিয়ে খেলতাম। 'আহা! কী আনন্দই না হতো'। মনে আছে, ছেলেবেলায় খেলতে খেলতে আমি জগৎ ভুলে যেতাম। কিন্তু বড় হয়েও যদি ঐভাবে কেউ চলতে থাকে, তবে সেটি অত্যন্ত দুঃখজনক, দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। আরও কত ধরনের আনন্দ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে! স্কুলে যান, বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ান। ওটি উচ্চতর আনন্দ। মানসিক আনন্দ আরও উচ্চস্তরের। শ্রেষ্ঠ হলো *আত্মানন্দ*, নিজের শাশ্বত স্বরূপ উপলব্ধির আনন্দ। ধাপে ধাপে মানবিক সম্ভাবনা বিকাশের কী অসাধারণ তত্ত্বই না বেদান্ত উপস্থাপনা করেছে! তাই, পরের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

—'যেহেতু ত্বকের স্পর্শজাত সুখ কেবল দুঃখেরই কারণ হয় এবং তাদের আদি ও অন্ত আছে, হে কৌন্তেয়, জ্ঞানী ব্যক্তি তাই তার মধ্যে সুখের অন্বেষণ করেন না।'

এইটিই সিদ্ধান্ত বাক্য। *সংস্পর্শজা ভোগা,* 'বাহ্যসংযোগজনিত সুখ', তাদের বলা হচ্ছে *সংস্পর্শজা; সংস্পর্শ* ও *স্পর্শের* একই অর্থ, 'বাহ্যিক ত্বকস্পর্শ।' এই সমস্ত সুখের একটিই দোষ : *আদ্যন্তবন্তঃ,* 'এগুলির আরম্ভ আছে, শেষ আছে'। এগুলি আপনি সবসময় পাবেন না এবং এইজন্য একটা অভাববোধ আপনাকে পীড়িত করবে। তাছাড়া, *দুঃখযোনয় এব তে,* 'তারা দুঃখ-বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়'। আপনি যে শুধু সুখই লাভ করবেন তা হয় না, দুঃখও পাবেন। সুখ ও দুঃখের নিরন্তর দোলায় দোদুল্যমান আমাদের জীবন। ইংরেজ কবি জন কীট্‌স্ (John Keats) এই ভাবটি তাঁর Ode to Melancholy-তে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন :

Ay, in the very temple of Delight
Veil'd Melancholy has her Sovran shrine!
অর্থাৎ, পরম সুখের মন্দিরেই, হায়,
প্রচ্ছন্ন বিষাদের মুখ দেখা যায়!

মহাকবি কালিদাসের *মেঘদূত* মহাকাব্যেও এই সত্যটি ঝংকৃত হয়েছে (শ্লোক, ১১৩) :

কস্য অত্যন্তং সুখম্ উপনতম্ দুঃখম্ একান্ততো বা।
নিচৈঃ গচ্ছৎ উপরি চ দশা চক্র নেমি ক্রমেণ ॥

—'কে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী? কেই বা চিরদুঃখী? আমাদের অবস্থা নেমিবৎ—অর্থাৎ চাকার বেষ্টনীর মতো একবার ওপরে ওঠে, আবার নিচে নেমে আসে।'

মানুষের জীবনে এটিই চিরন্তন সত্য। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন : *যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে,* 'ইন্দ্রিয় সংস্পর্শে উৎপন্ন সুখ হচ্ছে দুঃখের কারণ'; *আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয়,* 'হে অর্জুন, এদের আদি ও অন্ত আছে'। তাহলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত? ন *তেষু রমতে বুধঃ,* 'পরিণত মনের

মানুষ বা বিচক্ষণ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখে প্রীত হবেন না'। দেখুন, এগুলি সবই মানুষের বাস্তব জীবনের সমস্যা। আমরা যখন নিজেদের জীবন বা আমাদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করি, তখন জীবনের বহু নতুন, অজানা দিক আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়, খুলে যায় সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। আপনার ভিতর কী কী সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে, তা আপনার জানা ভালো। স্যার জুলিয়ান হাক্সলে একটি মনুষ্য সম্ভাবনা বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন এবং বেদান্ত সেই বিজ্ঞান, অত্যন্ত প্রাচীন হয়েও যা অত্যন্ত নবীন। আগেই বলেছি *বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ* এই তিনটি সম্ভাবনাই মানুষের সামনে রয়েছে। এখন আনন্দের এই বিভিন্ন স্তরগুলির কথা স্মরণে রেখে আমাদের একটি থেকে আর একটিতে উন্নীত হতে হবে। একটি বিশেষ স্তরেই দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকবেন না। বেদান্ত অবিরাম আমাদের বলছে—বদ্ধ হোয়ো না, বদ্ধাবস্থার ঊর্ধ্বে ওঠো। মানুষের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আধুনিক জীববিজ্ঞানও সেই একই কথা বলছে—বদ্ধ হোয়ো না।

প্রত্যেক জীবই আনন্দের সন্ধান করছে। কিন্তু মানুষই একমাত্র জীব যে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে এই আনন্দের অনুসন্ধান করতে পারে। অন্য সব জীবের আনন্দ দৈহিক স্তরেই সীমাবদ্ধ। এই কারণেই *স্পর্শ* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। *বাহ্য স্পর্শেষু অসক্তাত্মা,* 'যিনি বাহ্য স্পর্শের প্রতি অনাসক্ত'। মানুষের স্থূলতম ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয়, অসংযত হলে, মানুষ পশুস্তরে নেমে যায়। ইন্দ্রিয়গুলির ঊর্ধ্বে আছে মন, যা ইন্দ্রিয়তন্ত্র থেকে সূক্ষ্মতর। কিন্তু সূক্ষ্মতম হচ্ছেন আত্মা, সর্বভূতস্থ দিব্য আত্মা। আমাদের যত আনন্দের অনুভূতি তা সেখান থেকেই উৎসারিত হয়। সেই উৎস অভিমুখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এরই নাম অগ্রগতি এবং এটি নির্ভর করে ইন্দ্রিয়শক্তি সংযত করার বিশেষ অভ্যাসের ওপর। এই সংযম না করলে মানুষ বিপদে পড়বে। আমাদের ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চতর বস্তুর অনুসন্ধান করতে হবে এবং এই সম্ভাবনাটি যে আমাদের মধ্যে বর্তমান, একথা উপনিষদ ও গীতায় বারবার বলা হয়েছে। আগেই বলেছি, বেদান্তের একটিই আহ্বান—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। এক জায়গায় থেমে থেকো না। উচ্চতর সম্ভাবনাগুলি তোমারই মধ্যে বিকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। বাস্তবিক, এইভাবেই আমরা ইন্দ্রিয়, মন ও আর সব কিছুকে অতিক্রম করে, এসবের পারে যে শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ অনন্ত আত্মা বিরাজ করছেন, তাঁকে আবিষ্কার করি। আত্মাই সূক্ষ্মতম, গূঢ়তম, পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা। আত্মাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখলে মানুষকে সত্যিই সীমিত

মনে হয়। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ও অনুভবের মাধ্যমে বিচার করলে মানুষ আর কতটুকু? কিন্তু যদি তার বাইরের রূপ এবং দেহ-মন অতিক্রম করে তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন, তবে তার মধ্যে এক বিরাট অবিশ্বাস্য বস্তুর সন্ধান পাবেন। তখন আর মানুষকে ক্ষুদ্র জীব বলে মনে হবে না, তখন অনুভব হবে যে, সে স্বরূপত অনন্ত, শাশ্বত, মৃত্যুহীন।

উপনিষদের এক ঋষি তাই মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে একদিন এই সত্য উচ্চারণ করেছিলেন (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৪/৩) ঃ

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

—'তুমি নারী, তুমি পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী; তুমি দণ্ডধারী, স্খলিতচরণ, জীর্ণদেহ বৃদ্ধ, তুমিই জগতে নানারূপে জাত।'

এই উপনিষদেই এক নবীন ঋষি সমগ্র মানবজাতিকে *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, 'অমৃতের পুত্রগণ' বলে সম্বোধন করেছেন (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ২/৫)। কিন্তু যতক্ষণ ইন্দ্রিয়স্তরে আছি, ততক্ষণ আমরা *অমৃতস্য পুত্রাঃ* নই। কারণ জীবনের যত পাপকর্ম, যত দুঃখকষ্ট এবং তথাকথিত যত আনন্দ, সেসব এই ইন্দ্রিয়ের স্তর থেকেই আসে। এসব কিছুর উর্ধ্বে আছে গভীরতর, সূক্ষ্মতর ও দৃঢ়তর স্থিতি যেখানে মানুষের ওঠা উচিত। তবে সর্বোচ্চ অবস্থা হলো আমাদের সকলের ভিতর যে ঈশ্বর বিরাজ করছেন তাঁকে উপলব্ধি করা। এই সত্যটি আমাদের সামনে এই কারণে তুলে ধরা হয়েছে যাতে আমরা ঐ সত্যকে অনুসরণ করতে পারি। তাতে আমাদের নিজেদেরও কল্যাণ, সমাজেরও কল্যাণ। একমাত্র এই ধরনের পরিস্থিতি হলে তবেই অন্তরে বাহিরে শান্তি বিরাজ করবে। যত অপরাধ আর অপরাধপ্রবণতা, তার মূল হলো ইন্দ্রিয়গুলি এবং তাদের সঙ্গে মনও আংশিকভাবে যুক্ত। সুখের সঙ্গে সঙ্গে অনেক উৎপাতও এসে জোটে আমাদের জীবনে। সুতরাং, সত্তার আরও গভীরে আমাদের যেতে হবে এবং স্পর্শ করতে হবে অন্তরে অবস্থিত অন্তরতম সত্যটিকে। এই মহত্তম উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হলে তবে আবার আপনি ইন্দ্রিয়স্তরে পরম দক্ষতা ও কর্তৃত্বের সঙ্গে কর্ম করতে পারবেন এবং তাতে সমাজেরও প্রভূত কল্যাণ হবে। এইভাবেই গীতা আমাদের সামনে জীবনের পূর্ণতার চিত্রটি তুলে ধরে, কেমন করে জীবন গঠন করতে হয়, তা শিক্ষা দিচ্ছেন। নিজের জীবন আমাদের নিজেদেরই গড়ে তুলতে হবে। এখানেই ২২তম শ্লোকটির গুরুত্ব। আধুনিক

সভ্যতা মানেই টাকার খেলা। প্রত্যেকটি স্থূল ভোগের জন্যই অর্থের প্রয়োজন। যে যত ভোগ করতে চায়, তার ততই অর্থের তৃষ্ণা। যেহেতু অত অর্থ সদুপায়ে উপার্জন করা যায় না, তাই অপরকে ঠকিয়ে, সরকারকে প্রতারণা করে, চুরি, ডাকাতি বা অন্য যে কোন উপায়ে সেই অর্থ মানুষ হস্তগত করে। এই হচ্ছে আজকালকার মানবিক পরিস্থিতির এক দুঃখজনক দিক।

এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে, মানুষকে এই দুর্বলতা থেকে উদ্ধার করতে হলে, তাকে বারবার শোনাতে হবে কী বিরাট সম্ভাবনা তার মধ্যে সুপ্ত আছে এবং সেইদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। *গীতা* ঠিক এইটিই করছেন। আজকের বিশ্বসভ্যতা ভোগমুখী, সর্বত্রই জড় পণ্য উপভোগের কোলাহলপূর্ণ প্রতিযোগিতা। এই সভ্যতার বিষময় ফল চতুর্দিকে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্ পথে গেলে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে? *গীতা* আমাদের সেই পথটিই বলে দিচ্ছেন। কী সেই পথ? সেই পথ হলো মানুষের সত্তার গভীরতম পরিচয়টি জানা এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্যে নিজের শক্তিকে নিয়োজিত করা। মানুষের ক্রমবিকাশের একটি লক্ষ্য বা গতিপথ আছে এবং তা পূর্ণতার দিকে। সেই পূর্ণতা আমাদের অর্জন করতেই হবে। যদি আধুনিক বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে বেদান্তের ভাবগুলি ছড়ানো যায় তাহলে সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হবে। বর্তমান সভ্যতার দর্শনে কোন দিক্‌নির্দেশ নেই। শুধু ঘুরে মরা। একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি—থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়। এইজন্য সর্বত্রই একধরনের উদ্দেশ্যহীনতা চোখে পড়ছে। মনে রাখা দরকার, উদ্দেশ্যহীন, দিশাহীন নারী-পুরুষ নিজেরাও যেমন প্রভূত উদ্বেগ, দুঃখ ও ব্যর্থতার শিকার হতে পারে, তেমনি সমাজের উপরেও সেই নৈরাশ্যের ও অশান্তির ছাপ পড়তে বাধ্য। বর্তমানে ভারতীয় সমাজেরও এই হাল হয়েছে। অথচ এই মহান ভারতবর্ষের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রয়েছে যুগ যুগ পরীক্ষিত জ্ঞানের ভাণ্ডার ও অমূল্য সব যুক্তিসিদ্ধ ভাবনা যা সমগ্র মানব সমাজের উন্নয়নের পাথেয় হতে পারে। ২৩তম শ্লোকে এই বিষয়টি চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হবে। এই শ্লোকটি আমি প্রায়ই স্মরণ করি ও তার মধ্যে থেকে নিত্যই কিছু না কিছু গভীরতর অর্থ খুঁজে পাই। এটিই এই শ্লোকের বিশেষত্ব। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

—'যিনি ইহজীবনেই, শরীরত্যাগের আগে, কাম ও ক্রোধ থেকে উদ্ভূত বেগ প্রতিরোধ করতে পারেন, সেই পুরুষ অথবা নারীই যোগী, তিনিই সুখী।'

এটি অসাধারণ শ্লোক। *শক্নোতি*, 'যিনি সক্ষম'; *ইহৈব*, 'ইহজন্মে', এই শরীরেই, কোন সুদূর স্বর্গে নয়; *সোঢ়ুং*, 'সহ্য করতে।' কী সহ্য করবেন? *বেগম্*, 'প্রচণ্ড স্রোতের বেগ'। কী ধরনের স্রোত? *কামক্রোধোদ্ভবং* '*কাম* ও *ক্রোধ* হতে উদ্ভূত', ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-তৃষ্ণা এবং ক্রোধ। এইগুলির এমন প্রবল শক্তি যা আপনাকে ধরাশায়ী করতে পারে, আপনার সমগ্র জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে। এই হচ্ছে এই স্রোতের প্রকৃতি। অতএব, 'যাঁরা, ইহজীবনেই, শরীর-ত্যাগের আগে, কাম ও ক্রোধের প্রচণ্ড বেগ সহ্য করতে পারেন বা ধারণ করতে পারেন', *শক্নোতি ইহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।* মৃত্যুর পর আর কিছুই করা সম্ভব নয়। কেবল মৃত্যুর পূর্বেই এটি করা যায়। *প্রাক্* অর্থাৎ 'পূর্ব'। *শরীরবিমোক্ষণ* অর্থাৎ 'শরীরত্যাগ'। *গীতা* চাইছেন, আমরা সকলেই যেন আমাদের নিজের নিজের সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে বিকশিত করে মুক্ত হয়ে যাই, আমরা যেন আমাদের ভিতরকার বিক্ষেপকারী নানা তরঙ্গের বেগকে প্রতিহত করতে শিখি। তাতে কী লাভ হবে? *স যুক্তঃ*, 'সেই নারী অথবা পুরুষ হচ্ছেন যোগী'; *স সুখী নরঃ*, 'তিনি সুখী মানব।' যদি সুখী হতে চান, তবে এইসব বেগ প্রতিরোধ করার শক্তিটি আপনাকে অর্জন করতে হবে। কাম ও ক্রোধের এই তরঙ্গগুলি আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে, আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন শক্তিগুলির ক্রীতদাস বানিয়ে ছাড়ে। তখন আর আমাদের মুক্তি কোথায়? সুখই বা কোথায়? 'অন্তর শান্ত না হলে সুখ কোথায়?', *গীতার* দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, *অশান্তস্য কুতঃ সুখম্?* 'অশান্ত ব্যক্তির সুখ কোথায়?'

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অরণ্যের বনস্পতির মতো নিত্য দোদুল্যমান যে মন, যে মন-রূপ বনস্পতি ইতিউতি উৎপাটিত হচ্ছে, সেই অশান্ত মনে সুখ কোথায়? এই ধরনের মনুষ্যজীবন কী দুর্ভাগ্যজনক! কিন্তু এমনও বৃক্ষ আছে, যার শিকড় অত্যন্ত শক্ত ও গভীর; বায়ু বেগে বইলেও সে ঠিক দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু যে বৃক্ষের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করেনি, তা অচিরেই ধরাশায়ী হয়। যিশুর অনুরূপ একটি উপদেশ আমরা আগেই আলোচনা করেছি। অতএব, অন্তরে নিহিত সত্যের ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। যাঁদের জীবন এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁরা স্থির ও শক্তিমান, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁরা

সম্পূর্ণরূপে শান্ত ও অচঞ্চল। কোথা থেকে তাঁরা এই শক্তিলাভ করেন? তার উত্তর এই, স্বরূপের গভীরতম প্রদেশ থেকে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব এই শ্লোকে আমাদের উদ্দেশ্যে বলছেন ঃ *শক্নোতি ইহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।* ধর্মের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতিই মৃত্যুর পর ফলবতী হওয়ার কথা। কিন্তু গীতায় এই জাতীয় ধর্মের কোন স্থান নেই। এখানে সবই *ইহৈব, ইহৈব,* 'এখানেই, এখানেই'। উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে ওঠার জন্য যৌবনের তেজকে সংযত করতে হবে; কারণ বার্ধক্যে তেজ ক্রমেই কমে আসে। নদীতে জল থাকলে, সেখানে বাঁধ দিয়ে বিরাট সরোবর সৃষ্টি করা যায়, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ও কৃষিকর্মের জন্য খাল কাটা যায়, কিন্তু নদীতে জল না থাকলে বাঁধ দিয়ে কী লাভ? বার্ধক্যে আর কোন শক্তি অবশিষ্ট থাকে না, কিন্তু যৌবনে তার প্রাচুর্য থাকে। তাই, এই বয়সেই মানুষের শক্তিকে একটি বিশেষ খাতে প্রবলভাবে প্রবাহিত করানো প্রয়োজন যাতে সে অন্যের সেবা করতে পারে এবং নিজেও আধ্যাত্মিক উন্নতি করে পূর্ণকাম হতে পারে।

মানবিক বিকাশ ও পরিপূর্ণতার এই চিত্রটি গীতা সমগ্র মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছে। অল্পবয়সে যদি এই শক্তি মানুষকে এখানে-ওখানে ঠেলে নিয়ে যায়, তাকে দিয়ে অসৎকর্ম ও সমাজবিরোধী কাজ করায়, তবে মনুষ্যজীবনের করুণ পরিণতি হবে। নিজের শক্তির গুণগতমান বাড়িয়ে এবং তাকে উপযুক্ত খাতে চালিত করতে হলে মানুষকে সংযত জীবনযাপন করতেই হবে। নদীকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োজন হয় মানুষের; নদী নিজেকে সংযত করতে পারে না। সে কেবল বয়েই যায় এবং বন্যার সময় সে ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার, শস্য সমস্ত ধ্বংস করে মানুষকে চরম দুর্দশায় ফেলে। এইজন্য দুরন্ত নদীকে নিয়ন্ত্রিত করে, কীভাবে তার জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, কীভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়, মানুষ সে কৌশল আয়ত্ত করেছে। এখন মানুষকে নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলিকেও একইভাবে সংযত করতে হবে এবং এই কাজটি তাকেই করতে হবে, তার হয়ে অন্য কেউ করে দেবে না। এই শ্লোকে শুধু *কাম ও ক্রোধ* এই দুটি শব্দ ব্যবহৃত হলেও রিপু প্রকৃতপক্ষে ছ'টি, অসংযত হলে তারা মানুষের ছ'টি শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয় অধ্যায়ে আমি এগুলি বর্ণনা করেছি। সংস্কৃতে এদের *ষড়রিপু* বলা হয়। *রিপু* অর্থাৎ 'শত্রু'। *ষড়* অর্থাৎ 'ছয়'। মানুষের এই যে ছ'টি শত্রু, তারা বাইরে কোথাও নেই, সবই তার নিজের ভেতরে লুকিয়ে আছে। প্রথমটি হচ্ছে *কাম,* অসংযত কাম; দ্বিতীয়টি হচ্ছে *ক্রোধ,* রাগ; তারপর *লোভ,* অত্যধিক বিষয়তৃষ্ণা; তারপর *মোহ,* ভ্রান্তি; *মদ,* দম্ভ *বা* দর্প; সব শেষে *মাৎসর্য,*

ঈর্ষা। এই ছ'টি শত্রু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। তাদের সামলে সঠিকভাবে চলতে হবে, তাদের অনুকূল করে নিতে হবে। এগুলি সবই শক্তি এবং শক্তি যেমন শত্রু হতে পারে, তেমনি বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার ফলে বন্ধুও হতে পারে। মানুষের মধ্যে যে পাশবিক শক্তি আছে, তাকে আত্মসংযম ও অভ্যাসের মাধ্যমে একটু শুদ্ধ ও পরিমার্জিত করে নেওয়া দরকার। তা যদি করা যায়, তাহলে সেই ব্যক্তির মধ্য থেকে মহত্তর কিছু বেরিয়ে আসবে। তা যখন আসে, তখন *স যুক্তঃ স সুখী নরঃ*, 'তিনি একজন *যোগী*, একজন সুখী ব্যক্তি।' নদীর কাছে যেসব কৃষকেরা বাস করে, কত দুঃখই না তারা ভোগ করে! ঘর অবধি জল উঠে আসে। সমস্ত চাষবাস নষ্ট হয়। তারপর একদিন এই উদ্দাম জলশক্তিকে সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নিয়ন্ত্রণ করার সরকারি প্রকল্প রচিত হয়। প্রকল্পটি রূপায়িত হলে তখন দেখবেন সেখানকার মানুষ সুখে আছেন! *স যুক্তঃ স সুখী নরঃ*। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই। আমরা সুখী হতে চাই, *যুক্তঃ* বা যোগী হতে চাই। কিন্তু কেবল ঐ একটি উপায়েই তা হওয়া সম্ভব। আমরা যদি রিপুগুলির বিক্ষুব্ধ তরঙ্গগুলির মোকাবিলা করতে না পারি, তবে সেই স্রোত আমাদের কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার কোন ঠিক নেই। তখন আমাদের কী গতি হবে?

সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি মেলে যেখানে নরনারী প্রবল ষড়রিপুর প্রবাহে ভেসে গেছে। এই যে ভেসে যাওয়া, এখান থেকেই করুণ-রসাত্মক সাহিত্যের জন্ম! বিয়োগান্তক বা করুণ-রসাত্মক নাটক দেখতে ভালোই লাগে, কিন্তু নিজের জীবনে যখন সেই করুণরসের তরঙ্গ আছড়ে পড়ে, সে অভিজ্ঞতা বড় মারাত্মক। অভিনয়ে এটি উপভোগ করুন। কিন্তু নিজের জীবনে ট্র্যাজেডির অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় নয়। নিজের জীবনকে ট্র্যাজেডি করে তুলবেন না। বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার ও কবি গ্যেটে (Goethe) 'Faust' নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন, ঠিক যেমন করা হয়েছে *গীতার* এই অধ্যায়ে, আমি আগেই যথাস্থানে সে-কথার উল্লেখ করেছি। *গীতার* তত্ত্বের প্রতিধ্বনি মাঝেমাঝেই পাশ্চাত্য সাহিত্যে শুনতে পাওয়া যায়, যেমন ব্রাউনিং, শেলী, টেনিসন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ ব্রিটিশ কবিদের রচনায় এবং ইউরোপীয় ভূখণ্ডের গ্যেটে ও অন্য কয়েকজনের লেখাতে। প্রাচ্য থেকেই এইসব ভাব ক্রমশ পাশ্চাত্যে যায় এবং তখনকার সময় থেকে এই প্রক্রিয়াটি এখন আরও তীব্র হয়েছে।

সে যাই হোক, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে আমরা প্রতিনিয়তই আমাদের ভিতরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য ইত্যাদি যে আবেগ শক্তিগুলি রয়েছে, তাদেরই বশীভূত হচ্ছি। এ দুরবস্থার নিরসন ঘটাতে হবে এবং তা করতে হবে আমাদেরই, অন্য কেউ আমাদের হয়ে করে দিতে পারবে না। একবার তা করতে পারলে, তখন আপনি পূর্ণ, তখন আপনি সুখী; *স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।* এখন এ বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে ও সাফল্য লাভের জন্য পুরুষকার অবলম্বন করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এই অন্তর্দৃষ্টিই দিচ্ছেন। যখন আমরা স্থির হয়ে বসি, তখন এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। হয়ত কখনও আমার মধ্যে প্রবল ঘৃণার ভাব জাগছে। তখন কী করব? তখন আমাকেও ঐ ভাবটি প্রতিরোধ করতে হবে। ঠিক সেইরকম, যখন লোভ আসে, তাকে সংবরণ না করলে সে বেড়েই যাবে। কিন্তু এই রিপুকে কীভাবে সংযত করতে হয়, তা যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনি পরিস্থিতির ওপর প্রভুত্ব করতে পারবেন। এইভাবে অন্তর থেকে নিরন্তর ষড়রিপুর যেসব ঢেউ উঠছে, তাদের দ্বারা আপনি আর অভিভূত হবেন না।

এমনকি উচ্চাকাঙ্ক্ষার তরঙ্গও আপনাকে বিপর্যস্ত করতে পারে। ঠিক সময়ে যদি আপনি তার গতি রোধ করতে পারেন, তবে বহু কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারবেন। কিন্তু সেই স্রোতে ভেসে গেলে সমস্তই হারাবেন। এই প্রসঙ্গে নেপোলিয়ন ও হিটলারের জীবনকাহিনী অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। নেপোলিয়ন যদি ১৮০৮ খ্রিঃ স্পেনের যুদ্ধ বন্ধ করে দিতেন ও রাশিয়াকে আক্রমণ না করতেন, তবে তিনি এক স্থায়ী, ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ইউরোপ গড়ে তুলতে পারতেন। হিটলারের যা ছিল না, নেপোলিয়নের সেই মহান পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তাঁর লাগামহীন উচ্চাশা তাঁর সর্বনাশ করল এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদের বন্দি হয়ে সেন্ট হেলেনায় তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হলো। হিটলারের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। স্বদেশবাসী ও ইহুদী সম্প্রদায়ের অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধনের পর অসংযত উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁকে ধ্বংস করল। এরকমই হয়। অবাধ উচ্চাকাঙ্ক্ষাই আমাদের বিচারবুদ্ধি হরণ করে আমাদের সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেয়। তাহলে দেখুন, ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে গীতায় যেটি বলা হয়েছে, এখানেও তাই দেখা যাচ্ছে—নিজের হাতেই নিজের বিনাশ ঘটছে, নিজেই নিজের শত্রু হচ্ছি।

এইজন্যই আমাদের ভিতরের এইসব প্রচণ্ড ক্ষতিকারক শক্তিগুলিকে সাহসের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ও শোধন করতে বলা হচ্ছে। এইভাবেই আমরা উন্নত

চরিত্রের নরনারী হব। ভেবে দেখুন তখন কী সুন্দর সমাজই গঠিত হবে যখন পুরুষ-নারী সকলেই আত্মনিয়ন্ত্রণ করে মানবপ্রেমী ও মানবদরদী হয়ে উঠবেন!

শঙ্করাচার্য বারবার *বিবেকচূড়ামণি*-তে বলেছেন (৫২ শ্লোক) ঃ

মস্তকন্যস্তভারাদেঃ দুঃখম্ অন্যৈঃ নিবার্যতে।
ক্ষুধাদিকৃত দুঃখং তু বিনা স্বেন ন কেনচিৎ॥

—'তুমি যদি মাথায় ভারী বোঝা নিয়ে যাও, অন্য কেউ সেই ভার লাঘব করে তোমার কষ্ট কিছুটা কমাতে পারে। কিন্তু তোমার হয়ে অন্য কেউ খেলে তোমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে না। তোমাকেই খেতে হবে।'

৫৪তম শ্লোকে তিনি আরো বলেছেন ঃ

বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধচক্ষুষা
স্বেনৈব বেদ্যং ন তু পণ্ডিতেন।
চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষৈব
জ্ঞাতব্যম্ অন্যৈরবগম্যতে কিম্॥

—'যেমন পূর্ণিমার চাঁদ স্বচক্ষে দেখতে হয়, তেমনি সত্যের স্বরূপও জ্ঞানের স্বচ্ছ চোখ দিয়ে প্রত্যেক মানুষকে নিজেকেই উপলব্ধি করতে হয়। অন্যের দেওয়া বর্ণনায় কি সে তৃপ্ত হতে পারে?'

অতএব, বেদান্ত এই ধরনের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ওপর জোর দিচ্ছে। কীসের উপলব্ধি? পরম বা উচ্চতম সত্যের উপলব্ধি। কৌশল জানা থাকলে এই অপরোক্ষ অনুভূতি আপনারও হতে পারে। অনুভব করতে হবে। অনুভূতিই আসল কথা। শুধু এই নিয়ে কথা বললে বা পড়লে চলবে না। এই অধ্যায়ের ২৩তম শ্লোকে এই বাস্তব বিষয়টির ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষের কাছেই আজ এই শিক্ষার গভীর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। বিশ্বজুড়ে আজ কোটি কোটি তরুণ-তরুণী; শারীরিক শক্তিতে তারা ভরপুর, কিন্তু আত্মসংযমহীন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর ফল কী হচ্ছে, তা আপনারা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন। কত সহজেই মানুষের জান্তব প্রবৃত্তিটি আজ আত্মপ্রকাশ করছে! ফুটবল খেলার মাঠেই হোক বা আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার আসরেই হোক, সর্বত্রই উচ্ছৃঙ্খল যুব-শক্তির তাণ্ডব খেলাধূলার নির্মল আনন্দ পণ্ড করে দিচ্ছে। একবার ভাবুন বেলজিয়ামে কী দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাই না ঘটল! ব্রিটিশ ফুটবলাররা সেখানে কী তাণ্ডবটাই না চালাল! জার্মানিতেও তাই হয়েছে। ভারতবর্ষেও এমন অনেক ঘটনাই ঘটছে। এমনকি আমাদের রাজনীতিও এই উচ্ছৃঙ্খলতার ক্রীড়াভূমি হয়ে

উঠেছে। এই ধরনের অসংযত মানুষের উপর নির্ভর করে গণতন্ত্রের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটতে পারে না। এই বিধ্বংসী শক্তিকে মহৎ উদ্দেশ্যের অভিমুখে ফেরাতে না পারলে গণতন্ত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব আমাদের সকলেরই সাবধান হওয়া দরকার। কোথাও শক্তির অভাব নেই, কিন্তু সেই শক্তির অপব্যয় হওয়ার দরুন মানুষের শান্তি নষ্ট হচ্ছে। সমাজে ও রাজনীতিতে আজ এইটিই ঘটছে। কিন্তু এটা হওয়া উচিত নয়। মহান আচার্যদের কথা আপনাদের শুনতে হবে, কারণ তাঁরা মানুষকে ভালবাসতেন, তাঁরা আমাদের এমন কিছু দিতে পারেন, যা আমরা নিজের নিজের স্তর থেকেই অভ্যাস করতে পারি। তাঁরা যা বলেন, তার মধ্যে অবাস্তবতা কিছুই নেই। বরং সেগুলি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ। মানুষের গূঢ় প্রকৃতি বা স্বরূপ বিশ্লেষণ করে শান্তিপূর্ণ ও সম্ভাব্য পূর্ণাঙ্গ জীবনের একটি চিত্র তাঁরা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। *স যুক্তঃ স সুখী নরঃ*, 'এই ধরনের আপ্তকাম মানুষই হচ্ছেন যোগী ও সুখী'। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ এত সুন্দরভাবে এই আবেদনটি আমাদের কাছে রেখেছেন।

এই মারাত্মক ষড়রিপুর উচ্ছ্বাস আমাদের দমন করতেই হবে। কারণ এর দ্বারা প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নিচে নেমে যাচ্ছে ও সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ছে। গিবন-এর লেখা রোম-এর ইতিহাস পড়লে দেখবেন যে, দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে যে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, সেই সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছিল মানুষের চারিত্রিক অবনতি। রোমান সভ্যতা তখন প্রচণ্ড বহির্মুখী; ভোগের বাতিক তখন তাদের এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছিল। এমনকি রোমের সম্রাটরাও সৈন্যদের হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিলেন। সৈন্যদের খুশি করতে তাদের বিশেষ ভেট দিতে হতো। মানুষের রুচি তখন এতটাই অমার্জিত হয়ে পড়েছিল যে, বন্দিদের হিংস্র জন্তু দিয়ে খাওয়ানোর 'খেলাধুলা' রোমের নাগরিকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠল। রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতন এইভাবেই শুরু হয়েছিলো। আরও দুশোবছর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে অবশেষে একদিন এই সভ্যতার মৃত্যু হলো। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ছ'টি রিপুর প্রবল স্রোতে যখন মানুষ একেবারে ভেসে যায়, তখনই বুঝতে হবে সেই সভ্যতার দিন ঘনিয়ে এসেছে। এই সত্য স্বীকার করতেই হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। তা যদি করা হয়, তবেই সুস্থ সভ্যতা, সুস্থিত ও সুঃ সমাজ তৈরি হবে। আজ ভারতবর্ষকে একটি প্রগতিশীল ও যথার্থ গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করতে হলে এই শিক্ষায় ফিরে আসতে হবে। আমাদের

সামনে এটিই কঠিন পরীক্ষা। *আমি প্রায়ই একথা বলে থাকি যে, আমাদের প্রচুর রোগ আছে ঠিকই, কিন্তু আমরা এই কারণে ভাগ্যবান যে আমাদের রোগনিরাময়ের ওষুধও আছে।* ওষুধ দিন, রোগ সেরে যাবে। পরবর্তী, অর্থাৎ ২৪তম শ্লোকে এই ভাবটিকেই বিস্তার করে বলা হয়েছে।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

—'অন্তরস্থ আত্মায় যাঁর সুখ, অন্তরস্থ আত্মায় যাঁর আরাম, অন্তরস্থ আত্মাই যাঁর জ্যোতি, একমাত্র সেই যোগীই ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।'

সেই যোগী *ব্রহ্মনির্বাণম্,* 'ব্রহ্মজ্ঞান' লাভ করেন; *ব্রহ্মভূতঃ,* 'ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে'। কী ধরনের যোগী? *যোঽন্তঃ সুখো,* 'অন্তরস্থ আত্মায় যাঁর সুখ'। তাঁর সুখ কোন বাইরের বস্তুর ওপর নির্ভরশীল নয়। আমাদের শৈশবের সুখ সম্পূর্ণ বাহ্যবিষয়ের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু আমরা যত বড় হই ও মানসিকভাবে পরিণত হই, সেই নির্ভরতা একটু একটু করে কমতে থাকে। কিন্তু এই যোগীর ক্ষেত্রে সেই নির্ভরতা একেবারেই থাকে না, তিনি সেসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বাহ্যবিষয়ে কোন নির্ভরতা নেই তাঁর। একেই মুক্তি বলা হয়। মুক্তির অর্থ বাহ্যবিষয়ে অনির্ভরতা। *মনুস্মৃতি* বলছেন ঃ

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বম্ আত্মবশং সুখম্।
ইতি বিদ্যাৎ সমাসেন স্বরূপং সুখদুঃখয়োঃ ॥

—'যা-কিছু তোমাকে বাহ্যবিষয়ে নির্ভরশীল হতে বাধ্য করে, তা-ই হলো দুঃখ; যা-কিছু তোমাকে সেই নির্ভরতা থেকে মুক্ত করে, তাই প্রকৃত সুখ। সংক্ষেপে, এই হচ্ছে সুখ ও দুঃখের স্বরূপ; এই সত্যটি জেনে রাখ।'

বাহ্যবিষয়ের ওপর যেকোন নির্ভরতাই দুঃখদায়ক। আমরা এই দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। অবশ্য পরস্পরের প্রতি আস্থা থাকা দোষের নয়, বরং তা অভিপ্রেত, কারণ সেখানে প্রকৃত কোন নির্ভরতা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরকম একটা মনোভাব গড়ে তোলার ওপর জোর দিতে হবে যে, 'এটা ছাড়াও আমি চলতে পারব'। যিনি তা চলতে পারেন, অনন্যনির্ভর সেই ব্যক্তি নিজের ভিতর এমন আলোর সন্ধান পেয়েছেন যা সকল আলোর উৎস। সেই আলোর নির্ঝরটিই আত্মা, যাঁকে *মুণ্ডকোপনিষদ* (২.২.৯) *জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ,* 'সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি' রূপে বর্ণনা করেছেন। *কঠোপনিষদও* (২.২.১৫) বলেছেন,

তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি, 'একমাত্র তাঁর আলোকেই এই সমগ্র ব্যক্ত জগৎ উদ্ভাসিত'। সেই জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার একটু আলো আমি দেখেছি, তাই আমি সম্পূর্ণ তৃপ্ত। এই হচ্ছে ভাব। *ব্রহ্মভূতঃ,* 'যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন', বেদান্ত অনুযায়ী তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান (*মুণ্ডকোপনিষদ,* ৩.২.৯) ঃ *ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি,* 'ব্রহ্মজ্ঞানী অবশ্যই ব্রহ্মই হয়ে যান।' মানুষের অন্তর্জীবনে জানা এবং হওয়া সমার্থক। কিন্তু বাহ্য বা জাগতিক জীবনে তা সম্ভব নয়। একটি টেবিলকে জানলে আপনি কখনওই টেবিল হয়ে যান না; কিন্তু যখন আপনি নিজেকে পবিত্র ভাবেন, তখন আপনি পবিত্র হয়ে যান। যখন নিজেকে সংশয়াতীতভাবে জ্ঞানস্বরূপ বলে বোধ করেন, তখন আপনি জ্ঞানী। কারণ সেটিই আপনার প্রকৃত স্বরূপ। পবিত্রতার উপর বই লিখে আপনি পবিত্র হতে পারেন না; নিজের ভিতর সেই পবিত্রতাকে উপলব্ধি করতে হবে তবেই আপনি পবিত্র। *অন্তর্জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে, জানা আর হওয়া একই বস্তু।* কিন্তু বাহ্যজগতে তা হয় না। পরবর্তী শ্লোকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে ঃ

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

—'নির্দোষ, সংশয়রহিত, জিতেন্দ্রিয় ও সর্বজীবের কল্যাণে নিরত হয়ে ঋষিরা ব্রহ্মনির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করেন।'

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং ঋষয়ঃ, 'ঋষিরা *ব্রহ্মনির্বাণ,* ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব লাভ করেন।' কী ধরনের *ঋষি তাঁরা? ক্ষীণকল্মষাঃ,* 'যাঁদের পাপ ও দোষ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে'। একমাত্র এই অবস্থা হলে, তবেই আমরা স্বরূপের জ্ঞান লাভ করতে পারি। *ছিন্নদ্বৈধা,* 'যিনি দ্বৈতভাব অতিক্রম করে গেছেন।' অর্থাৎ ব্রহ্মে সমস্ত কিছুর একত্ব অনুভব করার পর যাঁর মধ্য থেকে ভেদভাব বা বহুত্বের ভাব দূর হয়ে গেছে। *যতাত্মানঃ,* 'যিনি জিতেন্দ্রিয়'। এবং বাহ্যদৃষ্টিতে *সর্বভূতহিতে রতাঃ,* 'সকল জীবের কল্যাণ ও সুখে যাঁর আগ্রহ'। কী অপূর্ব ভাব! যখন আপনার অন্তর্লোক এইসব মহৎগুণে সমৃদ্ধ হয়, তখন আপনার সমস্ত শক্তি অন্যের কল্যাণেই নিয়োজিত হয়, অন্যকে সুখী করার কাজেই ব্যয়িত হয়। কী করে মহাত্মা গান্ধী *মহাত্মা* হলেন? তার উত্তর এই, তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে উজাড় করে দিয়েছিলেন! আজ ভারতীয়দের মধ্যে যদি সামান্যভাবেও এই ভাব জাগে, তাহলে কী অশেষ

কল্যাণই না হবে! সেক্ষেত্রে একজন প্রশাসক নিজের উদ্দেশ্যেই বলবেন, 'লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে আছে; আমি তাঁদের সেবা করব। নানাভাবে গ্রামের মানুষদের দেখাশোনা করবার জন্য সরকার আমাকে নিযুক্ত করেছে। আমি তাঁদের মুখে হাসি ফোটাব'। কিন্তু একথা তিনি তখনই বলতে পারবেন বা কাজে পরিণত করতে পারবেন, যখন আধ্যাত্মিক দিক থেকে তার কিছুটা উন্নতি হবে। এই আধ্যাত্মিকতা কিছুটা বৃদ্ধি পেলে তবেই আমাদের উন্নয়ন-পরিকল্পনাগুলি সফল হবে। না হলে, যেমন দেখছি, পরিকল্পনাগুলি 'গরিবী হটাও' শ্লোগানেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। টাকার শ্রাদ্ধ, অথচ অগ্রগতি কিছুই হবে না।

অতএব, বুঝতে হবে এই উপদেশটি শুধুমাত্র মুনিঋষিদের জন্যই নয়। এটি আমাদের সকলের জন্য, যাতে আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে এক পা, দু-পা, তিন-পা করে অগ্রসর হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সুখী করতে পারি। অবশ্য একথা ঠিক যে, কিছু মানুষ এই পথে অনেকদূর এগিয়ে অতি উচ্চস্তরে উঠতে পারেন; এখানে বিশেষভাবে তাঁদেরই উল্লেখ করা হয়েছে। *লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ; ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ।* এঁরা সর্বদা লোক কল্যাণার্থে কর্ম করতে আগ্রহী, *সর্বভূতহিতে রতাঃ।* এই জাতীয় মানসিকতা থেকেই মহৎ চরিত্রের জন্ম হয়। গান্ধীজী এবং আরও কয়েকজন এই গোত্রের মানুষ। অবশ্য সারা ভারতবর্ষেই হাজার হাজার মানুষ ছড়িয়ে আছেন, যাঁরা অল্প-স্বল্প এই মনোভাবের অধিকারী। তাঁদের প্রকাশ্যে দেখা না গেলেও তাঁরা আছেন। সব সমাজেই তাঁরা থাকেন। কিন্তু এই ভাবটিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে গেলে আমাদের শিক্ষাপরিকল্পনাটি এমন ভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে সকলেই পূর্ণাঙ্গ মানব বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে পারে। এইটিই প্রকৃত শিক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দ একেই মানুষ তৈরির এবং জাতি গড়ার শিক্ষা ও ধর্ম বলেছেন। শিক্ষা সম্বন্ধে কী অপূর্ব ধারণা! সত্যি বলতে কি, এঁদের শিক্ষা ও বাণীর আলোকেই আমরা মানুষের জীবন সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারি, পারি দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, শোষণ দূর করে সমাজে সুবিচার স্থাপন করতে। কিন্তু কীভাবে এগুলি করা সম্ভব? এই রূপান্তর ঘটাবার রহস্যটা কী? রহস্যটি এই ঃ মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিস্রোত দুটি ধারায় প্রবাহিত—একটি প্রবাহ ঈশ্বরমুখী, অন্যটি মানবমুখী। যাঁরা সর্বভূতের কল্যাণে অর্থাৎ লোককল্যাণে রত আছেন, তাঁদের হৃদয়ের শক্তি প্রথমে ঈশ্বর অভিমুখীন হয়েছিল বলেই পরবর্তিকালে সেই শক্তিপ্রবাহই আবার মানবমুখী হতে পেরেছে। গীতা শক্তির দুটি ধারাকেই সমন্বিত করেছেন এবং

বলতে চাইছেন—ঈশ্বরমুখী শক্তিকেই মানবমুখী করে মানবসমাজের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে যাও। *সর্বভূতহিতেরতাঃ* তত্ত্বটির তাৎপর্য হলো এই। তাঁরা 'জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে সর্বজীবের কল্যাণ ও সুখের জন্য তথা লোকল্যাণ নিমিত্ত কর্ম করতে আগ্রহী'। পরবর্তী শ্লোকগুলিও অপূর্ব।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

—'কামক্রোধ বিমুক্ত, সুসংযত চিত্ত, আত্মজ্ঞানী যতীরা ইহলোকে ও পরলোকে পূর্ণমুক্তি লাভ করেন।'

কামক্রোধবিযুক্তানাং, 'যাঁরা কাম ও ক্রোধ হতে মুক্ত'; *যতীনাং,* 'যাঁরা আধ্যাত্মিকভাবে সংযত'; *যতচেতসাম্,* 'যাঁদের মন পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত'; এই ধরনের মানুষের কাছে, *অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে,* 'ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব একটি সংসিদ্ধ অভিজ্ঞতা'। এরকম মানুষকে এই ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য ধ্যানে বসতে হয় না। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, প্রশাসন, রাজনীতি অথবা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থেকেও চব্বিশ ঘণ্টা তিনি ব্রহ্মেই স্থিত। *বিদিতাত্মনাম্,* কারণ 'তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন'। অতএব, ইহলোকে, এখানে, এখনই তাঁদের জীবন সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা। *অভিতো* শব্দটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার যদি এরকম অবস্থা হয়, তাহলে একলাই থাকুন অথবা অন্যের সঙ্গেই থাকুন, ধ্যানই করুন অথবা কাজই করুন—সর্বদাই আপনি ব্রহ্মের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। *অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্,* অনন্ত আত্মা বা ব্রহ্মকে তিনি আপনার মধ্যে, আমার মধ্যে, আমাদের সকলের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন এবং এই কারণেই তিনি সকলের কল্যাণ ও সুখের জন্য কাজ করে যেতে পারেন। *গীতা* আমাদের সামনে কর্মের এই মহান আদর্শটিই তুলে ধরেছেন—সকলের হিতের জন্য, সকলের সুখের জন্য কর্ম কর। ধর্মপ্রচার আরম্ভের সময় ভগবান বুদ্ধও এই ভাবাদর্শ প্রচার করে বলেছিলেন : *বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়,* 'বহু মানুষের হিতার্থে, বহু মানুষের সুখার্থে'। *গীতা* এই আদর্শের ওপরই সব থেকে বেশি জোর দিয়েছেন। সকলের কল্যাণ চাই, একজনের বা একটি গোষ্ঠীর নয়। *সর্বভূতহিতে রতাঃ*-র মধ্যে এই ভাবটিই প্রকাশ পেয়েছে। এরপর দুটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের কথা বলেছেন। কারণ অন্তর্জগতের সমস্যাগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে একটু অন্তর্মুখী হওয়া প্রয়োজন।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

—'বাহ্যবিষয়াদির সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করে, দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে স্থির করে, নাসিকার মধ্যে *প্রাণ* ও *অপান* বায়ুর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করে, যিনি মোক্ষলাভকে পরম উদ্দেশ্য করেন এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূন্য হয়ে বিরাজ করেন, সেই ব্যক্তি সত্যই সর্বদা মুক্ত।'

এই দুটি শ্লোকে সংক্ষেপে ধ্যানের বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে। এই শ্লোকদুটি যেন *ধ্যানযোগ* নামক পরবর্তী অধ্যায়টির ভূমিকা। অর্থাৎ এখানে যা সংক্ষেপে বলা হয়েছে, পরবর্তী অধ্যায়ে তাই-ই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। *স্পর্শান্ কৃত্বা বহিঃ বাহ্যান্*, 'সকল বাহ্যবিষয়ের সংস্পর্শ থেকে মনকে নিরুদ্ধ করে'। অর্থাৎ ধ্যানে বসলে ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করবে না; তখন তাদের ছুটি, কারণ এই আন্তর জীবনে তাদের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তাদের উপযোগিতা বাহ্যজীবনে। সুতরাং, ধ্যানের সময় আমাদের প্রথম কাজই হলো ইন্দ্রিয়তন্ত্রগুলির কাছ থেকে বিদায় নেওয়া। তখন তারা আমার আর কোন কাজে লাগবে না, কারণ অন্তর্জগতের সত্য উন্মাটন করার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। তারা শুধু আপনার চারপাশের পরিবর্তনশীল জগৎকেই প্রকাশ করতে পারে। *চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ*, 'দৃষ্টি ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থির করে'। খুব প্রয়োজনীয় না হলেও, এখানে এটির উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ 'দুটি চোখ পরস্পরের কাছাকাছি এসে দুটি নাসারন্ধ্রের কেন্দ্রস্থলে মিলিত হয়'; এটি ধ্যানাবস্থার একটি লক্ষণ। সাধারণত, আমরা চোখ দুটিই বন্ধ করি। সেইটিই সব থেকে ভালো ব্যবস্থা, কারণ চোখ এমন ইন্দ্রিয় যা সর্বক্ষণ দৃষ্টিগোচর বিষয়গুলির দ্বারা উত্তেজিত হয়ে ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটায়। মনস্তাত্ত্বিকেরাও বলেন যে, ত্বকের স্পর্শের চেয়ে দৃষ্ট বস্তু মনকে অনেক বেশি বিক্ষিপ্ত করে। তাই, ধ্যানের প্রাথমিক সাধারণ কৌশলটি হলো চোখ বন্ধ করে দৃষ্টিকে নিজের ভিতর গুটিয়ে নেওয়া। তারপর *প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা*, 'শরীরে *প্রাণ* ও *অপান* বায়ুকে সমানভাবে প্রবাহিত করে'। *নাসাভ্যন্তরচারিণৌ*, 'নাসিকার ভিতর সঞ্চরমান'। শ্বাসপ্রশ্বাসের এই নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মনকে শান্ত করা যায়, এটিই তাৎপর্য। এরপর, *যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিঃ*, 'ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সুসংযত করে'; *মুনিঃ মোক্ষপরায়ণঃ*, 'মোক্ষের অভিলাষী সাধক বা মুনি'; 'আমি সামান্য

জীব হয়ে থাকতে চাই না', এরকম একটা মনোভাব নিয়ে ধ্যানাভ্যাসে রত হচ্ছেন। *বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো,* 'যিনি ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেছেন।' এই তিনটি আবেগ এতোই প্রবল যে, এগুলি যে-কারো জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে ও অন্য অনেকের জীবনে দুঃখ ডেকে আনতে পারে। এই তিনটি আবেগকে *গীতা* এখানে একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। *বিগত* অর্থাৎ 'বর্জিত' বা ভয়ঙ্কর এই তিনটি আবেগ থেকে মুক্ত। *যঃ সদা মুক্ত এব সঃ,* 'এই ধরনের মানুষ আধ্যাত্মিক দিক থেকে সদামুক্ত'।

এইভাবেই ধ্যানের মাধ্যমে আমাদের অন্তর্জগতের বিকাশ হয় এবং সেই বিকাশের ফলে আমরা এমন এক অনাস্বাদিত মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করি, যা বাহ্য জাগতিক জীবনের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয়। এই ধ্যানের সুফল প্রতি পদক্ষেপে আমাদের বাহ্যজীবনে প্রতিফলিত হবে, তার ছাপ পড়বে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর, আমাদের আচার ও আচরণে। যতই ধ্যানের গভীরে প্রবেশ করব, ততই আমাদের বাহ্যজীবন, বাহ্যকর্ম ও পারস্পরিক বাহ্য সম্পর্ক উন্নততর হবে। এই জন্য, যিনি যোগী বা মুনি, তিনি ধ্যানের অভ্যাস করে নিজেকে সংযত করেছেন এবং তাই 'তিনি সদামুক্ত'। *সদামুক্ত এব সঃ,* 'তিনি সদামুক্ত'। এটি একটি আদর্শ। এর থেকে আমরা এখন অনেক দূরে। কিন্তু আমরা এই পথ অবলম্বন করে একপা, দুপা, তিনপা করে যথাসাধ্য এগোতে তো পারি। এটি কঠিন কাজ সন্দেহ নেই, তবে অসাধ্য নয়। ধ্যানের সমস্যাগুলি নিয়ে অর্থাৎ ধ্যান করা কত কঠিন, ইত্যাদি নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা হবে। আমাদের হয়ে অর্জুন প্রশ্ন করবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সেসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের একটি শহরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এই ধ্যানের বিষয়ে একটি অসাধারণ কথা বলেছিলেন। (Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.5, p.253) ঃ

"ধ্যান হচ্ছে একটা বিশেষ অবস্থা। ধ্যান কর! ধ্যানই সর্বোচ্চ সাধনা। আধ্যাত্মিক জীবনের একেবারে কাছাকাছি আসা—যখন মন থাকে ধ্যানস্থ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের এ এমন এক বিশেষ মুহূর্ত যখন আমরা কোনভাবেই ঐহিক বস্তুজগতের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকি না—আত্মা তখন একেবারেই আত্মগত, সবরকমের জড়ত্ব থেকে মুক্ত—আত্মার সঙ্গে এ এক অভাবনীয় সান্নিধ্যের অনুভূতি!"

এবার আমরা পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ অর্থাৎ ২৯তম শ্লোকে আসছি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্লোকটি এই ঃ

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

—'আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ফলদানের কর্তা ও ফলভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর ও সর্বজীবের সুহৃদ বলে যিনি জানেন, তিনি শান্তিলাভ করেন।'

অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি এই সম্বন্ধে বলেছেন। *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং,* 'যতরকম যজ্ঞ ও তপস্যা হয়, তার ফলভোক্তা ও ফলদাতা' হিসাবে আমাকে জানো। তাৎপর্য এই, এগুলি শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই, সেই পরম সত্যের কাছেই পৌঁছয়। *সর্বলোকমহেশ্বরম্,* 'সমগ্র বিশ্বের প্রভু', তিনি এই বিশ্বের ধারক, এক ও অদ্বিতীয় অনন্ত দিব্যসত্তা। তাঁর তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি *সুহৃদং সর্বভূতানাং,* 'সর্বজীবের বন্ধু'। ঈশ্বরকে এখানে সকলের সুহৃদ বলা হয়েছে। তাঁকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। ভারতীয় ধর্ম থেকে ভয়ের ভগবান বহু যুগ আগেই বিদায় নিয়েছিলেন। তার পরিবর্তে আবির্ভূত হলেন প্রেমিক ঈশ্বর। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, 'আমি সকলের সুহৃদ'। আমাকে এইভাবে উপলব্ধি করলে মানুষ শান্তিলাভ করে। এইটিই সর্বশেষ পংক্তি।

এটি অতি সুন্দর শ্লোক যার উপজীব্য ভক্তি বা বিশুদ্ধ প্রেম। কার প্রতি ভক্তি? বেদান্তের সগুণ-নির্গুণ ঈশ্বরের সগুণ ভাবের প্রতি *ভক্তি।* সপ্তম ও অন্যান্য অধ্যায়ে এই ভক্তির বিষয়ই আলোচিত হবে। এখানে কেবল তার একটু ভূমিকা করে বলা হয়েছে, 'আমাকে সকল জীবের সুহৃদ বলে জানো'। কী চমৎকার ভাব! কী আশ্বাসের কথা! আমাদের সীমিত শক্তি, সীমিত ক্ষমতা, কিন্তু এক অসীম শক্তি আমাদের পিছনে আছেন। ইচ্ছে করলে আমরা সবসময় সেই অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার থেকে শক্তিলাভ করতে পারি। যেমন ধরুন, একটি ছোট ব্যাঙ্ক। যদি অনেক লোক একসঙ্গে টাকা তুলতে আসে, তবে ব্যাঙ্কটি লাটে উঠবে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি পিছনে থাকে, তবে সেই ব্যাঙ্কের কোন ভয় নেই। ঠিক তেমনই, আমাদের মনুষ্যজীবনের শত দুর্বলতা সত্ত্বেও যদি আমার প্রবল বিশ্বাস থাকে যে, এই বিশ্বের পশ্চাতে এক অনন্ত সত্য আছেন, তিনি আমার পিছনেও আছেন এবং তিনিই আমার নিকটতম বন্ধু, আমার অন্তরাত্মা, আমাকে সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত, তবে আমরা মানসিক অশান্তি থেকে মুক্ত থাকব ও শান্তি পাব।

আজকের এই মানসিক অশান্তির জগতে, ঈশ্বরকে আমাদের একান্ত

প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের এক লেখক বলেছেন, 'ঈশ্বর বলে যদি কেউ নাও থাকেন, তবে একজন ঈশ্বরকে উদ্ভাবন করতে হবে।' বাস্তবিক, আজ তাঁকে আমাদের বড় প্রয়োজন। ঈশ্বরের প্রতি প্রবল বিশ্বাস রাখুন, কিন্তু এখানে তাঁকে উদ্ভাবন করবার প্রয়োজন নেই। আমাদের দর্শন বলে যে এই পরিবর্তনশীল জগতের পশ্চাতে একটি অপরিবর্তনীয় সত্য আছে। এটি একটি *বস্তু,* একটি সত্য। তিনি আমাদের আত্মা, সর্বজীবের আত্মা। সেইটিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। *তত্ত্বমসি, তত্ত্বমসি*-র এই হলো অর্থ। তুমিই সেই। এই সত্যটি এখন আরও অনেক বৈজ্ঞানিকের মনে উদিত হচ্ছে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদরা এখন অনুভব করছেন যে, চৈতন্যের মতো আত্যন্তিক ও নিত্য সত্তা ছাড়া এই বিশ্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আধুনিক চিন্তায় এই ধারাটি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। বেদান্ত যাঁকে *সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা,* অর্থাৎ সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ অনন্ত আত্মা বা ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করেছে, এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের সেই সত্যের দিকেই নিয়ে যাবে। আমরা যে আনন্দই পাই না কেন, তা ব্রহ্মানন্দের এক কণামাত্র। সেই ব্রহ্মানন্দের কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। অতএব, আমরা এই দিব্যজীবনের অংশীদার হয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারি, উন্নত থেকে উন্নততর হতে পারি।

অতএব, আজকের প্রবণতা কী করে অন্তর্জীবনের গুণগত মান বাড়ানো যায়। আজ এই দিকটির ওপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এতদিন পরিমাণগত উৎকর্ষই ছিল আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও শিল্প সভ্যতার ধ্যানজ্ঞান। এখন পাশ্চাত্যের মনীষীরা গুণগত উৎকর্ষলাভের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। আপনার জীবনের গুণগত মানটি কী? আপনি কি শান্তিতে আছেন? আপনি কি সুখী? আপনি কি অপরের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ, মনকষাকষি না করে থাকতে পারছেন? জীবন সম্পর্কে এই গুণগত মানের প্রসঙ্গটি উত্তরোত্তর বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু এই গুণগত দিকটি আসে কোথা থেকে ? আসে জগতের পিছনে যে এক দিব্য সত্তা আছেন, এক সগুণ ঈশ্বরসত্তা বা দিব্য পুরুষ আছেন, এই বিশ্বাস থেকে; এবং যেহেতু আপনি মানুষ, এই ঈশ্বর আপনার কাছে ব্যক্তিরূপেই প্রকাশিত হন ও আপনার ডাকে সাড়া দেন। দর্শনে আমরা *চরম* সত্যের কথা বলি। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে বলি *অন্তরঙ্গ* সত্যের কথা। প্রথমটি পরম, শেষেরটি অন্তরঙ্গ। *ভক্তির* প্রভাবে পরম সত্য বা ব্রহ্ম আমাদের কাছের ভগবান হয়ে যান। তিনি আমাদের সঙ্গে অভিন্ন। তিনি দূরে নেই। তিনি এখানেই, আমাদের সকলের অতি নিকটে।

উপনিষদে হেঁয়ালি করে বা আপাতবিরুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে বলা হয়েছে— ঈশ্বর অনেক দূরে, আবার তিনি কাছেও; তিনি নিকট হতে নিকটতম; তিনি অণুর থেকেও ছোট, আবার তিনিই বৃহত্তম। আসলে, যে পরম সত্তা দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে, তাঁর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, দূর অথবা নিকট ইত্যাদি কোন শব্দই খাটে না; এই শব্দগুলি শুধু দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আমাদের পরিচিত যে জগৎ, তার সম্পর্কেই ব্যবহার করা চলে। পরমেশ্বর বা আত্মা দেশ-কালগত সীমার অতীত তত্ত্ব। তিনি অনন্ত, অবিনশ্বর। ঐটিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। আমাদের আত্মার আত্মা তিনি। সুতো যেমন বহু ফুল মালায় ধরে রাখে, তিনিও তেমনি আমাদের সকলের মধ্যে থেকে সকলকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছেন। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এই ভাষা ব্যবহার করে বলেছেন যে, তিনিই সেই সূত্র যা সকল জীবকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে। সূত্রটিকে যত নিবিড়ভাবে স্পর্শ করবেন, আপনি তত বেশি দৃঢ়, শক্তিশালী ও শান্তিতে ভরপুর হয়ে যাবেন। *ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব;* 'বহু মুক্তা যেমন একটি মালায় গাঁথা থাকে, তেমনি সমস্ত বিশ্ব আমাতে সূত্রবদ্ধ।' মুক্তাগুলি আলাদা, কিন্তু সুতো থাকায় তারা ঐক্যবদ্ধ একটি মালায় পরিণত হয়। আমাদের সকলের ভিতর সেই দিব্যসূত্রটি হলেন আত্মা।

এই পরম সত্যের ওপর ভিত্তি করেই এই পঞ্চম অধ্যায়ে সাম্যভাবের আলোচনা করা হয়েছে। আমরা সকলেই সমান। ব্রহ্মে দুই নেই, আমরাও তাই এক। আমার ও আপনার মধ্যে, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্নের মধ্যে ব্রহ্ম সমানভাবে বিরাজ করছেন; কোথাও তিনি বেশি আছেন বা কোথাও কম আছেন, তা নয়। তিনি এমন একক যাঁর ভগ্নাংশ হয় না। এই কারণেই, মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির মহান আদর্শ হচ্ছে একত্ব, অর্থাৎ প্রতিটি জীবের মধ্যে একই ঈশ্বরের পূর্ণরূপ দর্শন করা। এই ভাবটি আমরা ১৮ ও ১৯ নম্বর শ্লোকে পেয়েছি। সেখানে *সমম্* ও *সমত্ব,* সমতা ও একতার কথা বলা হয়েছে। আমরা সব এক। ইন্দ্রিয়ের রাজত্বেই যত কিছু পার্থক্য। কিন্তু হৃদয়ের গভীরে ডুব দিলে একত্বই আপনার চোখে পড়বে। ঐ চেতনার মধ্যেই নিশিদিন বাস করুন। এই ভাবটিই শ্রীকৃষ্ণ আবার ঈশ্বররূপে, সকলের বন্ধুরূপে এখানে তুলে ধরেছেন। তিনিই আমাদের অন্তরাত্মা, অন্য যে-কোন বস্তুর থেকে আমাদের নিকটতম। *কোরাণ*-এ এক জায়গায় পয়গম্বর মহম্মদ বলছেন, 'তোমার গলায় শিরাগুলির থেকেও ঈশ্বর তোমার নিকটে'। এতই কাছে রয়েছেন তিনি। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই

হচ্ছে মহান দর্শন ও ধর্মগুলির ধারণা। পঞ্চম অধ্যায়ের সমস্ত শিক্ষাটি তাই শেষ করা হচ্ছে এই অসাধারণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঃ

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

ইতি সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

'সন্ন্যাসযোগনামক পঞ্চম অধ্যায়ের এখানেই সমাপ্তি।'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

ধ্যান-সম্পর্কীয় যোগ

এই ষষ্ঠ অধ্যায়টির নাম দেওয়া হয়েছে *ধ্যানযোগ* অর্থাৎ ধ্যান-সম্পর্কিত যোগটিই এখানকার আলোচ্য বিষয়। আধ্যাত্মিক জীবনে *সমত্ব*, বা সাম্যবোধ লাভের জন্য বিশেষ অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। এই ধরনের অনুশীলনের একটি হলো ধ্যান, অন্যটি হলো সমন্বয় বা সহযোগিতার ভাব নিয়ে সকলের সঙ্গে কাজ করে যাওয়া। অনুশীলনের তৃতীয়টি হলো অন্তর্জীবন, যার সাহায্যে আপনি মানসিক শক্তিগুলিকে সংযত করে, হৃদয়ে নিহিত দিব্যতার সান্নিধ্য উপলব্ধি করার উপযুক্ত করে মনকে গড়ে তুলতে পারেন। অন্তর্ভেদী মননের সামর্থ্যের ওপরই ধ্যান নির্ভর করে। তাই, এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের সূচনাতেই আমরা আধ্যাত্মিক জীবন সংক্রান্ত কয়েকটি শ্লোক পাচ্ছি এবং তার পরেই কয়েকটি সুন্দর শ্লোকে ধ্যানের কৌশল ব্যাখ্যা করা হবে। প্রারম্ভিক শ্লোকে বলা হচ্ছে ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

—'কর্মফলের ওপর নির্ভর না করে যে ব্যক্তি কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি (যথার্থ) কর্মত্যাগী এবং দৃঢ়চিত্ত; যিনি অগ্নি স্পর্শ করেন না, তিনি নন, বা যিনি কর্ম করেন না, তিনিও নন।'

এই প্রথম শ্লোকটিতেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বলছেন, 'কে *যোগী*, কে যথার্থ *সন্ন্যাসী* বা ত্যাগী'। তিনি নিজেই এই প্রশ্ন তুলে নিজেই তার উত্তর দিচ্ছেন ঃ *অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ*, 'যিনি নিজের জন্য কোন কর্মফলের প্রত্যাশা না করে, কর্তব্য কর্ম করে যান'—এই হলো দৃষ্টিভঙ্গি। গীতার সমগ্র শিক্ষার ভিত্তিই এই *অনাসক্তি*—কর্মফলের উপর নির্ভর

করো না; তা সকলের প্রাপ্য, শুধু তোমার নয়। অতএব, *অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ,* এই বাণীর তাৎপর্য হলো ঃ নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে কর্তব্যকর্ম পালন করুন। সেখানে ক্ষুদ্র 'আমি'কে আর দেখা যাবে না। বিরাট 'আমি', সকলকে অঙ্গীভূত করে যে আমি, তা-ই ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। কাজেই, এই অবস্থায় আমাদের কর্মফল আমরা অনায়াসেই ত্যাগ করতে পারি—'এরপর আর আমাদের কর্মফলের প্রয়োজন নেই'। *অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ, স সন্ন্যাসী চ যোগী চ,* যাঁর এইরকম মনোভাব, 'সেই ব্যক্তিই যথার্থ *সন্ন্যাসী,* যথার্থ *যোগী,* যথার্থ ত্যাগী পুরুষ, সত্যই একজন যোগসিদ্ধ পুরুষ'; *ন নিরগ্নিঃ ন চাক্রিয়ঃ,* 'যাঁরা কেবল আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তাঁরা নন।' *নিরগ্নিঃ* কথাটির অর্থ, 'যিনি অগ্নিকুণ্ডে নিজের আহার্য প্রস্তুত করেন না', গৃহস্থরা যজ্ঞের জন্য আগুন জ্বালান, আবার রান্নাবান্নার কাজেও আগুন ব্যবহার করেন। *সন্ন্যাসী* কিন্তু নিজের জন্য রাঁধেন না, ভিক্ষা করে যা পান, তাতেই তিনি পরিতুষ্ট থাকেন। তাই সংস্কৃত ভাষায় তাঁকে *নিরগ্নিঃ* বলা হয়। কিন্তু কেবল *নিরগ্নিঃ* হলেই যে কেউ সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন, তা নয়; *ন চাক্রিয়ঃ,* 'যিনি কর্ম করেন না, তিনিও নন।' যিনি ফলের প্রতি অনাসক্ত হয়ে কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই যথার্থ *সন্ন্যাসী*।

কেন আমরা কর্মানুষ্ঠান করে থাকি? এর কারণ হলো আমাদের অপূর্ণ কামনা-বাসনা; তাই কর্মানুষ্ঠান আমাদের করতেই হয়, কামনাই আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে। যখন আপনার কামনা-বাসনা থাকবে না, তখন আপনার কর্মও থাকবে না। এই কারণে, কর্মত্যাগকে উচ্চ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের একটি বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়। কিন্তু কর্মত্যাগ আদৌ উচ্চ আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ নয়। অতএব, কর্মত্যাগ করেই আপনি যথার্থ *যোগী* বা *সন্ন্যাসী* হতে পারেন না। *ন নিরগ্নিঃ ন চাক্রিয়ঃ। ক্রিয়ঃ* কথার অর্থ 'কর্ম'। কর্মে উৎসাহ দেয় বাসনা; প্রথমে বাসনা, তারপর উদ্দীপনা এবং তারপর কর্ম।

মনোবিজ্ঞানে আপনারা পড়ে থাকেন যে, প্রথমে আপনার মনে কোন বাসনা জাগে। তা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠে উদ্দীপনায় পরিণত হয় এবং ঐ উদ্দীপনাই আপনাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। পরিশেষে আপনি কর্মের ফল লাভ করেন। তখন হয়তো ঐ বাসনাটি চলে গিয়ে তার জায়গায় আর একটি নতুন বাসনার জন্ম হয়। এইভাবে দেখা গেছে সকল কর্মেরই মূল হলো বাসনা। *মনুস্মৃতি* এ সম্পর্কে বলেছেন (২.৪) ঃ

অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্ যদ্ হি কুরুতে কিঞ্চিৎ তৎ তৎ কামস্য চেষ্টিতম্ ॥

—'যিনি বাসনাহীন, তাঁর কোন কর্ম নেই; মানুষ যা-কিছু কর্ম করে, তা তার পূর্ব বাসনার ফল।'

নির্বাসনা দু-রকমের হয়। একটি হলো মূঢ়, অলস ব্যক্তির নির্বাসনা, যার কোন বিশেষ ইচ্ছা থাকে না এবং অন্যটি হলো, যাঁরা সকল দ্বৈতভাবকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করেছেন, তাঁদের নির্বাসনা। অধিকাংশ সমাজেই, বিশেষত ভারতবর্ষে, বাসনাশূন্যতাকে কোন মহৎ গুণ বলা যায় না। আমরা চাই সাধারণ মানুষের কিছু বাসনা থাক। 'কেন আমি অপরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করব? আমি জীবনকে সুন্দর, আরও সুন্দর করে তুলতে চাই'—এইরকম একটা বাসনা অবশ্যই থাকা চাই। এই ইচ্ছা থেকেই লোকের মধ্যে শিক্ষা আসবে, গড়ে উঠবে উন্নততর পরিবেশ। তা না হলে এসব কিছুই হবে না। অতএব আমরা ভারতীয়দের মধ্যে একটা বাসনা জাগিয়ে তুলতে চাই—এক উন্নততর জীবনের বাসনা, যে-জীবনে সুস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, সুশিক্ষা, জনসেবা ও ধর্মজীবনের স্থান থাকবে। অতএব, জনসাধারণের মধ্যে এইসব সদিচ্ছা জাগিয়ে তুলতে হবে। যে-ধরনের নির্বাসনা সচরাচর এদেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, তা উচ্চপর্যায়ের নয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান হলে, ঈশ্বরকে জানলে, যে নির্বাসনা আসে সেটিই যথার্থ নির্বাসনা, উচ্চাঙ্গের নির্বাসনা। তখন আর আপনার কিছুই চাইবার থাকবে না; মনও বাইরের দিকে ছোটাছুটি করবে না। আর মন যদি কখনও বহির্মুখী হয়ও, তা কেবল অন্যের মঙ্গল কামনায়, অন্যকে সাহায্য করার জন্য—অন্য কোন কারণে নয়। গীতার বিভিন্ন জায়গায় এই ভাব ফুটে উঠেছে (৫.২৫, ১২.৪)—*সর্বভূতহিতেরতাঃ*, 'সর্বদাই সকলের সুখ ও কল্যাণে নিরত'। এই হলো শ্রেষ্ঠ নির্বাসনা। আমরা চাই মানুষের মধ্যে কিছু বাসনা থাকুক যাতে সে নৈরাশ্যপূর্ণ ও পূতিগন্ধময় জীবনে আবদ্ধ না থেকে, জীবনকে ক্রমশ উন্নত করতে উদ্বুদ্ধ হয়। অতএব, উন্নতির জন্য কিছুটা বাসনা পোষণ করুন। আমাদের জনসাধারণের মধ্যে আজ এই বাসনার সঞ্চার করতে হবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি হলে ঐ বাসনাই আবার নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। ঐ অবস্থাটিকে আমরা বলি *অকামঃ*, সম্পূর্ণ কামরহিত। অতএব, এই *অকামঃ* অবস্থার দুটি ভিন্ন মাত্রা আছে। একটি হলো সাধারণ মাত্রা, যা অজ্ঞতা, মোহ এবং আলস্যে পূর্ণ এবং অন্যটি হলো *সাত্ত্বিক*

অকামঃ, যা সকল প্রকার কামনা-বাসনার অতীত, কারণ তখন আত্মোপলব্ধি হয়েছে, আপনার ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়ে গেছে। আপনার আর কী চাই? ঈশ্বরের সঙ্গে আর কোন্ জিনিসের তুলনা হতে পারে? ঈশ্বরকে পেলে অন্য সবকিছুই অবান্তর হয়ে পড়ে, সব কিছুই আলুনি লাগে। খ্রিস্টীয়, সুফী, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মরমী সাধকদের বহু উক্তিতে একটি ভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা বলেন, 'আমি এই জগতের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটি অর্থাৎ ঈশ্বরকে লাভ করেছি। আমি আর অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করি না।' এটিই হলো নির্বাসনার অবস্থা। তবু যেটুকু বাসনা এইসব মহাভাগ্যবান ব্যক্তির অন্তরে অবশিষ্ট থাকে, তা হলো কেবল মানুষকে সেবা করার বাসনা, মানুষের জীবনকে উন্নত থেকে উন্নততর করে তোলার বাসনা। সকল মহৎ ব্যক্তিই এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

এই ভাবেরই অনুরণন চলেছে পরবর্তী শ্লোকে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঃ

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

—'হে পাণ্ডব, তুমি জেনো—যাকে সন্ন্যাস বলা হয়, তা বস্তুতপক্ষে কর্মযোগের প্রতি অনুরাগ, কারণ, সংকল্প ত্যাগ না করলে কেউই কর্মযোগী হতে পারে না।'

'যাকে *সন্ন্যাস* বলা হয়, তাকেই *যোগ* বলা হয়'। *যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।* শুধু এটা ওটা ত্যাগ করলেই *সন্ন্যাস* হয় না। যথার্থ *সন্ন্যাস* এবং যথার্থ *যোগ* এক এবং অভিন্ন। *হি অসংন্যস্ত সংকল্পো,* 'যদি আপনি *সংকল্প* ত্যাগ না করেন'; *ন যোগী ভবতি কশ্চন,* তবে 'আপনি *যোগী* অথবা *সন্ন্যাসী* হতে পারবেন না'। *সংকল্প* হলো বহির্মুখী বাসনা, 'আমার এটা চাই, আমার ওটা চাই', ইত্যাদি ভাব। এর অন্ত নেই—একেই আমি আগে আধুনিক সভ্যতার 'ভোগবাদী বাতিক' বলে উল্লেখ করেছি। মন নিরন্তর জপে চলেছে, 'আমার এটা চাই, আমার ওটা চাই'। একেই *সংকল্প* বলা হয়। এটিই সব বাসনার মূল। এই সংকল্প থেকেই সব কামনা বাসনার উৎপত্তি। মহাভারতে (Critical Edition ঃ শান্তিপর্ব, ১৭১.২৫) একটি চমৎকার কাহিনী আছে, যার শেষে, ঐ কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্রটি বলছেন,

কাম! জানামি তে মূলং সংকল্পাৎ কিল জায়সে।
ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি সমূলো ন ভবিষ্যসি ॥

—'হায়, এখন আমি বুঝেছি। হে বাসনা, *সংকল্প* থেকেই তোমার জন্ম। আমি আর কোন *সংকল্প* করব না; তাহলে তুমিও আর কাছে এসে আমাকে কষ্ট দেবে না।'

অতএব, সংকল্প থেকেই বাসনা এবং বাসনা থেকেই নানাবিধ সামাজিক কর্ম ও মোহগ্রস্থ জীবনের উদ্ভব, যে জীবনের চিত্র জার্মান কবি এবং নাট্যকার গ্যেটে তাঁর The Faust গ্রন্থে এই ভাবে তুলে ধরেছেন—'বাসনার ফলেই আমি হঠাৎ একদিন ভোগের বস্তু পেয়ে যাই এবং ভোগে নিমজ্জিত হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ি ঐ বাসনারই ফলে।'

অতএব, যখনই আমাদের মন এই সব সংকল্পে পূর্ণ হয়ে থাকে, তখন আর আমরা তাদের বশে রাখতে পারি না, তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, আমরা তাদের দাসে পরিণত হই এবং তারাও আমাদের এদিক সেদিক টেনে নিয়ে যায়। কিছু পেলে, আপনি আরও বেশি চান; যখন তা পান না, তখনই আপনার মনে অতৃপ্তিবোধ জেগে ওঠে। এইভাবে অনবরত ভোগ্যবস্তুর পিছনে ছুটে, বাসনার মাধ্যমে সংকল্প প্রকাশ করে এবং বাসনা তাড়িত হয়ে কর্ম করে মানুষ কখনওই পূর্ণতালাভ করতে পারে না, কখনওই চিরতৃপ্ত হতে পারে না। আনন্দে বাঁচার একমাত্র পথ হলো অন্তত কিছুটা শক্তিকে উচ্চতর কোন লক্ষ্যের দিকে সঞ্চালিত করা। এই উচ্চতর লক্ষ্যটি হলো মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ, যে বিষয়ে আজ বহু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী গ্রন্থ রচনা করছেন। এই সব গ্রন্থে মানুষের জীবন ও সভ্যতাকে অধ্যাত্ম রঙে রাঙানোর প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।

সুতরাং, *ন হ্যসংন্যস্ত সংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন, 'সংকল্প* ত্যাগ না করলে আপনি *যোগী* হতে পারবেন না।' এই সংকল্প-ত্যাগ অথবা সন্ন্যাসই যোগীকে যোগী করে তোলে। সংকল্পকেই নিয়ন্ত্রিত এবং সংযত করতে হবে। তাই ভাবতে হবে, কীভাবে আজকের এই ভোগবাদী সভ্যতাকে বিপথে চলা থেকে নিবৃত্ত করা যায়। এই জড়বস্তু ভোগের বীভৎস তৃষ্ণাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এ কাজ তখনই করা সম্ভব যখন আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনের পার্থক্যটি আমরা বুঝব। প্রয়োজন আপনি মেটান ক্ষতি নেই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদার রাশ টানুন, কারণ চাহিদার অন্ত নেই। এই মহৎ শিক্ষাটি আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনগুলি কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু প্রয়োজন এবং চাহিদার এই পার্থক্য আমরা ভুলে গেছি। এখন সব কিছুই আমাদের 'চাহিদার'

পর্যায়ভুক্ত এবং সব চাহিদাই কালে 'প্রয়োজনের' রূপ নিচ্ছে। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বহুবিধ সমস্যার। যযাতি-র কথা আমি আগেই বলেছি। তিনি ভোগের কুফলটি বুঝতে পেরেছিলেন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, পৌরাণিক যুগে, তিনি ভারতবর্ষের এক মহান রাজা ছিলেন। ভোগসুখের সুদীর্ঘ জীবন পূর্ণ উপভোগ করার পর তিনি এই বিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করলে একদিন তাঁর কাছে এই সত্যটি প্রতিভাত হলো (শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৯/১৯/১৪) ঃ

ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এব অভিবর্ধতে ॥

—'বাসনা চরিতার্থ করে বাসনার নিবৃত্তি হয় না; যেমন (আগুন নেভাতে) আগুনে ঘৃতাহুতি দিলে তা আরও বেশি জ্বলে ওঠে।' এই ছিল, যযাতির ভাষা।

আগেই বলেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই যুক্তরাষ্ট্রের 'সাম্প্রতিক' অর্থনৈতিক প্রবণতা পর্যালোচনার জন্য যে 'হুভার কমিটি কমিশন' গঠিত হয়, তার রিপোর্টে এই কথাটি রয়েছে ঃ

'এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, মানুষের বাসনা অন্তহীন, এমন কোন বাসনা নেই, যা পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাসনার সৃষ্টি করে না।'

অতএব, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই অন্তহীন বাসনাগুলি বেড়েই চলে এবং তাদের পিছনে ক্রমাগত ছুটে আমাদের জীবন হালকা ও দুর্বল হয়ে পড়ে। আমাদের অবস্থা গল্পের সেই গাধার মতো, যে গাধাটি তেলকলে ক্রমাগত ঘানি ঘুরিয়ে চলে। একটা গাজরের টুকরো তার সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং সেটা তার নাগালের মধ্যে মনে করে গাধাটি ক্রমাগত সেটি ধরার চেষ্টা করে। এর ফলে গাধাটি চলতেই থাকে এবং তেলকলের মালিক এভাবে গাধাটিকে কাজে লাগিয়ে তার কাজ হাসিল করে। কিন্তু গাধাটি কী পায়? কিছুই না! মানুষের জীবনও কখনও কখনও এইরকম হয়ে পড়ে। আজ এটা, কাল সেটা, এইভাবে ঘুরে মরে দিন দিন মানুষ মনুষ্যত্ব খুইয়ে বসে। এই হলো ভোগবাদী বাতিকের ফল। কিন্তু কীভাবে এই প্রবৃত্তিকে সংযত করা যায়? কীভাবে তার মোড় ফিরিয়ে, তাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা যায়? আধুনিক সভ্যতায় মানুষের সমস্যা সম্পর্কে যে সব আলাপ-আলোচনা চলছে, এই প্রশ্নটি রয়েছে তাদের কেন্দ্রে।

বহুযুগ আগেই কিন্তু বেদান্ত এই বিষয়টি পর্যালোচনা করে এ সম্পর্কে

আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন। তাতে একথা কখনওই বলা হয়নি 'ভোগ কোরো না'; কখনওই বলা হয়নি, 'তোমার প্রয়োজন মিটিও না'। সেখানে বলা হয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে আপনাকে অবশ্যই সংযত হতে হবে, ভোগেচ্ছার রাশ টেনে ধরতে হবে। সংযমের কথা বোঝাতে *নিবৃত্তি* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে; অন্যদিকে কোন কিছুর পেছনে ছোটাকে বলা হয়েছে *প্রবৃত্তি*। এই অন্তহীন *প্রবৃত্তির* খেপামিকে সংযত রাখার নাম *নিবৃত্তি* বা 'প্রত্যাহার'—অর্থাৎ 'আমার এতে কোন প্রয়োজন নেই, একে বাদ দিয়েও আমার জীবন চলতে পারে', এমন একটা মনোভাব। কেবল মননশীল ব্যক্তিরাই এইরকম একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, কারণ অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জীবনের আলোর আভাস তাঁরা দেখতে পান। কিন্তু দূরদর্শন প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলিই আজ আমাদের মগজ এমন বিগড়ে দিচ্ছে যে, একটি বিজ্ঞাপন দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মনে হতে থাকে যে সেই বিজ্ঞাপিত বস্তুটি আপনার চাই। এইভাবে কৃত্রিমভাবে আপনার মনে চাহিদার *সৃষ্টি* করা হয়। বর্তমানে আমেরিকার বেশ কিছু লেখক এই অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ—বিজ্ঞাপনদাতারা মানুষের মনে চাপ সৃষ্টি করে তাঁদের তৈরি ভোগ্যপণ্য কিনতে বাধ্য করছেন। এই বিজ্ঞাপন জিনিসপত্রের দামও বাড়িয়ে দিচ্ছে, কারণ ঐ জিনিসপত্রের দামের সঙ্গে তাঁরা বিজ্ঞাপনের খরচটিও জুড়ে দিচ্ছেন। প্রকারান্তরে এইসব বিজ্ঞাপনের খরচ আপনাকে এবং আমাকেই দিতে হচ্ছে। সাধারণত আমরা এসব ভেতরের ব্যাপারস্যাপার জানি না। কিন্তু ধীরে ধীরে আপনি বুঝবেন যে এইটিই পরিস্থিতি ঃ সভ্যতা যত জটিল হচ্ছে, ততই মানুষ নিজের পছন্দ ও প্রয়োজন স্থির করার স্বাধীনতা হারাচ্ছেন। আপনি কী সিদ্ধান্ত নেবেন, তা বিজ্ঞাপনদাতারাই আপনার হয়ে ঠিক করে দিচ্ছেন! ভাবুন দেখি কাণ্ডটা! এই হলো ভোগবাদী সমাজের সমস্যা, যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাদের। তাহলে এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যাবে কী করে?

তার উত্তরে বলা যায়, আমাদের প্রয়োজন এমন এক দর্শন, যা মানুষকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় উপভোগকারী জীব হিসাবেই গণ্য করে না; সঙ্গীত, শিল্প, নৈতিক মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি উচ্চতর মূল্যবোধগুলিও যে মানবিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সে কথাও সে মনে রাখে। এগুলি আয়ত্ত করার সব সম্ভাবনাই আমাদের মধ্যে রয়েছে। তাই বলছি, এগুলিকে অবহেলা করবেন না। শুধুমাত্র দৈহিক স্তরে, ইন্দ্রিয়ভোগের স্তরে মত্ত হলেই চলবে না। তা যদি হন, তার জন্য আপনাকে কষ্ট পেতে হবে। জগতের মহান দর্শন এবং ধর্মগুলি

থেকে এই সৎশিক্ষা আমাদের পেতে হবে। সুখের কথা, এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ ক্রমশ এই বৈদান্তিক চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

পরবর্তী শ্লোকে আমরা আর একটি সুন্দর চিন্তার মুখোমুখি হচ্ছি ঃ

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে ।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

—'মনঃসংযোগের জন্য চিত্তশুদ্ধিলাভে আগ্রহী ধ্যানযোগীর পক্ষে কর্মই পথ বলে কথিত হয়। যিনি এই (একাগ্রতা) লাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে কর্মনিবৃত্তিকেই পথ বলা হয়।'

আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ যোগম্, 'যিনি যোগী হওয়ার চেষ্টা করছেন'; তিনি সাধন করছেন; *আরুরুক্ষোঃ* মানে 'আরোহণের অভিলাষী'। *কর্ম কারণম্ উচ্যতে,* 'বলা হয়, কর্মই' তাঁদের উচ্চ যোগভূমিতে আরোহণের 'উপায়' বা সহায়ক হয়। সেক্ষেত্রে কর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোন কর্ম না করে আপনি সেই যোগভূমিতে আরোহণ করতে পারেন না। কিন্তু, *যোগ আরূঢ়স্য তস্যৈব,* 'যিনি সেই যোগে উপনীত হয়েছেন; *যোগারূঢ়* মানে 'যে ব্যক্তি ইতোমধ্যেই যোগস্তরে উন্নীত হয়েছেন'। তখন তিনি কীরকম আচরণ করবেন? *শমঃ কারণং উচ্যতে,* তাঁর পক্ষে 'সব কর্ম থেকে নিবৃত্তিই হলো উপায়'। সেই যোগারূঢ় ব্যক্তি তখন সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। তাঁর অন্তরের সবরকম কোলাহল তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে, হৃদয়ে বিরাজ করছে পরিপূর্ণ শান্তি।

অতএব, এই হলো দুটি পর্যায়। যখন আপনি যোগী হওয়ার চেষ্টা করছেন, তখন আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু একবার *যোগী* হয়ে গেলে, তখন আপনার সকল কর্মের অবসান হবে। তখন আপনার সব প্রয়োজন ফুরিয়েছে; আপনার মন আর বাইরে বাইরে ছুটে বেড়ায় না। তখন আপনি নিজের ভিতর এমন অমূল্য বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন যে, গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে আপনার মন দিনরাত বলতে থাকবে—'চাই না, আমার আর কিছুই চাই না'।

আমাদের দার্শনিকরা কখনওই বলেন না—আপনি শুকনো তপস্বী হন। ছোট ছোট জিনিস আপনি এই কারণেই ত্যাগ করেন যে, আপনি তাদের থেকে উৎকৃষ্টতর, উচ্চতর, অধিকতর মূল্যবান কোন কিছু লাভ করেছেন এবং সেই সর্বোচ্চ বস্তু হলো আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। সেই উপলব্ধি থেকেই পূর্ণতাবোধ আসে এবং এই পূর্ণতালাভই মানবিক ক্রমবিকাশের লক্ষ্য। বিংশ শতাব্দীর জীবতত্ত্বও

এই এক কথা বলছে। জীববিজ্ঞানীরা বলছেন, দৈহিক পরিতৃপ্তি, বংশবৃদ্ধি এবং শারীরিক অস্তিত্ব রক্ষা—এগুলোর কোনটাই মানবিক ক্রমবিকাশের লক্ষ্য নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবতত্ত্ব অনুসারে অবশ্য ঐগুলিকেই মানুষের মূল লক্ষ্য বলে ধরা হতো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি হওয়ার দরুন স্যার জুলিয়ান হাক্সলের মতো মহান বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মানবিক ক্রমবিকাশের লক্ষ্য হলো পূর্ণতালাভ। আপনি কি পূর্ণতালাভ করেছেন? তা যদি করে থাকেন, তাহলে জুলিয়ান হাক্সলে বলছেন, 'উৎকর্ষ বা গুণমানকে পরিমাণের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে'। এখন থেকে, পরিমাণ নয়, জীবনের গুণগতমানই আপনার কাছে ক্রমবিকাশের কষ্টিপাথর হয়ে উঠবে। আপনি কি আত্মতৃপ্ত? আপনি কি আপনার স্বামী বা আপনার স্ত্রী অথবা আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে পারেন? উৎকর্ষের কী অসাধারণ ব্যঞ্জনা! বাস্তবিক, চরম উৎকর্ষলাভই মানবিক ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য এবং একমাত্র তার দ্বারাই আপনি আপ্তকাম হতে পারেন। এই কারণেই হাক্সলে চেয়েছিলেন জড়বিজ্ঞান এক উচ্চতর বিজ্ঞানে উন্নীত হয়ে এই পূর্ণতা লাভের বিষয়টির ওপর আলোকপাত করুক। তিনি এই অভিলষিত বিজ্ঞানের নাম দিয়েছিলেন 'a science of human possibilities', বা মানব সম্ভাবনা বিজ্ঞান। ভারতবর্ষের প্রাচীন বেদান্তই সেই বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান বলে যে আপনার, আমার, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সম্ভাবনা রয়েছে; এবং প্রত্যেক মানুষই উদ্বেগ জয় করে যথার্থ শান্ত ও স্থিতধী হয়ে উঠতে পারে।

শম শব্দটির অর্থ 'কর্মপ্রচেষ্টার নিবৃত্তি' কারণ হৃদয় তখন সম্পূর্ণ শান্ত এবং স্থির। যখন হ্রদের জল সম্পূর্ণ শান্ত, একটিও বুদ্বুদ বা তরঙ্গ সেখানে থাকে না, সেই অবস্থাকে বলা হয় *শম*। মনেরও এই *শম* অবস্থা হয়। কিন্তু মনের এ অবস্থা তখনই হয়, যখন আপনার মধ্যে পূর্ণতার অনুভূতি জেগে ওঠে। যখন আপনি যথার্থই তৃপ্ত, তখনই আপনার এই *শম* ভাব আসবে। ক্ষুধার্ত হলে আপনি ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হন। উত্তেজিত হয়ে আপনি ভাবেন: 'আমাকে খেতে হবে, আমার খাদ্য চাই' ইত্যাদি। এইভাবে বাসনা জাগ্রত হয় এবং কাজ শুরু হয়ে যায়। আপনি রাঁধেন, তারপর খান। খাওয়ার পর আপনার স্বস্তি এবং তখনই পরিপূর্ণতা বোধ জাগে। উদরপূর্তির পর যদি কেউ ফের আপনাকে খেতে দেয়, তবে আপনি নিশ্চয় বলবেন, 'না আমি খাব না, এখন আমার পেট ভর্তি, আমি এখন পরিতৃপ্ত'। এ তো আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা, যদিও এ তৃপ্তি তাৎক্ষণিক। দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতা বলে যে, সার্বিক

পরিপূর্ণতাবোধের একটি অবস্থাও আছে যখন মন আর কখনওই বহির্জগতের কোন কিছুর প্রতি ধাবিত হয় না; সেটি হলো ঈশ্বরোপলব্ধির অবস্থা। সেটি হলো *যোগের* অবস্থা। *যোগারূঢ়,* 'যিনি সেই যোগাবস্থায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত'। শ্রীরমণ মহর্ষির কথাই ধরুন। করুণা ছাড়া আর কোন কিছুই তাঁকে তাঁর অন্তর্মুখীন অবস্থা থেকে বাইরে টেনে নিয়ে আসতে পারত না—শুধুই করুণা। বুদ্ধ এবং যিশুর মতো ব্যক্তিত্বেও এই নিগূঢ় করুণা বর্তমান ছিল। সেই করুণায় দ্রবীভূত হয়েই তাঁরা উপদেশ দিতেন, যা সকল মানুষের প্রভূত কল্যাণ করেছে। এইসব মহামানব সম্পূর্ণভাবে মুক্ত—আপ্তকাম। সংস্কৃতে *কৃতার্থ* ও *কৃতকৃত্য,* বলে যে দুটি শব্দ আছে, তা এই পূর্ণতার অবস্থাকেই বোঝায়।

অতএব, এই হলো *যোগারূঢ়* ভাব, *যোগাবস্থায়* পৌঁছানো এবং *যোগে* প্রতিষ্ঠা। পরবর্তী শ্লোকে *যোগারূঢ়* ব্যক্তির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে ঃ

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে ।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

—'যখন কেউ সর্বসংকল্প পরিত্যাগ করার দরুন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়াদি বা কর্মের প্রতি অনাসক্ত হন, তখন তিনি *যোগ* স্তরে উন্নীত হয়েছেন, বলা হয়।'

কোন ব্যক্তিকে *যোগারূঢ়* তখনই বলা চলে, যখন *ন অনুষজ্যতে,* 'তাঁর মধ্যে কোন আগ্রহ থাকে না'; *ইন্দ্রিয়ার্থেষু;* 'ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি'; *কর্মসু,* বিষয় উপভোগের জন্য যে সব কর্ম, সে 'কর্মের প্রতিও নয়'। *সর্বসংকল্প সন্ন্যাসী,* 'যে সন্ন্যাসী সকল সংকল্প ত্যাগ করেছেন।' এমন ব্যক্তিই *যোগারূঢ়,* অর্থাৎ 'যিনি নিজেকে যোগে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।' মানুষের পক্ষেই এই অবস্থা লাভ করা সম্ভব। এক জীবনেই হয়তো আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হতে পারে, কিন্তু শুরু তো করা চাই; সেই লক্ষ্য সামনে রেখে অন্তত একটু তো এগিয়ে যাওয়া চাই; উদ্বেগ ও সংঘাতের ঊর্ধ্বে উঠে এই জীবনেই একটু আনন্দ, সত্যিকারের শান্তির আস্বাদ তো পাওয়া চাই।

পরবর্তী দুটি শ্লোকে মানুষের উদ্দেশ্যে এক মহান বাণী বেরিয়েছে শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে। শ্লোকদুটির ভাব, ভাষা ও দৃপ্তভঙ্গিটি লক্ষ্য করার মতো। প্রত্যেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের মধ্যে এই মহৎ ভাবটি সঞ্চারিত করতে পারেন। বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা আলোচনার সময় আপনারা দেখতে পাবেন। পঞ্চম শ্লোকে বলা হয়েছে,

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

—'নিজের চেষ্টায় উঠে দাঁড়াও, নিজেকে অধোগামী করো না, কারণ কেবল তুমিই তোমার বন্ধু এবং তুমিই তোমার শত্রু।'

এটি বিস্ময়কর উক্তি, কারণ আমাদের প্রবণতা নিজের দুঃখকষ্টের জন্য অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো। আজ, বিশেষত এই আধুনিক সভ্যতায়, এই প্রবণতা মানুষকে অষ্টপ্রহর গ্রাস করে রয়েছে। ফলে আমার বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী কে? কেন? আমার বাবা অথবা মা, অথবা সমাজ অথবা ঈশ্বর—এই ধরনের উত্তরই আমরা দিয়ে থাকি। সব দোষ অন্যের উপর চাপিয়ে এটা জাহির করতে চাই যে, 'আমি নিজে কোন কিছুর জন্যই দায়ী নই'। এমনকি শিশুরাও আজকাল বলে, যদি তাদের কাজে কিছু দোষ-ত্রুটি থাকে, তবে তার জন্য দায়ী তাদের বাবা-মা। 'আমি নির্দোষ, অতএব আমার ওপর দোষ চাপানো কেন?'—এই হচ্ছে তাদের মনোভাব। কিন্তু এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে বরং এই নতুন ধারণা পোষণ করা হিতকর—*উদ্ধরেদ্ আত্মনাত্মানম্*, 'নিজেই নিজেকে উদ্ধার করো'। ধরা যাক, অল্প বয়সে আপনি কোন দুর্ব্যবহার পেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি যদি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন, তাহলে সেই কুপ্রভাবকে আপনি কাটিয়ে উঠতে পারেন। সেই ইতিবাচক মানসিকতাটি কী ঃ 'নিজেই নিজেকে উদ্ধার করব'—এই ভাব। অতএব, নিজেই নিজেকে টেনে তুলুন, সর্বদা অন্যের কাছ থেকে ধাক্কা খাওয়ার দরকার নেই। ভাবুন—'আমার এই দুর্ভাগ্য হয়েছিল; তার জন্য আমি দুঃখকষ্টও পেয়েছি; কিন্তু এখন আমাকেই তা কাটিয়ে উঠতে হবে এবং সে শক্তি আমার মধ্যে আছে'। এই আত্মবিশ্বাস জাগলে ঐ অশুভ চিন্তাগুলি আপনার থেকেই দূর হয়ে যাবে। কিন্তু তা না করে কেবল অন্যদের উপর দোষারোপ! কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করুন ঃ 'কেন তুমি পরীক্ষায় ফেল করলে?' উত্তর পাবেন—'শিক্ষক পড়ান নি!' অবশ্য আজকের দিনে ভারতবর্ষে একথা সত্য যে, সব শিক্ষক ভালো পড়ান না; অথবা প্রশ্নপত্র অত্যন্ত কঠিন হয় এবং যেসব প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে, সেগুলি ক্লাসে ঠিকমতো পড়ানো হয় না। কথাগুলি কমবেশি হয়তো যুক্তিযুক্ত; কিন্তু পরীক্ষায় ব্যর্থতার আরও একটি কারণ আছে—'হয়তো আমি ভালোভাবে পড়িনি।' এই উত্তরটি কিন্তু কেউই দেয় না। এই উত্তরটিই দেওয়া ভালো ঃ 'আমি ভালোভাবে পড়িনি। সব দোষ আমি নিজে নিচ্ছি। আমি নিজেকে সংশোধন করব।'

এইরকম ভাবনা আপনাকে শক্তি জোগাবে, নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে আপনাকে সচেতন করে তুলবে।

অতএব, *ন আত্মানম্ অবসাদয়েৎ,* 'নিজেকে নীচে টেনে নামাবেন না।' কেন? *আত্মা এব হি আত্মনো বন্ধুঃ,* 'মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু' এবং *আত্মা এব রিপুঃ আত্মনঃ,* 'মানুষ নিজেই নিজের শত্রু'। কী অদ্ভুত ভাব! *আত্মা এব হি আত্মনো বন্ধুঃ আত্মা এব রিপুঃ আত্মনঃ।* খাঁটি কথা, 'আমি নিজেই আমার বন্ধু, আবার আমি নিজেই আমার শত্রু।' এমনকি যদি কেউ আমাকে কষ্ট দেয়, আর আমি যদি তা মনে না রাখি, তবে তা আমাকে আদৌ বিচলিত করবে না। কিন্তু যদি আমি তা গ্রহণ করে মনের মধ্যে পোষণ করি, তবেই তা আমাকে কষ্ট দেবে। অতএব, আমার কষ্টের জন্য দায়ী হলো ঘটনাটিকে আমার মনের মধ্যে গ্রহণ করা বা স্বীকার করা। এসব অবাঞ্ছিত ঘটনা ভুলেও মনে স্থান দেবেন না, মন থেকে এসব ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করুন। সেই সামর্থ্য আমাদের নেই বলেই আমরা এসব দ্বারা প্রভাবিত হই। অতএব, সেই আন্তর শক্তিকে জাগিয়ে তোলাই শ্রেয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলা হয়, আপনার চারপাশে এমন বহু জীবাণু ছড়িয়ে আছে, যা আপনার মধ্যে রোগ সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু আপনার দেহ যদি শক্তিশালী হয়, তবে আপনার কোন রোগ হবে না, জীবাণুগুলি আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কাজেই, নিজের শক্তি বাড়ান। এই হলো শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ।

ভারতবর্ষে যখন, স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়, তখন প্রথম দিকের রাজনৈতিক নেতারা বললেন, 'দয়া করে আমাদের স্বাধীনতা উপহার দিন।' তারপর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে শুরু হলো যথার্থ আন্দোলন; তিনি উচ্চারণ করলেন সেই মহামন্ত্র, 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার, আমি তা অর্জন করবই।' শেষপর্যন্ত এই মন্ত্র অনুসরণের ফলশ্রুতিই হলো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। তাই বলি, নিজের ওপর নির্ভর করুন, অন্য কারও মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবেন না। অন্যের ওপর নির্ভর করা মানে নিজেকে সংকুচিত করা। নিজের ভাবে বড় হন। এই ভাবই অভিব্যক্ত হয়েছিল ১৯৪২-এ গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এ এবং তার পাঁচ বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

জাতীয় জীবনের মতো এই সত্য আমাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও খাটে। কিন্তু তাহলে কি হয়, সংশয়গ্রস্ত আমরা ফের প্রশ্ন তুলি ঃ আমি নিজে

নিজের বন্ধু হতে পারি, কিন্তু নিজে নিজের শত্রু কীভাবে হব? আমার শত্রু অবশ্যই অন্য কেউ হবেন! শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন পরবর্তী শ্লোকে।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

—'যখন মানুষ নিজেকে বশে আনতে পারে, তখন সে নিজের বন্ধু হয়ে ওঠে; কিন্তু যে নিজেকে জয় করতে পারেনি, সে নিজের অনিষ্টকারী, (এবং বাইরের) শত্রুর মতো (হয়ে ওঠে)'।

এই শ্লোকগুলিতে গভীর মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি নিহিত আছে। যখন আপনি ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনবেন, মনকে সংযত করবেন, তখন আপনার অপরিমেয় চারিত্রিক শক্তি গড়ে উঠবে; তখন আপনি আপনার বন্ধু হয়ে উঠবেন। কিন্তু তা না হয়ে, *অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে*, 'যখন আপনি আপনার মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ না করে, পরিশীলিত না করে, তাদের খেয়াল-খুশিমতো চলতে দেন, তখন আপনি নিজেই নিজের শত্রু হয়ে উঠবেন।' এই হলো মূল শিক্ষা।

আমাদের চারিত্রিক বিকাশের পক্ষে এই শিক্ষার কতই না দরকার! সর্বদা অন্যের উপর দোষারোপ করা ভালো নয়। বস্তুতপক্ষে, অভিযোগের অভ্যাস অতি হীন মানসিকতার পরিচায়ক এবং বহু মানুষই এই মানসিকতার শিকার ঃ তারা সর্বদাই কোন না কোন বিষয়ে, মানুষ এবং পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এর ফলে দেখা দেয় এক ধরনের ক্ষোভ। সেই ক্ষোভ এইভাবে প্রকাশ পায় ঃ 'ও আমাকে এই কথা বলল!' এইভাবে আমি মনের ভিতর একটার পর একটা ক্ষোভের পাহাড় গড়ে তুলছি। বেশ কয়েক বছর আগে একটি আমেরিকান পত্রিকায় একটি কথা পড়েছিলাম; সেখানে বলা হয়েছিল, 'সেই হৃদয়ই ধন্য, যা ক্ষোভের জঞ্জাল সংগ্রহ করে বেড়ায় না।' বাস্তবিক, সকাল থেকে সন্ধ্যা আমরা কেবল ক্ষোভ সংগ্রহ করেই চলেছি। ফলে, যখন আপনার বয়স চল্লিশ বা পঞ্চাশ হবে, দেখবেন, আপনার হৃদয় ক্ষোভ এবং অভিযোগের একটি প্রকাণ্ড সংগ্রহশালা হয়ে উঠেছে। এতে আপনার কী লাভ? আপনি তো আপনারই 'এক নম্বর শত্রু' হয়ে উঠলেন। ঐসব আক্রোশ কেনইবা সযত্নে দিনের পর দিন হৃদয়ে পুষে রেখেছিলেন? সেগুলিকে তো আপনি তখনই বিচার-বিশ্লেষণ করে মন থেকে দূর করে দিতে পারতেন। কাজেই বলুন,

আপনার শত্রু কে? আপনি নিজে। মনে করুন, কেউ আমাকে কটূক্তি করে চলে গেল এবং আমিও সেই কটূক্তিকে সাদরে গ্রহণ করে মনে মনে ফুঁসতে থাকলাম। তাতে কী হবে? আমিই দুর্বল হয়ে পড়ব, অবসাদগ্রস্ত হব। যিনি আমাকে দু-কথা বলেছিলেন, তিনি হয়তো কবেই এ জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন; কিন্তু আজও আমি তাঁর ছুঁড়ে দেওয়া কথাগুলিকে নিজের মধ্যে লালন করছি। কেন? কারণ তাঁর মন্তব্যকে একদা আমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করতে দিয়েছিলাম। তাহলে, কে আমার শত্রু? আমিই আমার শত্রু। কারণ মনের উপর, অন্তর্জীবনের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

শিশুদের লক্ষ্য করুন। একটি শিশু অন্য একটি শিশুকে কটু কথা বললেই, শিশুটি খেলাধুলা ছেড়ে অমনি মায়ের কাছে নালিশ জানাতে ছুটবে। আমরাও কিন্তু এইসব শিশুর মতোই, ক্রমাগত কোন না কোনকিছুর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েই চলেছি। আমাদের বুদ্ধি এখনও অপরিণত। শ্রীকৃষ্ণ চান, আমরা সকলেই মানসিক দিক থেকে পরিণত হয়ে উঠি, নিজেদের কৃতকর্মের দায়িত্ব যেন নিজেরাই গ্রহণ করতে শিখি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপনি কোন অন্যায় করলে আপনাকে কিছু শাস্তি পেতে হবে। তখন যেন আপনি বলতে পারেন, 'হ্যাঁ, আমি অন্যায় করেছি, শাস্তি নেব; আমাকে এই শাস্তি দেওয়া অন্যায় নয়'। আজকাল বলা হয়, শাস্তি দিলে মানুষের মন ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এ কেবল ভিত্তিহীন কল্পনা। ফ্রয়েড (Freud)-এর যুগ থেকেই এইসব ধারণার চলন হয়েছে। কোনওরকম শাস্তি, এমনকি সামান্য ভর্ৎসনাও দুর্বল মানুষকে মানসিকভাবে আহত করতে পারে; অতএব শাস্তি নয়, তিরস্কারও নয়। এই নব্য নীতিই আজ মানুষের মনকে আরও দুর্বল করে তুলেছে। এভাবে দুর্বল হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এসব ক্ষেত্রে আমার বলা উচিত, 'বেশ, আমি দোষ করেছি, আমিই তার শাস্তি গ্রহণ করব। ঠিক আছে। এইখানেই ব্যাপারটি মিটে যাক।' এই হলো মনের শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার এই অভ্যাস থেকেই ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে এবং কেবল এই ধরনের মানুষই চরিত্রকে উন্নত করতে পারে।

অতএব, এই দুটি শ্লোকের গুরুত্ব অনেক : *উদ্ধরেদ্ আত্মনা আত্মানম্*— 'নিজেই নিজেকে উদ্ধার করুন,' কারণ আপনিই আপনার বন্ধু, আপনিই আপনার শত্রু। কীভাবে? যখন আপনি আপনার মন ও ইন্দ্রিয়গুলির শক্তিকে সুসংযত করেন, তখন আপনি আপনার বন্ধু। আর তা যদি না করেন, তাহলে আপনিই আপনার শত্রু হয়ে উঠবেন।

শিশুরা জিভ কামড়ে যন্ত্রণার জন্য তাদের মাকেই দায়ী করে। কিন্তু আপনি তো আর শিশু না। যদি নিজের জিভে কামড় দিয়ে ফেলেন, তবে আপনি নিজের ওপরই দোষারোপ করুন, অন্য কারও ওপরে নয়। এইভাবেই, আপনাকে ভিতরের শক্তি বাড়াতে হবে। ভিতরের এই শক্তি যত বৃদ্ধি পাবে, অন্যদের প্রতি আপনার অভিযোগও ততই কমে আসবে। যতই অন্যদের প্রতি দোষারোপ করবেন, আপনি ততই দুর্বল হয়ে পড়বেন। নিজের ওপর আস্থা আসলে জনগণের এবং জাতির শক্তিও কিছুটা বাড়বেই বাড়বে। 'হ্যাঁ, একাজ আমি করেছি। আর কখনও এ ভুল করব না'। একেই বলে পৌরুষ, একেই বলে দৃঢ়তা। আমি যদি ভুল করি, তবে আমাকেই শাস্তিভোগ করে তার মূল্য দিতে হবে। এই দণ্ড আমি মাথা পেতে নেব। এ শুধু তত্ত্বকথা নয়; বাস্তব জীবনে এই তত্ত্বের প্রয়োগও সম্ভব।

অনাত্মনঃ তু শত্রুত্বে বর্তেত আত্মৈব শত্রুবৎ, 'যে মানসিক শক্তির ভাণ্ডার আপনার রয়েছে, তার সদ্ব্যবহার না করে নিজেই নিজের শত্রু হয়ে উঠবেন না'। এই শক্তিকে বাগে আনুন; শোধন করুন, শুদ্ধ করুন, সংযত করুন, তখন দেখবেন আপনার সমগ্র দেহমন আপনার সুহৃদ হয়ে উঠবে। কোন কিছুই তখন আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

এই শ্লোকদুটিতে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলকে এই নির্দেশই দিয়েছেন। এইভাবেই আমরা আমাদের আন্তর শক্তি বাড়াতে পারি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, প্রতিটি শিশুকে অবশ্যই বলা উচিত, 'তুমিই তোমার বন্ধু, তুমিই তোমার শত্রু'। এই বাণী তাদের আন্তরশক্তিতে বলীয়ান করে তুলবে। বর্তমানে এই শিক্ষার একান্ত অভাব। ফলে শক্তির বিকাশও তেমন ঘটছে না। আমাদের অভিযোগের আঙুল সর্বদাই অন্যের দিকে ফেরানো। হয় বলি—'ঐ ব্যক্তি আমার জীবন একবার বিষিয়ে তুলেছেন', না হয় বলি, 'ইনি বা এই শিশুটি আমার কাছে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে'। যাতে শিশুদের মনের জোর বাড়ে, সেই কারণে এই অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যকর্তব্য। বাহ্য পরিস্থিতি অতি বিপজ্জনক ও খারাপ হলে আপনাকে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়তে হবে, কিন্তু মানবিক সম্পর্কজনিত ছোটোখাটো সমস্যা যদি আপনাকে প্রায়শই পীড়িত করে, তবে সেগুলির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজের মধ্য থেকেই শক্তি আহরণ করতে হবে; লজ্জাবতী লতার মতো অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর হয়ে ভেঙে পড়লে চলবে না। এমন হওয়া উচিত নয়। লজ্জাবতী লতা এতটাই সংবেদনশীল যে,

তাতে একটু জোরে ফুঁ দিলেই সে আধমরা হয়ে পড়বে; পরে অবশ্য তা আবার সতেজ হয়ে ওঠে। মানুষের পক্ষে এইরকম লজ্জাবতী লতা হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বাইরের চাপ সহ্য করার মতো কিছুটা শক্তি তার থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। বাড়ির পরিচিত পরিবেশে বড় হয়ে একটি শিশু যখন স্কুল বা কলেজে যায়, তখন সে এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করে। তার ওপর তখন নানারকম চাপ আসতে থাকে। তাকে অবশ্যই সেসব পরিস্থিতির মোকাবিলা করে নতুন শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। এইজন্যই তো আমরা শিশুদের স্কুলে পাঠাই। কিন্তু তারা যদি কেবল বাড়িতে অন্তরঙ্গ পরিজনদের সঙ্গেই দিন কাটায়, তবে তারা অপদার্থ হয়ে উঠবে। ঘরের বাইরে বিরাট জগৎ পড়ে রয়েছে; সেখানেও তাদের স্থান করে নিতে হবে। আজকের আধুনিক সমাজের কথাই ধরুন না। সেখান থেকে যে সব চাপ আমাদের ওপর আসে সেগুলির মোকাবিলা করতে আমাদের কী বিপুল আন্তর শক্তিরই না প্রয়োজন! এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো নিজেকে বলীয়ান করে তোলা। আপনার শিশুকে বাইরের জগতে পাঠাবার আগে তাকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলুন এবং মূলত সেই শক্তি হলো আধ্যাত্মিক শক্তি—শুধু দৈহিক বা বৌদ্ধিক শক্তি নয়, যথার্থ আধ্যাত্মিক শক্তি। আধুনিক সভ্যতার উদ্বেগজনক দিকগুলির সঙ্গে যুঝতে হলে কিছুটা আধ্যাত্মিক শক্তির দরকার। না হলে 'সভ্যতা' তাদের ধ্বংস করে ফেলবে।

তাই ভগবদ্গীতা-র অভিপ্রায়, প্রত্যেক পিতামাতা তাঁদের সন্তানদের বলুন—'বাইরের জগতে যাওয়ার আগে তোমরা নিজেদের শক্তি বাড়াও'। বাস্তবিক, এই দুনিয়ায় এত বিচিত্র ও বিপজ্জনক স্রোত বইছে যে, শিশু এবং তরুণ-তরুণীরা সহজেই সেই স্রোতে তলিয়ে যেতে পারে। আমরা চাই না তারা সর্বনাশা স্রোতে ভেসে যাক। সাঁতার জানলে তবেই আমরা নদীকে ঠিকমতো উপভোগ করতে পারি। যদি আমরা নদীর স্রোতে ভেসেই গেলাম, তাহলে আর নদীতে নামার মজাটা কী? আধুনিক সমাজের চেহারাটা ঠিক এই বিপজ্জনক খরস্রোতা নদীর তরঙ্গের মতো। অতএব, আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের শিক্ষা আজ সব শিশুকে অবশ্যই দিতে হবে, কারণ পরিস্থিতি দিন দিন আরো সঙ্গিন হয়ে উঠছে। আগেকার দিনে, বহির্জগতে এখনকার মতো এরকম টানাপোড়েনের স্রোত বইতো না। আজকের সামাজিক পরিবেশে একটি শিশু পাঁচদিনেই উচ্ছন্নে যেতে পারে। এর প্রতিকার কী? একমাত্র প্রতিকার এই বাণীটি—*উদ্ধরেদ্ আত্মনা আত্মানম্।* আপনার শিশুসন্তানকে বলুন, 'নিজের পায়ে দাঁড়াও', শক্তি বাড়াও, তাহলে কোন

অভিজ্ঞতাই তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। বিচারশক্তি গড়ে তোলো। সংযম অভ্যাস কর। তা যদি কর, তাহলে দেখতে পাবে, তোমার ভিতরে প্রচণ্ড শক্তি জেগে উঠেছে। সেই শক্তি, যা আগেই বলেছি, দৈহিক বা বৌদ্ধিক শক্তি নয়। তা আধ্যাত্মিক শক্তি। একজন প্রথম শ্রেণির কৃতী ছাত্র, একজন দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে পারে এবং এক্ষেত্রে বৌদ্ধিক শক্তি কোন কাজেই লাগবে না। একমাত্র অন্তরের দিব্য দ্যুতি সম্বন্ধে কিছুটা সচেতনতাই তাকে রক্ষা করতে পারে। অন্তরের সেই দিব্যতা সম্পর্কে শিশুদের অবহিত করুন। তাদের বলুন, এই দেহ-মনের পিছনে এক দিব্য দ্যুতি রয়েছে। সেটিই অনন্ত শক্তির উৎস। তারা যেন বোঝে যে, 'সেই দিব্যশক্তির অন্তত কিছুটা আশ্রয় আমাকে গ্রহণ করতে হবে; তবেই আমি বহির্জগতের চাপ কাটিয়ে উঠতে পারব'। যদি এই ধরনের মানসিকতা গড়ে তোলার শিক্ষা শিশুদের দেওয়া হয়, তবে তারা আধুনিক সমাজের নানাবিধ সমস্যার মোকাবিলা করতে সমর্থ হবে; অন্যথায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ শিশু আধুনিক জীবনযাত্রার স্রোতে বিধ্বস্ত হতে বাধ্য।

অতএব, শ্রীকৃষ্ণের এই শিক্ষা আজকের শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য। সব যুগেই এই শিক্ষা অশেষ কল্যাণকর, বিশেষত আজকের সমাজে, কারণ এখন অধিকাংশ সমস্যাই আসে বাইরে থেকে, যা অতি বড় দৃঢ়চিত্ত মানুষের মনকেও টলিয়ে দিতে পারে। অতএব, আধ্যাত্মিক শক্তিই যথার্থ শক্তি। এই শক্তি থাকলে, যে-কোন শিশু মানসিক চাপ ও বিভিন্ন ধকল সইতে পারবে; সেক্ষেত্রে সামান্য তিরস্কার বা বেত্রাঘাতেও সে বিচলিত হবে না এবং এই শাসনের জন্য তার মধ্যে কোন মনোবিকার দেখা দেবে না। কিন্তু আজ খুব কম শিশুর মধ্যেই এই সহ্যগুণ থাকে। ফলে শীঘ্রই তারা মানসিক বিকৃতির শিকার হয়ে পড়ে, তাদের মনের মধ্যে নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হয়। এমন ঔদাসীন্য তাদের পেয়ে বসে যে, তারা তাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব ভুলে গুম হয়ে বসে থাকে। এই সব সমস্যা অনিবার্য। আজকের সমাজ এইরকমই। তাই, মানুষকে এই সত্যটি বুঝতে হবে যে, প্রত্যেকের মধ্যেই আধ্যাত্মিক শক্তি নিত্য বিরাজমান। বেদান্ত-সাহিত্যে এই শিক্ষাই আমরা পাই।

আগেই বলেছি, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে শক্তির তিনটি উৎস রয়েছে। প্রথমটি হলো শারীরিক শক্তি, *বাহুবলম্*, শক্তি হিসাবে যা খুবই সাধারণ পর্যায়ের। এই শক্তিকে আমরা সহজে বুঝতে পারি। দ্বিতীয়টি হলো *বুদ্ধিবলম্*, অর্থাৎ বৌদ্ধিক

শক্তি। শক্তির বিচারে এই দুটি খুবই সাধারণ। দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় উন্নততর হলেও যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, সেখানে কখনও কখনও এই বুদ্ধিবলও কোন কাজে লাগে না। তাই বেদান্ত শক্তির তৃতীয় একটি উৎসের কথা বলেছে যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নিহিত। তাকে বলা হয় *আত্মবলম্* বা *যোগবলম্*। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হলে তবেই তার বিকাশ ঘটে থাকে। এই পরম শক্তির একমাত্র উৎস হলো আত্মা। অতএব, *বাহুবলম্, বুদ্ধিবলম্ এবং আত্মবলম্*—এই তিনটি হলো শক্তি। আমাদের শিশুদের মধ্যে এই তিনরকম বলেরই বিকাশসাধন করতে হবে। তারা ব্যায়াম করুক, খেলাধুলা করুক; এইভাবে তাদের দেহ শক্তসমর্থ হয়ে উঠুক। একইভাবে তারা বই পড়ুক, চিন্তা করুক—মন ও বুদ্ধির বিকাশ সাধন করে সৃজনশীল হয়ে উঠুক তারা। এই সৃজনশীলতার খুব দরকার। কিন্তু সেখানেই যেন তারা থেমে না যায়। নিজেদের ভিতর থেকে কিছুটা আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করার চেষ্টাও তারা করুক। যদি তারা সামান্যতম আত্মবলেরও অধিকারী হয়, তবে বাইরের জগতের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা তাদের আরও বেড়ে যাবে।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের এই যে সব চমৎকার ভাব, আমি মনে করি, এগুলি শিশুদের অবশ্যই শোনা উচিত। ছয় কি সাত বছর বয়সে তাদের এইসব চিন্তার খোরাক দেওয়া হোক। পরে বয়স যত বাড়বে, তত তাদের কাছে এই বিষয়গুলির গুরুত্ব বুঝিয়ে বলতে হবে। বয়স বছর বারো হলে তারা বিষয়টি সামান্য বুঝতে পারবে। অন্তত এই বয়সে তাদের ভিতর এই চিন্তাটুকু আসা উচিত যে, 'হ্যাঁ, আমি আমার অন্তরের শক্তির উপর নির্ভর করতে পারি, আমি আমার আন্তর শক্তিকে কিছুটা বিকশিত করতে পারি'। এভাবে ধীরে ধীরে এগোতে থাকলে তারা যখন কুড়ি-একুশ বছরে প্রাপ্তবয়স্ক হবে, তখন তাদের কাছে এই আত্মশক্তি এক মহামূল্য সম্পদ হয়ে উঠবে। আজ জগতে এই সম্পদেরই প্রয়োজন। তাই এই যুগে মানুষের কাছে এই দুটি শ্লোকের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

এবার শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের মূল বিষয়, অর্থাৎ ধ্যানের ব্যাখ্যা শুরু করছেন। এযাবৎ এই বিষয়ের প্রাথমিক ধারণাগুলি তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোক থেকে আমরা ধ্যানের যথাযথ প্রক্রিয়াটি জানতে পারব। এখানে ৭ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

—'জিতেন্দ্রিয় এবং প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি, শীত এবং উষ্ণতা, সুখ এবং দুঃখ, মান এবং অপমান, সর্ব অবস্থায় পরমাত্ম-তত্ত্বের উপলব্ধিতে সর্বদা নিবিষ্ট থাকেন।'

জিতাত্মনঃ, 'যিনি নিজের আন্তর শক্তিসমূহকে জয় করেছেন'; কখনও কখনও *আত্মন্* শব্দের অর্থ 'শরীর', কখনও তার অর্থ 'ইন্দ্রিয়গ্রাম' অথবা 'মন' এবং কখনও কখনও তা তার নিজস্ব অর্থে, অর্থাৎ সেই 'অনন্ত সত্তা' অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব, এই শরীরও *আত্মা*। শরীর এবং চেয়ার—এদের মধ্যে শরীর হলো *আত্মা*, যা চেয়ারের ওপর বসে এবং চেয়ারটি হলো অনাত্ম বস্তুমাত্র। অতএব, ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে বেদান্তে এই শারীরিক স্তর থেকেই 'আত্মা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার দ্বারা কোন ক্ষেত্রে বিষয়ীকে এবং কোন ক্ষেত্রে বিষয়গুলিকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু শুদ্ধ আত্মাই যথার্থ আত্মা, জীবের প্রকৃত আন্তর সত্তা, অবিনশ্বর ঐশী সত্তা, যা সকলের মধ্যে এক এবং সর্বদাই বিষয়িরূপে অবস্থিত। প্রকৃত আত্মা কখনওই বিষয় নয়। এই শুদ্ধ আত্মাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্য আর একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। সেটি হলো *পরমাত্মা*, অর্থাৎ পরমসত্তা। 'আত্মা' শব্দটিই যথেষ্ট, তবুও কখনও কখনও 'পরমাত্মা' বা পরম সত্তা কথাটি ব্যবহৃত হয়। এর কারণ কী? কারণ এই যে, বিভিন্ন স্তর থেকেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি। যদি আপনি নিম্ন কোন একটি স্তর থেকে আত্মাকে বোঝার চেষ্টা করেন, তখন যথার্থ আত্মা বলতে বুঝতে হবে *পরমাত্মা*, যিনি পরম ঐশী সত্তা বা ব্রহ্ম স্বয়ং।

অতএব, *জিতাত্মনঃ*, 'যিনি আত্মাকে জয় করেছেন'। এই আত্মা কী? এখানে আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন বিশিষ্ট; *জিতাত্মনঃ*, 'যিনি আত্ম-সংযমের দ্বারা নিজেকে জয় করেছেন'। *প্রশান্তস্য*, 'প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তির'; এই আত্ম-সংযম থেকেই আসে চিত্তের যথার্থ স্থৈর্য, যথার্থ শান্তি। জীবের অশান্তি কেবলমাত্র তার ইন্দ্রিয়স্তরে, মানসিক স্তরে। এই স্তরগুলি অতিক্রম করলে, সবকিছুই শান্তিতে পূর্ণ। অতএব, এই শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে এই স্তরে মনকে একাগ্র করতে হবে; তবেই আপনার চিত্ত শান্ত হবে। *পরমাত্মা সমাহিতঃ*, 'এরকম মানুষই *পরমাত্মায়* পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ও নিবিষ্টচিত্ত হতে পারেন'। কেবল এই উপায়েই আমরা পরম সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারি। অন্তর্জীবন বিক্ষুব্ধ হলে আমাদের এই আত্মানুভূতি হয় না। এ অতি সুন্দর ভাব।

অতএব, *শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথা মান-অপমানয়োঃ,* মন সর্বদাই স্থির ও প্রশান্ত, এমনকি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের 'শীত, উষ্ণতা, সুখ, দুঃখ, মান ও অপমান'-এর মতো নিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যেও। বাহ্যজগতের ঘটনাগুলি সর্বদাই আমাদের আঘাত করছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মনের গভীরে বিরাজ করছে অচঞ্চল প্রশান্তি। *প্রশান্তস্য* কথাটির এই হলো অর্থ। যখন আপনি *প্রশান্ত,* তখন মান বা অপমান, শীত বা উষ্ণতা, সুখ বা দুঃখ, কিছুই আর আপনার মনকে বিচলিত করতে পারে না। এই হলো *যোগ*-এর ফল। একমাত্র *যোগ*-ই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। এখন আমরা মুক্ত নই। তাই প্রকৃতির চাপের কাছে নতিস্বীকার করি। কিন্তু *যোগ* অবলম্বন করলে, ধীরে ধীরে আপনি উপলব্ধি করেন, 'হ্যাঁ, আমি মুক্ত, আমি মুক্ত। বাইরের শক্তিগুলির হুকুম মেনে চলতে আমি আর বাধ্য নই'। আধুনিক যুগে এই গভীর সত্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন, কারণ আজ আমরা বাহ্যশক্তির গোলাম হয়ে পড়েছি; তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও এতটাই প্রভাবিত যে, আমরা আত্মার মহিমা ভুলে গেছি, বিস্মৃত হয়েছি আমাদের সত্তার পূর্ণতাকে। তাই প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন এই *যোগ*। সৌভাগ্যের বিষয়, বিশ্বজুড়েই আজ যোগের প্রতি মানুষের আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়ছে।

পরবর্তী শ্লোকে বলা হচ্ছে,

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

—'যাঁর হৃদয় জ্ঞান এবং বিজ্ঞানলাভে পরিতৃপ্ত এবং অবিচলিত, যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁর কাছে মাটি, পাথর এবং সোনার মূল্য সমান, সেই যোগীকেই যোগারূঢ় বলা হয়।'

জীবনের এই পর্যায়ে যখন বহির্জগতের বিষয়গুলি আপনাকে আর আকর্ষণ করে না, আপনাকে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করে না, তখন আপনি মুক্ত, তখন আপনি আত্মস্থ হয়েছেন। এইরকম মানুষকেই এখানে বলা হয়েছে, 'তিনি একজন যথার্থ *যোগী'; যুক্তঃ* শব্দের অর্থ 'যোগে সুপ্রতিষ্ঠিত'। কীভাবে? *জ্ঞানবিজ্ঞান তৃপ্ত আত্মা,* 'জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের দ্বারা পরিতৃপ্ত'। এখানে *জ্ঞান* বলতে কেবল শাস্ত্রীয় খুঁটিনাটির জ্ঞানকেই বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা *যোগ* সম্পর্কে, *ব্রহ্মজ্ঞান* সম্পর্কে যে চর্চা করছি, তাকে বলা হয় *জ্ঞান।* কিন্তু, যখন

আপনি তত্ত্বের অন্তর্নিহিত সত্যটি উপলব্ধি করেন, তখন তাকে বলা হয় *বিজ্ঞান,* বা 'প্রজ্ঞা, অর্থাৎ সেই সত্যের অনুভূতি'। তত্ত্ব সম্পর্কে বৌদ্ধিক জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। আপনাকে সেই তত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবনে এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শুকনো পরোক্ষ তাত্ত্বিক জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। এক্ষেত্রে ভূরি ভূরি পুঁথিগত তত্ত্বজ্ঞানের চেয়ে এক ফোঁটা অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশি। তাই বলা হচ্ছে, *জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্ত আত্মা,* 'যিনি *জ্ঞান এবং বিজ্ঞান* লাভ করে পরিতৃপ্ত; *কূটস্থঃ,* 'যিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, নির্বিকার'। মনের এই অবস্থার কথা বোঝাতে গিয়ে আমাদের আচার্যরা প্রায়শই বলে থাকেন, 'কামারশালে নেহাইয়ের মতো হও'। সেখানে কত অসংখ্য লোহার টুকরোকে পিটিয়ে কতই না আকার দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু নেহাই যে-কে-সেই, তার কোনওরকম পরিবর্তন হচ্ছে না। নেহাই নির্বিকার। মনের স্থিতাবস্থা বোঝাতে এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। অতএব, *বিজিতেন্দ্রিয়ঃ,* অর্থাৎ 'যিনি সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন।' আমার অনুমতি ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ই আর তাদের ইচ্ছামতো কাজ করতে পারে না। এখন আমিই তাদের প্রভু। মনের এই স্থিতির কথাই এখানে বলা হয়েছে। প্রকৃতিও চায়, মানুষ তার ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে আনুক। তা না হলে আমাদের মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে উঠবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ অধিকাংশ মানুষেরই এই দুরবস্থা। তাদের সমস্ত চিন্তাশক্তি ইন্দ্রিয়ভোগ প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হচ্ছে; ইন্দ্রিয়গুলিই তাদের প্রভু। এ যেন লেজ কুকুরকে নাড়াচ্ছে। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই এই কথা খাটে। ইন্দ্রিয়গুলির দাপটে আমাদের মস্তিষ্ক যেন নিষ্ক্রিয় হতে বসেছে; কোন বিষয়ে তার কোন স্বাধীনতা নেই। অথচ স্নায়ুতত্ত্ব বলছে, মস্তিষ্কের কাজ হলো ইন্দ্রিয়ের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে, জীবনের উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে আমাদের নিয়ে যাওয়া।

তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, *বিজিতেন্দ্রিয়ঃ,* 'যিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পেরেছেন'; *যুক্ত ইত্যুচ্যতে,* 'তিনি একজন যুক্ত, অর্থাৎ যোগে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বা যোগী বলে পরিগণিত হন'। যোগীর মন এক অদ্ভুত গুণে সমৃদ্ধ। কোন কিছু সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন এবং ইন্দ্রিয়ের উপর যাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, এমন লোকের মূল্যায়ন—এ দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইন্দ্রিয়গুলিকে কতটা আকর্ষণ করতে পারে, ইন্দ্রিয়গুলিকে কতটা পরিতুষ্ট করতে পারে, তার ভিত্তিতেই আমরা সাধারণত এই জগতের মূল্যায়ন করি। কিন্তু যোগী ইন্দ্রিয়সুখের মোহ থেকে মুক্ত। কাজেই, তার ভিত্তিতে তিনি জগতের মূল্যায়ন করেন না। এই কারণেই, এখানে বলা হয়েছে, *সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ;*

লোষ্ট মানে 'মাটি'; *অশ্ম* কথাটির অর্থ 'পাথর' এবং *কাঞ্চন* অর্থ 'সোনা'; *সম* অর্থাৎ 'সমান'; এই তিনটির মূল্যই তাঁর কাছে এক। এই হলো যোগীর দৃষ্টিভঙ্গি। বাস্তবিক, এসব জিনিস শুধু ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করার জন্যই—মনুষ্য জীবনে ইন্দ্রিয় স্তরের ঊর্ধ্বে এগুলির কোন দামই নেই।

অতএব, এই স্তরে মানুষ এক অদ্ভুত *সমত্ব* গুণের, ভেদজ্ঞানরহিত মনোভাবের অধিকারী হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সমত্বভাবের সাধন করেছিলেন—বার বার 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলতে বলতে টাকা ও মাটি দুটিকেই একসঙ্গে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ কথাটির অর্থ হলো 'টাকা এবং মাটির মধ্যে বস্তুত কোন প্রভেদ নেই'। শুধুমাত্র জৈবিক পরিতৃপ্তির জন্যই এই টাকার কদর। এ ছাড়া অর্থের অন্য কোন মূল্য নেই। মনের শান্তি, চারিত্রিক উৎকর্ষ, আধ্যাত্মিক বিকাশ—এসবের কোনটিই অর্থের বিনিময়ে আমরা লাভ করতে পারি না। টাকা শুধু খাদ্য, পানীয় ও সুখের বন্দোবস্ত করতে পারে। তার বেশি কিছুই নয়। তাই, গীতা এই *'সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন'*-এর কথা বারবার বলে চলেছেন।

যখনই আপনি *যোগ*-এর পথে পা বাড়াবেন, তখনই বিচার বিবেচনার এই ক্ষমতা আপনার মধ্যে বিকশিত হতে থাকবে। আপনি বুঝতে পারবেন এগুলি সব সাধারণ বস্তু। স্বভাবতই, তাদের প্রতি আপনি উদাসীন হয়ে উঠবেন; সেগুলি আপনার বেশি প্রয়োজন হবে না। সাধারণ সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু হলেই আপনার যথেষ্ট মনে হবে। একবার যদি আপনি ইন্দ্রিয়ের স্তর অতিক্রম করে যেতে পারেন, তাহলেই আপনার মধ্যে এই ধরনের মানসিকতার বিকাশ ঘটবে। একে *যোগ* বলা হয়। এই যোগে প্রতিষ্ঠিত হলে ইন্দ্রিয়স্তরেও আপনি অবিচলিত থাকতে পারবেন। যোগ সাধকের কাছে এ সবই স্বাভাবিক হয়ে আসে। বাইরের চাপে পড়ে যোগী এটা ওটা ত্যাগ করেন না। তিনি যা করেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার বশেই করেন। ফলে কোন কিছু হারানোর বোধ, এমনকি কোন কিছু ত্যাগের অনুভূতিও সেখানে থাকে না। সমগ্র ব্যাপারটাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ঘটে থাকে। যোগীর দৃষ্টিভঙ্গি হলো—'আমি এমন কিছুর অনুসন্ধান করছি যা গভীরতম, যা অসীম। তার তুলনায় জাগতিক এ সব বস্তু নিতান্তই তুচ্ছ।' সত্যিকথা, ঈশ্বরলাভ করলে, এসব তুচ্ছ বস্তু কীভাবে আর আমাদের আকর্ষণ করতে পারে? এসব তখন তুচ্ছ ধূলিকণা বোধ হয়। এইধরনের অনুভূতি *বহবো,* 'অনেকেই' লাভ করেছেন।

এই কথাটি আপনাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে ঃ যদি আজকের সমাজে পাপের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে, তবে তা এই কারণে যে, সাধারণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলিকে আমরা বড্ড বেশি মূল্য দিচ্ছি। এর ফলে যা মহার্ঘ ও কল্যাণকর, সেই বস্তুগুলি হয় সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে, নয়তো তাদের অবমূল্যায়ন ঘটছে। কিন্তু যাঁরা ভক্ত, তাঁরা অন্য ধরনের মনোভাব পোষণ করেন। তাঁরা মহান ভক্ত হনুমানের মতো বলেন, 'রাম-রূপ অমূল্য রত্ন আমি হৃদয়ে ধারণ করেছি, অন্য ছাইভস্মে আমার কী প্রয়োজন?' এ শুধু তত্ত্ব কথা নয়; এ ধরনের অভিজ্ঞতা এই জীবনেই হয়। সেখানে কোন হাড়ভাঙা সংগ্রাম থাকে না, থাকে না কোনরকম অভাববোধ; সব কিছুই ঘটে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে।

যোগীর আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা পরের শ্লোকে বলা হচ্ছে ঃ

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু ।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

—'যে ব্যক্তি সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, বিদ্বেষভাজন, আত্মীয়বর্গের প্রতি সমমনোভাব পোষণ করেন, যিনি ধার্মিক এবং অধার্মিকের প্রতি সমবুদ্ধিসম্পন্ন, তিনিই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।'

সেই *সমবুদ্ধি*, সেই 'সমদৃষ্টি'-র ভূয়সী প্রশংসা গীতা বারবার করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়েও (শ্লোক, ১৮) আমরা সেই *সমদর্শিন্*-এর উল্লেখ পেয়েছি, অর্থাৎ 'যিনি সকল পরিস্থিতিতেই সমমনোভাবসম্পন্ন'। *সুহৃৎ* অর্থাৎ এমন 'একজন বন্ধু'—যিনি সর্বদাই হিতকামনা করেন; এবং *মিত্র*, সাধারণ 'বন্ধু'; *অরি* অর্থাৎ 'শত্রু'; *উদাসীন*, অর্থাৎ 'নিরাসক্ত ব্যক্তি'; *মধ্যস্থঃ*, 'যিনি বিবদমান দুই পক্ষকে সমদৃষ্টিতে দেখেন; *দ্বেষ্যঃ*, 'যিনি আপনাকে ঈর্ষা করেন', *বন্ধু*, 'আত্মীয়'; *সাধু*, 'ভালোমানুষ'; *পাপেষু*, 'পাপীদের প্রতি'; *সমবুদ্ধিঃ*, 'যিনি সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করেন'; *বিশিষ্যতে*, 'এই হলো সর্বোত্তম মানসিকতা'। যোগের পথে, আধ্যাত্মিক সচেতনতার পথে সামান্য একটু অগ্রসর হলেই আমাদের ভিতর এই ভাব জাগ্রত হয়। আপনি যদি আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হয়ে থাকেন, তাহলে কেউ আপনাকে তিরস্কার করলেও বা দুর্ব্যবহার করলেও আপনি মুহ্যমান হয়ে পড়বেন না। পোকা কামড়ালে যেমন মনে হয়, আপনারও তেমনই মনে হবে। আঘাতকে উপেক্ষা করার শক্তি আপনি কোথা থেকে পেলেন? সে শক্তি পেয়েছেন নিজের অন্তর থেকেই, কারণ আপনি আপনার অন্তরস্থ মহত্তম সত্তার, অনন্ত পরমাত্মার সংস্পর্শে রয়েছেন। কিন্তু যদি আমি অতিমাত্রায়

জাগতিক হই, জগতের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে মত্ত হয়ে থাকি, তাহলে এর যে-কোন একটিই আমার মানসিক শান্তি তছনছ করে দিতে পারে। অবশ্য আধ্যাত্মিক জীবনে একবার প্রবেশ করলে বাহ্য জগতের এইসব চাপ আর আপনাকে কষ্ট দিতে পারে না। আপনাকে বিপর্যস্ত করার ক্ষমতা তাদের আর থাকে না। এই ধরনের অসাধারণ অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন—কীভাবে আপনি মনকে বাহ্যঘটনার প্রভাব থেকে বাঁচাবেন? না, শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে তা কখনওই সম্ভব নয়; দৈহিক বল বেশিক্ষণ আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু যদি আপনার মন উচ্চতর কোন কিছুর সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাহলে আর এইসব বহির্জাগতিক ঘটনা কোনভাবেই আপনার মনে রেখাপাত করবে না। আপনি ভাববেন, 'যে যা বলে বলুক, আমার তাতে কিছুই আসে যায় না'। যোগের পথে পা না বাড়ালে কিন্তু এই মনোভাব আপনার মধ্যে কিছুতেই আসতে পারে না। একবার যোগমার্গে প্রবেশ করলে তখন অবশ্য ধীরে ধীরে সব কিছুই প্রশান্ত ও স্থির হয়ে যায়।

এই *সমবুদ্ধি*-র জয়গান গীতার বহু শ্লোকেই আমরা শুনতে পাই, যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৫ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে *সমদুঃখসুখম্*। ঐ দ্বিতীয় অধ্যায়েরই ৪৮ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে *সমত্বম্*। আবার পঞ্চম অধ্যায়ের ১৮ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে, *সমদর্শিনঃ*। দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩ সংখ্যক শ্লোকে এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৪ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে, সমদুঃখসুখঃ; দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে পাচ্ছি *সমবুদ্ধয়ঃ* এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ২৮ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে, *সমবস্থিতম্।*

এরপর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

—'যোগী একাকী নির্জনে স্থির হয়ে, সংযত দেহে এবং সংযত চিত্তে, আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রহ (করার সকল উদ্বেগ) থেকে মুক্ত হয়ে নিরন্তর মনঃসংযোগের অভ্যাস করবেন।'

যোগের দ্বারা যেসব মহৎ গুণ আয়ত্ত করা যায়, বিশেষ করে, অতি প্রয়োজনীয় চারিত্রিক শক্তি, সেসবের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এখন ধ্যানযোগ অভ্যাসের বিশেষ পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরিচিত করছেন। আগের আগের অধ্যায়গুলিতে তিনি যোগের যে শিক্ষা দিয়েছেন, এই শিক্ষা তার থেকে আলাদা।

দশম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন : *যোগী যুঞ্জীত সততম্ আত্মানম্*, 'যোগীকে নিরন্তর মনঃসংযোগের অভ্যাস করতে হবে।' কীভাবে এই মনকে কাজে লাগাতে হবে? কীভাবে মনকে গড়ে তুলতে হবে? কীভাবে মনকে শুদ্ধ করে তুলতে হবে? কীভাবেই বা তাকে একাগ্র করে তোলা যায়? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এ বিষয়ে যোগীকে অবিরত অভ্যাস চালিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু কীভাবে যোগী এই ধ্যানের অভ্যাস গড়ে তুলবেন? *রহসি স্থিতঃ*, এই বিশেষ যোগের ক্ষেত্রে 'নির্জনে স্থির হয়ে বসতে হবে'। কারণ একমাত্র শান্ত ও নির্জন স্থানেই মনকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়; বাইরের উত্তেজনায় সতত উদ্বেলিত, এমন কোন স্থানে মনের এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, *একাকী*, 'একলাই' মনঃসংযোগের চেষ্টা করতে হবে, ভিড়ের মধ্যে নয়। সত্যি কথা। একবার আপনি ইন্দ্রিয়গুলির এলাকার বাইরে যাওয়ার সাধনা শুরু করলে দেখবেন, তখন আর সেখানে অন্য কোন লোকের আদৌ প্রয়োজন হয় না। এমনকি যদি কেউ আপনার কাছে বসেও থাকেন, তবুও আপনি তার সান্নিধ্য অনুভব করবেন না। এই অনুভব না করার কারণ, তখন আপনি সম্পূর্ণ অন্য জগতে রয়েছেন; অন্যজনও ভিন্ন একটি জগতে রয়েছেন। তাই ধ্যানে বসলে স্বাভাবিকভাবেই আপনি *একাকী* হয়ে পড়েন। সেই সময়ে আপনার চারপাশে ভিড় থাকলেও আপনি একা, নিঃসঙ্গ। এই একাকীত্ব ধ্যানের একটি মহৎ গুণ। স্বামী, স্ত্রী, সন্তান—সকলে একত্রে বসে থাকলেও যখনই আপনি ধ্যান শুরু করবেন, তখন আর সেখানে স্বামী, স্ত্রী বা সন্তানের অস্তিত্ব থাকে না। তখন আপনি আপনার নিজের জগতে হারিয়ে গেছেন। এই হলো একাকীত্ব, এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। আমাদের মনে হতে পারে—সেই একাকীত্বকে কীভাবে উপভোগ করা যায়? তাও কি সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব, কারণ তখন আমরা উপলব্ধি করি যে, সত্য সত্যই আমরা একাকী নই; যোগ-এর মাধ্যমে তখন আমরা হৃদয়-গুহায় লুকিয়ে থাকা পরম ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করি। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘ সময় এবং নিয়মিত অনুশীলন এবং সেই কৌশলই এখানে বলা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়শই গাইতেন :

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন, তুই দেখ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে।

আপনি যেন আপনার হৃদয়ের মধ্যে ঢুকে গেছেন; সেখানে আপনি এবং জগন্মাতা ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই। এ হলো আপনার মনের উচ্চতম অবস্থা। কেবল নিয়মিত অনুশীলন এবং নৈতিক জীবন যাপনের মাধ্যমেই আপনি এই অবস্থায় পৌঁছতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এইভাবে যোগীকে সর্বদাই নিজের মন এবং অন্তর্জগতের শক্তিগুলিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করতে হবে। তাঁকে *যতচিত্তাত্মা* হতে হবে, অর্থাৎ 'যিনি তাঁর দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছেন'; *যত* মানে 'সুসংযত', এবং *যতি* মানে 'যিনি তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন'; এর দ্বারা একজন *সন্ন্যাসীকেও* বোঝানো হয়ে থাকে। *যতচিত্তাত্মা,* অর্থাৎ চিত্ত এবং আত্মা—দুই-ই সুনিয়ন্ত্রিত। এখানে *আত্মা* মানে শরীর। এছাড়াও তিনি *নিরাশীঃ,* অর্থাৎ 'বাসনাশূন্য' হবেন; তাঁর মধ্যে এমন কোন বাসনা থাকবে না, যা তার চিত্তকে বহির্মুখী করবে। *অপরিগ্রহঃ,* অর্থাৎ 'কারও কাছ থেকে দান গ্রহণ না করা।' আপনাকে বহুবিধ উপহার দেওয়া হবে এবং যখন আপনি সেগুলি গ্রহণ করবেন, তখন আপনার মন বাইরের জগতের দিকে ধেয়ে যাবে। যোগ সাধনায় *অপরিগ্রহঃ* তাই একটি মহৎ গুণ; পতঞ্জলির *যোগসূত্রে* (২.৩০) এর উল্লেখ আছে। সাংসারিক জীবনযাপন করলে, অন্য মানুষের সাহায্য প্রয়োজন হয়; কিন্তু আত্মোপলব্ধির এই পথে ওসব বস্তু আদৌ আমাদের কাজে লাগে না। তাই, অধ্যাত্ম সাধক অনুভব করেন যে, 'লোকে আর আমাকে কী দিতে পারে? বড়জোর টাকা বা আসবাবপত্র, না হয় এটা সেটা। কিন্তু আমার কাছে তো ওসবের কোন মূল্য নেই। আমি তো ওসবের প্রত্যাশী নই। আমি চাই পরম বস্তু।' সাধকের যখন এরকম উপলব্ধি হয়, এরকম মানসিক অবস্থা হয়, তখন *অপরিগ্রহ*-রূপ এই গুণ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছে উপস্থিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলে চলেছেন,

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥

—'শুদ্ধ স্থানে, বেশি উঁচু নয়, আবার বেশি নিচু নয়, এমন জায়গায় [যোগী তাঁর] আসন দৃঢ়ভাবে স্থাপন করবেন এবং সেই আসন হবে কুশের ওপর মৃগ-চর্ম এবং তার ওপর বস্ত্রখণ্ড স্থাপন করে।'

যোগ যে রীতিমত একটি বিজ্ঞান তা বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। এই বিজ্ঞানে

কী করণীয় এবং কীভাবে করণীয়, সে সম্পর্কে সব খুঁটিনাটি নির্দেশই এখানে দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই বলা হচ্ছে, একটি পরিষ্কার জায়গা বেছে নিন, *শুচৌ দেশে*; কী জন্য? ধ্যানের জন্য; *স্থিরম্ আসনম্ আত্মনঃ*, 'নিজের জন্য একটি দৃঢ় আসন রচনা করুন'। এই আসনটিকে অবশ্যই দৃঢ় হতে হবে। নাহলে দেহ এবং মন স্থির হবে না। নড়বড়ে *আসন* কাজের হয় না। অতএব, *শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম্ আসনম্ আত্মনঃ।* তারপর আবার আসন কীরকম হবে, তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে; গভীর চিন্তাপ্রসূত এইসব নির্দেশ। বলা হচ্ছে, *নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং*, 'খুব উঁচুও নয়, আবার খুব নিচুও নয়'; ধ্যানের পক্ষে দুই-ই হানিকর; আপনি পড়ে যেতে পারেন বা আপনার ওপর কোন কিছু পড়তে পারে—সবই সম্ভব। যদি আপনি খাদের মতো জায়গায় বসে ধ্যান করেন, সেখানে জল জমা হতে পারে। পরবর্তী নির্দেশ হচ্ছে, *চৈলাজিন কুশোত্তরম্;* আসনের জন্য তিনটি বস্তুর প্রয়োজন ঃ প্রথমে একটি সাধারণ কুশাসন, যা আর্দ্রতা থেকে আপনাকে রক্ষা করবে; তার ওপর একটি হরিণের চামড়া এবং তার ওপর নরম তুলোর কাপড়। *চৈলাজিনকুশ;* তিনটি বস্তু, একটির ওপর একটি। সবচেয়ে নিচেরটি হলো *কুশ* এবং সবচেয়ে ওপরেরটি হলো *চৈল* অর্থাৎ 'কাপড়'। কী নিখুঁত নির্দেশ। এইভাবে আসন প্রস্তুত করে, এবার আপনি যোগবিজ্ঞানের পরীক্ষায় নামবেন। এটি হলো কেবল প্রস্তুতি পর্ব, যেন একটি বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরি তৈরি করা হলো।

এখন আপনি কী করবেন?

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

—'সেখানে, সেই আসনে উপবেশন করে, মনকে একাগ্র করে, ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়াগুলিকে সংযত করে চিত্তশুদ্ধির জন্য *যোগ* অভ্যাস করবেন।'

এরপর, *তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা*, 'সেখানে মনকে একাগ্র করতে চেষ্টা করে'; *যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ*, 'চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে নিয়মিত এবং সংযত করে'; *উপবিশ্য আসনে*, 'ঐ আসনে উপবেশন করে'; *যুঞ্জ্যাৎ যোগম্*, 'আপনি যোগের অভ্যাস করতে পারেন'। কী উদ্দেশ্যে? *আত্মবিশুদ্ধয়ে*, 'নিজেকে শুদ্ধ করার জন্য'। তাৎপর্য হলো, আপনি যে ধ্যানের আসনে বসে ঈশ্বরকে নিচে নামিয়ে আনবেন, তা নয়। ঈশ্বর আপনার মধ্যেই বিরাজ করছেন, তবে কিছু প্রতিবন্ধক

থাকায় তিনি যেন ব্যক্ত হতে পারছেন না। আপনাকে এই বাধাগুলি দূর করতে হবে। তাহলেই ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশিত হবেন। তলায় আছে আগুন, কিন্তু ছাই-চাপা থাকায় তা আপনার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। ছাই সরিয়ে দিন, আগুন নিজে থেকেই প্রকাশিত হবে। প্রকাশ পাওয়া না পাওয়া নিয়েই সমস্যা। বেদান্ত মতে আপনাকে নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করতে হবে না; ঈশ্বর সেখানে আগে থেকেই আছেন। এবার, পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখুন, এই যোগ-বিজ্ঞানের আচার্য কতটা সতর্ক! কী সুগভীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন! বলছেন,

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥

—'দৃঢ়তার সঙ্গে দেহ, মস্তক এবং গ্রীবাকে সোজা এবং স্থির রেখে, (চোখের তারাকে অচঞ্চল রেখে, যেন) নিজের নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে তিনি অবস্থান করবেন।'

সেখানে, সেই আসনে, আপনার দেহকে সোজা রাখুন; শরীরের তিনটি অংশ—*কায়, শিরস্* এবং *গ্রীবা* , (শরীর, মাথা এবং ঘাড়) অবশ্যই যেন সোজা এবং স্থির থাকে। মেরুদণ্ড সোজা রেখে স্থির হয়ে বসবেন। কুঁজো হয়ে বা বেঁকেচুরে বসা ঠিক নয়। শরীরের স্থিরতা সতর্কতার লক্ষণ ঃ *ধারয়ন্ অচলং স্থিরঃ,* 'সম্পূর্ণ স্থির, কোনরকম নড়াচড়া নেই'। *সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং,* 'মনকে আত্মায় একাগ্র করা হচ্ছে। এই অবস্থায় চোখ সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে যায়'। শঙ্করাচার্য এই শব্দগুলির অর্থ করেছেন— 'দৃষ্টি যেন নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ'। কিন্তু বুঝতে হবে, নাকের অগ্রভাগ ধ্যানের বিষয় *নয়*; ধ্যানের বিষয় আত্মা।

দিশশ্চ অনবলোকয়ন্, 'এখানে ওখানে চারদিকে দৃষ্টি না দিয়ে'; অর্থাৎ আপনার মন যেন ইতস্তত না ঘুরে বেড়ায়। এর অর্থ হলো, এখনও আমরা মানবীয় আচরণের এলাকায় রয়েছি; সেখান থেকে যাত্রা করছি অন্তর্জগতের উদ্দেশ্যে, নিজেরই ভিতরে। বাইরের জগৎ বাইরেই পড়ে থাকল। এইভাবে যোগচর্চার বিজ্ঞান এবং কলাকৌশল আমরা অনুসরণ করতে শুরু করি।

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

—'প্রশান্ত এবং নির্ভীক হৃদয়ে, ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিত হয়ে, মনকে বশীভূত করে

এবং সদা মদ্গতচিত্ত হয়ে, আমাকেই পরম লক্ষ্য বলে জেনে তিনি (যোগে) বসবেন।'

প্রশান্তাত্মা, অর্থাৎ 'যাঁর মন শান্ত'; তারপর *বিগতভীঃ,* অর্থাৎ 'নির্ভীক'। আমরা ভয়ের হাত থেকে বাঁচতে চাই। নির্ভীক হওয়াই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু নিজেদের প্রকৃতির এক সামান্য জীব ভেবে পশুপাখী, কীটপতঙ্গ এবং অন্যান্য মানুষ—সকলের ভয়েই আমরা ভীত। এবার আমরা নির্ভীকতার স্তরে উঠতে চলেছি। কিন্তু একমাত্র আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ছাড়া, অন্য আর কোনভাবেই নির্ভীক হওয়া সম্ভব নয়। *ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ,* 'ব্রহ্মচর্যের অনুশীলনে রত'। *মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো,* 'এইভাবে মন সংযত করে এবং আমাতে', অর্থাৎ সকল জীবের অন্তর্যামিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করে; *যুক্ত আসীত মৎপরঃ,* 'সেই সাধক আমাতেই স্থিত এবং পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উপবেশন করবেন।' শ্রীকৃষ্ণই মানুষের সকল সাধনার পরম লক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণকে *যোগেশ্বর* বলা হয়। যোগের মাধ্যমে আমরা সেই *যোগেশ্বর-এর* অনুসন্ধান করি। গীতার অন্তিম অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে দেখবেন, বলা হচ্ছে, *যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ,* অর্থাৎ 'যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আছেন।' সকল সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য সেই পরম ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব লাভ; এ এমন পরম প্রাপ্তি যা আপনাকে সকলের সঙ্গে একীভূত করে, কারণ ঈশ্বর সকল জীবের মধ্যেই রয়েছেন। এই ভাবেই এই পৃথিবীতে, এই জীবনে এবং এই শরীরেই, যোগী তাঁর সর্বব্যাপিত্বের অনুভূতি লাভ করে থাকেন।

এইভাবে অভ্যাস করলে কী হয়?

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

—'এইভাবে মনকে সর্বদা দৃঢ়নিবিষ্ট করে, সংযতচিত্ত যোগী আমাতে অবস্থিত পরম শান্তি লাভ করেন—যে শান্তির পরাকাষ্ঠা *নির্বাণ* (মোক্ষ) লাভে।'

যুঞ্জন্ এবং, 'এইভাবে যোগের অভ্যাস করে'; *সদা,* 'সর্বদাই'; *আত্মানম্,* যোগের মাধ্যমে এই আধ্যাত্মিক বিকাশলাভের মহান যন্ত্ররূপে 'নিজেকে ব্যবহার করে'; কী করে? *নিয়তমানসঃ,* 'সংযত মনের সাহায্যে', আপনি *শান্তিং,* 'মহাশান্তি' লাভ করেন। সেই শান্তির প্রকৃতি কী ধরনের? *নির্বাণ পরমাং,* যে শান্তি আপনাকে *নির্বাণ*-এর দিকে নিয়ে যাবে। *নির্বাণ* হলো আপেক্ষিক দ্বন্দ্বময় জগতের অতীত পূর্ণ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। যখন সব জাগতিকতা এবং আপেক্ষিকতার পারে পৌছান

যায়, বুদ্ধ এবং বহু মহান ঋষি যেখানে পৌঁছেছিলেন, তখনই মানুষ পরম শান্তি লাভ করে। *নির্বাণ পরমাং শান্তিম্,* '*নির্বাণ* থেকে যে শান্তি আসে।' *মৎসংস্থাম্,* 'আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার অবস্থা'। আমাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েই যোগী তাঁর পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি করেন। তাই *মৎসংস্থাম্ অধিগচ্ছতি,* 'যোগী আমার স্বরূপ-অবস্থা লাভ করেন। এ হলো প্রারম্ভিক যোগসাধনার এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা—আসন প্রস্তুত করে বসা থেকে নিজের দেহ-মনকে স্থির করা এবং তারপর গভীরে ডুব দেওয়া। কয়েকটি শ্লোকের মাধ্যমে ধ্যানের সমগ্র বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।

এখন যদি আপনি এই পথে সাফল্য অর্জন করতে চান, তবে তার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে দেখা যায়, মানুষ অনেকরকম কৃচ্ছ্রসাধন করেন—যেমন দীর্ঘকাল উপবাসী থাকা, প্রখর রোদে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি। এমনকি খ্রিস্টীয় মরমী সাধকরাও প্রথম দিকে এইরকম কঠোরতা করতেন যদিও মহান আচার্যরা সেগুলিকে কোন গুরুত্ব দেননি। দেহবোধ দূর করার জন্য কিছু কিছু খ্রিস্টান মরমীয়া সাধক তো সর্বক্ষণ লাঠির আঘাতে নিজেদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করতেন। কিন্তু এইধরনের অর্থহীন শারীরিক নির্যাতন মহত্তম আচার্যরা কখনওই সমর্থন করেননি। তাঁরা বলেছেন, যোগের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে এক শান্ত মানসিকতা আসা দরকার। বুদ্ধর জীবন আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। বুদ্ধও প্রথমদিকে উপবাস ইত্যাদির মাধ্যমে প্রভূত কঠোরতা করেছিলেন। কিন্তু তার ফলে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। অবশেষে সুজাতা নাম্নী এক বালিকার দেওয়া পরমান্ন আহার করে, তৃপ্ত হয়ে তিনি সত্যোপলব্ধির জন্য ধ্যানে বসেন। বোধিলাভের পর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ বলেছেন, 'আমি দেখেছি, আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনায়, প্রত্যেকেই শারীরিক কঠোরতা করেন। আমিও দীর্ঘদিন এইভাবে উপবাস করেছি। কিন্তু একদিন যখন আমি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম, দেখি আমার শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। আমি পড়ে গেলাম। দেখতে পেলাম আমার পেট আর পিঠ এক হয়ে গেছে। আমি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম! তখন ভাবলাম, আমি কী মূর্খের কাজই না করছি! এই শরীরই আমার একমাত্র যন্ত্র, যার সাহায্যে আমি সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি। আর তাকে কিনা আমি দুর্বল করে ফেলছি। এ আমার মস্ত ভুল। না, আমি আর এই ভুল করব না।' এরপরই তাঁর কণ্ঠ থেকে উদ্গাত হলো সেই মহামন্ত্র, *মধ্যপন্থা,* অর্থাৎ 'মধ্যবর্তী পথ।' অতিমাত্রায় কৃচ্ছ্রতাসাধনও নয়, আবার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির স্রোতে ভেসে যাওয়াও নয়—দুয়ের মাঝামাঝি একটা পথ বেছে নিতে হবে এবং অধিকাংশ সময় নিজেকে অধ্যাত্মসাধনায়

ডুবিয়ে রাখতে হবে। এই হলো *মধ্যপন্থা,* যা পরবর্তিকালে জ্ঞান লাভের পর বুদ্ধ তাঁর পাঁচজন শিষ্যের কাছে সারনাথে প্রচার করেছিলেন।

এখানে এই গীতাতেও এই একই ভাব প্রচারিত হয়েছে। বাস্তবিক, সুস্থ আধ্যাত্মিক জীবনে অর্থহীন কৃচ্ছ্রসাধন এবং নিষ্প্রাণ তপস্যার কোন স্থান নেই। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য আমরা পরবর্তী শ্লোকে পাচ্ছি। সেখানে তিনি বলছেন,

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬ ॥

—'হে অর্জুন, যাঁরা অতি আহার করেন বা যাঁরা দীর্ঘকাল অনাহারে থাকেন; যাঁরা বহুক্ষণ নিদ্রাভিভূত থাকেন, অথবা দীর্ঘকাল বিনিদ্র থাকেন, তাঁদের পক্ষে যোগ (-এ সিদ্ধিলাভ) করা সম্ভব হয় না।'

যিনি খুব বেশি খান, তিনি *যোগী* হতে পারবেন না। আবার যিনি কিছুই খান না, তিনিও *যোগী* হতে পারবেন না। দেখুন, এখানে দুইধরনের মানুষের কথাই বলা হয়েছে। *নাত্যশ্নতস্তু, অতি* মানে 'অত্যধিক'; অশ্নতঃ মানে 'যিনি আহার করেন'। তেমনি, *ন চৈকান্তম্ অনশ্নতঃ,* 'তাঁদের পক্ষেও সম্ভব নয়, যাঁরা দীর্ঘকাল উপবাস করেন'; এধরনের মানুষও *যোগী* হতে পারেন না। একইভাবে, *ন চ অতি স্বপ্নশীলস্য,* 'তাঁর পক্ষেও সম্ভব নয়, যিনি অতিমাত্রায় ঘুমান'; তাঁরাও *যোগী* হতে পারেন না। তারপর, *জাগ্রতো নৈব চার্জুন,* 'হে অর্জুন, যিনি সর্বদা জেগে থাকেন, তাঁর পক্ষেও যোগী হওয়া সম্ভব নয়;' এইরূপ নর নারীও যোগী হতে পারেন না। এ হলো যোগের নেতিবাচক দিক। পরবর্তী শ্লোকে ইতিবাচক দিকটি দেখানো হয়েছে,

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

—'যিনি আহারে, বিহারে, কর্ম প্রচেষ্টায় এবং নিদ্রায় ও জাগরণের ক্ষেত্রেও মিতাচারী, তাঁর পক্ষে যোগ দুঃখনাশের কারণ হয়।'

কী সুন্দর এবং যুক্তিপূর্ণ কথা! *যুক্তাহার বিহারস্য,* অর্থাৎ 'পরিমিত আহার এবং বিহার, অর্থাৎ বিনোদন'; *যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু,* 'পরিমিত কর্মপ্রচেষ্টা'। সর্বদাই কর্মে ব্যস্ত থাকা উচিত নয়, আবার আলস্যও ভালো নয়; *যুক্তস্বপ্নাববোধস্য,*

'যাঁর নিদ্রা এবং জাগরণ পরিমিত।' তাঁর কাছে 'যোগ দুঃখনাশক হয়ে ওঠে', *যোগো ভবতি দুঃখহা।* এই ভাবেই আমরা যোগসাধনের ফল পেতে পারি।

যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট, তাঁদের পক্ষে এর চাইতে ভালো উপদেশ আর হয় না। এখনও লোকে নানারকম সাধন করেন; কিন্তু বুদ্ধ, কৃষ্ণ, পতঞ্জলির মতো মহান আচার্যরা এ বিষয়ে কী বলেছেন, সে সত্য তাঁরা জানেন না। তাঁদের নিজস্ব কিছু প্রবণতা থাকে এবং তাঁরা সেগুলিকেই অনুসরণ করেন। কিন্তু এই ধরনের সাধনে খুব বেশি লাভ হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ এই নির্দেশ দিচ্ছেন।

মনে রাখতে হবে, যিনি যথার্থ যোগী, তাঁর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই; তিনি একজন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ; শুধু তিনি গভীর সত্যের অনুসন্ধান করেন এবং সেই অন্বেষণ চলে তাঁর অন্তরে, বাইরে নয়। বাইরের জাগতিক অন্বেষণ তিনি শেষ করেছেন। তিনি তাঁর সব দায়-দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিবার থাকলে তিনি সন্তানদের বিয়ে-থা দিয়ে এখন একটু অবসর পেয়েছেন। যাঁদের জীবনে এরকম সুযোগ এসেছে, তাঁরাই এই যোগ অভ্যাস করে জীবনের সর্বোত্তম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন। অবশ্য, যাঁরা যৌবনেই এই যোগসাধনায় মগ্ন হয়েছেন তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা অসাধারণ। সাংসারিক জীবনের প্রতি কোনকালেই তাঁদের কোন আকর্ষণ ছিল না; তাই যৌবনকাল থেকেই তাঁরা এই যোগের পথ অবলম্বন করেছেন। সংসার-দায়মুক্ত মানুষ এবং অসংসারী—এই দু-ধরনের মানুষের জন্যই যোগের পথ খোলা। আপনি আধ্যাত্মিক জীবন এবং যোগের পথ যে-কোন সময়ে এবং জীবনের যে-কোন পর্যায়েই বেছে নিতে পারেন। আপনি যখনই নিজেকে এ পথের যোগ্য মনে করবেন, তখনই এ পথে প্রবেশ করতে পারেন; এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি ভাবতে পারেন, 'এখনও আমি এর যোগ্য নই। আমার অনেক কাজ বাকি'। বেশতো, তাতে কোন ক্ষতি নেই। যখন সময় হবে, তখনই আপনি এ পথে আসবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলতেন। একটি ছেলে শোবার সময়ে তার মা-কে বলছে, 'মা, আমার বাহ্যে পেলে আমাকে জাগিয়ে দিও'। মা বলছেন, 'বাবা, বাহ্যে পেলে তুমি আপনিই জেগে উঠবে; আমাকে আর ডেকে দিতে হবে না।' তেমনি, ভগবানলাভের ব্যাকুলতা জাগলে আপনি তাকে রোধ করতে পারবেন না। প্রতিটি মানুষের জীবনেই কখনও না কখনও এই ব্যাকুলতা আসবে এবং

যখনই তা আসবে, তখনই উঠে পড়ে লেগে যাওয়া কর্তব্য। সেইটিই সবচেয়ে বড় কাজ। তখন আর এই ডাক অবহেলা করবেন না। মহান আচার্যরা আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন। অনাবশ্যক শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনের কথা তাঁরা বলেননি।

একবার দুই মহিলাভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁরা প্রণাম করলেন। তাঁরা উপবাসী ছিলেন। তাঁদের সংকল্প ছিল শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম করার পরই তাঁরা আহার করবেন। তাঁদের কিছু উপদেশ দেবার পর যখন শ্রীরামকৃষ্ণ জানতে পারলেন যে তাঁরা উপবাসী আছেন, তখন তিনি বললেন, 'তোমরা উপবাস করে এসেছ কেন? খেয়ে আসতে হয়। মেয়েরা আমার মা-র এক-একটি রূপ কিনা; তাই তাদের কষ্ট আমি দেখতে পারি না; জগন্মাতার এক-একটি রূপ। খেয়ে আসবে, আনন্দে থাকবে। তারপর তিনি তাঁদের মন্দিরের প্রসাদ খাইয়ে বললেন, তোমরা কিছু খেলে, এখন আমার মনটা শীতল হলো; আমি মেয়েদের উপবাসী দেখতে পারি না।' (কথামৃত, উদ্বোধন, ১ সং, পৃঃ ৫২০, ২৪ মে, ১৮৮৪)। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর মধ্যে এটি অতি সুন্দর ঘটনা।

সে যাই হোক, বর্তমান শ্লোকে আমরা দেখছি যে, যোগের ফলে আমাদের সকল দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে।

এই অধ্যায়ের ১৬ এবং ১৭ সংখ্যক শ্লোক দুটি আমাদের কাছে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্য তুলে ধরেছে। কী সেই সত্য? তা হলো—বাড়াবাড়ি না করে মধ্যপথই অনুসরণীয়, বুদ্ধ যে-পথকে বলেছেন—*মধ্যপন্থা*। অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধন যেমন ভালো নয়, তেমনি আবার অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সুখভোগও ভালো নয়। এইভাবেই যদি চলি, তাহলেই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। অন্য সব কিছুই হলো নিছক 'ধর্মীয়' ব্যাপার। কিছু কৃচ্ছ্রসাধন করে আপনি ধার্মিক হতে পারেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে এর তেমন কিছু দাম নেই। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আপনি যদি মধ্যপন্থা অনুসরণ করে পরিমিত আহার, পান, বিশ্রাম ও কাজকর্ম করেন, তাহলে যোগের মাধ্যমে আপনার সব দুঃখকষ্ট বিনষ্ট হবে। আধ্যাত্মিক বিকাশের পক্ষে চরম পথ ভালো নয়। বুদ্ধ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তার বহু পূর্বেই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই সত্যের কথা আমাদের বলেছেন।

এখন ১৮ সংখ্যক শ্লোকটি শুরু হচ্ছে। এখানে ধ্যানের পদ্ধতি ও কৌশল বলা হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

—'সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত চিত্ত যখন সকল কামনা-মুক্ত হয়ে, আত্মাতে শান্তভাবে অবস্থান করে, তখন সেই ব্যক্তিকে (আত্ম-) সমাহিত বলা হয়।'

মনকে *যুক্তঃ* অর্থাৎ 'যোগে প্রতিষ্ঠিত' বলা যায় তখনই, যখন *বিনিয়তং চিত্তম্,* অর্থাৎ '*চিত্ত* বা মন সংযত হয়ে'; *আত্মন্যেব অবতিষ্ঠতে,* 'শুধুমাত্র আত্মাতেই অবস্থান করে', ইতস্তত ছুটে বেড়ায় না। কেবল তখনই আমরা বলতে পারি যে, মন *যুক্তঃ* হয়েছে; চিত্ত যোগে আরূঢ় হয়েছে। এই হলো প্রথম বক্তব্য। এরপর বলা হচ্ছে, *নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যঃ,* 'কোন বাহ্য কামনা মনে উদিত হয়ে মনকে চঞ্চল করে না'। তখন তা সম্পূর্ণরূপে আত্মস্বরূপে স্থিত হয়েছে। *যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা,* 'তখন বলা হয়, মন *যুক্ত,* অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে'। এরপর শ্রীকৃষ্ণ একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন ঃ

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা ।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

—"বাতাসবর্জিত স্থানে দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না"—যিনি আত্মায় মনকে একাগ্র করার সাধনা করছেন, সেই সংযতচিত্ত যোগীর ক্ষেত্রেও ঐ একই উপমা দেওয়া হয়েছে।

তেলের প্রদীপ বাতাসবর্জিত কোন স্থানে রাখলে, তার শিখাটি যেমন সম্পূর্ণ স্থির হয়ে থাকে, তেমনিই হলো স্থির, সমাহিত অর্থাৎ চাঞ্চল্যহীন মনের অবস্থা। যোগাবস্থাকে সেই নিষ্কম্প দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করা হয়। শিখা সর্বক্ষণ আন্দোলিত হলে বুঝতে হবে চারিদিকে ঝোড়ো বাতাস বইছে—আর শিখাটি সেই বায়ুস্রোতে প্রভাবিত হচ্ছে। কিন্তু, দীপটিকে যদি এমন স্থানে রাখা যায়, যেখানে বাইরের বাতাস ঢুকতে পারে না, তাহলে দেখা যাবে তার শিখা সম্পূর্ণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যোগের অবস্থায় মন এমনই স্থির ও অচঞ্চল থাকে। এ অবস্থাটি আয়ত্ত করা যে অতি কঠিন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার জন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘ অনুশীলন। কিন্তু এই অবস্থা লাভ করা যায় না—এমন নয়। বহু সাধক তা লাভ করেছেন এবং যে কেউ এই যোগে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। এরপর কয়েকটি শ্লোকে সেই ধ্যানের স্বরূপ এবং ধ্যানের ফল সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বলবেন।

যথা দীপো নিবাতস্থো ন ইঙ্গতে; ইঙ্গনম্ মানে যা কাঁপছে বা তরঙ্গায়িত হচ্ছে। যোগীর নিরুদ্ধ চিত্ত কিন্তু নিশ্চল, অকম্পিত দীপশিখার মতো। *সোপমা স্মৃতা,* 'যোগে মনের অবস্থা সম্পর্কে এ হলো এক সুপরিচিত উপমা'; *যোগিনো যতচিত্তসা,* 'সংযতচিত্ত যোগীর'; *যুঞ্জতো যোগম্ আত্মনঃ,* 'যিনি আত্মায় মন নিবিষ্ট করার জন্য অনুশীলন করছেন, তাঁর'।

বস্তুতপক্ষে, এই সত্যটি দিয়েই ঋষি পতঞ্জলি তাঁর বিখ্যাত যোগসূত্র শুরু করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের মনের দুটি অবস্থা আছে—বিক্ষিপ্ত অবস্থা এবং একত্রিত অবস্থা। মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থাই হলো জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা। হাজার জিনিসের মাঝে মন ছড়িয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, যাকে নিদ্রা বলা হয়, সেটিই মনের একত্রিত অবস্থা। প্রতিদিনই আপনার মনটি এইভাবে একত্রিত হচ্ছে। তখন আপনি সম্পূর্ণ শান্ত এবং স্থির। কিন্তু আপনি যখন সচেতনভাবে মনকে একত্রিত করেন, তখন আবার সেই একত্রিত অবস্থার আর একটি নতুন রূপ উন্মোচিত হয়। তাকেই যোগ বলা হয়েছে। কয়েকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তা ব্যাখ্যা করবেন।

মনের এই একত্রিত অবস্থা লাভ করবার জন্য মানুষকে সাধনা করতে হয়, চেষ্টা করতে হয়। আপনার হয়ে প্রকৃতি তা করে দেবে না। প্রকৃতি আপনাকে সামর্থ্য দিয়েছে, কিন্তু কাজটি আপনাকেই করতে হবে। অতএব, নিজের ওপর যথার্থ প্রভুত্ব করতে হলে মনের বিভিন্ন অবস্থার একত্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আমাদের করতে হবে। মন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হলে জীবনে মুক্তি আস্বাদন করা যায়। তাই প্রতিটি মানুষেরই এই চিত্তসংযম প্রয়োজন, অন্তত সামান্য পরিমাণে হলেও। মনকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা আপনার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু কিছুটাও যদি মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলেও তা আপনার কল্যাণ করবে। যখনই মনের মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হবে, তখনই সাবধান হয়ে যেতে হবে, বুঝতে হবে ক্রোধ আসছে এবং তখনই তাকে দমন করা চাই। মন যাঁর বশীভূত, তিনিই এমনটি করতে পারেন। ক্রুদ্ধ হলে লক্ষ্য করে দেখবেন যে, ক্রোধ যেন ক্রমশ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে। মন পরিশীলিত হলে আবেগের এইসব সূক্ষ্ম দিকগুলো আমরা সহজেই ধরতে পারি এবং অন্যের উপর ফেটে পড়ার আগেই ক্রোধের গতি আমরা রোধ করতে পারি। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি মানুষেরই এই ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। সুস্থ মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং সর্বোপরি, আত্মোপলব্ধির জন্য, পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার জন্য,

এই সামর্থ্য অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। যোগের মূল উদ্দেশ্যই এই—মনকে ঠিক ঠিক সংযত করে, তারই সাহায্যে আমাদের অসীম স্বরূপকে উপলব্ধি করা। মনের সেই সামগ্রিক সংযম বা নিরোধকেই এখানে *যোগ* বলা হয়েছে।

এই *ধ্যান* গীতার একটিমাত্র অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। গীতার *যোগ* কিন্তু ধ্যানযোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তা আরও ব্যাপক। ধ্যানযোগ গীতার সামগ্রিক যোগের একটি আনুষঙ্গিক দিকমাত্র। গীতার যে পূর্ণাঙ্গ যোগ, তাতে দৈনন্দিনকর্ম, মানবিক সম্পর্ক ও আরও নানা বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ধ্যানের কথাও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ জীবনের ঐ সব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে গেলে ধ্যান আপনাকে সাহায্য করবে। অতএব, *ধ্যান* হলো গীতার সামগ্রিক যোগের একটি অংশমাত্র, সমগ্র বিষয় নয়। কেউ কেউ হয়তো ধ্যানে উৎসাহী নাও হতে পারেন, কিন্তু তবুও যোগী হতে তাঁদের কোন বাধা নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্টই বলেছেন, 'অন্য কোন যোগের সহায়তা ছাড়াই একজন *কর্মযোগী* সত্য উপলব্ধি করতে পারেন, আত্মসাক্ষাৎকার করতে পারেন, কারণ এটিও একটি পথ।' কিন্তু কর্মযোগী যদি ধ্যান অভ্যাস করেন, তবে তা তাঁর কাজের পক্ষে সহায়ক হবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতার সার্বিক যোগের সঙ্গে এই শিক্ষাটিকেও যুক্ত করেছেন। এই কারণেই আঠারোটি অধ্যায়ের মধ্যে শুধু এই ষষ্ঠ অধ্যায়টিতেই ধ্যানযোগের আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ আধ্যাত্মিক জীবনে এবং বিশেষত গীতায় আলোচিত যোগযুক্ত জীবনে এই হলো ধ্যানের তাৎপর্য। এরপর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

—'একাগ্রতা অভ্যাসের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সংযত মন যখন প্রশান্তি লাভ করে এবং যখন আত্মা [শুদ্ধমন] দ্বারা আত্মাকেই প্রত্যক্ষ করে, তখন সাধক আত্মাতেই (প্রত্যগাত্মাতেই) পরিতুষ্ট হন।'

এখন আমরা কতকগুলি শ্লোক পরপর পাব, যেগুলির শুরু 'যখন' দিয়ে, 'যখন এটা হয়, যখন ওটা হয়', এইভাবে এবং শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলবেন, 'এই হবে তার ফল।' অতএব প্রথমে, *যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধম্,* 'যখন এই *চিত্ত* বা মন অন্তর্মুখী হয়'; *উপরমতে,* অর্থাৎ 'উপরত হয়'; *যোগসেবয়া,*

'যোগাভ্যাস করে'; *যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্ আত্মনি তুষ্যতি,* 'যখন আপন প্রত্যগাত্মায়, পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে আপনি কেবল পরমাত্মাতেই পরিতুষ্টি লাভ করেন'। ভারী চমৎকার কথা! বাইরের বিষয়গুলি থেকে মন গুটিয়ে নিলে আমাদের মন শূন্য হয়ে যাচ্ছে না। বস্তুত আমরা তখন নিজের ভিতরে যে অনন্ত দিব্য সত্তা বিরাজমান, তাঁকে খুঁজে পাই এবং সেই প্রাপ্তির আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই। যখন তা হয় ঃ

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥

—'যখন সাধক সেই অনন্ত আনন্দ অনুভব করেন, যে আনন্দ (বিশুদ্ধ) বুদ্ধিতে উপলব্ধ হয় এবং যা ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং যেখানে প্রতিষ্ঠিত হলে সাধক আর কখনওই তাঁর যথার্থ স্থিতি [আত্মস্বরূপ] থেকে বিচলিত হন না।'

সুখম্ আত্যন্তিকং যৎ তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্; অর্থাৎ 'পরম সুখ', *আত্যন্তিকং সুখম্।* আপনি সেই *আত্যন্তিকং সুখম্,* 'অনন্ত সুখ' অনুভব করতে শুরু করেন ; *যৎ তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যম্,* 'আপনার *বুদ্ধি* যা গ্রহণ করতে পারে'; *অতীন্দ্রিয়ম্,* 'ইন্দ্রিয়গুলি তা ধরতে পারে না।' আত্মার সংস্পর্শে আসার অতুলনীয় আনন্দকে *বুদ্ধি* যখন গ্রহণ করতে পারে, তখন সেই আনন্দ হলো *বুদ্ধিগ্রাহ্যম্;* এবং তা *অতীন্দ্রিয়ম্,* 'আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কখনওই সেখানে পৌঁছাতে পারে না', কারণ তাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয়গুলিই স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে কাজ করে এবং স্নায়ুতন্ত্রের প্রেরণাশক্তির গতি নির্ধারিত হয় ইন্দ্রিয়গুলির কর্মক্ষমতার ওপর। এমনকি বিজ্ঞানীরাও প্রশ্ন করেন, স্নায়ুর আবেগ-পরিবাহী গতিবেগ কতটুকু? বড়জোর ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার। কত সাধারণ এই গতিবেগ! কীভাবে তা পরম সত্যের গভীরে প্রবেশ করবে?

তাই, *অতীন্দ্রিয়ম্* কথাটির ওপর বারবার জোর দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, আত্মানুভূতির সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয় ও স্নায়ুতন্ত্রের নাগালের বাইরে। এখানে ইন্দ্রিয়গুলির কোন মূল্য নেই। যখন আপনি ধ্যানে বসেন, তখন ইন্দ্রিয়গুলিকে বিদায় দিয়েই বসেন। ধ্যানের সময়ে তাদের কোন প্রয়োজন হয় না বলে তারা বাইরেই পড়ে থাকে। ইন্দ্রিয়াদির প্রতি এই মনোভাব তাদের তাচ্ছিল্য করার জন্য নয়, সত্যানুভূতির উচ্চতর, গভীরতর স্তরে উন্নীত হবার জন্য। জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রায়শই আপনাকে তলিয়ে দেখতে হয়, অনুসন্ধানকে

গভীর থেকে গভীরতর করে তুলতে হয়, যাতে প্রকৃতি তার রহস্য আপনার কাছে উন্মোচিত করতে পারে। তাই এই ইন্দ্রিয়গুলি কেবল মানবজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে, বিশেষত বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেই কাজে লাগে।

অতএব, *বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্;* এখানে কেবল *বুদ্ধি* বা প্রবুদ্ধ বিচারশক্তিই কাজে আসে, কারণ বুদ্ধিই আত্মার সব থেকে কাছাকাছি। বুদ্ধি অত্যন্ত সূক্ষ্ম জিনিস। তাকে ঠিকমতো তালিম দিলে, তার মধ্যে সত্যকে অনাবৃত করার এক দুর্লভ শক্তি জেগে ওঠে। উপনিষদে এই কথাই বলা হয়েছে। প্রশিক্ষণ দিয়ে যে-কোন শক্তিকেই অন্তর্ভেদী করে তোলা যায়। আলোকরশ্মির কথাই ধরুন; যথাযথ পরিচর্যার দ্বারা তার স্পন্দনের দ্রুততা বৃদ্ধি করলে তা তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী হয়ে উঠবে, যেমন x-ray, যদিও এমনিতে তা একটি সামান্য রশ্মিমাত্র। সেই রকম একটি লেজার রশ্মিও দ্রুত স্পন্দিত হওয়ার দরুন অন্তর্ভেদী ক্ষমতার অধিকারী হয়। এই অবস্থাটি বুদ্ধির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে, তাকে বলা হয় *বুদ্ধিগ্রাহ্যম্।* সেই বুদ্ধিই আত্মোপলব্ধির অসীম আনন্দের ধারণা করতে পারে।

তাই বলা হচ্ছে, *বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্।* এই ধারণাটি এসেছে *কঠোপনিষদ* থেকে (১.৩.১২)। সেখানে বলা হয়েছে, *দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ*—এই আত্মা সকল জীবের মধ্যেই বিরাজ করছেন, কিন্তু তিনি আবৃত হয়ে আছেন। তিনি কি এইভাবে সর্বদাই গুপ্ত থাকবেন? না, আমরা তাঁকে খুঁজে বার করতে পারি। *দৃশ্যতে,* 'তিনি দৃষ্ট হন'। কীভাবে? *অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা,* 'যখন সাধারণ বুদ্ধি একাগ্র অর্থাৎ একমুখী হয়'; এই হলো সেই অভিব্যক্তির প্রকৃতি। কীকরে আপনি এই সূক্ষ্ম বুদ্ধি লাভ করবেন? সূক্ষ্ম হতে ক্রমশ সূক্ষ্মতর সত্যের অবধারণে বুদ্ধিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে। শেষে, এমন একটা সময় আসে যখন এই বুদ্ধি সূক্ষ্মতম সত্যকে, অর্থাৎ আত্মাকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করে। *সূক্ষ্ম বুদ্ধি* সূক্ষ্ম বস্তুকে উপলব্ধি করতে পারে এবং *স্থূল বুদ্ধি কেবল* স্থূল বস্তুকেই উপলব্ধি করতে পারে। *সূক্ষ্মদর্শিভিঃ,* 'যাঁরা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সত্যগুলিকে উপলব্ধি করার উপযুক্ত করে নিজেদের অনুশীলিত করেছেন'। এই ধরনের মানুষদের সূক্ষ্মদর্শী বলা হয়। চিত্তের একাগ্রতার জন্যই কেউ *সূক্ষ্মদর্শী* হতে পারেন এবং এই সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি তাঁর *সূক্ষ্মবুদ্ধির* দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাই আমাদের মনকে যতদূর সম্ভব একাগ্র করে তুলতে হবে। মানুষের মনকে গড়ে তোলার, পরিশীলিত করার এই হলো উপায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই উপনিষদ বলছেন, *দৃশ্যতে,* 'আত্মাকে দর্শন করা যায়'। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, মনের দ্বারাও নয়, *বুদ্ধির* দ্বারা। কীভাবে? না—আজকের ভাষায় বলতে গেলে, *বুদ্ধি* হলো শুদ্ধ বিচার শক্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনার মনোগত যত শক্তি রয়েছে, তার ভেতর বুদ্ধি হলো শুদ্ধতম। 'মানসিক শক্তি'র যথার্থ অর্থ আপনার ভিতরের সব রকমের শক্তি, কারণ সব শক্তিই শেষ পর্যন্ত মানসিক শক্তিতে পর্যবসিত হয়। শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে আপনি তাদের কিছুটা উন্নত করে তুলুন; তখন তা হয়ে উঠবে মন। মনকে আরও উন্নত করলে তা হয়ে ওঠে *বুদ্ধি।* একই শক্তি—তা থেকেই বুদ্ধিকে বিকশিত করতে হবে। গীতায় এর আগে শ্রীকৃষ্ণ বারবার বলেছেন, 'বুদ্ধির বিকাশ ঘটাও'। শিক্ষার মাধ্যমেই বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, যা সত্যকে অসত্য থেকে আলাদা করে সত্তার গভীরে প্রবেশ করতে পারে। একেই *বুদ্ধি* বলা হয়।

অতএব, *বেত্তি যত্র,* 'যখন [বুদ্ধিগ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর আত্মানন্দ যোগী] অনুভব করেন,' তখন, *ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ,* 'তিনি আর কখনওই সেই সত্য-স্থিতি থেকে বিচ্যুত হন না'; *ন চলতি,* মন পরম সত্য থেকে 'পতিত হয় না'। মন তাতেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এটি হলো মনের একেবারে অবিচলিত অবস্থা।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

—'যা পেলে, অন্য আর কোন প্রাপ্তিকেই মহত্তর মনে হয় না এবং যে অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ মহাদুঃখেও বিচলিত হয় না।'

মন্যতে নাধিকং ততঃ, 'যা লাভ করলে মহত্তর অন্য কোন কিছুই লাভ করার থাকে না'। সেটি পরম আনন্দের অবস্থা। *যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং ততঃ অধিকং ন মন্যতে,* 'আপনার আদৌ মনে হবে না যে, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু আপনার পাওয়ার আছে।' আপনার মনই বলে দেবে যে, আপনি পরম বস্তু লাভ করেছেন। এর চেয়ে মহত্তর আর কিছুই নেই। *যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে,* 'যে অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হলে, আপনি আর কখনও মহাদুঃখেও বিচলিত হবেন না।' অতি সামান্য দুঃখও আমাদের অস্থির করে তোলে, কিন্তু যখন আমরা আত্মস্বরূপে স্থির হই, তখন মহাদুঃখও আমাদের বিচলিত করতে পারবে না। বলা হচ্ছে, 'এমনকি অতি বড় দুঃখেও'; *ন বিচাল্যতে,* 'বিচলিত হয় না'। তখন আপনি সর্বদাই অবিচলিত।

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥

—'সেই অবস্থাকে যোগ-এর অবস্থা বলে জানবে—যে অবস্থায়, দুঃখের সঙ্গে কোন সংযোগই থাকে না। অধ্যবসায় সহকারে, অবিষণ্ণ চিত্তে এই যোগ অভ্যাস করা কর্তব্য'।

তং বিদ্যাৎ দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্; 'তাকেই *যোগ* বলে জেনো', যা *দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগম্,* 'যে-অবস্থায় দুঃখের সঙ্গে, যন্ত্রণার সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।' ভাষাটা একবার লক্ষ্য করুন। *দুঃখ-সংযোগ* হলো মানুষের স্বাভাবিক জীবন, 'যা দুঃখের সঙ্গে যুক্ত'। গায়ে একটি পিন ফুটলেই আপনি ব্যথা পাবেন; এ হলো *দুঃখ-সংযোগ। বিয়োগ* মানে হলো এই বেদনার অননুভূতি, দুঃখের সঙ্গে কোন সংযোগ সেখানে নেই। দুঃখদায়ক ঘটনা ঘটে, কিন্তু তা আপনাকে দুঃখ দিতে পারে না, তার জন্য আপনি বিচলিত হন না; *যোগসংজ্ঞিতম্,* 'একেই *যোগ* বলা হয়'; *স নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ,* 'দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এই যোগ অভ্যাস করতে হবে', *নিশ্চয়* অর্থ নিশ্চিতভাবে; এ সুযোগ সকলের জন্যই, এ সম্ভাবনা সকলের মধ্যেই রয়েছে; এ কেবল শুধু তত্ত্বকথা নয়, এক বিশেষ মতবাদমাত্র নয়, একে উপলব্ধি করা যায়, এ অবস্থা লাভ করা যায়। অতএব, *নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ যোগঃ,* 'দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে এই *যোগ* অবশ্যই অভ্যাস করা কর্তব্য'; *অনির্বিণ্ণচেতসা,* অর্থাৎ 'অবিষণ্ণ হয়ে'; অবিচলিত হয়ে এই যোগ সাধনা অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। দু-একদিনে এই সাধনার ফল না পেলে আপনার মধ্যে হয়তো যোগাভ্যাস ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা হতে পারে। কিন্তু না, সাধনা অব্যাহত রাখুন। সিদ্ধ হতে গেলে যদি একশো বছর লাগে তো লাগুক; তাতে কী এসে যায়? আমি তো একটা কাজের মতো কাজ করছি—আমার নিজের সত্য প্রকৃতি, আমার যথার্থ পরিচয় জানার চেষ্টা করছি। এই অসাধারণ অনুসন্ধান তাই আমাকে অব্যাহত রাখতেই হবে। আমাকে জানতেই হবে, কী গভীর রহস্য আমাকে ঘিরে খেলা করছে। যোগাভ্যাস সেই সত্যকে জানার একটি উপায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকার স্বর্ণসন্ধানীদের মধ্যেও এই ধরনের তীব্র মানসিক সংকল্প, সকল দুঃখকষ্ট, এমনকি মৃত্যুকেও উপেক্ষা করার মনোবল লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

একটা কথা মনে রাখা দরকার—কঠোর পরিশ্রম করলে তবেই যোগ সাধনায় আমরা সিদ্ধ হতে পারি। যোগ কোন মতবাদ বা বিশেষ কোন ধর্মবিশ্বাস

নয়। এই কারণেই ভারতবর্ষে আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মজগতের সব কিছুই বিশ্লেষণ করে দেখি। ধর্মের দুটি শ্রেণিবিভাগ। একটি হলো জাতিগত শ্রেণিবিন্যাস, যার ভিত্তি সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও বিশ্বাস; অন্যটি হলো বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণিবিভাগ। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, ইসলামধর্ম—এগুলি সব জাতিগত শ্রেণিবিভাগের দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে, বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী আমরা পাই কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ এবং জ্ঞানযোগ। এখানে গীতা ধর্মের এইসব জাতিগত বিভিন্নতার এবং সীমাবদ্ধতার বেড়াজাল ভেদ করে ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণিবিভাগ নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান : 'এই যোগ অবশ্যই অধ্যবসায় সহকারে অনুসরণ করতে হবে এবং এর কিছু ফল এই জীবনেই লাভ করতে হবে'।

এখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

সংকল্পপ্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

—'সংকল্পজাত সকল কামনাকে নিঃশেষে পরিত্যাগ করে এবং কেবল মনের দ্বারা, ইন্দ্রিয়গুলিকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা তাদের বিষয়গুলি থেকে একেবারে নিবৃত্ত করে'।

সংকল্প প্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা, 'সংকল্পজাত সকল *কাম* বা কামনা তথা বহির্মুখী স্পৃহা ত্যাগ করে'। *সর্বান্ অশেষতঃ,* 'সবগুলিই সম্পূর্ণভাবে' যখন নিয়ন্ত্রিত হয়; *মনসা এব ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ,* 'কেবল মনের মাধ্যমেই ইন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত এবং সংযত করে'। মনই হলো ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র। মন নিজেই একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়। মনকে বলা হয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। তবুও অন্য পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে সমন্বিত করার শক্তি মনেরই আছে। অতএব, এই মনের দ্বারাই আমরা ইন্দ্রিয়গুলির সমস্ত শক্তি আহরণ করি।

কঠ উপনিষদ্-এর প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়বল্লীতে মনকে লাগামের সঙ্গে, ইন্দ্রিয়গুলিকে ঘোড়ার সঙ্গে, দেহকে রথের সঙ্গে এবং বুদ্ধিকে লাগামধারী সারথির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভারী সুন্দর উপমা! বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়তন্ত্র এবং দেহ—এরা চারটি হলো কাজের যন্ত্র। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের ভূমিকা আছে। মনের কাজ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা, যেমন লাগামের কাজ ঘোড়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা। ঘোড়াগুলিকে বশে রাখতে গেলে লাগাম চাই। এই

কারণেই বলা হয়েছে, 'মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ কর' এবং এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব করে বুদ্ধি বা বোধসম্পন্ন যুক্তিপূর্ণ ইচ্ছাশক্তি। বুদ্ধিই হলো প্রভু; জীবনের যাত্রাপথে সেই হলো নিয়ন্তা। এই কারণেই কঠোপনিষদ বুদ্ধিকে সারথি বলেছে। *সমন্ততঃ* অর্থাৎ 'সকল দিক থেকে'। যদি রথ পাঁচ-ঘোড়ার হয় এবং তার মধ্যে মাত্র তিনটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, অন্য দুটি ঘোড়াকে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া হয়—তাহলে সর্বনাশ! তেমন হতে দেওয়া চলবে না। পাঁচটি ঘোড়াকেই বশে রাখতে হবে। তা যদি রাখা যায়, একমাত্র তখনই যাত্রা নিরাপদ ও আরামপ্রদ হবে এবং ঘোড়াগুলি আমাদের গন্তব্যস্থলের দিকে নিয়ে যেতে পারবে।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

—'ধৈর্যযুক্ত বিচার বা বুদ্ধির সাহায্যে, মনকে আত্মায় নিবিষ্ট রেখে, সাধক ধাপে ধাপে প্রশান্ত হয়ে যান, তিনি যেন অন্য কোন কিছুর চিন্তা না করেন।'

এবার এখানে ধ্যানের ঠিক ঠিক প্রকৃতি বর্ণনা করা হচ্ছে। *শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ,* হঠাৎ করে স্থির হতে পারবেন না; তাই বলা হচ্ছে, *শনৈঃ,* অর্থাৎ 'ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে'; *উপরমেৎ,* 'উপরত হবে'। কারণ মহৎ কাজ কেবল ধীরে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমেই সাধিত হয়। চট্ করে তা সম্ভব নয়। তাড়াহুড়ো করতে গেলে আপনি অসুবিধায় পড়বেন। হয় শারীরিক কষ্টে, না হয় মানসিক কষ্টে ভুগবেন। তাই ধীরে ধীরে অভ্যাস করুন; *বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া,* 'বুদ্ধিযুক্ত ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে'—সমস্ত শক্তিকে সংহত করে। *আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা,* 'মনকে ধীরে ধীরে আত্মায় সমাহিত করে'; *ন কিঞ্চিৎ অপি চিন্তয়েৎ,* 'আর কোন কিছু চিন্তা করবেন না'। পরবর্তী পদক্ষেপটি কী?

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

—'চঞ্চল ও অস্থির মন যে কারণেই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াক না কেন, তা থেকে তাকে নিবৃত্ত করে সাধক যেন কেবল আত্মার বশেই মনকে নিয়ে আসেন।'

এই শ্লোকে দ্বিতীয় একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মন বহির্মুখী হলেই যা আমাদের অবশ্য পালনীয়। *যতো যতো নিশ্চরতি মনঃ চঞ্চলম্ অস্থিরম্,* 'যখন

মন এদিক সেদিক ধেয়ে যায়'; *অস্থিরম্* অর্থাৎ 'কখনই স্থির হয় না'; *চঞ্চলম্*, অর্থাৎ 'ছটফট করে'; *নিশ্চরতি*, 'বহিমুখী হয়'; ততঃ *ততো নিয়ম্য*, 'তক্ষুণি তাকে নিয়ন্ত্রণ করে'; *আত্মন্যেব বশং নয়েৎ*, 'কেবল আত্মার বশেই নিয়ে আসবে।' এ এক নিরন্তর সংগ্রাম, এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ; তবু এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু পরে এক জায়গায় অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলবেন, 'নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারাই মনকে বশে আনা যায়'। এ প্রশ্ন শুধু অর্জুনেরই নয়, আমাদের সকলেরই। অর্জুন যেন আমাদের হয়েই কৃষ্ণের কাছে এই প্রশ্ন তুলেছেন। এই প্রশ্নটি আমরা পরে পাব। এখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

—'যাঁর চিত্ত প্রশান্ত ও রজোবৃত্তি শূন্য হয়েছে, যিনি ব্রহ্মভাব লাভ করেছেন এবং সকল কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছেন, বাস্তবিক সেই যোগীর কাছেই পরম আনন্দ এসে থাকে।'

এরকম যোগীই *প্রশান্তমনসম্*, 'যাঁর মন সম্পূর্ণ শান্ত এবং স্থির', কারণ তিনি দীর্ঘকাল যোগ অভ্যাস করেছেন। এরকম যোগীর চিত্ত ধীরে ধীরে শান্ত হতে হতে এখন সম্পূর্ণ শান্ত হয়েছে। *সুখম্ উত্তমম্ উপৈতি*, 'পরম বিশুদ্ধ সুখ তাঁর কাছে আসে।' নানাধরনের সুখ আপনি পেতে পারেন, কিন্তু এ হলো *উত্তমং সুখম্*, অর্থাৎ সারা জীবনে যতরকম সুখ আপনি ভোগ করতে পারেন, তার মধ্যে 'সর্বোত্তম সুখ।' সুস্বাদু আহার পেলেও সুখ হয়। কিন্তু এ সুখ সম্পূর্ণ আলাদা, এ হলো *উত্তমং সুখম্*; আত্মায় স্থিত হলে তবেই আপনি এই সুখ পেতে পারেন। বাইরের কোন কিছুর উপর এই সুখ নির্ভর করে না। *শান্তরজসম্*, 'রজোগুণ, অর্থাৎ সবরকম চিত্তচাঞ্চল্য তখন সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়েছে।' কী চমৎকার অবস্থা! প্রশ্ন হতে পারে, মন কেন চঞ্চল হয়? এর উত্তর—রাজসিক প্রকৃতি। রজোগুণই মনকে এদিক ওদিক ছুটিয়ে মারে। এই হলো *রজস্* শব্দের অর্থ। *রজস্* এবং *তমস্* উভয় গুণই মনকে উচ্চ লক্ষ্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী করে তোলে। এই দুটি গুণ যখন মানুষের মনকে প্রভাবিত করে, তখন সেই মন দিয়ে জগতের সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করা যায় মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। এই ক্ষেত্রে রজোগুণ দূরীভূত হয়েছে। মন হয়ে উঠেছে *শান্তরজসম্।* কোন কিছুই আর তখন মনকে চঞ্চল করে তুলতে পারে না; মনের লম্ফঝম্প যেন শেষ হয়ে গেছে। *রাজসিক* মনই নিরন্তর ছুটে বেড়ায়।

এরপর বলা হয়েছে, *যোগী* হলেন *ব্রহ্মভূতম্*, অর্থাৎ তাঁর 'চিত্ত ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে' এবং *অকল্মষম্*, 'সব কলুষতা থেকে মুক্ত'। এই মন হলো বিশুদ্ধ মন। এই বিশুদ্ধতাই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত যোগীর স্বভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি এবং শুদ্ধ আত্মা এক বস্তু।' আমাদের অন্তর্জীবনের বিভিন্ন অবস্থাকে বোঝাতে আমরা বিভিন্ন নাম ব্যবহার করি, কিন্তু যথার্থভাবে বিচার করলে দেখা যায়, *শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি* এবং *শুদ্ধ আত্মা* একই জিনিস। অতএব, সেই *শুদ্ধ মন*, যা স্বয়ং *শুদ্ধ আত্মা*, যা স্বয়ং *শুদ্ধ বুদ্ধি*, তা হলো *অকল্মষম্*, অর্থাৎ সকল কলুষ থেকে মুক্ত। আমাদের মধ্যে যখন এইরকম একটা অবস্থা আসে, তখন আমরা *ব্রহ্মভূতম্*, অর্থাৎ 'ব্রহ্মের সঙ্গে এক' হয়ে যাই।

'Republic of Plato' নামে প্লেটো-র বিখ্যাত গ্রন্থে 'Freedom' নামক একটি নাটক আছে। সেখানে নিচের এই সুন্দর মন্তব্যটি দেখতে পাবেন ঃ

'শ্রেষ্ঠ চিন্তা তখনই হয়, যখন মন নিজের বশে থাকে এবং শব্দ, দৃশ্য, দুঃখ, সুখ কিছুই আর তাকে বিব্রত করতে পারে না; যখন শরীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে আসে, যখন তার শারীরিক অনুভূতিগুলির কোন বোধ থাকে না। তখন সে বিশুদ্ধ সত্তার অন্বেষণ করে—এ হলো মনের সর্বোত্তম অবস্থা'।

সংযত, সুনিয়ন্ত্রিত ও আত্মস্থ মনের কথা বলতে গিয়ে বেদান্তও ঠিক এই কথাই বলছে। মনের এই অবস্থাতেই তার সর্বোচ্চ মহিমা প্রকাশিত হয়। সুফী, খ্রিস্টান এবং হিন্দু, সব মরমী সাধকই বলেছেন যে, মনের প্রশিক্ষণ দরকার এবং তাকে আত্মাভিমুখী করে তোলা প্রয়োজন। আপনি মনকে বহির্মুখী করে কাজকর্ম করেন, অর্থ ও সম্পদ উপার্জন করে বৈষয়িক উন্নতি করেন। এ কাজ ভালো, কিন্তু এ হলো মানবজীবনের একটি দিক। প্রবৃত্তিমূলক এই কর্মজীবনের ওপর গীতা খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু গীতায় একথাও বলা হয়েছে যে, এই জাগতিক কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানের মাধ্যমে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেবার, মানসিক শক্তিগুলিকে সংহত করার সামর্থ্যও অর্জন করুন। এই দুটি কাজ অবশ্যই একইসঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে। তা যদি করেন, একমাত্র তখনই আপনি জীবনে সার্বিক দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। গীতায় সকলকে এই দক্ষতারই অধিকারী করে তুলতে চাওয়া হয়েছে। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি এ কথার উল্লেখ করেছি।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে (শ্লোক, ৫০) দক্ষতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে *যোগ* কথাটির উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'যোগ হলো কর্মের দক্ষতা', *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্‌* এবং এই দক্ষতার অর্থ হলো দ্বিবিধ নৈপুণ্য—বহির্মুখী কর্ম-কুশলতা এবং অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিক সামর্থ্য। গীতার যে যোগ, এই হলো তার বিশেষত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ তাই ধ্যানের এই ধারণাটিও যোগের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ধ্যান হলো আমাদের যথার্থ স্বরূপকে অনুধাবনের প্রচেষ্টা। কাজ ফুরিয়ে গেলে পুরনো অকেজো যন্ত্রপাতি যেমন আমরা আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিই, মনের সঙ্গে আমরা যেন তেমন ব্যবহার না করি। মনের সাহায্যে বাইরের কাজকর্ম আমরা সবই করব, কিন্তু মন তো আর নিষ্প্রাণ যন্ত্র নয়; তাই কাজ চুকে গেলে তাকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া চলবে না। মন তথা মানুষের এই অবমূল্যায়ন হওয়া উচিত নয়। সারাদিনের খাটাখাটুনির পর আপনার উচিত বাইরের জগৎ থেকে একটুখানি আলগা হওয়া, বিশুদ্ধ হওয়া এবং অনুভব করা যে, আপনি এখন একান্তভাবে আপনার নিজের। *যদি এই অবস্থা লাভ করতে হয়, তবে আপনাকে সেই পথই অনুসরণ করতে হবে, গীতায় যার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ, বহির্জীবন এবং অন্তর্জীবনের সমন্বয়।* মানুষ মরচে পড়া লোহালক্কড়ের মতো পরিত্যজ্য হতে পারে না। স্ত্রী হোক, পুরুষই হোক, সকলেরই একটা অন্তর্জীবন আছে; সকলকেই নিজের ভিতর থেকে কিছু একটা লাভ করতে হবে, কেবল অন্যের সেবা ও ভোগ্যপণ্য তৈরির যন্ত্র হতে থাকলে তার চলবে না। মানুষের প্রতি আমাদের যে মনোভাব, সেই মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

তাই বর্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, রজোবৃত্তিশূন্য ও প্রশান্ত মনের এই বিশেষ অবস্থায় মানুষ ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায়। এই হলো এই জীবনেই পরিপূর্ণতা লাভ। আমরা অতীতে কাজ করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব, কিন্তু পরিপূর্ণতালাভ করার পর আমাদের সব কাজের চরিত্রটাই পাল্টে যাবে; আধ্যাত্মিকতার দ্বারা তা এতটাই অনুরঞ্জিত হবে যে, কাজকে তখন আর কাজ বলে মনে হবে না। তা হয়ে উঠবে নৈষ্কর্ম। তাওবাদী দর্শন, জেন (Zen) বৌদ্ধ ধর্মমত এবং বেদান্ত—সকলেই এই এক কথা বলছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা করেছি।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

—'সকল কলুষতা থেকে মুক্ত যোগী, চিত্তকে নিরন্তর এইভাবে ব্যাপৃত রেখে, ব্রহ্মের সংস্পর্শজনিত আত্যন্তিকী শান্তি সহজেই লাভ করেন।'

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে; ব্রহ্মসংস্পর্শম্, অর্থাৎ 'ব্রহ্মের সংস্পর্শ, ঈশ্বরের সংস্পর্শ, দিব্য সংস্পর্শ'। ভক্তেরা একথার অর্থ সহজে অনুধাবন করতে পারেন। বাস্তবিক, একবার শ্রীকৃষ্ণ-চরণ স্পর্শ করতে পারলে কী অদ্ভুত আনন্দই না পাওয়া যায়! তাই, *সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অশ্নুতে,* 'অতি সহজেই যোগী এই ব্রহ্ম সংস্পর্শ লাভ করেন' এবং সেই স্পর্শ পেয়ে *অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে,* 'তিনি অপার সুখ উপভোগ করেন'। ভাল খাবার খেয়ে আমরা সুখ অনুভব করি; সহানুভূতিপূর্ণ একটি কথা শুনে আমরা সুখী হই। এরকম বহুভাবেই আমরা ছোটখাট সুখ অনুভব করে থাকি। এগুলি হলো মনুষ্যজীবনে সুখের টুকিটাকি; কিন্তু সুখের সাগর হলেন স্বয়ং ব্রহ্ম, যিনি *আনন্দস্বরূপ,* অর্থাৎ যিনি স্বরূপত আনন্দই এবং এই যোগীরা তাঁরই সংস্পর্শে এসে থাকেন। আমরা সেই ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত আনন্দ কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রগুলিতে বলা হয়েছে, 'ঈশ্বরানুভূতি হলে আপনি শরীরের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে অসীম আনন্দ অনুভব করবেন'। যাঁদের ঈশ্বরানুভূতি হয়েছে, তাঁরা সকলেই আমাদের কাছে এই অনন্ত আনন্দের কথা বলে গেছেন। কারণ ঈশ্বরই হলেন আনন্দস্বরূপ, আনন্দের সারবস্তু, আনন্দের সাগর। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের যতকিছু পার্থিব আনন্দ, তা খণ্ডিত, সীমিত আনন্দ—অনন্ত ব্রহ্মানন্দের নগণ্য এক একটি কণা। যোগী সেকথা জানেন। তাই, এই ক্ষুদ্র আনন্দগুলি ত্যাগ করে তিনি আনন্দের মূল উৎস, অর্থাৎ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যান। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (৪.৩.৩২) বলা হয়েছে, *এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রাম্ উপজীবন্তি,* 'এই জগতে জীব যেসব আনন্দ ভোগ করে, তা সেই অসীম আনন্দের', সাক্ষাৎ *ব্রহ্মানন্দের* বা *আত্মানন্দের* 'কণিকামাত্র'।

এখানে, এই যোগ আপনাকে সেই *ব্রহ্মসংস্পর্শম্,* 'অসীম আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মস্পর্শ'-এর সন্ধান দিচ্ছেন এবং বলছেন, *অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে,* 'এই সব যোগী অসীম সুখ অনুভব করেন।' গীতায় তাই বলা হচ্ছে, 'আমাদের মনের বর্তমান অবস্থায়, আমরা এই অনন্ত সুখের ধারণা করতে পারি না।' আমরা শুধু বলতে পারি, এ হলো এক মহা আনন্দ, কিন্তু আমরা এর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি না। বর্তমান অবস্থায় আমাদের সাধারণ জীবনে যে-সব ছোট ছোট আনন্দ পেয়ে থাকি, তা নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকি। সেটাই আমাদের

কাছে বিশাল ব্যাপার। ঐ এক-আধকণা সুখ পেয়েই আমরা বিভোর হয়ে যাই। মনে করুন, আমার চাকরি নেই; চাকরির জন্য আমি হন্যে হয়ে ঘুরছি। ছমাস প্রাণান্ত চেষ্টার পর একটা কাজ জুটে গেল। তখন কী হয়? আমি 'অসীম' আনন্দে আপ্লুত হই। এই সব ছোটখাট প্রাপ্তিই মানুষের আনন্দের মাপকাঠি। এ হলো এক ধরনের আনন্দ। কিন্তু আনন্দের তো নানা স্তর আছে। কাজেই, কল্পনা করুন, এইসব আনন্দ অনন্ত গুণ বৃদ্ধি পেলে যা হয়, তাই হলো ব্রহ্মানন্দ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এবং তাঁর মাধ্যমে আমাদের সকলকে এখন এই শিক্ষাই দিচ্ছেন।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

—'যোগের দ্বারা যোগীর চিত্ত স্বরূপে একাগ্র হলে, সকল বস্তুতে সমদৃষ্টি লাভ করলে, তিনি আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্ব ভূতকে আত্মায় দর্শন করেন।'

অর্জুন কোন প্রশ্ন করার আগে আমরা আরো কয়েকটি শ্লোক পাচ্ছি যেখানে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এখানে বলছেন, যোগীর মন যখন শান্ত এবং স্থির হয়, যোগী যখন ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেন, তখনই তাঁর মধ্যে সমত্বভাবের বিকাশ ঘটে। এটি যোগোভ্যাসের চরম উৎকর্ষ। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন, সেই সমদৃষ্টি বেদান্তশাস্ত্রের একটি মহান শিক্ষা।

যোগের দ্বারা চিত্ত সমাহিত করে সকল জীবের প্রতি (সাম্যভাব, *সমত্ব, সমদৃষ্টি*) সমভাব অবলম্বন করে যোগী নিজের আত্মাকে সর্বজীবে এবং সর্বজীবের মধ্যে নিজের আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন। সবকিছুকে আত্মায় এবং আত্মার মধ্যে সবকিছুকে দর্শন করাই মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য এবং বেদান্ত এমন এক দর্শন যা সকলকেই এই সর্বাত্মক দৃষ্টিদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

সর্বভূতস্থম্ আত্মানম্, 'আত্মা সকল জীবের মধ্যে', এবং *সর্বভূতানি চাত্মনি*, 'সকল জীব আত্মায়'; *ঈক্ষতে*, 'দেখেন', অর্থাৎ এই রকম উপলব্ধি করেন; *যোগযুক্তাত্মা*, 'যিনি যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন,' যাঁর চিত্ত যোগে একাকার হয়েছে; *সর্বত্র সমদর্শনঃ*, 'তিনি সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন', সর্বত্র এক অনন্ত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন—সেখানে উচ্চ বা নীচ বা কোনরকম পার্থক্য নেই। এখানেই প্রকৃত গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে এবং তা এই যে, আমরা সকলেই সমান,

কারণ সেই এক অনন্ত আত্মা সকল জীবের মধ্যেই পূর্ণ মহিমায় বিরাজমান, অংশরূপে নয়। সমদর্শিত্ব অর্থাৎ 'সাম্যদৃষ্টি' তাই গীতার এক মহৎ শিক্ষা।

অন্য যে-কোন দেশের তুলনায় আমাদের দেশে আজ এই শিক্ষার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, কারণ আমরা বরাবর মানুষে-মানুষে পার্থক্য করে এসেছি। কেউ যদি অল্প উপার্জন করেন, আমরা তাকে হীনদৃষ্টিতে দেখি; আবার কেউ বেশি মাইনে পেলে, তাকে আমরা বিশেষ সম্মান করি। এই বৈষম্যদোষ আমাদের সমাজকে পেয়ে বসেছে। আধুনিক যুগে গীতার এই শিক্ষা তাই আমাদের সকলের কাছে আশীর্বাদ-স্বরূপ। *সর্বত্র সমদর্শনঃ,* 'যিনি সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন'। মানুষ মানুষ, তা তিনি বিত্তবান অথবা গরিব, তা আমাদের দেখবার কী প্রয়োজন? টাকাকড়ি দিয়ে তো মানুষের যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে না। মূল্যায়ন করতে হবে আত্মা দিয়ে যে অনন্ত আত্মা প্রত্যেকের মধ্যেই বিরাজ করছেন। এই শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে জাতপাত বা ধর্মবিশ্বাসগত বিরোধ দূরীভূত হয়ে যথার্থ গণতন্ত্রের অভ্যুদয় হবে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিপুল পরিবর্তন আসবে। এই ব্রহ্মজ্ঞানের ছিটেফোঁটাও যদি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে আসে, তাহলেই আমাদের গণতন্ত্র দৃঢ় ও স্থায়ী হবে।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মকে বোঝাতে ঈশ্বরাবতারের কথা বলেছেন। 'যিনি সকলের মধ্যে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন' না বলে, এখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'যিনি আমাকে, ঈশ্বরাবতাররূপে সকলের মধ্যে দেখেন' ঃ

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

—'যিনি সর্বজীবে আমাকে প্রত্যক্ষ করেন এবং আমাতে সর্বজীবকে দর্শন করেন, তিনি কখনওই আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হন না এবং আমিও তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হই না।'

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি, 'যিনি আমাকে সকল জীবের মধ্যে এবং সকল জীবকে আমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন'; *তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি,* 'এরূপ ব্যক্তি কখনওই আমার থেকে পৃথক হন না এবং আমিও কখনও তাঁর নিকট থেকে পৃথক হই না, আমরা সর্বদাই একাত্ম ও যুক্ত হয়ে আছি'।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥

—'যিনি একত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, সর্বজীবের মধ্যে অধিষ্ঠিত আমাকে ভজনা করেন, তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতি যে রকমই হোক না কেন, সেই যোগী আমাতেই অবস্থান করেন।'

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজতি, 'যিনি সর্বভূতে অবস্থিত আমার ভজনা করেন'। একটি সুতো যেমন বহু মুক্তোকে একত্র ধারণ করে একটি মণিমালার রূপ দেয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণও সকল জীবের মধ্যে এক সমন্বয়সূত্ররূপে বিরাজ করছেন। একথা গীতার এক জায়গায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন। *ভজতি একত্বং আস্থিতঃ,* 'একত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমার ভজনা করেন'; *সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে,* 'তাঁর জীবনের ধারা যেমনই হোক না কেন, তিনি সর্বদা আমাতেই অবস্থান করেন'। কেউ ব্যবসা করতে পারেন, জুতা সেলাই করতে পারেন, পথের ধারে পাথর ভাঙতে পারেন অথবা প্রশাসকের পদেও থাকতে পারেন; তার জীবনযাত্রার ধরন যে রকমই হোক না কেন, তিনি সর্বদা আমাতেই অবস্থান করেন, এই কথাই বলা হয়েছে। কী সুন্দর ভাব! বাস্তবিক, যেসব জায়গার কথা আমরা ভাবতেও পারি না, সেখানেও আমরা শ্রেষ্ঠ ভক্তদের দেখা পেতে পারি। আমাদের ধর্মীয় ইতিহাসে আমরা দেখেছি, একজন সাধারণ মুচির ঈশ্বরোপলব্ধি হয়েছে; একজন সাধারণ গৃহবধূও ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। সমাজে তাঁর মর্যাদা হয়তো সাধারণ, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে তিনি অসাধারণ। এমনটি সকলের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। সমাজে আপনার স্থান যাই হোক না কেন বা সমাজে যে ধরনের কাজই আপনি করুন না কেন, এই যোগ সাধন করে আপনি সর্বদা সেই পরম ঈশ্বরের মধ্যেই থাকতে পারেন; *স যোগী ময়ি বর্ততে,* 'সেই *যোগী*' সর্বদা 'আমাতেই অবস্থান করেন'।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

—'হে অর্জুন, যে যোগী নিজের সুখ ও দুঃখকে যেভাবে দেখেন, সর্বত্রই সেভাবে দেখে থাকেন, সেই যোগীকেই শ্রেষ্ঠ যোগী বলে গণ্য করা হয়।'

আত্মৌপম্যেন, 'নিজের ব্যাপারে আপনি যেরকম অনুভব করেন', অন্যদের ক্ষেত্রেও সেইরকম অনুভব করুন। আপনার কাছে যা যন্ত্রণাদায়ক, আপনি তা

এড়িয়ে চলতে চান। অতএব, অন্যদেরও যন্ত্রণা বা কষ্ট দেওয়া আপনার উচিত নয়। নিজের ব্যাপারে আপনি যেরকম অনুভব করেন, অন্যদের সম্বন্ধেও সেইরকম অনুভব করুন। মানুষের সঙ্গে মানুষের আচরণের এ হলো এক সর্বজনীন আদর্শ, যা আপনারা বাইবেলে, চৈনিক চিন্তাধারায়, ভারতীয় মননে—সর্বত্রই পাবেন। এই আদর্শ বলে—যা আপনার কাছে সুখদায়ক নয়, তা অপরের ঘাড়েও চাপাবেন না।

তাই বলা হচ্ছে, *আত্মৌপম্যেন,* 'নিজেকে যেভাবে দেখেন, অন্যদেরও সেইভাবে দেখুন'; *সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন,* 'হে অর্জুন, যিনি সবকিছু ও সকলকে সমানভাবে দেখেন'; *সুখং বা যদি বা দুঃখম্,* 'তা দুঃখ বা সুখ যা-ই হোক না কেন'। যা আপনাকে দুঃখ দেয়, সেই দুঃখ যেন আপনি অন্যকে দেবেন না। এই ভাব অবশ্যই মনের মধ্যে থাকা চাই। *স যোগী পরমো মতঃ,* 'সেই যোগীই আমার মতে শ্রেষ্ঠ।' শ্রেষ্ঠ কেন? শ্রেষ্ঠ এই জন্য যে, তিনি সকলের সঙ্গে একত্ব অনুভব করেছেন।

এই শিক্ষার অন্তত কিছুটাও যদি আমাদের মাথায় ও হৃদয়ে ঢোকে, তাহলে কী অসাধারণ পরিবর্তনটাই না আমাদের সমাজে আসবে। যখন আমরা অন্যদের প্রতি ঘোর অন্যায় করি, তখন একবার ভেবেও দেখি না যে, যদি সেই অন্যায় আমাদের প্রতি করা হতো, তবে তাতে আমাদের কী দুর্দশাই না হতো। আসলে আমরা জানিই না কীভাবে অন্যদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হয়। সহানুভূতি আসে একত্ববোধ থেকে, যা আমাদের মধ্যে নেই। এই হলো সবচেয়ে বড় দোষ, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের সমাজকে ভুগিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই আক্ষেপ করে বলেছেন, আমাদের অনেকেরই হৃদয় বলে কিছু নেই; বুদ্ধি আছে, মস্তিষ্ক আছে, কিন্তু হৃদয় নেই, অন্যদের জন্য সহানুভূতি নেই। এই জঘন্য আচরণের ফলেই সমাজ আজ এইখানে এসে ঠেকেছে।

সমাজে আজ অবশ্যই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে এবং সে পরিবর্তন আনতে গেলে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অন্তর্জগতের সেই পরিবর্তন কীভাবে আসবে? বেদান্তের পথ অনুসরণ করে। তাহলেই আমাদের মধ্যে *সমদৃষ্টি* জাগবে; তখন এই সমাজ সত্যিই স্বর্গ হয়ে উঠবে। জীবন হবে সুখপ্রদ। আনন্দের জন্য কোন স্বর্গে যাবার প্রয়োজন নেই। এখানেই আমরা স্বর্গ রচনা করতে পারি। তবে তার জন্য বেদান্তের সত্যটি

উপলব্ধি করতে হবে এবং আচরণে তা অন্তত একটু-আধটু ফুটিয়ে তুলতে হবে। তা যদি করি, তাহলে এই জগতেই, এখনই সত্য যুগ বা স্বর্ণ যুগ এসে যেতে পারে। মহান আচার্যরা এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই পৃথিবীতে এসেছিলেন। আমাদের যুগে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কী অসাধারণ ব্যক্তিত্বই না ছিলেন তিনি! যেন একত্ব বোধের প্রতিমূর্তি! শুধু শ্রীরামকৃষ্ণই নন, স্বামী বিবেকানন্দ, সারদাদেবী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের প্রত্যেকের মধ্যেই ছিল এই একত্বের ভাব। 'আমরা সকলেই এক'। কী চমৎকার এই ভাব! এই কারণেই বাংলার মুসলমান বিপ্লবী কবি কাজী নজরুল ইসলাম শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, *'সত্য যুগের পুণ্য স্মৃতি আনিলে কলিতে তুমি তাপস,'* কী ব্যঞ্জনা! শ্রীরামকৃষ্ণ *সত্য যুগের* স্মৃতি নিয়ে এসেছেন এই *কলিযুগে।* এই শিক্ষাকে আত্মস্থ করে সমাজে *সত্যযুগ* প্রতিষ্ঠা করার দায় আমাদের। তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন। এটিই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

তাই, এখানে শ্রীকৃষ্ণ এই *সমদৃষ্টি ও সমত্ব*-র কথা বলেছেন। অতি কঠিন হলেও, এ গুণ আমাদের অর্জন করতেই হবে। আমাদের ত্যাগ করতে হবে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার উত্তরাধিকার, যেখানে সবকিছুই পুরোহিততন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তখন রাজা এবং সামন্তরা ভোগসুখে জীবন কাটাতেন। অথচ তাঁদের চারপাশে লক্ষ লক্ষ মানুষ অশেষ দুঃখ এবং চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতো। এই ছিল আমাদের অতীত ভারতবর্ষ। আজও অনেক ক্ষেত্রে এই রকমই হয়ে চলেছে। বহু মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে, যাতে মুষ্টিমেয় কিছু লোক সুখে ও আরামে জীবন কাটাতে পারেন! এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই। গীতা চাইছেন, আমাদের মধ্যে এবং পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যেই এই একত্ববোধের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠুক।

এই *সমতাদৃষ্টি* হলো সাম্যের সার এবং পরবর্তী শ্লোকে অর্জুন এ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করবেন। বলবেন, 'এই *সমদৃষ্টি* এক আশ্চর্য সুন্দর ভাব; হে মধুসূদন, অতি সুন্দরভাবে আপনি তা উপস্থাপিতও করেছেন। কিন্তু আমি দেখছি এভাবে আচরণ করা খুবই কঠিন। মনের *সমত্ব* কিছুতেই ধরে রাখা যায় না; মন সর্বদাই ওঠানামা করে, সর্বদাই ছুটে বেড়ায়। কীভাবে এই মনকে নিয়ন্ত্রণ করব'? অর্জুন যেন আমাদের হয়ে, লক্ষ লক্ষ মানুষের হয়ে, এই প্রশ্ন করেছেন কারণ এই সমস্যা আমাদের সকলেরই সমস্যা। পরবর্তী শ্লোক থেকে শ্রীকৃষ্ণ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির আলোচনা করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৯-৩২, এই চারটি শ্লোকে সর্বজীবে একই সদ্‌বস্তুকে দর্শন করবার সামর্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এই দিব্যদৃষ্টি ধ্যানেরই ফল।

গীতায় প্রধান যে যোগের কথা বলা হয়েছে, তা মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এই যোগের ক্ষেত্রে ধ্যানযোগেরও কিছু অবদান আছে। ধ্যানযোগ হলো পূর্ণ বা অখণ্ড যোগ, আধ্যাত্মিক জীবনের সকল দিক যেখানে সুসমন্বিত। কাজেই, ধ্যানের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় ধরে আলোচিত হয়েছে। এই বিষয়ে বেশ কিছু শ্লোক আমরা আগেই পাঠ করেছি এবং এই পর্যায়ের শেষ চারটি শ্লোকে (২৯-৩২), সেই ধ্যানের ফলরূপ যে *সমদৃষ্টি, সমভাব* লাভ করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পতঞ্জলি তাঁর *যোগসূত্রে* যে ধ্যান-পথের উল্লেখ করেছেন, সে পথ দিয়েও যেমন এই প্রাপ্তি সম্ভব, তেমনি *ভক্তি* এবং *জ্ঞান*-এর মাধ্যমেও তা লাভ করা যায়। অতএব, আমাদের মনে রাখতে হবে, সব পথ দিয়েই সেই পরম প্রাপ্তি সম্ভব। পঞ্চম অধ্যায়ে ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি যে, এই *সমভাব জ্ঞান* থেকেও এসে থাকে। সপ্তম অধ্যায়ে এবং পরবর্তী আরও কয়েকটি অধ্যায়ে দেখবেন, ভক্তির মাধ্যমেও এই পরম প্রাপ্তি হয়। অতএব, কর্তব্য হলো সকল জীবের মধ্যে একই আত্মাকে দর্শন করা এবং যে বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে সবরকম পাপ, হিংসা এবং ঘৃণার জন্ম হয়, তা দূর করা। সব পাপের উৎস এই ভেদদৃষ্টি।

অতএব, এই অভিন্নতাবোধ, এই *সমত্বভাব,* আমাদের অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে এবং তার জন্য দরকার ইন্দ্রিয়স্তরের ঊর্ধ্বে ওঠা। ইন্দ্রিয়স্তরে থাকলে সবকিছুই পৃথক মনে হবে। একমাত্র যখন আপনি এই ইন্দ্রিয়স্তরকে অতিক্রম করেন, তখনই কেবল এই জগতের সব কিছুর পিছনে সেই পরম একত্ব, সেই বিশুদ্ধ চৈতন্য, এক এবং অদ্বিতীয় সত্তার দর্শন লাভ করতে পারেন। *তাই ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম বা ধ্যান—যে পথ দিয়েই যান না কেন ইন্দ্রিয়স্তরের পারে আপনাকে যেতেই হবে।* শুধু এইটুকু পার্থক্য যে, এই ধ্যান-পথ এবং জ্ঞান-পথ তুলনামূলক ভাবে কঠিন। কিন্তু ভক্তি-পথে সেই একই বস্তু অনেক সহজে লাভ করা যায়। সেখানে আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা করতে হয় না। তাদের *নিয়েই* আমরা পথ চলি এবং নিম্নতর প্রকৃতির প্রভাব ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠি। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ একথা বলবেন। কিন্তু, মনে রাখতে হবে যে, আমাদের লক্ষ্য হলো *সমত্ব* এবং

সব পথেই তা লাভ করা সম্ভব। কিন্তু গীতায় সব পথগুলিকেই সমন্বিত করে এক পরম আধ্যাত্মিক আদর্শ স্থাপন করা হয়েছে, যাকে আমি 'কর্ম ও ধ্যান, *প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির* সংমিশ্রণে পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিকতা' বলে থাকি। এইটি হলো আধুনিক যুগের উপযোগী জীবনদর্শন। বর্তমান যুগে, শ্রীরামকৃষ্ণ এই জীবনদর্শনকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন—*চোখ বন্ধ করে ধ্যান করলেই কেবল ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়, এমন নয়, চোখ খুলে কাজ করার সময়েও তাঁকে দেখা যায়।* এ হলো অদ্বৈত-বেদান্তের এক গভীর ভাব। অদ্বৈত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত গীতার এই সুষম ও পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তার ওপর শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ জোর দিয়েছেন। ধ্যান করা কঠিন; ধ্যানের যাঁরা চেষ্টা করেন, তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন কাজটি সহজ নয়। বছরের পর বছর চেষ্টা করলেও যথার্থ ধ্যানের অবস্থা আপনার কাছে সহজে ধরা দেবে না। এর কারণ, মন যখন একটি বিশেষ ধারায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন সহজে তার মতিগতি অন্যদিকে ফেরানো যায় না। যদি মনঃসংযোগ এবং ধ্যানের মাধ্যমেই আমরা এই *সমভাব* বা সমত্বদৃষ্টি লাভ করতে চাই, তা অত্যন্ত কঠিন, কারণ আমাদের মন সততই চঞ্চল। এই সংশয়ের কথাই অর্জুন বলেছেন ৩৩ এবং ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে, যার আলোচনা আমরা এবার শুরু করব।

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

অর্জুন বললেন—'হে মধুসূদন, সমত্বদর্শনরূপ যে যোগের কথা আপনি বললেন, (মনের) চাঞ্চল্য হেতু, দীর্ঘকালব্যাপী তার স্থায়িত্বের (সম্ভাবনা) আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

অর্জুন বলছেন, 'এই মন অত্যন্ত চঞ্চল; এই অসাধারণ যোগদৃষ্টি লাভ করার মতো উপযুক্ত স্থৈর্য এবং একাগ্রতা আমার নেই।' *যোঽয়ং যোগঃ ত্বয়া প্রোক্তঃ,* 'যে যোগের কথা আপনি এখন ব্যাখ্যা করলেন', অর্থাৎ এই *ধ্যান-যোগ; এতস্যাহং ন পশ্যামি,* 'তা আমি বুঝতে পারছি না'; *চঞ্চলত্বাৎ,* 'কারণ মন অত্যন্ত চঞ্চল'; *স্থিতিং স্থিরাম্,* 'তার দীর্ঘস্থায়ী স্থিরতা'। বাস্তবিক, আমরা সহজে মনকে একাগ্র করতে পারি না। মনের এরকম নিশ্চলতা ও দৃঢ়তা আমাদের নাগালের বাইরে।

পরবর্তী শ্লোকে অর্জুন তাঁর মনের অবস্থার কথা আরও বিশদভাবে বলছেন ঃ

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

—'হে কৃষ্ণ, মন সত্যিই চঞ্চল, অশান্ত, বলবান এবং অনমনীয়; তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, বায়ুকে নিরুদ্ধ করে রাখার মতোই কঠিন বলে আমি মনে করি।'

আমাদের সকলের সংশয় অর্জুন এখানে ব্যক্ত করছেন। তিনি বলছেন, 'হে কৃষ্ণ, মন অতি, অতিশয় চঞ্চল'। *চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ;* সংস্কৃতে *'হি'* কথাটির অর্থ হলো 'সুবিদিত'। যেখানেই আপনারা এই *'হি'* শব্দটি পাবেন, বুঝবেন 'একথা সুবিদিত'। *প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম্,* 'তা আমাকে জোর করে এদিকে ওদিকে টেনে নিয়ে যায়'। এটাই মনের ধর্ম; *তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে সুদুষ্করম্,* 'একে নিয়ন্ত্রণ করা এবং বশে রাখা অত্যন্ত কঠিন বলেই আমি মনে করি'। কীরকম কঠিন? *বায়োরিব,* 'বায়ুকে ধরার প্রচেষ্টার মতোই'।

পরপর এই দুটি শ্লোকে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার সমস্যাটি খুবই প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। একথা আমাদেরও জেনে রাখা ভালো যে, কাজটি মোটেই সহজ নয়; অত্যন্ত দুরূহ। ছমাসের মধ্যেই একাজ সেরে ফেলা যায় না। আমাদের পক্ষ থেকে তাই অর্জুন এই প্রশ্ন করেছেন। নানা দিক থেকে বিষয়টিকে বিবেচনা করে এবার শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তর দিচ্ছেন। তিনি বলছেন,

শ্রীভগবান্ উবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫॥

শ্রীভগবান বললেন—'হে মহাবীর, মন যে চঞ্চল এবং তাকে যে সহজে বশে আনা যায় না, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু, হে কুন্তীপুত্র, অভ্যাস এবং ত্যাগের দ্বারা এটি করা সম্ভব।'

ভগবান বলছেন, 'অর্জুন, তুমি ঠিকই বলেছ, এই মনকে বশীভূত করা সত্যিই কঠিন।' মন সম্বন্ধে অর্জুনের এই মন্তব্য শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করছেন; মনের ধর্ম যে চঞ্চলতা, সে কথা তিনি অস্বীকার করছেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কীভাবে

আমরা মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সে কথাই তিনি আমাদের শোনাচ্ছেন। *অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্; অসংশয়ম্,* 'তুমি যথার্থই বলেছো, তোমার বক্তব্য সন্দেহাতীত'; *মনো দুর্নিগ্রহম্,* 'মনকে সংযত করা কঠিন', *চলম্,* কারণ 'তা সর্বদাই চঞ্চল।' অর্জুন যখন বলছেন, আমি দেখেছি মনকে বশ করা কঠিন, তখন শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—*গৃহ্যতে,* 'তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব'। কীভাবে? দু'ভাবে, *অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে, অভ্যাস* এবং বৈরাগ্য-এর দ্বারা, 'নিরন্তর অভ্যাস এবং অনাসক্তি সাধনের মাধ্যমে'।

কেবল আধ্যাত্মিক জীবনে নয়, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও বারবার চেষ্টার ফলে অসাধ্য বিষয়কেও সাধ্য করে তোলা যায়। একই জিনিস বারবার করার ফলে আপনার একটা অভ্যাস গড়ে ওঠে, তখনই বিষয়টি আপনার আয়ত্তে আসে। কাউকে তবলায় বোল তুলতে দেখলে আপনি ভাবেন, 'ওঃ, এ আমি কস্মিনকালেও পারব না।' কিন্তু ছমাস অভ্যাস করলেই আপনিও বেশ বাজাতে পারবেন। শৈশবে দেখতাম লোকে বেশ সাইকেল চালাচ্ছে, আর আমি ভাবতাম, 'এই সাইকেলে চড়া না জানি কতই কঠিন।' কিন্তু মাত্র কয়েকদিন অভ্যাস করলেই, আপনিও চালাতে পারবেন। অতএব, এ হলো *অভ্যাস*-এর প্রশ্ন। তাই অভ্যাস কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরপর আসছে *বৈরাগ্য,* অর্থাৎ, অনাসক্তি। মন কেন ছুটে বেড়ায়? তার কারণ, জগতের নানান বস্তু মনকে আকর্ষণ করে। তাই, আমরা যদি একটু অনাসক্ত হতে পারি, তাহলে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। অতএব, *অভ্যাস এবং বৈরাগ্য* চাই। পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রেও এই একই কথা বলেছেন: *অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্-নিরোধঃ, 'চিত্তবৃত্তি,* অর্থাৎ মনের ক্রিয়া এবং তার পরিবর্তনশীল প্রকৃতি, *অভ্যাস* এবং *বৈরাগ্য* দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব'। এই আত্মবিশ্বাস আমাদের অবশ্যই থাকা চাই। আপনি যদি বলেন, কোন কাজ আপনার পক্ষে করা অসম্ভব, তাহলে সে কাজ আপনি কোনদিনই করতে পারবেন না। তাই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে, প্রথমেই আপনার এই প্রত্যয় থাকা দরকার যে, 'হ্যাঁ, আমি এটা অবশ্যই করতে পারি'। একমাত্র তখনই সাফল্য আসবে। অসাধ্য বলে কিছু আছে কি? চাঁদে যাওয়াও একসময়ে অসম্ভব বলে মনে করা হতো। কিন্তু আজ? আজ তো তা সম্ভব হয়েছে। কাজেই, এমন অনেক কিছু আছে, যা একসময়ে আমরা অসম্ভব বলে মনে করি; কিন্তু সেই জিনিসই অন্য একসময়ে সম্ভবপর হয়ে ওঠে। অতএব, কোন কিছুকেই অসম্ভব বলবেন না। 'আমরা

সফল হবই, জয় আমাদের হবেই'—এই রকম একটা দুর্জয় সঙ্কল্প আমাদের অবশ্যই থাকা চাই।

গৌড়পাদ-এর *মাণ্ডুক্য উপনিষদ কারিকা*-র একটি বিখ্যাত শ্লোকেও (৩.৪১) এই ভাবটিই ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যখনই মনের সাহায্যে কোন কাজ করতে হবে, তখনই আপনার খুব দৃঢ় একটা সংকল্প থাকা প্রয়োজন। কীরকম সংকল্প? বলা হচ্ছে—'আপনি যেন একটি ঘাস নিয়ে বিন্দু বিন্দু করে সমুদ্রকে জলশূন্য করতে চেষ্টা করছেন।' এইরকম বজ্রকঠিন সংকল্প নিয়েই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেনৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ ভবেদ্ অপরিখেদতঃ ॥

হতাশ না হয়ে, হতোদ্যম না হয়ে মনকে বশে আনার জন্য অবিচলিতভাবে আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হচ্ছে, একবার একটি পাখি সমুদ্রকে শোষণ করার সংকল্প নিয়েছিল, কারণ তীরে রাখা তার ডিমগুলিকে সমুদ্র গ্রাস করেছিল। সে তার ছোট্ট ঠোঁটে করে একটি ঘাস নিয়ে এসে, তারই সাহায্যে বিন্দু বিন্দু করে জল তুলে সমুদ্রকে শূন্য করার চেষ্টা করতে লাগল। এ এক বিস্ময়কর দৃশ্য, সে কথা সত্যি; কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের এই দৃঢ় সংকল্পের নীতিকেই অনুসরণ করতে হবে। 'আমি সফল হব, আমি অবশ্যই আমার লক্ষ্যে পৌঁছবো'—এই প্রত্যয় আমাদের মধ্যে অবশ্যই থাকা চাই। এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠা আগে কত কঠিন ছিল! কিন্তু আজ তো প্রায় সবাই উঠছেন, এমনকি মহিলারাও। তাই আমি বলি, মনকে নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি এবং আত্ম-উপলব্ধির সামর্থ্য মানুষের মনেই সুপ্ত আছে। মনের এই শক্তির ওপর আস্থা রাখা চাই; বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমাদের মনে অনন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। শিশু যে কাজকে কঠিন মনে করে, কুড়ি বছরের যুবক সে কাজ অনায়াসে করে ফেলে। তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন, কোন কিছুর সম্ভাব্যতা বা অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমাদের যে বিচার, তা অত্যন্ত আপেক্ষিক। কাজেই চরম সিদ্ধান্ত করে বসবেন না। আপাতদৃষ্টিতে কোন কাজ যদি অসম্ভব মনেও হয়, তবু আপনি বলতে পারেন, 'বর্তমানে এ কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব বটে, তবে একদিন না একদিন একাজ আমি অবশ্যই করব, অবশ্যই করব'। আপনার মনোভাব এই রকমই হওয়া উচিত।

সার্কাসের বাঘ বা সিংহের কথাই ধরুন। প্রথম দিন যখন ট্রেনার সেই

ভয়ঙ্কর জন্তুটিকে তালিম দেবার চেষ্টা করেন, তা অসম্ভব বলেই মনে হয়। এমনকি তার কাছে যাওয়াই যায় না। এমনই তার চাউনি, তার তর্জন গর্জন যে তাকে দেখে ভয় হয়। কিন্তু, ধীরে ধীরে তাকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলে, সেই ভয়ানক জন্তুও বশীভূত হয়। এমনকি একদিন তার পিঠেও আমরা চড়ে বসতে পারি। এটাই তো আমরা করে থাকি। নয় কি? বন্য পশুর ক্ষেত্রে যা সত্য, আমাদের অমার্জিত চিত্তের পক্ষেও সেকথা সমানভাবে প্রযোজ্য। উদ্দাম মনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়; অনুগত ভৃত্যের মতো তাকে আপনি আপনার উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্র করে তুলতে পারেন। এর জন্য চাই প্রবল আত্মবিশ্বাস—'আমি পারবই' 'আমি পারবই', এই বিশ্বাস। তার জন্য যদি কয়েক বছর সময় লাগে, এমনকি কয়েকটা জীবনও ব্যয়িত হয়, তাতেই বা কী? শেষপর্যন্ত আমরা সাফল্য লাভ করবই। আমাদের কালের ধারণা এক জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তা আরও ব্যাপক, আরও সুদূরপ্রসারী। যে সাফল্য আমি আজ লাভ করতে পারলাম না, পরবর্তী কোন কালে তা আমি অবশ্যই লাভ করব। কিন্তু আমি এই সংগ্রাম অব্যাহত রাখব। এই জন্মও আমি বিফলে যেতে দেব না; কিছু সাফল্য আমি অবশ্যই অর্জন করব এবং যেটুকু বাকি থাকে, তা পরবর্তী জীবনে করব। কালের এই উদার ছাড়পত্র সকলকেই দেওয়া আছে, কারণ অনেক বিষয়েই মানুষকে সাফল্যলাভ করতে হবে এবং তা লাভ করার সম্ভাব্য শক্তি তার অন্তরেই লুকিয়ে আছে। তাই সময়ের যে মানদণ্ড বেদান্তে দেওয়া হয়েছে, তা অন্যান্য ধর্মের দেওয়া মানদণ্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাই, এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে লক্ষ্যপূরণের জন্য কালের এই অসাধারণ মানদণ্ড সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অবহিত করবেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে,* '*অভ্যাস* এবং *বৈরাগ্য* দ্বারা মনকে বশীভূত করা সম্ভব।' *বৈরাগ্য* হলো 'নিছক এক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণার মনোভাব'। *অভ্যাস* হলো 'পুনঃপুনঃ আচরণ'। এখানে আমরা এক চমৎকার ভাব পাচ্ছি—অভ্যাসের মাহাত্ম্য। আজ আপনি দেখছেন, এক টুকরো পাথর পড়ে আছে। পাহাড়ের ওপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল সেই পাথরের ওপর পড়ছে। কয়েক বছর অপেক্ষা করুন; দেখবেন, ওই বিন্দু বিন্দু জলের আঘাতে সেই পাথরটি ক্ষয়ে গেছে। আমি একটি পাথর দেখেছি, যেখানে একজন কপাল ছুঁইয়ে প্রতিদিন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন। কয়েক বছর যাবৎ ব্যাপারটি আমি লক্ষ্য করছিলাম। একদিন দেখলাম পাথরটিতে একটি গর্ত হয়েছে। অভ্যাসের ধর্মই এই। ত্বকের একটু পেলব স্পর্শ বা সামান্য এক

ফোঁটা জলও পাথর ক্ষইয়ে দিতে পারে। কী চমৎকার ব্যাপার! অতএব এই মন দিয়ে আমরা অসাধ্যসাধন করতে পারি। আমাদের এই মন এখন অস্থির ও অবাধ্য হলেও অভ্যাসের মাধ্যমে আমরা তাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি। প্রশিক্ষণ দিয়ে এই মনকেই আমাদের সবল ও স্থির করতে হবে। এই শ্লোকে এই শিক্ষাই আমাদের দেওয়া হয়েছে। এই দেশে যে সব মহাপুরুষ জন্মেছেন, তাঁরা সকলেই ধৈর্য সহকারে কর্ম করেছেন এবং এই সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন। আমরাও যেন তাই করি। 'আমরা সফল হবই, আমরা সফল হবই', এই হওয়া উচিত আমাদের মনোভাব। মানুষের জীবনে পরাজয়ের মনোভাবের কোন স্থান নেই। একবার আপনি হেরে যেতে পারেন, কিন্তু আবার চেষ্টা করুন, জয় আপনার হবেই। অনেকগুলো যুদ্ধে হেরে গিয়েও ব্রিটেন শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও তেমনই হয়ে থাকে। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বারবার আমরা হেরে যাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় আমাদের হবেই এবং মন আমাদের বশে আসবে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন হলেও সংগ্রাম আমাদের চালিয়েই যেতে হবে। বাস্তবিক, ধ্যানযোগ এবং *জ্ঞানযোগ*-এর পথ বড়ই কঠিন। *ভক্তিযোগ*-ও যে নিতান্ত সহজ তা নয়। সেখানেও আমরা দেখি মনকে বশীভূত করা কত কঠিন। তবে সান্ত্বনা এই, ভক্ত প্রার্থনা করে বলতে পারে, 'হে প্রভু, এমন করে দাও যাতে আমার মন বশে আসে।'

এ প্রসঙ্গে একটি শ্লোক মনে পড়েছে, যেখানে জগতের সকল ভক্তের পক্ষ থেকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, কারণ ভক্তেরা জানেন যে, তাদের দুর্বল মন কেবল ঈশ্বরের কৃপাতেই বশীভূত হতে পারে। আপনার, আমার সকলের তরফ থেকেই এই প্রার্থনা মন্ত্রটি রচনা করেছিলেন আদি শঙ্করাচার্য, যিনি ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শিবানন্দ লহরী'-র ২০ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে,

কপালিন্ ভিক্ষো মে হৃদয়কপিম্ অত্যন্তচপলম্;
দৃঢ়ং ভক্ত্যা বদ্ধা শিব ভবদধীনং কুরু বিভো ॥

কী ব্যাকুল প্রার্থনা! হে *কপালিন্*, অর্থাৎ 'হে শিব'; শিবকে কপালী বলা হয়, কারণ তিনি শ্মশান থেকে নরকপাল, অর্থাৎ একটি মাথার খুলি সংগ্রহ করে, তাকে ভিক্ষাগ্রহণ এবং খাদ্যপানীয় গ্রহণের পাত্ররূপে ব্যবহার করেন। *ভিক্ষো*, তাই তাঁকে 'ভিক্ষুক' বলে সম্বোধন করা হচ্ছে; *মে হৃদয়কপিং*, 'আমার হৃদয়রূপ বানর'; *অত্যন্ত চপলম্*, 'অত্যন্ত চঞ্চল' এই বানর; সে কখনও শান্ত

হয়ে বসে না; তার চোখ সর্বদাই এদিক ওদিক ঘুরছে। দেখবেন, বানরের ধরনধারণই এই রকম। শিব কি করবেন? *দৃঢ়ং ভক্ত্যা বদ্ধা,* 'ভক্তিরজ্জু দিয়ে মনকে শক্ত করে বাঁধবেন'। কিন্তু তারপর সেই মনকে এখানে সেখানে ফেলে রাখলে হবে না; *ভবদধীনং কুরু বিভো,* 'তাকে তোমার নিয়ন্ত্রণে রেখো'। তাহলে আর কোন ভয় থাকবে না। জগতের সকল ভক্তের পক্ষ থেকে এই হলো শঙ্করাচার্যের প্রার্থনা।

তাই, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বলছেন, 'আমি জয়ী হব, আমি জয়ী হব, কত কঠিন পরিস্থিতিতে আমি জয়ী হয়েছি, কত সমস্যার সমাধান আমি করেছি! এই প্রতিবন্ধকতাও আমি জয় করব'—এই ইতিবাচক মনোভাব অবলম্বন করতে। এই বিশ্বাস, এই *শ্রদ্ধা* বা *আত্মশ্রদ্ধা* যেন আমাদের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে। 'নিজের ওপর বিশ্বাস' এবং সেই সঙ্গে আপনার মধ্যে যে ঐশী সত্তা আছে, তার ওপর বিশ্বাস—দুটিই দরকার। 'আমার অন্তরের সেই দৈব সত্তার যখন ঘুম ভাঙবে, তখন আর অসম্ভব বলে কী থাকবে?' —এই হওয়া উচিত আমাদের মনোভাব। *একে বলা হয় শ্রদ্ধা, যা ইতিবাচক মনোভাবগুলির সমষ্টি।* নেতিবাচক মনোভাবগুলি দীর্ঘদিন লালন করা উচিত নয়; সাময়িক তা আমাদের মনে স্থান পেলেও পেতে পারে। সাধারণত 'আমি জয়ী হব, আমি পারব', এই মনোভাবই হওয়া উচিত। এরই নাম *শ্রদ্ধা* এবং এরপর সপ্তদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলবেন যে, একজন মানুষ যতটা শ্রদ্ধাবান, ততটাই ভালো; *শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ*। শ্রদ্ধা না থাকলে আপনি অপদার্থ হয়ে গেলেন। তাই, নিজের ওপর শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস রাখুন, আপনার মধ্যে যে অসাধারণ শক্তি রয়েছে, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করুন।

শ্রীকৃষ্ণ তাই *বৈরাগ্য* এবং *অভ্যাস*-এর কথা বলছেন। আমি রেঙ্গুনে এক ব্যারিস্টারের ছেলেকে দেখেছিলাম। সে ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ধূমপান ইত্যাদির মতো অনেক বদগুণও তার ছিল। একদিন সেই ব্যারিস্টার আমার কাছে এসে বললেন, 'আমার পুত্রটি এই ধরনের। তবে সে আপনাকে পছন্দ করে। অনুগ্রহ করে ওকে আপনি কিছু পরামর্শ দিন।' আমি বললাম 'শরীরটাকে শক্তপোক্ত করে তোলার জন্য ওকে রেঙ্গুন থেকে আপনি ব্যাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দিন। ওখানে গিয়ে ও প্রথমে শরীরের উন্নতি করুক। কারণ ওর শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেই সঙ্গে ওর মনটাও ভেঙে পড়েছে। ওকে ওখানে পাঠিয়ে দিন।' এর ফল হয়েছিল আশ্চর্যজনক। ছেলেটি যখন রেঙ্গুন থেকে ভাইজ্যাগে এসে

নামল, সেই সময়ের মধ্যে কারও বলার অপেক্ষা না রেখেই সে সিগারেট খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর সে ব্যাঙ্গালোরে গেল এবং তার শরীর সারিয়ে তুলল। তার মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা দিল এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা ঐ ধরনের কিছু একটা হয়েছিল।

এইভাবে, সামান্য একটু চেষ্টাতেই আমাদের মধ্যে নতুন শক্তি আসতে পারে। তাই আমাদের অবশ্যই সে চেষ্টা করা উচিত। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ অভ্যাসের ওপর এত জোর দিচ্ছেন। *অভ্যাস*—অভ্যাসের দ্বারা কত কিছুই না আমরা আয়ত্ত করতে পারি। মানুষ কত কষ্ট করে গান-বাজনা শেখে—হারমোনিয়াম, বীণা বা এইরকম সব যন্ত্র বাজানো কি মুখের কথা? কিন্তু তবু অভ্যাসের দ্বারাই মানুষ এই সামর্থ্য অর্জন করে। এক সময়ে যা অসম্ভব, অন্য সময়ে সেটাই সম্ভব হয়ে ওঠে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

—'আত্মসংযমে অনভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে *যোগ* দুষ্প্রাপ্য; এই হলো আমার অভিমত; কিন্তু যিনি আত্মসংযমে অভ্যস্ত, যথাবিহিত উপায়ে চেষ্টা করেন, সেই ব্যক্তির পক্ষে তা লাভ করা সম্ভব।'

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ, 'যাঁর নিজের, তথা মনের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, তাঁর পক্ষে যোগে সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা নেই'; *অসংযতাত্মনা,* অর্থাৎ 'যাঁর মন অনিয়ন্ত্রিত বা নিয়ন্ত্রণশূন্য'; *সংযত* মানে 'সুনিয়ন্ত্রিত'; *অসংযত* মানে 'নিয়ন্ত্রণহীন', অর্থাৎ যখন মন ইতস্তত ছুটে বেড়ায়; *দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ,* 'এই ধরনের লোকের কোনরকম যোগ হতে পারে না; এই আমার অভিমত', এই কথা শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন। *বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুম্ উপায়তঃ,* 'কিন্তু যাঁরা মনকে কিছুটাও নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন, তাঁরা যথার্থ পথ অবলম্বন করে প্রকৃত যোগে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন'। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *শক্যঃ অবাপ্তুম্,* 'তিনি যোগ লাভ করতে পারেন; *উপায়তঃ,* যথাবিহিত *উপায়* বা পথের মাধ্যমে।' যথার্থ পথ অবলম্বন করলে শেষ পর্যন্ত আপনি মনকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করতে পারবেন।

এবার অর্জুন অন্য আর একটি প্রশ্ন করছেন,

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

অর্জুন বললেন—'হে কৃষ্ণ, শ্রদ্ধাবান হওয়া সত্ত্বেও, যিনি আত্মনিয়ন্ত্রণে অক্ষম হয়ে যোগের পথ থেকে সরে যান, এইভাবে যোগসিদ্ধিলাভে ব্যর্থ হয়ে তিনি কী গতি প্রাপ্ত হন?'

মনে করুন কেউ প্রথমে সাধন পথে সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু পরে, কিঞ্চিৎ পথভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁর চেষ্টায় শৈথিল্য এসেছে। এইরকম ব্যক্তিকে বলা হয় *যোগভ্রষ্ট*।*অযতিঃ*, 'সংগ্রামে অসমর্থ; *শ্রদ্ধয়োপেতো*, অথচ, 'তাঁর হৃদয়ে প্রচুর শ্রদ্ধা' রয়েছে ঃ ''আমি অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করব''; তাঁর নিজের ওপর বিশ্বাস আছে; যোগবিধির ওপরেও তাঁর শ্রদ্ধা রয়েছে, কিন্তু *যোগাচ্চলিতমানসঃ*, 'তাঁর মন যোগের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে'; একটু গা-ছাড়া ভাব আসার ফলে তাঁর মন যোগভাবনা থেকে নিচে নেমে গেছে। *অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং*, 'যোগের পরম লক্ষ্যে পৌঁছতে না পেরে'; *সংসিদ্ধি* মানে যোগ সাধনায় 'সিদ্ধিলাভ'। *কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি*, 'সেই ব্যক্তির কী গতি হয়?' যে ব্যক্তি এই অবস্থায় পড়েছেন, হয়তো তিনি মৃত্যুশয্যায়। মৃত্যুর পর তাঁর কী গতি হবে? পরবর্তী শ্লোকে এই প্রশ্নটিকেই আরও একটু বিশদ করা হয়েছে ঃ

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

—'হে মহাবাহো [কৃষ্ণ], ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে উভয় দিক থেকেই ভ্রষ্ট, এই রকম মোহগ্রস্ত ব্যক্তি কি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের মতো আশ্রয়হীন হয়ে বিনষ্ট হন?'

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টঃ, 'যিনি দুটিই হারিয়েছেন—সাংসারিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবন; *উভয়* অর্থাৎ 'দুই'; *বিভ্রষ্টঃ*, দুটি পথ থেকেই 'পড়ে গেছেন'; *ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি*, প্রবল বাতাসে 'ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের মতো, তিনি কি বিনষ্ট হন?' সেই সাধকের অবস্থাও কি ঐরকম হয়? তিনি বেশ যোগসাধনা করছিলেন, এই সাধনায় তার বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাও ছিল, কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে তিনি সাধন ছেড়ে দিলেন। এই ধরনের মানুষ কি আকাশের বিক্ষিপ্ত মেঘের মতোই বিনষ্ট হয়ে যাবে? *অপ্রতিষ্ঠো*, যোগাবস্থায় 'প্রতিষ্ঠিত না হয়ে'; *বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি*, 'ব্রহ্মলাভের পথে বিভ্রান্ত হয়ে'। যাঁর মন সেই পথ হতে পতিত হয়েছে,

যিনি এই যোগের পথকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারলেন না, তাঁর ভবিষ্যৎ কী? এই হলো অর্জুনের প্রশ্ন।

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

—'হে কৃষ্ণ, আপনিই আমার এই সংশয় সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করতে পারেন; কারণ আপনি ছাড়া আর কারও পক্ষে তা দূর করা সম্ভব নয়।'

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ, 'হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয়'; *ছেত্তুম্ অর্হসি অশেষতঃ,* 'আপনিই এই সংশয় সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারেন'; *তদ্ অন্যঃ,* 'আপনি ছাড়া অন্য কেউ'; *সংশয়স্য অস্য ছেত্তা,* 'এই সংশয়ের খণ্ডনকারী'; *ন হি উপপদ্যতে,* আর কাউকে 'আমি দেখতে পাচ্ছি না'।

শ্রীভগবান্ উবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

শ্রীভগবান বললেন—'হে পার্থ, ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও তাঁর বিনাশ হয় না, কারণ, হে বৎস, কল্যাণকারী ব্যক্তির কখনওই দুর্গতি হয় না।'

প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক মানুষকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, যদি কেউ মঙ্গল-কর্ম করে, তবে সে কখনওই বিনষ্ট হবে না। গীতায় একাধিকবার শ্রীকৃষ্ণ এই পরম আশ্বাস দিয়েছেন। এখানেও বলছেন, 'অর্জুন, আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলছি, *ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। কল্যাণ* মানে 'যা মঙ্গলজনক, যা শুভ'। সংস্কৃত ভাষায় এটি এক মহিমাব্যঞ্জক শব্দ। 'অমরকোষ' অনুসারে, *কল্যাণ, মঙ্গল এবং শুভ,* এই তিনটি শব্দই সমার্থক। যিনি এই কল্যাণ বা মঙ্গল বা শুভ কর্ম করেন, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *তাত দুর্গতিং ন গচ্ছতি,* 'হে বৎস, তাঁর কখনওই দুর্গতি হয় না', বা তিনি কখনও কোন দুরবস্থায় পড়েন না; *দুর্গতি* মানে 'জীবনের অধোগতি'। এইরকম ব্যক্তির কখনও অধোগতি হয় না। এ হলো ভগবানের অঙ্গীকার। তাহলে তাঁর কী গতি হয়? শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিচ্ছেন ঃ

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

—'শুভ কর্মকারী ব্যক্তিদের প্রাপ্য পুণ্যলোক লাভ করে এবং বহু বছর সেখানে অতিবাহিত করে, সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোকে শুদ্ধ এবং শ্রীযুক্ত গৃহে পুনর্জন্ম লাভ করেন।'

যোগভ্রষ্টঃ, অসতর্কতাবশত চিত্ত বিপথে চালিত হওয়ায় *যোগ* সম্পূর্ণ না করে 'যিনি যোগের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন', তিনি পরজন্মে তাঁর অসমাপ্ত কর্মটুকু সম্পূর্ণ করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন। এটি 'সনাতন ধর্মের' বিশেষ শিক্ষা। বর্তমান বিশ্বের অন্য আর কোন ধর্মেই আপনারা এই ভাব পাবেন না। আগে আদিম ধর্মমতগুলিতে এই বিশ্বাসই প্রচলিত ছিল, কিন্তু অন্য ধর্মগুলির বিশ্বাস মানুষের বর্তমান জীবনটাই সব—আগেও সে ছিল না, পরেও সে থাকবে না। এখনকার স্থূল জীবনের মধ্যেই তার অস্তিত্ব সীমিত। কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের মহান আচার্যরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, এই শরীরটি বহু অভিব্যক্তির একটি—এই শরীর আগেও বহুবার জন্মেছে, ভবিষ্যতেও বহুবার জন্মাবে। ভারতবর্ষে স্থান ও কালের ধারণা, এ সম্পর্কে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যে ধারণা, তার মতোই ব্যাপক। আমরা সকলেই একটা মহৎ কিছু খুঁজছি। যদি এই জন্মে আমরা তা নাও পাই, পরের জন্মে পাব; তাও যদি না হয়, তবে তার পরবর্তী কোন একজন্মে। সুযোগ আমরা সকলেই পাব। এই হলো পুনর্জন্মের ধারণা।

সংসারে এই ক্রমাগত আসা-যাওয়া তখনই শেষ হবে, যখন আমরা ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র উৎস সেই অনন্ত অবিনাশী ব্রহ্ম বা আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারব। এই চরম উপলব্ধিকেই বেদান্ত মানবিক ক্রমবিকাশের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করে। পুনর্জন্মের ধারণা আমাদের তখনই হয়েছে, যখন মানবসত্তার তিনটি স্তর আমরা আবিষ্কার করেছি। তিনটি স্তরের একটি হলো *স্থূলশরীর।* সেই স্থূলশরীরের মধ্যে আবার রয়েছে কল্পনা, চিন্তা, সংস্কার ইত্যাদি সমন্বিত সূক্ষ্ম সত্তা বা *সূক্ষ্মশরীর।* সেই সূক্ষ্মশরীরের ভিতরে আবার আছে *কারণ-শরীর।* শেষেরটি সূক্ষ্মতম। অতএব, তিনটি স্তরের একটি হলো স্থূল, অন্যটি সূক্ষ্ম এবং শেষেরটি সূক্ষ্মতম। মৃত্যুর সময়ে যা ঘটে, তা হলো ঃ এই স্থূল-শরীরেরই মৃত্যু হয় এবং তা পড়ে থাকে। সূক্ষ্মশরীর এবং কারণশরীর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে যায়। এ যেন সাপের খোলস ছাড়ার মতো—পুরনো

চামড়া ত্যাগ করে নতুন চামড়া গ্রহণ করা। স্থূলশরীরের আয়ু সীমিত ও নির্দিষ্ট। বস্তুত, এক একটি শরীরের আয়ুষ্কাল এক একরকম। স্থূলশরীরের স্থায়িত্ব অত্যন্ত সীমিত, কিন্তু সূক্ষ্মশরীরের পরমায়ু অনেক বেশি। এমনকি এখনো, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশটাই স্থূল জড় শরীরের মাধ্যমে সেই সূক্ষ্মশরীরের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন *স্থূলশরীরের* মধ্য দিয়ে এ কেবল *সূক্ষ্মশরীরের* এক ধারাবাহিক প্রকাশ। আমাদের সচেতন অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় মনের অচেতন এবং অবচেতন স্তরের দ্বারা। মনের এই অচেতন এবং অবচেতন স্তরই *সূক্ষ্মশরীর* গঠন করে, যাতে নিহিত থাকে আমাদের আগের আগের জন্মের এবং বর্তমান জীবনের সবরকম কর্ম-সংস্কার। ঋষিরা যখন এই সূক্ষ্মশরীর আবিষ্কার করলেন, তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, স্থূলশরীরের মৃত্যু হলেই মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায় না; শুধুমাত্র তার স্থূল শারীরিক অভিব্যক্তিটুকুরই সমাপ্তি হয়। নতুন আর এক দেহ ধারণ করে আপনার জীবনের অভিযাত্রা চলতেই থাকবে। তাই মৃত্যু পূর্ণচ্ছেদ নয়, তা কমা বা সেমিকোলনের মতো সাময়িক বিরতিচিহ্নমাত্র। জীবন অব্যাহতই থাকে, যদিও স্থূলভাবে তা প্রমাণ করা যায় না। কেবল আধ্যাত্মিক অনুভূতি দিয়েই তা যাচাই করা সম্ভব।

এই কারণেই ঋষিরা মানব-সম্ভাবনা-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং সেই অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তাঁরা মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন যে, দৈহিক স্থূল অভিব্যক্তির অতীত এক সত্তা মৃত্যুর পরও টিকে থাকে। অতএব, এই জীবনে যা কিছু আমরা করি, তা বিনষ্ট হয় না। মৃত্যুর পরও আমাদের জীবনযাত্রা অব্যাহত থাকে। মৃত্যু যেন একরকমের ঘুম। ঘুম ভাঙলে জেগে উঠে আমরা আবার আমাদের যাত্রা শুরু করি। মনে করুন, কোন তীর্থযাত্রী তীর্থে যাচ্ছেন; যাত্রাপথে কোন এক জায়গায় তিনি একরাত্রি বিশ্রাম করেন এবং নিদ্রা যান। কিন্তু পরদিন সকালে উঠেই তিনি আবার যাত্রা শুরু করেন। মানুষের জীবনও সেইরকম। এ হলো আমাদের ধর্মের এক গূঢ় সত্য, যা ক্রমশই পাশ্চাত্যবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এঁদের মধ্যে বেশ কিছু বিজ্ঞানীও রয়েছেন, যদিও বিষয়টিকে জড়বিজ্ঞানের মানদণ্ড দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। আমাদের ইন্দ্রিয়তন্ত্র দিয়েও তত্ত্বটিকে প্রমাণ করা যায় না, কারণ তা অপরিমেয়। তবুও অনেকেই অনুভব করেন যে, বিষয়টির মধ্যে এক গূঢ় সত্য লুকিয়ে আছে।

ইংরাজি ভাষায় যাকে soul বা 'মানবাত্মা' বলা হয়, এই *সূক্ষ্মশরীর* হলো তাই। এই সূক্ষ্মশরীরেরই পুনর্জন্ম হয়। এই সত্য যে প্রাচীন ও আধুনিক কালের বেশ কিছু মানুষ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন, তার প্রমাণ সাম্প্রতিককালের একটি গ্রন্থ, যার নাম 'Reincarnation : An East-West Anthology'। গ্রন্থটি সংকলন করেছেন জোসেফ হেড (Joseph Head) এবং এস.এল.ক্রান্স্টন (S.L. Cranston) এবং প্রকাশিত হয়েছে Julian Press, Inc., New York থেকে। গ্রন্থের প্রচ্ছদে বলা হয়েছে ঃ

'পুনর্জন্ম তত্ত্বটিকে প্রায়শই প্রাচ্য ধারণা হিসাবেই দেখা হয় এবং মনে করা হয়ে থাকে যে, এই ধারণা পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এবং ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সকল যুগের বিশিষ্ট দার্শনিক, ধর্মশাস্ত্র-বেত্তা, কবি, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্যদের উদ্ধৃতিসমূহের বিপুল তথ্যপূর্ণ এই সংকলন, যার মধ্যে রয়েছে পুনর্জন্মবাদ ভাবধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যসমৃদ্ধ সমীক্ষা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে পুনর্জন্মবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা, যা চিরাচরিত চিন্তাধারার এই ত্রুটি সংশোধনে সহায়তা করবে।

'এই সংকলনের আলোচ্য-বিষয় মানুষের অমরত্ব, যাকে বহু দার্শনিক এ কালের মুখ্য বিচার্য বিষয় বলেছেন'।

ঘোষণাটি শেষ হয়েছে জেম্‌স ফ্রীমান ক্লার্ক (James Freeman Clarke) -এর নিম্নলিখিত মন্তব্য দিয়ে। তিনি বলেছেন ঃ

'এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় হবে, যদি দেখা যায় যে বিজ্ঞান এবং দর্শন, মৃত্যুর পরে আত্মার দেহান্তরে গমনের পুরনো তত্ত্বটি আবার গ্রহণ করছে এবং আমাদের বর্তমান ধর্মীয় মনোভাব এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাকে ঢেলে সাজিয়ে মানুষের বিশ্বাসের প্রশস্ত সমুদ্রে ভাসানোর উদ্যোগ করছে। অবশ্য মানুষের মতামতের ইতিহাসে এরকম বহু অদ্ভুত ঘটনাই ঘটেছে।'

গ্রন্থের মুখবন্ধে সংকলকরা বলেছেন, 'যদিও ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই বহু বিশিষ্ট চিন্তাবিদ পৃথিবীতে বারবার দেহধারণের এই ধারণাকে হয় সমর্থন করেছেন, নয়তো কখনও কখনও বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেছেন—এই গ্রন্থই যার প্রমাণ—তবুও এসব মন্তব্য পুনর্জন্মবাদকে একটি প্রামাণিক সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও বলব, যে চিন্তা

বহু বিশিষ্ট মানুষকে দীর্ঘকাল ভাবিয়েছে, তাকে হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না; বরং তা প্রশ্ন, পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধানের যোগ্য।'

আমরা সবাই বেঁচে থাকি এবং একদিন মারা যাই। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি সবকিছু শেষ হয়ে যায়? প্রত্যেক মানুষের মনেই এই প্রশ্ন। কঠ উপনিষদে (১.১.২০) বলা হয়েছে, *অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে,* অর্থাৎ 'কেউ বলেন তার (আত্মার) অস্তিত্ব আছে, কেউ বলেন নেই'। আমরা আমাদের এই চোখ দিয়ে হয়তো দেখতে পাই না, কিন্তু এমন কিছু অবশ্যই আছে, যা মৃত্যুর উর্ধ্বে। সেই পুনর্জন্মের সত্যতার উপর ভিত্তি করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যখন সেই *যোগভ্রষ্ট* ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন তিনি তাঁর পার্থিব শরীর বা স্থূলশরীরটিই শুধু ত্যাগ করেন, সূক্ষ্মশরীরে তখনও তিনি থাকেন এবং এক নতুন জন্মলাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি কোথায় ও কীভাবে জন্ম নেবেন তা তাঁর এই জন্মের প্রবণতার দ্বারাই নির্ধারিত হবে। কঠ উপনিষদে এই (২.২.১৭) কথাই বলা হয়েছে—*যথা কর্ম যথা শ্রুতম্,* 'তাদের কর্ম এবং জ্ঞান অনুসারে।' তাঁদের কীরকম জন্ম হবে? তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ এখানে দু-রকম জন্মের কথা বলেছেন।

প্রথমে বলছেন, *প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্*। প্রথমত সেই ব্যক্তি ইহলোকে প্রচুর ভালো কাজ করেছেন, প্রচুর পুণ্যকর্ম করেছেন; অতএব সেই ব্যক্তি 'পুণ্যকর্মকারীদের প্রাপ্য সূক্ষ্ম লোকে' যাবেন। *পুণ্যকৃতাং লোকান্।* কিন্তু সেই স্বর্গ বাস তো শাশ্বত নয়। যে পুণ্যকর্মের ফল তাঁকে স্বর্গে এনেছিল, তা যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, সেই ব্যক্তি তখন আবার মনুষ্যলোকে ফিরে আসবেন এবং পুনর্জন্ম গ্রহণ করবেন। কিন্তু কোথায়? *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে,* 'কোন ধনী, সদাচারী পরিবারে'। সেই বিশেষ পরিমণ্ডলের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হবেন। কারণ, মনের মিল বা টান বলেও তো একটা কথা আছে। ঐ বিশেষ পরিস্থিতি বা পরিমণ্ডলের সঙ্গে এই আত্মার একটা সম্বন্ধ আছে। অতএব, সেখানেই তাঁর জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *শাশ্বতীঃ সমাঃ,* 'দীর্ঘকাল স্বর্গসুখ ভোগ করার পর', যখন কোন মানবাত্মার পুণ্যের ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যায়, তখন তিনি এক সদাচারী এবং শ্রীযুক্ত পরিবারে জন্ম নিতে পারেন—*শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*। তারপর কী হয়? জন্মগ্রহণ করার কিছুকালের মধ্যেই পূর্ব জন্মের সংস্কারগুলি তাঁকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। এভাবে, আগের জন্মে যেখানে থেমে গিয়েছিলেন, সেখান থেকেই তিনি আবার চলা শুরু করেন। তাহলেই দেখুন, যা কিছু আপনি করেন, তার কোন কিছুই নষ্ট হয় না।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্, 'সেখানে তিনি পূর্বজন্মের সব চিন্তাধারা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হন।' অতীতের পতন তখন আর গুরুত্ব পায় না, গুরুত্ব পায় তাঁর অন্তর থেকে উৎসারিত নানা উদ্দীপনা এবং তাদের মধ্য দিয়ে বয়ে আসা মহৎ চিন্তাধারা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি। তখন নতুন জন্মপ্রাপ্ত অধ্যাত্মপিপাসু যোগী নিজের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন—'এবার নতুন করে যাত্রা শুরু করে এগিয়ে যাওয়া যাক'। পূর্বজন্মে তিনি কী করেছেন, সেসব হয়তো তাঁর মনে নেই, কিন্তু তাঁর অবচেতন মন তাঁকে সঠিক পথেই নিয়ে যাবে। *পুনর্জন্ম সম্বন্ধে একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি হলো, কোন লোকেরই গতজন্মের কোন স্মৃতি থাকে না*। তার উত্তরে বেদান্ত বলে, এই আপত্তি অযৌক্তিক কারণ *স্মৃতি অস্তিত্বের প্রমাণ হতে পারে না।* শৈশবের বহু স্মৃতিই তো মানুষ ভুলে যায়। তাতে কি তার অস্তিত্ব মিথ্যা হয়ে যায়?

আমাদের জীবনের দিকে তাকান। দেখবেন, ঠিক এমনটিই ঘটছে। বিশেষ কোন একটি বৃত্তি বা জীবিকা পছন্দ করতে কে আমাদের প্রবৃত্ত করে? একই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও, একই বংশগতির ধারক ও বাহক হয়েও সকলে তো একভাবে জীবন যাপন করে না, এক পথের পথিক হয় না। একই পরিবারের প্রতিটি শিশু নিজের নিজের রুচি অনুসারে সঙ্গীত, খেলাধুলা, বিজ্ঞানচর্চা বা পর্বতারোহণ ইত্যাদি কোন না কোন বিশেষ বৃত্তি বেছে নেয়। *এই বেছে নেওয়ার প্রেরণা কোথা থেকে আসে?* এই জীবন থেকে নয়, বংশগতির যে সাধারণ ধারা সকলের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে, সেখান থেকেও নয়। কারণ, এই জীবনে তার পছন্দের জীবিকা বা বৃত্তি সম্পর্কে এখনও তার কোন অভিজ্ঞতাই হয়নি। কাজেই, *সেই প্রেরণা অবশ্যই এসেছে পূর্বজন্ম থেকে।* সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলবেন, 'আমি জানি না ঠিক কেন, কিন্তু এই বিষয়টির প্রতিই আমি একটা টান বোধ করছি। আমি এটাই হতে চাই, অথবা ওটাই হতে চাই।' আপনি সেই ছেলে বা মেয়েকে যুক্তি দিয়ে বোঝান, 'না, ওটি করো না, অন্য কিছু কর'। দেখবেন, আপনার শত চেষ্টা সত্ত্বেও ঘুরেফিরে সে তার কথাতেই ফিরে এসে দৃঢ়তার সঙ্গে বলবে—'না, *এটাই* আমার পছন্দ'। এই জন্মের এই যে দৃঢ় সংকল্প তার ভিত্তি হলো তার পূর্বজন্মের কর্ম, তার সংস্কার। পূর্বজন্মের এই সংস্কারই আপনাকে অনুপ্রাণিত করে এক বিশেষ পথনির্দেশ দিয়ে থাকে। তাহলে দেখতে পাচ্ছি, প্রথম ধরনের পুনর্জন্ম হলো *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে এবং* দ্বিতীয় ধরনের পুনর্জন্ম হলো যোগীর পরিবারে। পরবর্তী শ্লোকে সে কথাই বলা হবে।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

—'অথবা [যোগভ্রষ্ট পুরুষ] কেবল জ্ঞানবান যোগিগণের কুলেই জন্মগ্রহণ করতে পারেন; এইপ্রকার জন্ম জগতে অতি দুর্লভ।'

অত্যন্ত জ্ঞানী *যোগীর* একটি পরিবার হয়ত তেমন সচ্ছল নাও হতে পারে; কিন্তু সেই পরিবারের লোকেরা খুব সদাচারী এবং ভালো। তাঁরা যোগ অভ্যাস করেন। সেরকম বংশেও তাঁর [যোগভ্রষ্টের] পরবর্তী জন্ম হতে পারে। এই ধরনের পরিবারে জন্ম হলে সেই ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্য বাড়তি প্রেরণা পাবে। ভারতবর্ষের একটি দৃষ্টান্ত দিই। অনেকেই আজ কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি, বিশেষত IAS এবং IPS-এর জন্য চেষ্টা করেন। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, অধিকাংশ আবেদনকারীই দিল্লীর লোক, কারণ সেখানকার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে ঐ ধরনের চাকুরিজীবির খুব রবরবা। তাই, এই পরিবেশ একটি সদ্যজাত শিশুকেও প্রভাবিত করে। শুরুতে, এই সব কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিগুলিতে দিল্লীবাসীদেরই একাধিপত্য ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই আকাঙ্ক্ষা দেশের প্রত্যন্ত অংশেও ছড়িয়ে পড়ছে। সামাজিক সংযোগের মাধ্যমে এক নতুন সংস্কার সর্বত্র জেগে ওঠার ফলে আজকাল বহু দূর-দুরান্তর থেকেও ছেলেমেয়েরা এই চাকরিতে আবেদন করতে ছুটে আসছে, এমনকি মফঃস্বল এবং গ্রামাঞ্চল থেকেও। তাই সামাজিক বাতাবরণ এবং পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব যে কিছু কম নয়, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। যোগের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার। পবিত্র ও শুদ্ধ পারিবারিক পরিবেশে জন্মালে কোন ব্যক্তি পূর্বজন্মে যেসব পুণ্যকর্ম করেছিলেন, এ জন্মেও তা অনুসরণ করতে প্রাণিত হবেন। এই প্রবণতার কারণটি তিনি না-ও জানতে পারেন, কিন্তু প্রবণতা তাঁকে ক্রমাগত ওই দিকেই টানে। অন্তরের এই আহ্বানকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না; বস্তুত, কেউই পারেন না।

এতৎ হি দুর্লভতরং, 'এই [যোগীকুলে জন্মানো] অতি দুর্লভ ব্যাপার ; এই নির্বাচনের সুযোগ সহজলভ্য নয়। *লোকে জন্ম যদীদৃশম্,* 'জগতে এইরকম জন্ম' অত্যন্ত দুর্লভ; বিরল কোন কোন ক্ষেত্রে এইরকম হয়ে থাকে। অতএব, যোগ-এর প্রবণতা আপনার মধ্যে আগে থেকেই ছিল, তার সঙ্গে এবার যুক্ত হলো যোগের অনুকূল নতুন পারিবারিক পরিমণ্ডল। প্রবণতা এবং পরিমণ্ডল এই দুয়ে মিলে আপনাকে যোগ সাধনার পূর্বতন পথে আবার যাত্রা শুরু করার প্রেরণা দেবে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

—'সেখানে পূর্বদেহে লব্ধ বুদ্ধির সঙ্গে তিনি যুক্ত হন এবং, হে কুরুনন্দন, তখন সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি আগের চেয়ে আরো বেশি যত্নবান হন।'

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্; তত্র অর্থাৎ 'সেখানে', যখন শিশুর বয়স চার থেকে আট বছর, তার মধ্যেই তার পূর্বজন্মের কিছু প্রেরণা, যা তার মধ্যে সূক্ষ্মদেহে আগে থেকেই কাজ করছিল, তাকে আধ্যাত্মিক বা যোগের পথে এগিয়ে যেতে উদ্দীপিত করে। আগের কোন জন্মে যে-পথ সে ছেড়ে দিয়েছিল, এখন আধ্যাত্মিক পূর্ণতালাভের জন্য সেই পথেই সে আবার যাত্রা শুরু করে। *পৌর্বদেহিকম্, 'পূর্বদেহের* সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত', অথবা সেই 'আগের দেহ', যে দেহে তিনি এই যোগ অভ্যাস করেছিলেন; *বুদ্ধিসংযোগং লভতে,* 'সেই *বুদ্ধি* তীব্র বেগে তার কাছে উপস্থিত হয়', যখন সে তার জীবনের পথ নির্বাচন করতে শুরু করে। সেই বুদ্ধিই শেষ পর্যন্ত তার মনে এইভাব জাগিয়ে তোলে ঃ 'এই পথই আমি গ্রহণ করব, এ হলো সেই পথ, যে পথে চলতে চলতে হঠাৎই আমি যাত্রা থামিয়ে দিয়েছিলাম'। *যততে চ ততো ভূয়ঃ,* 'এইরকম ব্যক্তিই এই নতুন জীবনে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার পথে আবার এগিয়ে চলেন'; *যত্ন,* মানে 'সংগ্রাম', প্রচেষ্টা; তিনি তাঁর আগের প্রচেষ্টা আরো প্রবলভাবে চালিয়ে যান; *সংসিদ্ধৌ,* 'আধ্যাত্মিক জীবনে সিদ্ধি বা পূর্ণতা লাভের জন্য'; *কুরুনন্দন,* অর্থাৎ 'অর্জুন'।

এইভাবেই আকাঙ্ক্ষিত জীবনের জন্য পূর্বজীবনের অসম্পূর্ণ সাধনা তিনি এই নতুন জন্মে অব্যাহত রাখেন; পরবর্তী জীবনেও ঐ এক প্রবণতা তাঁকে সাধনপথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনার পূর্বজন্মের *বুদ্ধি* এখন আপনাকে প্রভাবিত করবে। দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির মৃত্যু হয় না। মন এবং বুদ্ধি, দুটোই জীবনের সব সংস্কারের সঙ্গে থেকে যায়; থেকে যায় কর্ম-ফলগুলিও। কাজেই, সেই বুদ্ধিই এখন এই নতুন জীবনে সক্রিয় হতে শুরু করে। তা না হলে, কেন একটি শিশু তার শৈশব থেকেই সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কেনই বা আর একজন সেনাবাহিনীতে যাওয়া পছন্দ করে তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। একই পরিবারে তাদের জন্ম, বংশানুগতির নিয়ন্ত্রক উপাদানেরও (genetic) কোন পার্থক্য তাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তবুও তাদের পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে কেন এই পার্থক্য? কোন জীনতত্ত্বেই এর সঠিক ব্যাখ্যা মেলে না।

আমাদের দেশের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা বলেছেন, সত্য হলো এই ঃ মানুষ স্থূল-শরীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অতএব, মৃত্যু মানে জীবনসংগ্রামের সমাপ্তি নয়। মানুষের একটা সূক্ষ্মশরীরও আছে। সেই সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর নষ্ট হলেও থাকে এবং সেই সূক্ষ্মশরীরই তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি নতুন শরীর তৈরি করে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মের সব আচার্যরা এই শিক্ষাই দিয়েছেন। যাঁরা বিশ্বাস করেন, মানবসত্তা কেবল স্থূলশরীরেই সীমিত, তাঁরা এই পরম সত্য উপলব্ধি করতে পারেন না।

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥

—'[যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির] পূর্বজীবনের সেই যোগ অভ্যাসই তাঁকে অনায়াসে [যোগ অনুশীলনে] আকৃষ্ট করে। এমনকি, যোগানুসন্ধানকারী [যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি] বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠাতা অপেক্ষাও উচ্চতর স্তরে উঠে যান।'

পূর্বাভ্যাস, 'আগের অভ্যাস বা সাধন'; *হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ,* 'না চাইলেও তাঁকে অধ্যাত্মসাধনের পথে আকর্ষণ করে।' আপনি নিজে হয়তো এ পথ খুব একটা পছন্দ করেন না, কিন্তু আপনার ভিতরের প্রেরণা আপনাকে সেই দিকেই নিয়ে যাবে। এরপর একটি সুন্দর সত্য শ্রীকৃষ্ণ এখানে উদ্‌ঘাটিত করেছেন ঃ *জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্ম অতিবর্ততে; শব্দব্রহ্ম* হলো 'বেদ', বেদের সেই অংশ, যেখানে ক্রিয়া ও নানারকম অনুষ্ঠানের কথা বলা আছে, ধর্মের ব্যাপারে কী করণীয় আর কী অকরণীয়, সে বিষয়ে নির্দেশ আছে। এর আক্ষরিক অর্থ হলো ব্রহ্ম বা চরম সত্য, যা *শব্দ*রূপে প্রকাশিত; *শব্দ* মানে বেদ। কোরাণে, বাইবেলে, সর্বত্রই ধর্মের এই বিধিনিষেধের দিকটি আপনারা দেখতে পাবেন। এই বেদেরই জ্ঞানকাণ্ডে বলা হয়েছে যে, সাধক যখন ধর্ম নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেন, তখনই এইসব বিধিনিষেধ অতিক্রম করে যান। যতদিন আপনি এই পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু না করেন, ততদিন আপনি এই সব বিধিনিষেধের মধ্যে, কিন্তু একবার যখন আপনি ধর্মকে হাতেনাতে পরীক্ষা করতে এবং উপলব্ধি করতে শুরু করবেন, তখন যে-কোন ধর্মের বিধিনিষেধকে আপনি অতিক্রম করে যান। এইভাবেই *শব্দব্রহ্মকে* অতিক্রম করা যায়। কে অতিক্রম করে? *জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য,* 'যিনি যোগমার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু বা পরীক্ষানিরীক্ষা করেন।' যখন আপনি অধ্যাত্ম যোগ অভ্যাস করতে শুরু করেন, তখন আপনার আদৌ এই সব বিধিনিষেধের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। কারণ,

আপনি হাতেকলমে পরীক্ষা করছেন এবং সেটাই যথার্থ ধর্ম। বিধিনিষেধগুলি নিতান্ত প্রাথমিক ব্যাপার। শিশুকে পাঁচ বা ছয় বছর বয়স পর্যন্ত অবশ্যই তার বাবা-মার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতে হয়, কিন্তু এর পর নিজের বিচারবুদ্ধি খাটিয়েই তাকে নিজের কর্তব্য স্থির করতে হবে। তখন সে বলতে পারে 'আমি এটা পছন্দ করি, ওটা পছন্দ করি' ইত্যাদি।

আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। ধর্মজীবনের একেবারে গোড়ায় আপনি বিধিনিষেধ মেনে চলুন। হিন্দু *স্মৃতি* শাস্ত্রগুলিতে, ইসলামীয় *শরিয়ত*-এ এবং অন্যান্য বহু ধর্মশাস্ত্রেও এরকম বিধিনিষেধ দেখা যায়। আমরা এইসব আদেশ-নির্দেশ পালনও করি; কিন্তু এগুলি যে সারাজীবন মেনে চলতে হবে—এমন নয়। বস্তুত, এগুলি অতিক্রম করে যথার্থ ধর্ম নিয়ে আপনাকে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করতে হবে। সেই সময়ে আমাদের কোন বিধিনিষেধের বাঁধাবাঁধির প্রয়োজন হয় না। শ্রীকৃষ্ণ এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটিই এখানে বলছেন।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মা অতিবর্ততে, 'এমনকি যিনি যোগের স্বরূপ জানতে চান, তিনিও *শব্দব্রহ্ম* বা বেদ-এর আওতার বাইরে চলে যান'; ধর্মের *বিধি* অর্থাৎ 'কর্তব্য' এবং *নিষেধ* অর্থাৎ 'অকর্তব্য'—'এটি আমাদের করণীয় এবং ওটি আমাদের করণীয় নয়'—আপনি এইসবের পারে চলে যান, কারণ আপনি পরীক্ষানিরীক্ষায় নেমেছেন, আপনি সত্যের সন্ধান করছেন। কী চমৎকার ভাব। বৈদিক বিধিনিষেধের দ্বারা সীমাবদ্ধ হবার অর্থ হলো ধর্মজীবনে শিশু হয়ে থাকা। যখন আপনি বড় হন, তখন নিজেই চিন্তাভাবনা করে কাজ করেন, তখন আর আপনার পক্ষে এইসব বিধিনিষেধের প্রয়োজন হয় না। যাত্রা শুরু করার আগে আপনি মানচিত্রের সাহায্য নিয়ে থাকেন। তারপর আপনি সেটি ভাঁজ করে তুলে রাখেন এবং আপনার যাত্রা শুরু করেন। মানচিত্রের নির্দেশ অনুযায়ী আপনি নিজেই আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান; সমস্ত পথটা আপনি মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকেন না। তাই এইসব বিধিনিষেধ গৌণ ব্যাপার এবং সত্য অনুসন্ধানই হলো আসল কথা; অনুভূতিই মুখ্য, গ্রন্থ গৌণ। *পরীক্ষানিরীক্ষা এবং অনুভূতির যথার্থতা যাচাই করার জন্যই শুধু গ্রন্থের সাহায্য নিন।* কেবল ভারতের সনাতন ধর্মই খোলাখুলি স্বীকার করে যে, কেউ যখন ঠিক ঠিক ধর্মসাধনে নামেন, ধর্ম নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেন, তখন ধর্মীয় বিধিনিষেধগুলি আর তাঁকে প্রভাবিত করে না। যখন আপনি প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করেন এবং নিজের সঙ্গে সংগ্রাম শুরু

করেন, তখন আপনি ধর্মবিজ্ঞানের এলাকায় ঢুকে পড়েছেন। ধর্মের আরও একটা সাধারণ দিক আছে, সেটি হলো ধর্মের জাতিগত দিক। 'আমি একজন হিন্দু। অতএব, আমাকে বিশেষ কিছু কিছু আচার পালন করতে হবে। আমি মুসলমান, কাজেই আমাকে বিশেষ কিছু আচার মেনে চলতে হবে অথবা কিছু কিছু জিনিস এড়িয়ে চলতে হবে' ইত্যাদি। *কিন্তু একবার ধর্মসাধন শুরু করলে আপনার কাছে ধর্ম বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়।* তখন আপনি সকল ধর্মের মূলগত ঐক্যটিও আবিষ্কার করতে পারবেন। তখন দেখতে পাবেন, সুফী, খ্রিস্টান এবং হিন্দু ধর্মের মরমিয়া সাধকদের মধ্যে কত মিল!

এইটিই সর্বজনীন সত্য, যা পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মের মরমিয়া সাধকরা অনুভব করেছেন। এখান থেকেই বিশুদ্ধ ধর্মের শুরু—ধর্মকে অনুসন্ধানের বস্তু করে তোলা, বিজ্ঞান হিসাবে দেখা। বিজ্ঞান একটা অন্বেষণ, অনুসন্ধিৎসা তার প্রাণবস্তু। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডিংটন (Eddington) বলেছেন, 'অনুসন্ধিৎসাকে সামনে না রাখলে আপনি যথার্থ বিজ্ঞান বা যথার্থ ধর্মের ভাবটি বুঝতে পারবেন না।' অতএব এই অনুসন্ধিৎসার ভাবটি ধরে রাখুন; তবেই আপনি একজন বিজ্ঞানী, তবেই আপনি একজন সত্যিকারের আধ্যাত্মিক মানুষ বলে গণ্য হবেন। পদার্থবিদ বা জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়েই কেউ জন্মগ্রহণ করেন না। জ্যোতির্বিজ্ঞান অথবা পদার্থবিদ্যা নিয়ে অনুসন্ধান করেই একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বা পদার্থবিদ হন। ধর্মের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, একটি বিশেষ ধর্ম এবং তার বাধানিষেধের গণ্ডির ভিতর আমরা জন্মগ্রহণ করি এবং সেখানেই আবদ্ধ হয়ে পড়ি। কিন্তু যদি আপনি একজন প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞানী হয়ে উঠতে চান, তবে আপনাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা এবং অনুসন্ধান শুরু করতে হবে। বিজ্ঞান যেমন সর্বজনীন—সেখানে মার্কিনী বিজ্ঞান, ভারতীয় বিজ্ঞান বা আরবীয় বিজ্ঞান বলে কিছু নেই—ধর্মও তাই, অবশ্য যদি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায়, তবেই। *বেদান্ত বা সনাতন ধর্ম, এই উদার, সর্বজনীন ধর্মের কথাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে, যা আজ সাধারণ মানুষকে অবশ্যই বুঝতে হবে।* বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে স্থায়ী শান্তি এবং সংহতি তখনই আসবে, যখন আমরা ধর্মের এই মর্মবাণীটি হৃদয়ঙ্গম করব। প্রথমটি, অর্থাৎ জাতিগত ধর্ম দিয়ে শুরু করতে পারেন, তবে তা যেন ক্রমশ আপনাকে দ্বিতীয়টির দিকে, অর্থাৎ সর্বজনীন ধর্মের দিকেই নিয়ে যায়। তা যদি হয়, একমাত্র তখনই ধর্ম বিজ্ঞান হয়ে উঠবে এবং ধর্মকে যখন আপনি বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করবেন, তখন আপনার সমস্ত অনুসন্ধিৎসা হবে সত্যের জন্য,

তখন আর আপনি কেবল এক বিশেষ বিশ্বাস বা মতবাদের তোয়াক্কা করবেন না। আপনার কাছে তখন ওগুলি মূল্যহীন। তখন আপনার শুধু একটাই জিজ্ঞাসা—'এটি কি সত্য?' এবং সত্যের এই অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে আপনি ক্রমশ এগিয়ে যান এবং নিজের জীবনে সেই সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। ধর্মের প্রতি এই হলো সনাতন ধর্মের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। আপনি কি সত্য উপলব্ধি করেছেন? শুধু বিশ্বাসের কী সার্থকতা? বাস্তবিক, সনাতন ধর্মে বিশ্বাসকে চরম মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যগুলিতে বারবার বলেছেন, 'যে-কোন মূর্খও বলতে পারে, "আমি জানি, আমি জানি"। কিন্তু কী জান, সেটা দেখাও। তুমি কি কিছু উপলব্ধি করেছো? যদি করে থাক, আমরা দেখতে চাই তুমি কী উপলব্ধি করেছ। এইরকম পরীক্ষা এবং যাচাই করা প্রয়োজন। ভারতীয় অধ্যাত্মসাহিত্যে এই *অনুভব* বা অভিজ্ঞতার ওপর প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নিছক বিশ্বাসকে ভারতবর্ষ উচ্চ মর্যাদা দেয়নি। কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী না হয়েও একজন মানুষের চরিত্র অসাধারণ ভালো হতে পারে এবং আমরা সেই ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করি, কারণ তিনি নিছক একজন বিশ্বাসী নন। নিছক বিশ্বাসীর তেমন কোন মর্যাদা নেই।

তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে আমাদের কাছে সনাতন ধর্মের সার কথাটি তুলে ধরেছেন। অন্যান্য ধর্মে যদি আপনি পরীক্ষানিরীক্ষার চেষ্টা করেন, প্রচলিত মতবাদের বাইরে কোন কিছু উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনাকে হত্যাও করা হতে পারে। আপনি কোনমতেই প্রচলিত বিধিনিষেধের গোঁড়ামির বাইরে যেতে পারবেন না। সমস্ত জীবন চেষ্টা করলেও পারবেন না। ধর্মমতের গোঁড়ামির বাইরে যাবার চেষ্টা করায় কত মহান মরমিয়া সাধককে যে হত্যা করা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মের নেতারা এই কাণ্ড করেছেন। ইসলাম ধর্মের অনেক সাধক সর্বোচ্চ সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

বিধিবদ্ধ অনুশাসনের গণ্ডি অতিক্রম করে, ধর্মের প্রকৃত ভাবটুকু লাভ করতে মানুষ চেষ্টা করুক, যিশুখ্রিস্টও তা চেয়েছিলেন। যিশুও বলেছেন, প্রকৃত ধর্ম চাইলে আপনাকে অবশ্যই তার সন্ধান করতে হবে ঃ 'চাও, তবেই দেওয়া হবে; খোঁজো, তাহলেই পাবে; বন্ধ দরজায় করাঘাত কর, তবেই তা তোমার কাছে উন্মুক্ত হবে'। তাঁর এই বাণীর ভিতরেই ধর্মবিজ্ঞানের রহস্য নিহিত

আছে। কিন্তু বিগত ১৮০০ বছর এই ধর্মবিজ্ঞানকে খ্রিস্টান চার্চগুলি সাধারণের কাছে প্রচার করেননি। কিন্তু আজ আমরা এটি বুঝতে শিখেছি ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যে, ধর্ম হলো মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলি বিকাশের বিজ্ঞান যার দ্বারা প্রত্যেকের অন্তরে নিহিত দিব্য সম্ভাবনাগুলিকে এই জীবনেই বাস্তবায়িত করা যায়, ফুটিয়ে তোলা যায়। প্রকৃতি মানুষকে এই কাজের উপযুক্ত শক্তিও দিয়েছে। যখনই আপনি এই আত্মবিকাশের কাজে উঠে পড়ে লাগবেন, তখনই প্রচলিত বিধিনিষেধগুলি আপনার কাছে আলুনি লাগবে। আপনার ওপর তখন তাদের আর কোন প্রভাব থাকবে না। এখানে সংক্ষেপে এই কথাই বলা হয়েছে, *জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্ম অতিবর্ততে,* 'এমনকি একজন যোগ-জিজ্ঞাসু, একজন আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি *শব্দব্রহ্ম,* সকল বেদ, সকল শাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণের পারে চলে যান।' কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। এটিই পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকের আলোচ্য বিষয়, যেখানে দেখানো হয়েছে, কীভাবে একজন সাধক ক্রমাগত একটি জীবনের পর আর একটি জীবনে এই যোগসাধনা অব্যাহত রাখেন। যতদিন না তিনি আধ্যাত্মিক দিক থেকে যথেষ্ট পরিণত হয়ে সর্বোচ্চ উপলব্ধি লাভ করছেন, ততদিন পর্যন্ত এই সাধনা চলতেই থাকবে। এই চরম উপলব্ধির আগে তিনি হয়তো বারবার ব্যর্থ হবেন, যা আমরা লক্ষ্য করি না, কিন্তু হয়েই থাকে। এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ এবার আমাদের বলবেন। তিনি বলবেন, এই ব্যর্থতাগুলি শেষপর্যন্ত আমাদের সাফল্যের দিকেই নিয়ে যায়, অবশ্য যদি আমরা আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি।

ক্রমিক উন্নতির এই ধারণা, বিধিনিষেধ মেনে শেষপর্যন্ত সব বিধিনিষেধের পারে যাওয়ার ভাবটি কেবল হিন্দু সনাতন ঐতিহ্যেই দৃঢ়তার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে, খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্মে নয়। সেখানে এই সব বিধিনিষেধের ভয়ানক দাপট। সহজে আপনি সেগুলি ডিঙোতে পারবেন না এবং যদি আপনি সেগুলি অতিক্রম করেন, তার জন্য আপনি শাস্তিও পেতে পারেন। এমনকি আপনার মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। কিন্তু সনাতন ধর্মের ঐতিহ্যে, এই সব প্রচলিত বিধিনিষেধের বেড়া অতিক্রম করে যথার্থ ধর্মজীবন *যাপন* করলে, আপনাকে সাধুবাদ দেওয়া হয়, কারণ সেটাই হলো ধর্মের আসল কথা। সনাতন ধর্মে 'অনুভব' হলো ধর্মজীবনের কষ্টিপাথর, বিশ্বাস নয়। আর সব ধর্মে বিশ্বাসই হলো মুখ্য। কিন্তু ভারতবর্ষে তা নয়। এই কারণেই আমরা অবিশ্বাসীদেরও কোন ক্ষতি করি না, তাদের পুড়িয়ে মারি না বা তাদের উপর অত্যাচার করি না। এর কারণ হলো আমরা একটিমাত্র সত্যই বিশ্বাস করি এবং তা হলো ঃ

'ধর্ম হলো অনুভতি, বিশ্বাস করা নয়।' তাই আপনি যখন সত্য উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে ধর্ম নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেন তখন এই সব বিধিনিষেধগুলি আপনার কাছে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশের *সন্ধ্যাবন্দনা*-র কথাই ধরুন। এটি বৈধী বা বিধিবাদীয় অনুষ্ঠান। এর দ্বারা আপনার তেমন যে কিছু প্রাপ্তি হয়, তা নয়। কিন্তু যদি আপনি সন্ধ্যাবন্দনা না করেন, তাহলে অপরাধ হবে। *অকরণে প্রত্যবায় দোষঃ*, 'আপনি যদি তা না করেন, তবে তা দোষের হলো'। এই সব বৈধী অনুষ্ঠানের প্রকৃতি এরকমই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়'। আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে সন্ধ্যাদি অনুষ্ঠানের তুলনায় *গায়ত্রী-র* স্থান অনেক উঁচুতে। অতএব, যখন আপনার মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা সঞ্চারিত হবে, তখন আপনার আর সন্ধ্যাবন্দনা করার প্রয়োজন নেই; তখন সরাসরি আপনি গায়ত্রী-র ধ্যান করতে পারেন। শেষপর্যন্ত কিন্তু গায়ত্রীও লয় হয় ওঁ-কারে যা পরম ব্রহ্ম প্রতিপাদক শব্দ বা চরম সত্যের প্রতীক। এইভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমোন্নতি হয়। আমরা তো একই জায়গায় নিশ্চল হয়ে থাকতে পারি না; আশি বছর বয়সেও যদি আমাদের আধ্যাত্মিক শৈশব না ঘোচে, তবে তা দুর্ভাগ্যের কথা। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এই কথাই বলে। এখানে ধর্ম একটা বিজ্ঞান, কারণ তা আপনাকে এক প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক সত্যের উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়। গীতা ও উপনিষদ মানুষকে বিধিনিষেধের নিগড়ে বেঁধে রাখতে চায় না, বরং তারা প্রত্যেকেই তাদের অন্তরে নিহিত পরম সত্যকে উপলব্ধি করুক, এই তাঁদের অভীপ্সা। উপনিষদগুলিতে, গীতায় ও ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্যান্য মহান গ্রন্থগুলিতে বারবার এই সত্যোপলব্ধির ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। সুফী পরম্পরাতেও তাই। সেখানে বলা হয়েছে, 'আমি ধর্মের সব বিধিনিষেধ এবং বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের বাইরে যেতে চাই'। খ্রিস্টীয় মরমিয়া সাধকদের মুখেও এক কথা। কিন্তু তাঁদের সর্বদাই ক্ষমতাবান কট্টরপন্থীদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে সতর্ক থাকতে হয়। যদি আপনি বেশি স্বাধীনতা নিতে চান, তাহলে গোঁড়ারা আপনাকে আক্রমণ করবে, চার্চের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আপনাকে ছেড়ে দেবে না। এই কারণেই ঐসব ধর্মের মরমিয়া সাধকদের অতি সাবধানে চলতে হয়। এই কারণেই এই সব ধর্মে বহু সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মহাপ্রাণের অপমৃত্যু ঘটেছে।

ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের বিশেষত্ব এই, যে-সব সাধক ধর্মকে মনেপ্রাণে

ও জীবন দিয়ে গ্রহণ করেন, তাঁদের আমরা হত্যা করি না। কেউ যে আন্তরিকতার সঙ্গে ধর্ম অনুশীলন করছেন, তা দেখে আমরা খুশিই হই। কারণ ধর্ম কেবল কথার কথা নয়; ধর্মকে জীবনে গ্রহণ করতে হবে। ধর্মের সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। আধ্যাত্মিক পরীক্ষানিরীক্ষার এই হলো সার কথা। এই হলো ধর্মের প্রাণবস্তু। ধর্মের অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক দিকগুলিকে কখনও কখনও উপেক্ষাও করতে হয়, যেমন আমরা আজকাল করছি। আজকাল প্রাত্যহিক জীবনে সব ধর্মের মানুষই তো কত ধর্মীয় বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করছেন। বহু অনুশাসন তাঁরা মানেন না। কিন্তু তাতে হিন্দু ধর্মের কোন ক্ষতি হয়নি, কারণ হিন্দু ধর্ম সত্যোপলব্ধির সাধনার ওপর, অনুভূতিলাভের সাধনার ওপর জোর দেয়, যা সকলের পক্ষেই করা সম্ভব।

এই হলো ৪৪ সংখ্যক শ্লোকের গুরুত্ব বা মহিমা। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ*। যোগী, যদি তাঁর যোগসাধনার পথ থেকে সিদ্ধিলাভের আগেই চ্যুত হন এবং তাঁর মৃত্যু হয়, তবে অধ্যাত্মসাধনার যে-স্তর থেকে তিনি চ্যুত হয়েছিলেন, পরের জন্মে সেখান থেকেই তিনি আবার যাত্রা শুরু করেন এবং 'পূর্ববর্তী জীবনের আধ্যাত্মিক সংস্কারগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করেন এবং নতুন জীবনে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি শীঘ্রই একজন *জিজ্ঞাসু*, অনুসন্ধানকারী ও অন্বেষক হয়ে ওঠেন।'

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে পূজারির কাজ শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণ শীঘ্রই *জিজ্ঞাসু* হয়ে ওঠেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, 'এ আমি কী করছি? একটা পাথরের মূর্তি পুজো করছি? এ কি সত্য? এ কি ঠিক? এই পাথরের প্রতিমার মধ্যে কি জগন্মাতা আছেন?' মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ হলে মনে এসব প্রশ্ন ওঠে। তা না হলে, মনে কোন জিজ্ঞাসা আসে না। সব পূজারির মনেই যে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো প্রশ্ন ওঠে তা নয়। যা করতে হয়, তা তাঁরা যন্ত্রের মতো করে যান। বেতন বা দক্ষিণা পেলেই তাঁরা খুশি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তৃপ্ত হতে পারলেন না। তিনি প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'মাগো, তুই কি সত্যি? না কি শুধুই লোকের কল্পনা বা পৌরাণিক কল্প-কাহিনী?' এই সব প্রশ্ন থেকেই বিভিন্ন পথে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার এক অপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল।

পরবর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

—'যোগী অধ্যবসায় সহকারে প্রযত্ন করে, সকল কলুষ মুক্ত হয়ে শুদ্ধিলাভ করে, বহু জন্মের সাধনায় ক্রমশ সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হয়ে অবশেষে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে যান।'

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু, 'যখন যোগী প্রচণ্ড অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাধনা করেন'; *যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ,* 'সেই সাধনার ফলে যোগীর মনের সকল পাপ, সকল অপবিত্রতা যখন দূরীভূত হয়'। *সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ,* মানে, 'যিনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ'। এই ভাবে, ধাপে ধাপে, জন্মে জন্মে, যোগী তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটান। এই জন্মেই হয়তো সচেতনতার কিছুটা বিকাশ ঘটালেন আপনি, তারপর পরবর্তী জন্মে আরও কিছুটা; এইভাবেই চলতে থাকে। এই যাত্রা অতি দীর্ঘ, স্বল্প সময়ে তা শেষ করা যায় না। অতএব, *অনেক জন্ম সংসিদ্ধঃ,* 'বহু জন্মের সাধনার ফলে দোষমুক্ত হয়ে'। *ততো যাতি পরাং গতিম্,* 'অবশেষে অন্তিম জন্মে যোগী পরম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভ করেন।' প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হলে এক জন্মেও তা সম্ভব হতে পারে। অন্যথায়, যোগীকে এই আধ্যাত্মিক সম্পদ গড়ে তুলতে হবে এবং সম্পদ গড়ে তোলার অর্থ হলো উচ্চতর নৈতিক এবং চারিত্রিক নীতিকে ভিত্তি করে সৎ জীবনযাপন করা এবং ঈশ্বরকে ভালবেসে তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের দিকে এগোতে গেলে প্রয়োজন এক গতিশীল আধ্যাত্মিক জীবন; বদ্ধ, গতিহীন জীবন হলে হবে না। এইভাবে এগিয়ে চলুন। তবুও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে হয়তো দেখবেন, আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি খুব বেশি হয়নি। তারপর, ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে একদিন আপনার দেহাবসান হলে, পরবর্তী জীবনেও আপনার আধ্যাত্মিক অভিযাত্রা চলতেই থাকবে।

সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি হলেন নারদ। বলা হয়, মাতৃগর্ভে থাকতে থাকতেই তিনি অধ্যাত্মজীবনের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের গৃহে যেসব মুনিঋষি আসতেন, তাঁদের আলোচনা থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক নির্দেশাদি পেয়ে যেতেন। তাঁর মা ছিলেন সেই গৃহের পরিচারিকা। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি কঠোর সাধন শুরু করেন। শ্রীমদ্ভাগবতম্ গ্রন্থে তিনি তাঁর নিজের জীবনের এই কাহিনী শোনাতে গিয়ে বলেছেন ঃ একদিন তিনি এক দৈববাণী শুনলেন, 'নারদ, তুমি এই জন্মে সিদ্ধ হতে পারবে না।

তোমার মধ্যে এখনও কিছু কিছু দুর্বলতা আছে, যা তোমাকে দূর করতে হবে'। হলোও তাই। পরের জন্মে আমরা তাঁকে পেলাম পূর্ণজ্ঞানী নারদরূপে, যিনি সর্বদাই ভগবানের গুণকীর্তন করে বেড়ান। আমাদের অনেক পুরাণে নারদের অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাহিনী পাওয়া যায়।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ, 'প্রচণ্ড প্রচেষ্টা করে যোগী সবরকম কলুষতা থেকে মুক্ত হন'; *অনেক জন্ম সংসিদ্ধঃ,* 'জন্ম জন্ম ধরে পবিত্রতা এবং আধ্যাত্মিকভাব পুষ্ট করে'; শেষ জন্মে, *ততো যাতি পরাং গতিম্,* 'তিনি আধ্যাত্মিক সিদ্ধির চরম অবস্থায় উন্নীত হন'। আমাদের সকলের কাছেই এটি গভীর আশার বাণী।

পরবর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন প্রকার সাধকদের বিষয়ে এক তুলনামূলক আলোচনা করে বলেছেন,

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬ ॥

—'তপস্বীদের চেয়েও যোগীকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, (শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের থেকেও) যোগী শ্রেষ্ঠ; এবং যাঁরা (শাস্ত্রবিহিত) কর্ম করেন, তাঁদের থেকেও যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জুন, তুমি যোগী হও।'

এখানে শ্রেষ্ঠ যোগীর বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই আদর্শ যোগীর বর্ণনা শুরু হয়েছে এবং তারপর থেকে ক্রমান্বয়ে সেই ভাবমূর্তিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকার চিন্তা ও অনুপ্রেরণা আমাদের দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে এই অধ্যায়ে যুক্ত হয়েছে ধ্যানের মহান প্রক্রিয়াটি। মনের প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে, মনকে শান্ত এবং দৃঢ় করার ব্যাপারে পতঞ্জলির যে চিন্তাধারা, তার সঙ্গেও আমরা পরিচিত হয়েছি। গীতার 'যোগ' বা ব্যবহারিক আধ্যাত্মিকতার মধ্যে *কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এবং ধ্যান*—সবই পড়ে। বাস্তবিক, শ্রীকৃষ্ণ যে 'যোগ' শিক্ষা দিয়েছেন, তা খুবই ব্যাপক। আমি এর নাম দিয়েছি 'পূর্ণাঙ্গ বা সর্বাত্মক আধ্যাত্মিকতা'। কাজের সময়েই হোক বা বিশ্রামের সময়েই হোক, অথবা অন্যান্য মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সময়ে এবং ধ্যানের সময়েই হোক, আপনি সর্বদাই যোগযুক্ত হয়ে থাকতে পারেন। একজন গৃহবধূকেও বলা যায়—'আপনি একজন যোগী'। সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে ভাববেন, 'ঘরের বৌ কী করে যোগী হতে পারেন? যোগী তো ভিন্ন গোত্রের মানুষ, যিনি

হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে বসে তপস্যা করেন।' না, তা নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আপনিও একজন যোগী'। যে কাজই আপনি করুন না কেন, শ্রীকৃষ্ণ সব খেটেখাওয়া মানুষের কানে কানে বলছেন, 'আপনি একজন যোগী। আপনাদের সবাইকেই যোগী হয়ে উঠতে হবে'। এই হলো গীতার পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিকতা।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, *তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী,* কৃচ্ছ্রসাধনকারী 'তপস্বীর চেয়ে যোগী শ্রেষ্ঠ'। বস্তুতপক্ষে, কঠোর তপশ্চরণের খুব বেশি মূল্য নেই। আপনি বলতে পারেন, আমি পাঁচদিন উপোস করেছি। কিন্তু তাতে কী হলো? উপবাসের দ্বারা শারীরিক ক্ষুধাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন, সেটা অবশ্যই একটা মস্ত লাভ। এই কারণেই *তপস্বী* যে একটা ভালো কিছু করছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার বেশি কিছু নয়। তাঁর তুলনায় যোগী শ্রেষ্ঠ। *জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ,* '*জ্ঞানী* ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে, ঈশ্বর এবং আত্মা সম্পর্কে বিস্তর পড়াশুনা করে তত্ত্বের দিক থেকে সমস্ত কিছু জেনেছেন; কিন্তু এই জ্ঞানীও যোগীর তুলনায় নিকৃষ্ট। আপনি শাস্ত্র পড়ে ঈশ্বর এবং আত্মা সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছেন, সে কথা ঠিক, কিন্তু আপনি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেননি, তাঁর সঙ্গে একীভূত হননি। এরকম যে জ্ঞানী, তাঁর স্থান যোগীর নিচে। এরপর বলা হচ্ছে, *কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী,* 'যাঁরা রাগদ্বেষ যুক্ত হয়ে সকাম কর্ম করেন অথবা শাস্ত্রীয় কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন, সেই *কর্মী*ও যোগীর তুলনায় নিকৃষ্ট।' এরপর শ্লোকের শেষে অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ একটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। *তস্মাদ্,* 'অতএব'; *যোগী ভবার্জুন,* 'হে অর্জুন, তুমি *যোগী* হও'।

আপনি যদি প্রশ্ন করেন, শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে কী উপদেশ দিচ্ছেন, তাহলে আমি এই কথাই বলব : তিনি আপনার এবং প্রত্যেকের কানে কানে অস্ফুটস্বরে বলছেন, 'যোগী হও, যোগী হও। এ তোমার জন্মগত অধিকার। যা তোমার নিজের মধ্যে চিরকাল লুকিয়ে আছে, তুমি কেবল সেই সত্যকেই উপলব্ধি কর। আধ্যাত্মিকতায় তোমার জন্মগত অধিকার। তুমি সেই অধিকারকে কাজে লাগাও।' সকলের কাছে এই হলো শ্রীকৃষ্ণের বাণী।

গীতায় যে যোগের কথা বলা হয়েছে, এমন কোন মানুষ নেই, যিনি সেই যোগের পথ অনুসরণ করে যোগী হতে পারেন না। তপস্যা করার সাধ্য সকলের নেই। তবে তার প্রয়োজনই বা কী? এসব শক্তির অপচয় মাত্র। ছ'বছর দুশ্চর

তপশ্চর্যার পর বুদ্ধ বুঝতে পারলেন যে, তিনি অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। ধর্ম উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—'পেটে হাত রাখতেই আমি আমার মেরুদণ্ডের স্পর্শ অনুভব করলাম।' মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা করে তাঁর শরীরের দশা এমন হয়েছিল যে, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই পড়ে গেলেন। তারপর বসে বসে ভাবতে লাগলেন, 'এই কঠোরতা করে লাভ কী? এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? এর কোন মূল্যই নেই। এই দেহেই সর্বোচ্চ জ্ঞানলাভ করতে হবে, অথচ আমি একেই দিনে দিনে দুর্বল করে তুলেছি।' তাই তিনি বলেছিলেন, 'এই ধরনের কঠোর শারীরিক নিগ্রহ হলো নিম্নমানের তপস্যা। একইভাবে, যারা ইন্দ্রিয়ভোগের জীবনে আকণ্ঠ ডুবে থাকে, তারাও হীনপ্রকৃতির। আমি তাই মধ্যপথ অনুসরণ করব।' কী সুন্দর ভাব—*মধ্যম প্রতিপাদ,* 'মধ্যপথ', যা আমরা এই অধ্যায়ের শুরুতে দেখেছি। সেখানে বলা হয়েছে, 'অত্যধিক আহার করবেন না, অত্যধিক উপবাসও করবেন না, অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না, আবার অতিরিক্ত বিশ্রামও করবেন না।' যাঁরা এই মধ্যপথ অবলম্বন করেন, তাঁরাই যোগের পথে এগুতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই সুন্দর প্রেরণাদায়ক আহ্বানটি আমার বড় ভালো লাগে। প্রত্যেক শিশুর কানে কানে বলতে থাকুন, 'যোগী হও', 'যোগী হও', যেমন গীতায় বলা হয়েছে। ভালো কাজ করুন, সকলকে সাহায্য করুন, লোকের সেবা করুন, সকলকে সুখী করুন, সকলের মধ্যে আনন্দ নিয়ে এসে নিজের জীবনকে শান্ত ও অনাসক্ত করে গড়ে তুলুন। এ সবই যোগের অপরিহার্য অঙ্গ। এতেই আপনার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'কাজের সময় ঈশ্বরকে দেখবে চোখ খুলে, আর ধ্যানের সময় চোখ বুঁজে'। এই হলো এই যোগের প্রকৃতি। এইভাবেই কর্মের মধ্যে আপনি যোগের ভাব আনতে পারেন। সাধারণত কর্মকে যোগের অঙ্গ হিসাবে ধরা হয় না, কারণ কর্ম এমন এক জিনিস, যা স্বভাবতই মনকে বহির্জগতের দিকে, সংসারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যখন আপনি বাড়িতে কাজ করেন, তখন মনে করেন, এটি *সংসার।* আপনি যেন সংসারের কাজ করছেন। কিন্তু না, এটি *সংসার নয়,* এটি *যোগ*। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন, 'প্রতিটি কর্মই পবিত্র, সবই ঈশ্বরের কাজ। কাজের ভালোমন্দ নেই, কী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছ, সেটিই বিচার্য। দৃষ্টিভঙ্গিই কাজকে ভালো বা মন্দ করে তোলে।' এইভাবে গীতায় কর্মকে খুব উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছে। গীতার যোগ সর্বসাধারণের জন্য, এমনকি খেটে খাওয়া নরনারীদের জন্যও, জীবনের দায়িত্বগুলি যাঁদের সঠিকভাবে পালন করতে হয়; কিন্তু তারই

মাঝে এই যোগ অনুসরণ করে তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতে পারেন এবং সত্যোপলব্ধি করতে পারেন। এই উপদেশ রাজনীতিক, প্রশাসক, স্কুলের শিক্ষক, অধ্যাপক, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ, গৃহবধূ—সকলের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছে। গীতার তাৎপর্য ঠিক ঠিক অনুধাবন করতে পারলে নিরন্তর গুঞ্জরিত সেই মহামন্ত্র আমরা শুনতে পাব, যা শ্রীকৃষ্ণ সকলের কানে প্রতি মুহূর্তে উচ্চারণ করছেন, *তস্মাৎ যোগী ভব,* 'অতএব, যোগী হও, যোগী হও।' ধীরে ধীরে, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলুন; এই ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে এগুবার প্রয়োজন নেই। আপনি আপনার ছন্দেই এগোন। কিন্তু মনে রাখবেন পথ দীর্ঘ। প্রথমে এক পা এগিয়ে যান। এই যে এক পা এগোতে পারলেন, এর জন্য আপনি কৃতজ্ঞ থাকুন। তারপর দ্বিতীয় পা বাড়ান এবং এইভাবে নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন।

তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন এই দর্শন কতটা বাস্তব! এই দর্শন একবার গ্রহণ করলে—'আমি খুব দ্রুত এগোতে পারিনি'—এই জাতীয় অনুশোচনার প্রয়োজন হবে না। আপনার সাধ্য অনুসারেই আপনি এগিয়ে যাবেন। যিনি আপনার তুলনায় অনেক দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন, তাকে বলুন, 'ঈশ্বরের কৃপায় আপনি এগিয়ে যান, আমি আপনার পিছনে পিছনে আসছি।' এইরকম মনোভাব অবশ্যই আমাদের থাকা চাই। কাউকে ঈর্ষা করা নয়, অন্যকে নিচে টেনে নামানো নয়। বরং শুভেচ্ছা প্রকাশ করে বলুন, 'আপনি দ্রুত এগিয়ে যান। আমি আপনার পিছনে যাচ্ছি, কারণ আপনার ক্ষমতা আমার নেই।' কী চমৎকার ভাব! এইরকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মহৎ চরিত্রের সৃষ্টি হয়। এই মনোভাব, এ ধরনের চরিত্র অত্যন্ত প্রয়োজন।

লণ্ডনে দেওয়া স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলির অন্যতম বিষয় ছিল 'ব্যবহারিক বেদান্ত', যেখানে উন্নত চরিত্র এবং উদার মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। দৃষ্টান্তটি এই ঃ

সেই সময়কার ইংরেজি পত্রপত্রিকায় একটি ছবি ছাপা হয়েছিল। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান নৌবহরের এক যৌথ মহড়া চলছিল। হঠাৎ ঝড় ওঠায় ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ধীরে ধীরে ডুবতে থাকে। সেই সঙ্কট-মুহূর্তে জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং নৌসেনারা ডেকের ওপর সারিবদ্ধ হয়ে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাতে থাকেন। তাঁরা দেখলেন, তাঁদের সামনে দিয়ে ঝড়ে অক্ষত আমেরিকান জাহাজটি তরতর করে

এগিয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী বলছেন, 'আর তখন ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এবং জাতীয় পতাকাকে অভিবাদনরত এই ব্রিটিশ নৌসেনারা সেই আমেরিকান নৌসেনাদের এই ভয়ংকর অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারার জন্য সাধুবাদ জানালেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, "এগিয়ে যান, এগিয়ে যান; আনন্দ করুন, আনন্দ করুন, আমরা খুশি যে আপনারা এই ভয়ঙ্কর বিপদ কাটিয়ে আসতে পেরেছেন; আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য কিছু আসে যায় না।" এবং তারপর তারা সমুদ্রবক্ষে তলিয়ে গেলেন।'

যখন তাঁরা ডুবছিলেন, তখনও তাঁদের এই উদার মনোভাব। উন্নত মন এবং উন্নত চরিত্র না থাকলে কি এই দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে? এ ব্যাপারে আমাদের দুর্বলতাটি লক্ষ্যণীয়। যদি কেউ দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বেঁচে যান এবং আমাদের সংকট না কাটে, তবে যাঁরা পরিত্রাণ পেলেন, তাঁদের আমরা শাপশাপান্ত করি। আমরা উদার হতে পারি না। আবার সুসময় এলে অন্যদের কথা আর আমরা ভাবি না, নিজেদের নিয়েই মত্ত হয়ে থাকি। এটা হয় কেন? কারণ, আমাদের মন বড় নয়, চরিত্র উন্নত নয়; আমাদের মধ্যে যোগ-এর কোন ভাব নেই। ওপরে যে ঘটনাটির কথা বলা হয়েছে, সেখানে কিন্তু এই যোগ-এর মনোভাব প্রতিফলিত। স্বামীজী এই দৃষ্টিভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমাদের দেশে আজ এই দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত প্রয়োজন। আমরা যেন অন্যদের বলতে পারি—'এগিয়ে যান, এগিয়ে যান। আমিও আমার ক্ষমতা অনুযায়ী আপনাদের পিছনে পিছনে আসছি।' এই শিক্ষাই এখানে দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *তস্মাৎ যোগী ভবার্জুন,* 'অতএব, হে অর্জুন, যোগী হও'।

এরপর শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে এক নতুন সুর ধ্বনিত হয়েছে। সে সুর ভক্তির, যা পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ের মূল বিষয় হবে। এ যাবৎ আমরা কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছি, জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছি, ধ্যান এবং অন্যান্য অনেক বিষয়েই আলোচনা করেছি। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে, ২৯ সংখ্যক শ্লোকে ভক্তির অস্ফুট সুর আমরা অবশ্য ইতোমধ্যেই শুনেছি, যেখানে বলা হয়েছে,

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

বড় সুন্দর শ্লোক! সকলের সুহৃদ রূপে ঈশ্বর যে মনুষ্যশরীরে অবতীর্ণ হন, সে ইঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণ এখানে আমাদের দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, *সুহৃদং*

সর্বভূতানাম্, 'সকল জীবের সুহৃদরূপে যাঁরা আমাকে জানেন।' যে দেবদেবীকেই আপনি অর্চনা করুন না কেন, অর্পিত বস্তু শেষ পর্যন্ত তিনিই গ্রহণ করেন; *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং,* 'এইসব যজ্ঞ এবং তপস্যা শেষ পর্যন্ত আমাতেই এসে পৌঁছয়', অর্থাৎ আমি, জগদীশ্বরই তার লক্ষ্য; *সর্বলোকমহেশ্বরম্,* 'এই বিশ্বের পরম প্রভু'; *সুহৃদং সর্বভূতানাম্,* 'সকল জীবের বন্ধু;' *জ্ঞাত্বা মাং,* 'আমাকে এইরূপে জেনে'; *শান্তিম্ ঋচ্ছতি,* 'তাঁরা শান্তিলাভ করেন'। যথার্থ শান্তি এই ভগবানেই, সকল জীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত এই ঈশ্বরে। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ এই ভক্তির ঝঙ্কারই তুলেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে ভক্তিরসের সেই সুরই ঝঙ্কৃত হয়েছে, যার ফলে যোগের সমগ্র বিষয়টি নতুন ভাবে, নতুন প্রেরণায় সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে, গঙ্গা যেমন বিভিন্ন শাখানদীর জলধারায় ক্রমশ পুষ্ট হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি। প্রথমে দার্শনিক তত্ত্বরূপে উপস্থাপিত হলেও অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে যোগে সংযোজিত হয়েছে নতুন অর্থ, নতুন মাত্রা এবং নতুন শক্তি। এখানে, এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে, যে নতুন ভাবটিকে যোগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা হলো *ভক্তি,* সগুণ, ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম। যখন আপনি কর্ম করেন, তখন যদি ঈশ্বরের প্রতি আপনার যথার্থ প্রেম থাকে, তবে সেই কর্ম করে আপনি আনন্দ পাবেন। অতএব, প্রথমেই আপনাকে ভক্তির এই নতুন বিষয়টিকে যোগ-এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

—'এবং সকল যোগীর মধ্যে, আমার মতে, তিনিই "সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী", যিনি অন্তরাত্মা আমাতেই সমাহিত করে, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমাকে ভজনা করেন।'

যোগিনামপি সর্বেষাং, 'সকল যোগীর মধ্যে'; *মদ্গতেনান্তরাত্মনা,* 'যাঁর অন্তরাত্মা আমার প্রতি আকৃষ্ট, যে-আমি শ্রীকৃষ্ণরূপে সকল জীবের অন্তর্গত শাশ্বত সত্তারূপে বিদ্যমান্'; *শ্রদ্ধাবান্,* 'বিশ্বাস এবং প্রত্যয়যুক্ত যোগী'; *ভজতে যো মাং,* 'যিনি আমাকে ভজনা করেন'; *স মে যুক্ততমো মতঃ,* 'আমার মতে, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী'। সংস্কৃতে *তমঃ* শব্দটি সর্বোৎকৃষ্ট বোঝাতে ব্যবহৃত হয়: *তরঃ* এবং *তমঃ; তরঃ* কথাটি তুলনামূলক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যদি একটি বস্তু সবচেয়ে ভালো হয়, তখন আমরা বলি *তমঃ;* এর অর্থ শ্রেষ্ঠ। এই কারণেই

সংস্কৃতে *তারতম্য* শব্দটি তুলনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। *স মে যুক্ততমো মতঃ,* 'যোগীদের মধ্যে তিনি হলেন *যুক্ততমঃ,* অর্থাৎ "শ্রেষ্ঠ যোগী" '। যখন ধ্যান, জ্ঞান, কর্ম এবং মানবিক সম্পর্কের মধ্যে *ভক্তি* প্রবেশ করে, তখন সেই ভক্তিই হয়ে ওঠে ভিত্তি। অতএব, গীতার যে যোগ, তার মধ্যে এবার একটি নতুন ভাব যুক্ত হলো এবং এইটিই ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক।

ইতি ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ধ্যানযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় এখানেই সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

আত্মোপলব্ধিসহ জ্ঞানের পথ

এবার আমরা সপ্তম অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। এতে দেখবেন, ভক্তি অথবা নির্গুণ-সগুণ ঈশ্বরের সগুণ ভাবের প্রতি ভালবাসার কথা বেশি করে বলা হয়েছে। এই অধ্যায়টি ছাড়াও অষ্টম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত সবকটি অধ্যায়ই এমন ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ যে, যোগের এই পথটি উত্তরোত্তর দৃঢ় ও সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে।

আমাদের ব্যক্তিত্বের নানা দিক আছে; কিন্তু প্রত্যেকটি দিকই গীতার পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। আধ্যাত্মিকতা একপেশে হলে আমাদের ব্যক্তিত্বের একটি দিকই কেবল উন্নত হতে পারে এবং অন্যান্য দিকগুলি অবহেলিতই থেকে যায়। সেটি হওয়া উচিত নয়। তাই, আপনার ব্যক্তিত্বের সমস্ত দিকগুলি উন্নত করে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠুন। ভাবাবেশ এই ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। হৃদয়ের এই আবেগ হলো ভক্তির ভিত্তি এবং ভক্তিপথের লক্ষ্য এই আবেগকে জ্ঞানের সাহায্যে সঠিক ভাবে কাজে লাগানো। সেই কারণে, শ্রীকৃষ্ণের যোগদর্শনে ভক্তি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই এর ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় এইভাবে আরম্ভ হয়েছে,

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

—'হে পৃথাপুত্র, আমাতে দৃঢ়ভাবে মন নিবদ্ধ করে, আমার শরণাগত হয়ে যোগাভ্যাস করলে, কী করে নিঃসংশয়ে আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারবে, সেই কথাই এবার আমার কাছে শোনো।'

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ, 'হে অর্জুন, আমাতে দৃঢ়ভাবে মন নিবদ্ধ করে'; *যোগং যুঞ্জন্,* 'যোগাভ্যাস করে'; *মদ্ আশ্রয়ঃ,* 'সর্বদা আমার উপর নির্ভর করে', যে অদ্বিতীয় অসীম পরমাত্মা সকল জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করেছেন, সেটিই তাঁর প্রকৃত সত্তা। *অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি,* 'তুমি কি করে, নিঃসংশয়ে, আমাকে আমার পূর্ণস্বরূপে বুঝতে পারবে'; তৎ *শৃণু,* 'তা আমার কাছে শোনো', আমার কাছে শেখ; *সমগ্রম্,* সত্যকে তার 'পূর্ণস্বরূপে' জানো, আংশিকভাবে নয়।

ধর্মের ক্ষেত্রে অনেক মানুষই অত্যন্ত গোঁড়া এবং অসহিষ্ণু। কিন্তু কেন? তার কারণ এই, সত্যকে তারা আংশিকভাবে দেখে এবং সেই সীমিত ভাবকে আঁকড়ে ধরে ভাবে অন্য সব কিছুই ভুল। আর এই ভেবেই তারা অন্যের সাথে লড়াই এবং ঝগড়া করে। পূর্ণ সত্য উপলব্ধি করেছিল বলেই ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছে সহিষ্ণুতার দেশ, যে দেশ উপলব্ধি করেছে, বিভিন্ন পথ দিয়েই আপনি সত্যের দিকে যেতে পারেন। আপনার পথটিই যে একমাত্র সত্য পথ, তা নয়। ইংরেজিতে বলা হয়, 'আমার ধর্মমত হলো খাঁটি, আর তোমার ধর্মমত হলো ভেজাল অর্থাৎ মিশ্রমত, তাই তোমার শাস্তি হওয়া উচিত'[১] কিন্তু এখানে সেরকম নয়। আমরা সকলের ধর্মবিশ্বাসকে, সকলের আধ্যাত্মিক পথকে সম্মান করি ও তাদের স্বাগত জানাই। এইটিই মহান ভারতের মহত্তম গৌরব এবং ঋগ্বেদের যুগ থেকেই ভারতবর্ষের এই মহিমা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ভারতবর্ষের সমগ্র ঐতিহ্য, সমগ্র ইতিহাস, তার প্রকৃত অন্তঃ শক্তি ও সত্তাটিকে বোঝা যায়, যদি পাঁচ হাজার বছর আগেকার ঋগ্বেদীয় একটি ছোট্ট উক্তির মর্মোদ্ধার আমরা করতে পারি। কী সেই উক্তি? *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি,* 'সত্য এক, জ্ঞানীরা তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।' নামগুলি পৃথক, রূপগুলিও আলাদা, কিন্তু চরম সত্য এক ও অভিন্ন। এই ভাবটি ভারতীয়দের মনে গভীরভাবে গেঁথে যাওয়ায় ভারতবর্ষ সমন্বয় ও সহিষ্ণুতার দেশ হয়ে উঠেছিল। অন্য যে কোন দেশের তুলনায় কিছু সাময়িক, অতি সামান্য ঘটনা ছাড়া, কোন বড় মাপের নির্যাতন বা হত্যাকাণ্ড আমাদের ইতিহাসে ঘটেনি। সেই কারণে বলা হচ্ছে, *সমগ্রং মাম্,* 'আমাকে (ঈশ্বরকে) সমগ্ররূপে', পূর্ণরূপে জানো। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপলব্ধি যেহেতু ঈশ্বরের একটি দিকই উদ্ঘাটন করে, এইজন্য আমাদের অন্যান্য মানুষের অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা অভ্যাস করতে বলা হয়।

---
১ 'My doxy is orthodoxy, your doxy is heterodoxy ; so, you must be punished.'

আমাদের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি, ডঃ এস রাধাকৃষ্ণন, তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'Eastern Religions and Western Thought'-এ (অক্সফোর্ড বক্তৃতাবলি) সহনশীলতার এই দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতে আমরা যেমন বুঝি, সেই অনুসারেই তিনি ধর্ম ও সহিষ্ণুতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'অনন্তের প্রতি সসীম মনের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই হলো সহিষ্ণুতা।'

বাস্তবিক, অনন্তের শেষ নেই। অনন্ত অনন্তই। আমি যদি অনন্তের সামান্য একটু স্বাদ পেয়ে বলতে থাকি, 'অনন্তের সবটাই আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরে ফেলেছি', তাহলে সেটা অত্যন্ত বোকামি হবে; কারণ আমার অভিজ্ঞতার বাইরেও এত কিছু থেকে যায় যে, অন্যেও অসীমকে অন্যান্যভাবে উপলব্ধি করতে পারে। এই কারণেই, আমি যে শুধু অন্যের ব্যাপারে সহিষ্ণু হব তাই নয়, আমি অন্যের অনুভূতিকে শ্রদ্ধাও করব এবং সত্য বলে মেনে নেব। এই হলো ভারতবর্ষের উদার মনোভাব। মনে করুন, আপনি একটি কলসি নিয়ে সমুদ্রে গেলেন এবং কলসিটি ভরে জল নিয়ে এলেন। এরপর যদি আপনি বলেন যে, 'পরের বার আমি সমুদ্রের সমস্ত জল নিঃশেষ করে নিয়ে আসব, সেখানে আর কোন জল থাকবে না,' তাহলে সেটি খুবই হাস্যকর হবে। কারণ, লোকে সমুদ্র থেকে যত জলই নিক না কেন, সমুদ্র পূর্ণই থেকে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলতেন। এক পিঁপড়ে একটি চিনির পাহাড়ে গিয়েছিল। সে চিনির একটি দানা খেল এবং আর একটি দানা মুখে নিল; তারপর বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবল, 'পরের বার এসে আমি চিনির গোটা পাহাড়টা নিয়ে যাব'। কী বোকার মতো কল্পনা! এক হিন্দুধর্মকে বাদ দিলে পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্মে এই ধরনের কথাই বলা হয়। এবং এই থেকে যত অসহিষ্ণুতা, ভুল বোঝাবুঝি, হিংসা ও যুদ্ধের সৃষ্টি। ভারতবর্ষে যে সেটা হতে পারেনি, তার কারণ এখানে যে শুধুমাত্র সহিষ্ণুতা আছে তাই নয়, স্বীকৃতি ও গ্রহীষ্ণুতার ভাবও আছে। একথা অনস্বীকার্য যে, সত্যের আংশিক জ্ঞানও হয়, আবার সত্যের পূর্ণজ্ঞান—তাও হয়।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমাকে কীভাবে সম্পূর্ণরূপে জানা যাবে, আমি তোমাকে বলব। *সমগ্রম্: সমগ্রম্* মানে 'সম্পূর্ণ, সমস্ত'; *অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু*, 'আমাকে নিঃসংশয়ে এবং আমার পূর্ণস্বরূপে কীভাবে জানতে পারবে, সেই কথাই আমার কাছে শোনো।'

পরের শ্লোকে এই শিক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয়েছে ঃ

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

—'আমি তোমাকে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাসহ তত্ত্বজ্ঞানের কথা নিঃশেষে বলব, যা জানলে, এই সংসারে আর অন্য কিছুই জানার অবশিষ্ট থাকবে না।'

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ *জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানম্‌ ইদং বক্ষ্যামি অশেষতঃ,* 'আমি তোমাকে *বিজ্ঞান*সহ *জ্ঞান* সম্বন্ধে সমস্ত কিছুই বলব'। *জ্ঞান* হলো সাধারণ তত্ত্বজ্ঞান; বিজ্ঞান হলো 'সাক্ষাৎ অনুভূতি'। জ্ঞান ও বিজ্ঞান—দুটির মধ্যে কী প্রচণ্ড পার্থক্য! 'ঈশ্বর সম্পর্কে নিবিড় প্রত্যক্ষ অনুভূতি'-র নাম বিজ্ঞান; আর 'ঈশ্বরকে বোঝা বা ঈশ্বর সম্পর্কে জানা হলো জ্ঞান'। তাই, *বক্ষ্যামি,* 'আমি তোমার কাছে ব্যাখ্যা করব'; *অশেষতঃ,* 'এর সমস্ত দিক'; *যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যৎ জ্ঞাতব্যম্‌ অবশিষ্যতে,* 'যা জানলে জ্ঞাতব্য অন্য কিছু আর বাকি থাকবে না'; যা জানার সমস্ত কিছুই জানা হয়ে যাবে, কারণ এ হলো সর্বাত্মক জ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ *জ্ঞান* ও *বিজ্ঞান*-এর প্রাঞ্জল বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১৯৯৬, উদ্বোধন কার্যালয়, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪) ঃ

'জ্ঞানী ''নেতি'' ''নেতি'' করে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছানো যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিসে তৈয়ারি—সেই ইঁট, চুন, সুরকিতেই সিঁড়িও তৈয়ারি। ''নেতি'' ''নেতি'' করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ।

'ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন, সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। নি-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। ''আমি'' যায় না; তখন দেখে, তিনি আমি, তিনিই জীবজগৎ সব। এরই নাম বিজ্ঞান।'

উপনিষদের যুগ থেকেই ভারতবর্ষের মানুষ এই বিস্ময়কর সর্বাত্মক জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে; তার ফলেই দয়া, সহিষ্ণুতা ও সমঝোতার

মতো গুণগুলি ভারতবাসীর মজ্জাগত হয়েছে। আমাদের সমগ্র ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আমরা নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদীদেরও শ্রদ্ধা করে এসেছি, কারণ যাঁর সত্যের পূর্ণজ্ঞান হয়েছে তিনি জানেন, নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদীদের মধ্যেও সত্যকে *বোঝার সংগ্রাম* চলছে। পরম সত্য সম্বন্ধে তাঁরা এখনও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি, এই যা। এইরকম মানুষের জন্য স্বভাবতই আমাদের সহানুভূতি জাগে, আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু কেউ যদি শুধু একটি মতবাদকেই আঁকড়ে থাকে, তবে সে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধ্বংস করবে, যা ব্যাপকভাবে, কখনওই ভারতবর্ষে ঘটেনি। যা ঘটেছে, তা অজ্ঞতাপ্রসূত ছোটখাট বিক্ষিপ্ত ঘটনা, যা কিছু মানুষের সংকীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতার নিদর্শন।

যৎ জ্ঞাত্বা, 'যা জানলে'; *ইহ,* 'এই জগতে', *ভূয়োঽন্যৎ,* 'আর অন্য কিছু'; *জ্ঞাতব্যম্,* 'জানার'; *ন অবশিষ্যতে,* 'বাকি থাকে না'। সমগ্র সত্যের মধ্যে সমস্ত কিছুই এসে যাবে। প্রকৃত দর্শন পূর্ণ সত্যের দিশারী। কিন্তু বিভিন্ন বিজ্ঞান খণ্ড দৃষ্টি নিয়েই সত্যের বিচার করে। যেমন, রসায়নবিদ্যা বা পদার্থবিদ্যা স্থূল সত্যের বিশেষ কোন কোন দিক নিয়ে গবেষণা করে। আবার উদ্ভিদবিদ্যা বা দেহবিজ্ঞানে দেখা যাবে অন্য আরেকটি দিক এসে পড়েছে। এই সব বিজ্ঞানের কাজকর্ম বাহ্যবিষয় নিয়ে। আবার মনোবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য মানুষের অন্তর্জীবন। এখন, সত্যের বাইরের এবং ভিতরের এই যে দুটি দিক, তাদের যদি একত্র করতে পারেন, তাহলেই সত্যের সামগ্রিক রূপটি ধরতে পারবেন। সেইজন্যই ইউরোপের বহু দার্শনিক দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, এটি হলো 'সর্ব-বিদ্যা-সমষ্টি'। সত্যি কথা। সব বিদ্যাকেই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোন কিছুই বাদ দেওয়া চলবে না। বেদান্তে আমরা ঠিক এইটিই করেছি এবং গীতার এই অংশে এইটিই অল্প কথায় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

এখন যে তৃতীয় শ্লোকটি আসছে, সেটি আমরা পণ্ডিত ও সাধুসন্তদের আলোচনায় প্রায়শই শুনে থাকি। শ্লোকটি এই ঃ

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

—'সহস্র সহস্র নরনারীর মধ্যে, স্বল্প কয়েকজনই মাত্র সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন এবং এই সৌভাগ্যবান সাধকদের মধ্যে দৈবাৎ কেউ আমাকে স্বরূপত জানতে পারেন।'

'হাজার হাজার মানুষের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনই আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের জন্য সংগ্রাম করে', *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে, সিদ্ধয়ে* অর্থাৎ 'আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের জন্য'; *কশ্চিৎ যততি,* 'কয়েকজনই মাত্র চেষ্টা করে'; অন্যেরা ওই নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা খাওয়া দাওয়া ও অন্যান্য কর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে; এইটিই হলো শ্লোকের প্রথম পংক্তি। কিন্তু, *যততাম্ অপি সিদ্ধানাম্,* 'যাঁরা সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যেও'; *কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ,* 'মাত্র কয়েকজনই আমার সত্য স্বরূপ জানতে পারেন'। নিউ টেস্টামেন্টেও বলা হয়েছে, ঈশ্বর বাস্তবিক যেরকম, তাঁকে সেইভাবেই জানতে হবে, তাঁর 'সূক্ষ্মতম সত্য স্বরূপটি' ('In spirit and in truth') বুঝতে হবে। বাস্তবিক, ঈশ্বরকে আমাদের মনের খেয়ালখুশি মতো এবং ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারে দেখলে হবে না। ওটি পূর্ণ বোধ নয়। প্রকৃষ্ট বোধ নয়। আপনি ওই দিয়ে শুরু করতে পারেন, তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু শেষ করতে হবে ঈশ্বর যে পূর্ণ, তা অনুভব করে। ঐ দর্শনের স্বরূপ কী? এককথায়—একত্ব, সত্তার চরম ও পরম একত্ব বা অদ্বৈতানুভূতি। এই অদ্বৈত তত্ত্ব ভারতবর্ষের অবদান, যা বিশ্বের মনীষাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা সকলে সেই 'এক' থেকে আসি, আবার সেই একেই ফিরে যাই। সেই এক হলো ব্রহ্ম—*একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম,* 'ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়', যার দুই নেই। ব্রহ্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য এবং এই ব্রহ্মেই পূর্ণতার, সমগ্রতার ভাবটি পাওয়া যায়, কারণ সব নিয়েই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-বহির্ভূত কিছুই নেই।

এখানে তাই স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে ঃ অনেকে চেষ্টা করেন, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনই সিদ্ধিলাভ করেন। আমাদের অলিম্পিকের মতো। কতজনেই তো দৌড়-প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু মাত্র কয়েকজনই চূড়ান্ত পর্যায় বা গন্তব্যস্থলে পৌঁছান, আবার তাঁদের মধ্যে একজনই প্রথম স্থান লাভ করেন, কারণ তাঁর তুলনায় অন্যদের যোগ্যতা সীমিত।

আধ্যাত্মিক জীবনেও দেখা যায়, সকলেই হয়তো একসঙ্গে শুরু করছেন, কিন্তু সামর্থ্য সকলের সমান নয়। তাই, আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের গতি নিয়ন্ত্রিত হবে। এই কারণে কারও কারও একটু বেশি সময় লাগতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মূল সত্য হলো—সকলেই কোন না কোন সময়ে আত্মজ্ঞানলাভের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবেই পৌঁছবে, কারণ সেটিই তার প্রকৃত স্বরূপ। অতএব, সকলেরই যে সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছবার যোগ্যতা আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নিউ টেস্টামেন্টে যিশু বলেছেন, 'অনেককেই ডাকা হয়, কিন্তু অল্প কয়েকজনকেই বেছে নেওয়া হয়।' চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে যেমন করা হয় আর কি! দশ হাজার আবেদনকারীর মধ্য থেকে দশজনকে নেওয়া হবে, এই পর্যন্ত। আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রেও সেইরকম আমরা অনেকেই নামি, কিন্তু সামর্থ্য ও গুণগত পার্থক্য থাকায় অনেকে পিছিয়ে পড়েন এবং অন্যেরা দ্রুত এগিয়ে যান। এই অবস্থায়, পিছিয়ে-পড়া-মানুষদের মধ্যে তাঁরাই মহৎ, যাঁরা বলেন, 'এগিয়ে যাও ভাই। তুমি আমার শ্রদ্ধার পাত্র। আমি তোমার পিছনে আসছি। জানি, আমিও সেখানে পৌঁছব, তবে একটু দেরি হবে। তাতে আমার দুঃখ নেই'। নিজের সামর্থ্যের কথা বুঝে চিত্তের প্রশান্তি বজায় রাখা খুবই প্রয়োজন। অনাবশ্যকভাবে মনকে অস্থির করে তোলা অথবা আত্মপ্রশংসা বা বিজয়ীদের সমালোচনা করে মনকে দুর্বল করা বেদান্ত অনুমোদন করে না। বিশ্বাস রাখুন! বিশ্বাস করুন! আমরা সকলেই অভীষ্ট লাভ করব—এই হলো সঠিক মনোভাব। তাই এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তব। জীবনের সঙ্গে এর সঙ্গতি রয়েছে; জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপনি এই উক্তির সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন : *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।*

রাজনীতির দিকেই তাকিয়ে দেখুন। শত শত রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অনেকে নির্দল প্রার্থী হয়েও দাঁড়ান এবং পরাজিত হন। শত শত প্রার্থীর অধিকাংশই হেরে যান, কয়েকজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়, আবার তারই ভিতর কেউ কেউ জিতেও যান। জীবনের সব ক্ষেত্রেই এই কাণ্ড। আধ্যাত্মিক জীবনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। সেখানেও সবকিছু নির্ভর করছে আমাদের শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর। এগুলি তো সকলের সমান নয়। আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা সকলের মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু তাকে প্রকাশ করার সামর্থ্য সকলের সমান নয়; মানুষে মানুষে এই যে সামর্থ্যের পার্থক্য, তা বাস্তব সত্য।

এখন, শ্রীকৃষ্ণ বলবেন যে, সত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় : একটি হলো পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশিত সত্য; অন্যটি হলো ইন্দ্রিয়াতীত সত্য। আপনি যদি পূর্ণ বা সামগ্রিক সত্য উপলব্ধি করতে চান, তাহলে দুটি সত্যই গ্রহণ করতে হবে, শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বাহ্য জগৎকে গ্রহণ করলেই চলবে না। দুটি সত্যকেই শ্রীকৃষ্ণ *প্রকৃতি* বলেছেন—*পরা প্রকৃতি* ও *অপরা প্রকৃতি।* Nature-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ হলো *প্রকৃতি*। পাশ্চাত্যে প্রকৃতি বলতে শুধু জড় প্রকৃতিকেই বোঝায়। কিন্তু ভারতে প্রকৃতি বললে ভৌতিক ও অতিভৌতিক সব কিছুই বুঝায়। সমগ্র

সত্যই হলো *প্রকৃতি।* সেইজন্য, ভারতীয় চিন্তায় অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক বলে কিছু নেই। প্রকৃতি সম্বন্ধে সীমিত ধারণা থাকার ফলে পাশ্চাত্যের ধর্মচেতনায় অলৌকিকতা স্থান পেয়েছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কিন্তু অতিপ্রাকৃত ব্যাপার-স্যাপার স্বীকার করে না। এইকারণে তাদের ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। ভারতে এ সমস্যা নেই। *প্রকৃতি* বা nature-এর ধারণা আমাদের দেশে পূর্ণাঙ্গ; ভিতরে বাইরে যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে, সবই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, আমাদের চিন্তায় অতিপ্রাকৃত বস্তু বলে কিছু নেই এবং তার দরকারও নেই। আমাদের যা আছে, তা হলো অতিভৌতিক, অতীন্দ্রিয়, অতিযৌক্তিক এবং অতিচেতন। সেইজন্য, আমাদের প্রকৃতির ধারণার সঙ্গে জড়বিজ্ঞানের—যা অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক কোনকিছু স্বীকার করে না—কোন বিরোধ নেই।

তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে দু'ভাবে বিন্যস্ত করতে শুরু করেছেন, যার মাধ্যমে আমরা পরম সত্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। একটি হলো পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, যা সমস্ত ভৌতবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের বিষয়। অন্য সত্যটি কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূমির বহু উর্ধ্বে। দুটিই *প্রকৃতি।* প্রথমটিকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন *অপরা প্রকৃতি,* যা সাধারণ অথবা বাহ্যপ্রকৃতি; দ্বিতীয়টিকে বলেছেন *পরা প্রকৃতি,* বা উন্নততর অন্তঃপ্রকৃতি। তাই, প্রকৃতির দুটি স্তর—সাধারণ ও অসাধারণ—এবং *মুণ্ডকোপনিষদ* অনুযায়ী, এই দুটি স্তর দু-ধরনের বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত। একটিকে বলা হয়েছে *অপরা বিদ্যা* বা 'সাধারণ বিজ্ঞান' এবং অন্যটিকে বলা হয়েছে *পরা বিদ্যা* বা 'উচ্চতর বিজ্ঞান'। আমাদের মহান ঋষিরা এইভাবে বিদ্যা বা বিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইন্দ্রিয়গোচর যে-*অপরা প্রকৃতি* আপনার কাছে নশ্বর বলে প্রতিভাত হচ্ছে, তা কী দিয়ে গঠিত? পরের শ্লোকটিতে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে ঃ

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

—*ভূমিঃ* (মাটি), *আপঃ* (জল), *অনলঃ* (আগুন), *বায়ুঃ* (বাতাস), *খং* (আকাশ), *মনঃ* (মন), *বুদ্ধিঃ* (বুদ্ধি) এবং *অহঙ্কারঃ* (অহঙ্কার) ঃ আমার প্রকৃতি এই আটভাগে বিভক্ত।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *মে ভিন্না প্রকৃতিঃ অষ্টধা,* 'আমার *প্রকৃতি* আটভাগে বিভক্ত'

এবং এই প্রকৃতিকেই তুমি 'ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকাররূপে মানুষের মধ্যে প্রকাশিত দেখছ। এসবই আমার অপরা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে এইটিই বলছেন—*ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা,* এই হলো আমার প্রকৃতি। অর্থাৎ, আমি সমস্ত পার্থিব বস্তুতেই বিদ্যমান। কেন একথা বলছেন? বলছেন এইজন্য যে, শুদ্ধ চৈতন্যরূপে তিনি এইসব কিছুর মধ্যেই রয়েছেন।

পরের উক্তিটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

—'এই প্রকৃতি [যার কথা বললাম] নিকৃষ্টা। কিন্তু, হে মহাবাহো, জেনে রেখো, এর থেকে ভিন্ন হলো আমার প্রকৃষ্টা প্রকৃতি—বুদ্ধিতত্ত্ব বা চৈতন্য—যা এই প্রকাশিত জগতকে ধারণ করে আছে।'

অপরা ইয়ম্, 'এই অষ্টধা প্রকৃতিকে আমার নিকৃষ্টা প্রকৃতি' বলে জেনো; *ইতস্ত্বন্যাং বিদ্ধি মে পরাম্,* 'এবার এই নিকৃষ্টা প্রকৃতির থেকে স্বতন্ত্র আমার *পরা প্রকৃতিকে,* আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিকে বোঝবার চেষ্টা কর।' *জীবভূতাং মহাবাহো,* 'হে অর্জুন, [আমার এই শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি হলো] বোধ বা চৈতন্য!' *যয়েদং ধার্যতে জগৎ,* 'যার দ্বারা এই ব্যক্ত জগৎ বিধৃত'। শুদ্ধচৈতন্য জগতের ধারক; এইটি উচ্চতর প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতিকে বোঝবার যে বিজ্ঞান বা কৌশল, তা নিকৃষ্টা প্রকৃতিকে জানার বিজ্ঞান বা কৌশল থেকে আলাদা। প্রথমটি হলো *অপরা বিদ্যা,* নিকৃষ্ট বা জড় বিজ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি হলো *পরা বিদ্যা,* প্রকৃষ্ট বিজ্ঞান—অতিপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক। যা কিছু ইন্দ্রিয়গুলির ধরাছোঁয়ার বাইরে, তাই অতীন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূমির ঊর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় ভূমি। ভগবান বুদ্ধ বলতেন, *লোক* এবং তার ঊর্ধ্বে *লোকোত্তর;* এই জগৎ হলো *লোক,* তার ঊর্ধ্বে হলো *লোকোত্তর* বা তুরীয়ভূমি। *লোক* এবং *লোকোত্তরকে* একসঙ্গে বলা হয় 'পূর্ণ সত্য'। শুধু *লোক* পূর্ণ সত্য হতে পারে না; আবার শুধু *লোকোত্তর*—তাও পূর্ণ সত্য হতে পারে না। *লোক* এবং *লোকোত্তর, অপরা* এবং *পরা*—দুয়ে মিলে এই-ই হলো বেদান্ত মতে পূর্ণ সত্য। গ্রহ, নক্ষত্র থেকে শুরু করে এক তাল মাটি পর্যন্ত, এই মহাবিশ্বের সমস্তকিছুই নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ। *জীব* তাদের মধ্যেই ছিল, কিন্তু অপ্রকাশিত। মহাজাগতিক বিবর্তন যখন সজীব ও শারীরিক স্তরে উন্নীত হলো, তখনই তা ব্যক্ত হলো। সংস্কৃত শব্দ *জীব*

থেকেই ইংরেজি শব্দ 'জিন' এবং 'জেনেটিকস্' (প্রজনন-বিদ্যা) উদ্ভূত। জগৎ-রঙ্গমঞ্চে *জীব*-এর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই একটি নতুন সত্য প্রকাশ পেল, একটি নতুন দিক উন্মোচিত হলো। তাই বলা হচ্ছে, *জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ*, 'হে অর্জুন, চৈতন্য বা বুদ্ধিই হলো সেই বস্তু যা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছে।'

সত্যের এই দ্বিতীয় দিকটিকে এই কিছুদিন আগেও আধুনিক বিজ্ঞান আমল দেয়নি; শুধুমাত্র প্রথম দিকটি নিয়েই সে ব্যস্ত ছিল এবং বিজ্ঞানীরা সর্বদা আমাদের বলতেন, 'জড়পদার্থই সব, এইটিই পূর্ণ সত্য, এর ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই'। ওই দৃষ্টিভঙ্গি এখন ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। খোদ পাশ্চাত্যের অনেক বৈজ্ঞানিক এখন অনুভব করতে শুরু করেছেন যে, এই জড়প্রকৃতি সত্যের একটি সীমিত রূপ; আরও উচ্চতর সত্য কিছু আছে। চৈতন্য বা বুদ্ধিই সেই উচ্চতর বস্তু। সেইজন্য ইদানীং যেসব বই প্রকাশিত হচ্ছে, তার মধ্যে গীতার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের এই রূপান্তর ভারতবর্ষে ঘটেছিল ৪০০০ বছরেরও বেশি আগে, যখন অধ্যাত্মবিজ্ঞানীরা বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তে অন্তঃপ্রকৃতির ওপর তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ১৭ নভেম্বর, ১৮৯৭-তে লাহোরে (অধুনা পাকিস্তানে) দেওয়া বেদান্তের ওপর এক বক্তৃতায় এবিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছিলেন (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২৯-৩০) ঃ

'আমরা দুইটি জগতে বাস করিয়া থাকি—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ এই উভয় জগতেই প্রায় সমভাবে উন্নতি করিয়া আসিতেছে। প্রথমেই বহির্জগতে গবেষণা আরম্ভ হয় এবং মানুষ প্রথমত বহিঃপ্রকৃতি হইতেই সকল গভীর সমস্যার উত্তর পাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে প্রথমত তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ সমুদয় প্রকৃতি হইতে তাহার মহান ও সুন্দরের জন্য পিপাসা নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে; নিজেকে এবং নিজের ভিতরের সমুদয় বস্তুকে স্থূলের ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়া সে যে সকল উত্তর পাইয়াছে, ঈশ্বরতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে যে সকল অতি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছে, সেই শিবসুন্দরকে যে আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছে, তাহা অতি অপূর্ব। বহির্জগৎ হইতে মানুষ যথার্থই মহান ভাবসমূহ লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরে তাহার নিকট অন্য এক জগৎ উন্মুক্ত হইল, তাহা আরও মহত্তর, আরও

সুন্দরতর, আরও বহুগুণে বিকাশশীল। বেদের কর্মকাণ্ডভাগে আমরা ধর্মের অতি অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ বিবৃত দেখিতে পাই, আমরা জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা বিধাতার সম্বন্ধে অত্যন্ত বিস্ময়কর তত্ত্বসমূহ দেখিতে পাই; আর এই ব্রহ্মাণ্ডকে যে ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে অতিশয় প্রাণস্পর্শী। তোমাদের মধ্যে হয়তো অনেকেরই ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রলয় বর্ণনাত্মক সেই অপূর্ব মন্ত্রটির কথা স্মরণ আছে। বোধ হয় প্রলয়াবস্থার এরূপ মহাভাবদ্যোতক বর্ণনা দিতে এ পর্যন্ত কেহ চেষ্টা করেন নাই। তথাপি উহা কেবল বহিঃপ্রকৃতির মহান ভাবের বর্ণনা—উহা স্থূলেরই বর্ণনা, উহাতে যেন এখনও কিছু জড়ভাব লাগিয়া রহিয়াছে। উহা কেবল জড়ের ভাষায়, সীমার ভাষায় অসীমের বর্ণনা; উহা জড় দেহেরই বিস্তারের বর্ণনা—মনের নহে; উহা 'দেশে'রই অনন্তত্বের বর্ণনা, মনের নহে।

'এই কারণে, বেদের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডে দেখিতে পাই, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম প্রণালী ছিল—বহিঃপ্রকৃতি হইতে বিশ্বের প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করা। জড়জগৎ হইতেই জীবনের সমুদয় গভীর সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা প্রথমে হইয়াছিল। *যস্যৈতে হিমবন্তো মহিত্বা*[1] "এই হিমালয় পর্বত যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে।" এ খুব উচ্চ ধারণা বটে, কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত হয় নাই। ভারতীয় মন ঐ পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতবাসীর গবেষণা সম্পূর্ণরূপে বহির্জগৎ ছাড়িয়া ভিন্ন দিকে গেল, অন্তর্জগতে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, জড় হইতে তাঁহারা ক্রমশ "চৈতন্যে" আসিলেন। এই প্রশ্ন চতুর্দিক হইতে শ্রুত হইতে লাগিল : "মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়?" *অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে*[2], "কেহ বলে মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব থাকে; কেহ বলে, থাকে না। হে যমরাজ, ইহার মধ্যে সত্য কি?" এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, দেখিতে পাই। ভারতীয় মন বহির্জগৎ হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছিল, কিন্তু উহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই, আরও গভীর অনুসন্ধানে প্রয়াসী হইয়াছিল, নিজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, আত্মার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; শেষে উত্তর আসিল।

'বেদের এই ভাগের নাম উপনিষদ বা বেদান্ত—*আরণ্যক বা রহস্য।* এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম বাহ্য ক্রিয়াকলাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এখানে

---

১ হিরণ্যগর্ভসূক্তম্, ঋগ্বেদ, ১০।১২১।৪

২ কঠ উপনিষদ, ১।১।২০

আমরা দেখিতে পাই, আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি জড়ের ভাষায় নহে, চৈতন্যের ভাষায় বর্ণিত—সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ তাহার উপযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে আর কোনরূপ স্থূলভাব নাই, আমরা যে সকল বিষয় লইয়া সচরাচর ব্যস্ত থাকি, সেই সকল বিষয়ের সহিত জোড়াতালি দিয়া সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা নাই। উপনিষদের মহামনা ঋষিগণ অত্যন্ত সাহসের সহিত—এখন আমরা এরূপ সাহসের ধারণাই করিতে পারি না—নির্ভয়ে কোনরূপ জোড়াতালি না দিয়া মানবজাতির নিকট মহত্তর সত্যসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন; এইরূপ উচ্চতম সত্য জগতে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই।'

প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার সময় থেকেই বহিঃপ্রকৃতিকে ভিত্তি করে পাশ্চাত্য দর্শন গড়ে উঠেছিল। এটিকে বলা হয় speculative philosophy অথবা অনুমানমূলক দর্শন। পাশ্চাত্যের ধর্মগুলিও ঈশ্বরতত্ত্বের উদ্ভাবন করেছে তাদের বহিঃপ্রকৃতির জ্ঞানকে ভিত্তি করেই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও সেই এক বহিঃ-প্রকৃতিরই পর্যালোচনা। কিন্তু এই জড় বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বহিঃপ্রকৃতিকে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করেছে যে, তার আশ্চর্যজনক ফলাফল পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের ভিত টলিয়ে দিয়েছে। এর ফলে পৃথিবীতে সন্দেহবাদ, অজ্ঞাবাদ এবং নাস্তিকতার ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েক বছর আগে একটা ইংরেজি বই-এ একটি মজার ঘটনা পড়েছিলাম। একটি প্রকাশ্য সভায় পাশ্চাত্যের এক দার্শনিক বক্তৃতা দেবেন। সভাপতিত্ব করছিলেন এক খ্রিস্টান ধর্মশাস্ত্রবিদ। শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে বক্তার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে তিনি বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে দার্শনিক বক্তার পরিচয় করিয়ে দেবার এই সুযোগে আমি দর্শনের সংজ্ঞাটি একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। দর্শন হলো অন্ধকার ঘরে একটি কালো বেড়াল খোঁজার মতো, যে বেড়াল সেখানে আদপেই নেই। এখন আমি আমাদের দার্শনিককে তাঁর বক্তৃতা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।' দার্শনিক স্বভাবতই এই মন্তব্যে একটু বিব্রত হলেন এবং বক্তৃতা শুরু করলেন এই বলে, 'আমাদের ঈশ্বরতত্ত্ববিদ বন্ধু আমার বিষয়টির সংজ্ঞা দিলেন, কিন্তু নিজের বিষয়টির সংজ্ঞা দিতে ভুলে গেলেন। আপনাদের অবগতির জন্য সেই সংজ্ঞাটি আমি দিচ্ছি ঃ ধর্মতত্ত্ব হলো অন্ধকার ঘরে একটা কালো বেড়াল খুঁজে বেড়ানো, যা আদপেই সেখানে নেই, অথচ তাকে *পাওয়া গেছে বলে দাবি করা*।' এই কথায় প্রচণ্ড হাততালি পড়ে।

সমস্ত কল্পনানির্ভর দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের এই পরিণতি। কিন্তু প্রশ্ন এই, ধর্ম

ও দর্শনের ক্ষেত্রে কি কোন বৈজ্ঞানিক তথা *অভিজ্ঞতামূলক* দৃষ্টিভঙ্গি নেই, না তা গড়ে তোলা যায়? ভারতবর্ষ বলে, হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। আমাদের দেশে কল্পনামূলক ধর্ম ও দর্শন থেকে অভিজ্ঞতামূলক ধর্ম ও দর্শনের উত্তরণ ঘটেছিল উপনিষদের যুগে, ৪০০০ বছরেরও আগে, যখন মনীষীরা বাহ্য জগতের পরিবর্তে অন্তর্জগতের ওপর তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টি একাগ্র করলেন, মেতে গেলেন মনুষ্য প্রকৃতির গভীরতা অনুসন্ধানের সাধনায়।

বিবেকানন্দের বক্তৃতার উদ্ধৃত অংশে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির এই পালাবদল ও তার সুগভীর ফলশ্রুতিই ব্যক্ত হয়েছে। আজকের জড়বিজ্ঞান, বিশেষত পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান ও বিংশ শতাব্দীর জীববিজ্ঞান, ধীরে ধীরে এই দিকেই মোড় নিচ্ছে। এইদিকে প্রথম পদক্ষেপ হলো পারমাণবিক গবেষণায় তথ্য হিসাবে পর্যবেক্ষককে গুরুত্ব দেওয়া। যদি আরও এগিয়ে পর্যবেক্ষকের প্রকৃতি অনুসন্ধান করা হয়, তবে পদার্থবিজ্ঞান জড়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে অসীম আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করবে। মনুষ্যস্তরে ক্রমবিকাশের প্রকৃতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে জীববিজ্ঞান যে ইতোমধ্যেই সেই আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেছে, এই ইঙ্গিত স্যার জুলিয়ান হাক্সলে (Julian Huxley) অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাঁর 'Evolution : A New Synthesis' নামক গ্রন্থে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মনুষ্যস্তরে জৈব ক্রমবিকাশ মনোসামাজিক (Psychosocial) পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি আধ্যাত্মিক বিবর্তন, কিন্তু 'আধ্যাত্মিক' শব্দটি উনি সভয়ে এড়িয়ে গেছেন।

এই আধ্যাত্মিক বা মনোসামাজিক ক্রমবিকাশের মোটামুটি দুটি ধাপ আছে। প্রথমটি নৈতিক ও চারিত্রিক, আজকের দিনে যাকে value-orientation বা মানুষকে এক শান্তিপূর্ণ, সুসংহত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজের অঙ্গীভূত করার জন্য মূল্যবোধের শিক্ষা বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো সেই বিশেষ অবস্থা *বেদান্তে যাকে মুক্তি* বা পূর্ণ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা বলা হয়। *ভারতবর্ষের বেদান্ত তাই মনে করে যে, নীতিবিজ্ঞান হলো জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মাঝে একটি সেতু।* আধুনিক যুগে মানবীয় ক্রমবিকাশের এই ধারাটি হলো জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে প্রজ্ঞার দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই ধরনের ক্রমোন্নতি এবং অগ্রগতি যদি না ঘটে এবং মানুষ যদি শুধু এখনকার মতো ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও ক্রমবর্ধমান পণ্যগ্রাহিতার স্রোতে ভেসে যায়, তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানবজাতির শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। ব্রিটিশ অজ্ঞাবাদী দার্শনিক, বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell), তাঁর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গ্রন্থ, 'Impact of Science on Society'-তে (পৃষ্ঠা ১২০-২১) নিচের এই সাবধানবাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন ঃ

'আমরা এমন এক দৌড় প্রতিযোগিতার মধ্যে আছি, যেখানে মানুষের উপায়-নির্ধারণের কর্মকুশলতা, লক্ষ্য সম্বন্ধে মানুষের মূর্খতার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। যদি লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন না হই, তবে লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রত্যেকটি কৌশল মন্দকেই বাড়িয়ে তুলবে। মানুষ যে এতদিন টিকে আছে, সে তার অজ্ঞতা আর অক্ষমতার জন্য; কিন্তু শিক্ষা ও দক্ষতার সঙ্গে নির্বুদ্ধিতা যুক্ত হলে বাঁচার আর কোন নিশ্চয়তা থাকবে না। জ্ঞানই শক্তি, কিন্তু সেই শক্তি ভালো এবং মন্দ, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারে। অতএব, বলা যেতে পারে যে, *জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রজ্ঞা না বাড়ে, তবে সে জ্ঞান দুঃখই বাড়িয়ে তুলবে।*'

আধুনিক যুগের মানুষের কাছে এটিই গীতার মর্মবাণী। বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর উক্তিটিও যেন মহাকাশযুগের মানুষের কাছে প্রাচীন 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ' -এর আহ্বানেরই প্রতিধ্বনি। এই উপনিষদে (৬।২০) বলা হয়েছে ঃ

যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥

—'মনুষ্যজাতি যদি এই আকাশকে চামড়ার মতো গুটিয়েও ফেলতে পারে, তবুও নিজের (অন্তর্নিহিত) দেবত্বের কথা জানতে না পারলে তার দুঃখের অবসান হবে না।'

এই উপনিষদই অন্য একটি শ্লোকে বলছেন যে, আত্মানুসন্ধান থেকেই অনন্ত ও অবিনাশী জগৎকারণের জ্ঞান লাভ হয় (২।১৫) ঃ

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥

—অর্থাৎ 'যখন আত্মসংযমী, আধ্যাত্মিক তত্ত্বান্বেষু সাধক, এই শরীরেই, তাঁর হৃদয়-গুহাতেই, আত্মসত্যের মাধ্যমে দীপের ন্যায় স্বয়ংপ্রভ ব্রহ্মসত্যকে উপলব্ধি করেন, তখন সেই জন্মরহিত, শাশ্বত এবং প্রকৃতির বহুবিধ বিকারের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট পরমাত্মাকে জেনে তিনি সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হন।'

'নিউ টেস্টামেন্ট'-এ যিশুখ্রিস্টের কয়েকটি বাণীর মধ্যেও এই গভীর সত্য উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ 'ঈশ্বরের রাজ্য চোখ দিয়ে দেখা যায় না; সে রাজ্য এখানেও আছে, আবার ওখানেও; কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমার ভিতরেই আছে'। আবার বলছেন, 'যাদের চিত্ত শুদ্ধ, তারা ধন্য, কারণ তারাই ঈশ্বরদর্শন করবে।'

এই একই শিক্ষা আমরা পয়গম্বর মহম্মদের বাণীতে পাই। এই বাণীগুলি *হাদিৎ-এ উরুফি* ও *হাদিৎ-এ সুইদ্‌সি* নামে পরিচিত। জালালুদ্দিন রুমি তাঁর বিখ্যাত *মসনবি*-তে প্রায়ই এর থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন অথবা এর উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত একটি বাণীতে বলা হচ্ছে ঃ

মান আরাফা নাই সাহ্‌
ফাকো আরাবা নাব বাহ্‌

'যিনি নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করেন, একমাত্র তিনিই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারেন।'

অন্য এক জায়গায় জালালুদ্দিন রুমি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন ঃ 'প্রত্যেক মানবাত্মার মধ্যেই একজন খ্রিস্ট লুকিয়ে আছেন, সাহায্য পেতে অথবা বাধা পেতে, আঘাত পেতে অথবা আরোগ্যলাভ করতে। যদি কারো আত্মার আবরণ উন্মোচন কর তো নিশ্চয় দেখবে সেখানে খ্রিস্ট বিরাজ করছেন।'

কয়েকদিন আগে ইংল্যান্ডের নভোবস্তু বিজ্ঞানী (astro-physicist) ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) হায়দ্রাবাদে এসেছিলেন। বিড়লা প্ল্যানিটরিয়ামে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁর চল্লিশ বছর আগে লেখা একটি বই নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। বইটি ছিল পুরোপুরি বস্তুবাদী চিন্তাপ্রসূত। সম্প্রতি তিনি 'The Intelligent Universe' নামক একটি নতুন বই লিখেছেন। অতি চমৎকার বই, যাতে বুদ্ধি (বা চৈতন্যের) প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। উনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা আমাদের মনোভাব পাল্টেছি; বুদ্ধিতত্ত্ব ছাড়া বিশ্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না'। কী চমৎকার ভাব! কিন্তু এই আজকের দিনেও জীববিজ্ঞান ও জীবন্ত কোষ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, এরকম অনেক বৈজ্ঞানিকই বুদ্ধির প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান। তাঁদের মতে সবটাই যান্ত্রিক, তা রসায়নবিদ্যাই হোক, আর পদার্থবিদ্যাই হোক— তার মধ্যে অন্য কিছুকে তাঁরা স্বীকার করেন না। কোন কোন মানুষের এই হলো দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা দেখছেন যে, 'না, তা হতে পারে না'। জীবকোষের কী অদ্ভুত স্বভাব! কী আশ্চর্য আচরণ তার! জন্মাছে, পরিণত হচ্ছে,

সংখ্যায় বাড়ছে, নিজেই নিজেকে বদলাচ্ছে—নিজেকে মেরামত করতে তার বাইরের কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না। নিজের মধ্যে থেকেই মালমশলা সংগ্রহ করে সে মেরামতির কাজ সেরে নেয়—কী আশ্চর্য কাণ্ড! এইভাবেই একটি ছোট্ট কোষ বহু কোষবিশিষ্ট হয়ে, বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে, একটি জীবন্ত শিশুর আকার ধারণ করছে! জীবজগতে কী বিস্ময়কর কাণ্ডকারখানাই না ঘটছে! অতএব, জীববিজ্ঞান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণারত বহু বিজ্ঞানীই অনুভব করতে শুরু করেছেন যে, শুধু যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েই জীবদেহের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য বুদ্ধি অথবা চৈতন্য নামক ওই দ্বিতীয় বস্তুটি অপরিহার্য। কারণ, সব লক্ষ্য অভিমুখী কর্মের জন্য চাই বুদ্ধি। বুদ্ধিই কর্মের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ একটি কোষ বা কোষের ভিতর নিহিত বিশেষ একটি জিন ভ্রূণগঠনের জন্য একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ধেয়ে যায়। এখানে আমরা কী প্রচণ্ড এক লক্ষ্যাভিমুখী গতির পরিচয় পাই! এগুলিকে শুধুমাত্র দৈহিক বা যান্ত্রিক কাজ বলে আর চালানো যায় না, যদিও অনেক বৈজ্ঞানিক আজও এই ঊনবিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক মতবাদ আঁকড়ে আছেন। এঁদের বলা হয় 'রিডাকশনিস্ট', অর্থাৎ যাঁরা পৃথিবীর সব কিছুই পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন। বর্তমানে এঁদের আর তেমন কদর নেই। ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিকরা এই সঙ্কীর্ণ মনোভাব কাটিয়ে উঠছেন।

এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, 'এটিকে আমার নিকৃষ্টা (অপরা) *প্রকৃতি* বলে জেনো; আমার প্রকৃষ্টা (পরা) *প্রকৃতিও* আছে, যার দ্বারা সমস্ত জগৎ সজীব হয়ে আছে।' *যয়েদং ধার্যতে জগৎ*, 'যার দ্বারা সমগ্র জগৎ পুষ্ট' অর্থাৎ 'চৈতন্য দ্বারা', *জীবভূতাম্।* একই ঐশ্বরিক সত্তার দুটি দিক : *অপরা ও পরা।* এই *অপরা* হলো জড় বা *'অনড়'*, আর *পরা* হলো *চিৎ* বা 'চৈতন্য'। *চিৎ* এবং *জড়* একই সত্যের দুটি দিক। চতুর্দিকে যা দেখতে পান, সেগুলি *জড়।* একমাত্র জীবন্ত সত্তার ভিতরেই *চিৎ* প্রকাশিত। আমাদের দর্শন বলে, *জড়ের* ভিতরেও *চিৎ* আছে। কিন্তু হলে কি হয়, *জড়* তার *চিৎ*-মাত্রাকে প্রকাশ করার মতো যথেষ্ট উন্নত নয়। উন্নত হলে ধীরে ধীরে ঐ চৈতন্যের প্রকাশ ঘটে। সুতরাং, বেদান্ত মতে, বিবর্তন হলো গভীরে লুকিয়ে থাকা কোন বস্তুর প্রকাশ। বেদান্ত সেইজন্য বলে যে, বিবর্তন হলো *কাঠামোর বা দেহের ক্রমবিকাশ* ও চৈতন্যের *প্রকাশ।* ভৌতিক কাঠামোটিই ক্রমে ক্রমে বিবর্তিত হয়। মূল চিৎশক্তি সবেতেই বিদ্যমান, কিন্তু উন্নত দেহে সে সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। মাত্র একটি জীবকোষে চৈতন্যের প্রকাশ অতি সামান্য, কারণ ঐ কোষটি সম্পূর্ণ

বিকশিত নয়। কিন্তু কোষের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য আসে, তখন তারা একটি দেহের আকারে সংহত হয় এবং তখনই তার মধ্যে উত্তরোত্তর চৈতন্যের প্রকাশ হতে থাকে। একই জিনিস ঘটে যখন মানুষের মস্তিষ্ক গড়ে ওঠে। এখানে চৈতন্যের প্রকাশ অনেক বেশি। কী প্রকাশিত হচ্ছে? চৈতন্য। কী বিবর্তিত হচ্ছে? না, চিৎ নয়। কারণ চিৎ বা চৈতন্যের কোন বিবর্তন নেই; সে সর্বদা অপরিবর্তিত। বিবর্তন শুধু কাঠামোর বা দেহের এবং এই বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের প্রকাশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়। কী গভীর সত্য! একটি শিশুর দেহের কথাই চিন্তা করুন। শৈশবে তার দেহের তেমন কোন বিশেষত্ব থাকে না। কিন্তু যখন তার বারো কি তেরো বছর বয়স হয়, তখন তার মধ্যে নতুন মূল্যবোধ প্রকাশ পেতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যৌন চেতনার উন্মেষ হয় বারো কি তেরো বছর বয়সে এবং শরীর তখন এমনভাবে বিবর্তিত হয় যে, তার দ্বারা সহজেই এইভাব ব্যক্ত হতে পারে। এই কাঠামোটি অর্থাৎ দেহ-মন-রূপ যন্ত্রটি পূর্ণভাবে বিকশিত হলে এবং তাকে শুদ্ধ করে তুলতে পারলে দেখা যাবে, আপনার মধ্যে, আমার মধ্যে, সকলের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ হচ্ছে।

বেদান্ত এইভাবেই ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা দেয় এবং বলে থাকে যে, চৈতন্যের অভিব্যক্তির এই প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে—একটি সাধারণ জড়বস্তু থেকে আত্মা পর্যন্ত, সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ ও অন্যান্য আধিকারিক পুরুষ পর্যন্ত। চৈতন্য নিজেকে প্রকাশ করছে *জড়* বা অচেতন বস্তুর মধ্য দিয়ে এবং সেই *জড়*ও ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে *চৈতন্যকে* আরও বেশি প্রকাশ করতে। বেদান্ত মানুষকে *চিৎ-জড়-গ্রন্থি*, অর্থাৎ '*চিৎ* ও *জড়*-এর সংমিশ্রণ' বলে বর্ণনা করেছে। *জড়* উপাদান ও *চিৎ* উপাদান, দুই-ই আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু চিৎ কীভাবে জড়কে চালনা করবে সে দায়িত্ব আমাদের। প্রায়শ বহু মানুষের মধ্যে দেখা যায়, *জড়-ই চিৎ*-কে চালাচ্ছে। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, কারণ এর অর্থ পিছিয়ে যাওয়া। প্রকৃত অগ্রগতি তখনই হবে, যখন চৈতন্যকে প্রাধান্য দিয়ে *জড়কে* আপনি দাসে পরিণত করতে পারবেন। ১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাই বলেছিলেন, 'জড় তোমার দাস, তুমি জড়ের দাস নও'। কিন্তু আজকের সভ্যতায় *জড়ই* প্রভু হয়ে বসেছে, আর যে-মানুষ জড় পদার্থকে ভোগ্যদ্রব্যে পরিণত করেছে, সেই হয়েছে তার দাস, কারণ সত্তার চৈতন্য বলে যে একটা অনন্ত দিক বা পরিচয় আছে, সে সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। প্রকৃতি সম্পর্কে গীতার শ্রেণিবিন্যাসের এইটিই গুরুত্ব।

পরের কয়েকটি শ্লোক যখন আমি আলোচনা করব, তখন আপনারা চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোকের ওপর শংকরাচার্যের অতি চমৎকার একটি ভাষ্য পাবেন। সেইখানে দেখবেন বৈজ্ঞানিক মন সত্যকে কী পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে ধরেছে। কোন কিছুকেই সেখানে বাদ দেওয়া হয়নি, ফলে বিজ্ঞান সেখানে পূর্ণতা লাভ করেছে। *মুণ্ডকোপনিষদেও* একইরকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেখানে প্রশ্ন করা হয়েছে, *ব্রহ্মবিদ্যা* বা ব্রহ্মবিজ্ঞান কী? তার উত্তরে বলা হয়েছে—এটি হলো *সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা,* 'সব বিদ্যা বা বিজ্ঞানের ভিত্তি।' সত্যের পূর্ণতাকে, অনন্ত ও অবিনাশী চৈতন্যকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে—যা সমস্ত বিশ্বের একমাত্র উৎসস্থল। আর ব্রহ্মবিদ্যা হলো সেই বিজ্ঞান যা অন্যান্য সমস্ত বিজ্ঞানকে পূর্ণতা দেয়। তাই, ব্রহ্মবিদ্যা হলো সব বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞান। শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান।

সমস্ত অস্তিত্ব এবং যাবতীয় অভিজ্ঞতার সমষ্টি ও সর্বোচ্চ সত্য এই চৈতন্যতত্ত্বকে বেদান্ত ব্রহ্ম বা আত্মা নামে অভিহিত করেছে। ব্রহ্ম বা আত্মা হলেন শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধচৈতন্য, শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ। *তৈত্তিরীয়োপনিষদে* আছে—*সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,* 'ব্রহ্ম হলেন সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত'। তিনিই সমস্ত বিশ্বকে পালন করেন। এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন।

পরের শ্লোকে তিনি বলছেন ঃ

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয় ।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

—'জেনে রাখো, এই (উভয় প্রকৃতিই) সমস্ত জীবের উৎপত্তিস্থল এবং আমিই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ।'

এতৎ যোনীনি ভূতানি সর্বাণি ইতি উপধারয়, 'জেনে রাখো, সবকিছুই জগতের এই দুই (প্রকৃতি) থেকে উৎপন্ন'। ব্রহ্মাণ্ডে *চিৎ ও অচিৎ,* চৈতন্য ও জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নেই। সর্বত্রই কেবল *চিৎ* কিংবা *অচিৎ* দৃশ্যমান, অন্য কিছু নয়। *যোনি* অর্থাৎ 'উৎস'। *অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।* শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, '(জড় ও চেতন) এরাই আমার দুটি প্রকৃতি; এই উভয় প্রকৃতির মাধ্যমে আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ।'

এই শ্লোকের ওপর শঙ্করাচার্যের ভাষ্যটি অতি সুন্দর ও মননযোগ্য। তিনি বলছেন ঃ *প্রকৃতি দ্বয় দ্বারেণ অহং সর্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ জগতঃ কারণম্,* 'আমি, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, আমার দ্বিবিধ প্রকৃতির মাধ্যমে, এই জগতের কারণস্বরূপ।' এই জগতের

কারণ বা উৎস কি? আমরা প্রায়ই প্রশ্ন করি—এই জগতের পিছনে কী আছে? সাংখ্যদর্শনে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাতে 'কারণ' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, এখানেও সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কার্য ও কারণ দুটি আলাদা বস্তু নয়, এই-ই হলো 'কারণে'র ধারণা। কারণই একরূপে কার্য; কার্য কোন বাইরের বস্তু নয়। সুতরাং, 'দ্বিবিধ প্রকৃতির মাধ্যমে আমিই এই জগতের কারণ'। এই দ্বিবিধ প্রকৃতির প্রথমটি হলো সাধারণ প্রকৃতি, যা জড়বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের বিষয় এবং দ্বিতীয়টি হলো অ-সাধারণ প্রকৃতি, যা বুদ্ধি বা চৈতন্যরূপে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অন্বেষ্টব্য। একই সত্যের দুটি দিক। যা কিছু অস্তিত্বমান, সবই এসেছে এই প্রকৃতির কোনটি না কোনটি থেকে। সৃষ্টিতত্ত্ব পর্যালোচনাকালে আমরা শুধু বস্তুর স্থূল দিকটিই দেখি। কিন্তু যখন আমরা চৈতন্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, স্নায়ুর কার্যকলাপ অথবা মনের গতিবিধি বোঝবার প্রয়াস করি, তখন আমাদের প্রচেষ্টায় এক নতুন মূল্যবোধ, এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। সে মূল্যবোধের নাম বুদ্ধি বা চৈতন্য। এটি একেবারেই অন্য বিষয়। এই যে চৈতন্য, তার উৎসটি কী? আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে হবে। প্রায় নব্বই বছর আগে, ইংলন্ডে এক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'রেললাইনের উপর একটি ক্ষুদ্র কীট বসিয়া আছে। বহুদূর হইতে একটি ট্রেন আসিতেছে। রেললাইনের কম্পন হইতেছে। লাইনের উপরস্থ একটি ক্ষুদ্র পাথর সরিয়া যাইতে পারে না, তাহার সে ক্ষমতা নাই, সে পিষ্ট হইয়া গুঁড়াইয়া যায়। কিন্তু ক্ষুদ্র কীটটির নিজেকে রক্ষা করিবার বুদ্ধি আছে; সে শান্তভাবে সরিয়া যায়।' এটা সম্ভব হয়, তার কারণ ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যেও চেতনা নামক এক অসাধারণ তথ্যভিত্তি আছে। লক্ষ্যমুখী কর্ম একমাত্র প্রাণ ও চেতনা থেকেই আসতে পারে। তাই, আগের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এই দ্বিতীয় তথ্যভিত্তিটি, অর্থাৎ চৈতন্যই হলো 'সেই মূলবস্তু যা সমগ্র জগতের ভিত্তি ও পালক' *যয়া ইদং ধার্যতে জগৎ*। এই হলো শ্লোকটির উপর শঙ্করাচার্যের ভাষ্য। বেদান্তে ঈশ্বর হলেন সেই সত্য, যিনি *পরা* ও *অপরা*, এই দ্বৈত প্রকৃতি সহায়ে বিশ্বের কারণ। তাই উপনিষদে সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে প্রায়শই বলা হয়, 'ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) যেমন নিজের শরীরের লালা দিয়ে জাল বুনে, সেই জালের ভিতর বাস করে, তেমনি' ঈশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করলেন ও তাতে অনুপ্রবেশ করে বাস করতে লাগলেন। তাই, ঈশ্বর এই বিশ্বকে *প্রকাশ* করলেন বা বিশ্বে অধ্যস্ত হলেন, বিশ্বকে যে *সৃষ্টি* করলেন, তা নয়। সংস্কৃতে *সৃষ্টির* অর্থ প্রক্ষেপন বা প্রকাশ (projection)। বেদান্তে সৃষ্টি বা creation-এর কথা নেই।

অতএব, বেদান্ত বলে, 'পরমেশ্বর বিশ্বকে প্রকাশ করে তার ভিতরে আত্মারূপে, আমিরূপে, তুমিরূপে, চেতনারূপে বাস করেন,' *তৎসৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ।* সৃষ্টিতত্ত্বের দিক থেকে ভাবলে এখানে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কারণ তিনি এই সমস্ত *অচিৎ* বা অনাত্ম বস্তুর অতি গভীরে বিরাজ করছেন। যদিও বেদান্ত অনুযায়ী *অচিৎ*-এর ভিতরেও *চিৎ* বা চৈতন্য আছে, কিন্তু তা ধরাছোঁয়ার বাইরে, তা অনুভবযোগ্য নয়। একমাত্র *অচিৎ* যখন জীব কোষে উন্নীত হয়, তখনই চৈতন্যের প্রকাশ শুরু হয়। তার আগে বিশ্বের কোন কিছুর মধ্যেই চৈতন্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুদূর ছায়াপথেও না। চৈতন্যের অমৃত যেন বিবর্তনের মধ্য দিয়েই আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই যে বিবর্তন, তা শুধু কাঠামোর—দেহের, চৈতন্যের নয়, যেকথা আগেই বলেছি। চৈতন্য অখণ্ড, এক ও অদ্বিতীয়; দেহের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য উত্তরোত্তর প্রকাশিত হতে থাকে, এই যা। আজ এই সত্যটির উপর জোর দিতে হবে। বেদান্তের ভাষায় বললে বলতে হয়, বিবর্তন মানে দেহের ক্রমবিকাশ এবং সর্বভূতের ভিতরে চৈতন্যরূপে যিনি নিত্য বিরাজিত, তাঁর প্রকাশ। কয়েক দশক আগে পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞান এ মত মানতে চাইত না। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বস্তুবাদী। তাঁদের মতে কেবল স্থূল জড় পদার্থই বর্তমান এবং ঐ জড়বস্তু দিয়েই তাঁরা সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারেন। এটি ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর কট্টর জড়বাদী মনোভাব, যা বিংশ শতাব্দীকেও গ্রাস করেছিল এবং এখনও কিছু বৈজ্ঞানিক এই পুরনো মত আঁকড়ে আছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, কোন কোন বৈজ্ঞানিক এখন এই মত পোষণ করতে শুরু করেছেন যে, স্থূল জড় পদার্থ দিয়ে সব জাগতিক অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য অন্য আরও কিছু দরকার।

সেই অন্য কিছুর কথাই শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চম শ্লোকে বলেছেন ঃ *অপরেয়ম্ ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্,* 'এটি হলো আমার সাধারণ প্রকৃতি (নিকৃষ্টা); এবার আমার পরা (শ্রেষ্ঠ) প্রকৃতি সম্বন্ধে শোন'; *জীবভূতাং,* 'যা চৈতন্যস্বরূপ'। ছোট্ট জীবকোষটি সত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে, কারণ তার মধ্যে *পরা* প্রকৃতির ক্ষীণ প্রকাশ দেখা যায়। চৈতন্য তার ভিতর আগেও ছিল, কিন্তু তার কোন প্রকাশ ছিল না। ক্রমবিকাশের অগ্রগতি জীবকোষের স্তরে পৌঁছলে তবেই এই প্রকাশ সম্ভব হয়। এই কারণেই জীবকোষ নিজের প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে। সুতরাং এখানে এক নতুন তথ্যভিত্তির আবির্ভাব হচ্ছে, যাকে শ্রীকৃষ্ণ *পরা প্রকৃতি* বলে উল্লেখ করেছেন, 'যা চৈতন্যস্বরূপ', *জীবভূতাম্।*

আজকের জড়বাদী বৈজ্ঞানিকরা বলবেন যে, তাঁরা চৈতন্যকে, জীবকোষের আচরণকে, মানুষের আচরণকে, শেক্সপীয়র অথবা মহান অধ্যাত্মজগতের আচার্যদের আচরণকে জড়বস্তুর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারেন। আগেই বলেছি, এই অনমনীয় জড়বাদকে রিডাকশনিজম (Reductionism) বলে। ভারতের এবং বিদেশের বেশ কিছু বৈজ্ঞানিকই এই চরম রিডাকশনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। তাঁদের ধারণা, যত মহৎ চিন্তাই হোক না কেন, সবকিছুই তাঁরা রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা বা জিন এর তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন। তবে আশার কথা, বেশ কিছু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এখন এই মনোভাব থেকে সরে আসছেন; নিষ্প্রাণ জড়তত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র দ্বিতীয় একটি তত্ত্বকে তাঁরা স্বীকার করছেন। এই দ্বিতীয় তত্ত্বটিকেই শ্রীকৃষ্ণ *জীবভূতাম্*, অর্থাৎ বুদ্ধি বা চৈতন্য সত্তা বলে উল্লেখ করছেন। বাস্তবিক, চৈতন্য ছাড়া জগৎকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যদি সে চেষ্টা করেন, তাহলে তা হবে অতিমাত্রায় জড়বাদী এবং অবৈজ্ঞানিক। এই কারণেই, বিজ্ঞানের নতুন অগ্রগতিই, আজকের জড়বাদে ভাঙন ধরিয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, 'সমস্ত কিছুর অবিনাশী সত্তারূপে এবং জগতের ঈশ্বররূপে, *পরা* ও *অপরা* এই দুই প্রকৃতির মাধ্যমে আমিই জগতের কারণ; এই দুই প্রকৃতি আমার অপরিহার্য অঙ্গ।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর বৈজ্ঞানিক আছেন যাঁরা এই নতুন চিন্তাধারাটি অনুসরণ করছেন। তাঁদের বক্তব্য, স্থূল জড়বাদ কখনও বিশ্বের সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারে না। তার জন্য ওই *জীবভূতম্*—অর্থাৎ প্রকৃতির দ্বিতীয় দিকটিকে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। চৈতন্যের স্বীকৃতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আধুনিক স্নায়ু-বিজ্ঞানে এটি নিয়ে রীতিমতো গবেষণা চলছে। আবার তর্ক বিতর্কও হচ্ছে। সুখের কথা এই, বিশিষ্ট স্নায়ুবিজ্ঞানীরা বলছেন যে, শুধু মস্তিষ্ক দিয়ে মানুষের আচরণ ব্যাখ্যা করা যাবে না; এর জন্য চাই দ্বিতীয় বস্তুটি—চেতনা বা মন। মন ও মস্তিষ্ক দুটিই চাই। মস্তিষ্ক একলা সব কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে না। বৈজ্ঞানিক চিন্তা, এই যে নতুন মোড় নিয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই চিন্তা আধুনিক বিজ্ঞানে প্রাধান্য পেলে সমগ্র বিজ্ঞানজগতে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে যাবে, যা শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক উন্নতিকেই ত্বরান্বিত করবে। বহু, বহু যুগ আগে বেদান্তে যা বলা হয়েছিল, আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আজ তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দিচ্ছে। গত একশো বছর ধরে জড়বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা প্রাচীন বৈদান্তিক সত্যগুলিকেই প্রকারান্তরে সমর্থন করে এসেছে। বিজ্ঞানের একটি চিন্তাও বেদান্তের শিক্ষাকে

লঙ্ঘন করতে পারেনি; বরং বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলিকে আধুনিক বিজ্ঞান পরীক্ষানিরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখছে। আমাদের ঋষিরা যে সত্যকে অপরোক্ষানুভূতির মাধ্যমে উপলব্ধি করেছিলেন, আজকের বৈজ্ঞানিকরা তাকে বাহ্য, ভৌতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে দেখাবার চেষ্টা করছেন।

এই প্রসঙ্গে, সেই সব স্নায়ুবিজ্ঞানীদের কথা একটু জেনে রাখা ভালো, যাঁরা মস্তিষ্কের পিছনে মনের সক্রিয়তার কথা স্বীকার করেন এবং বলেন যে, মানুষের আচরণ ব্যাখ্যা করতে হলে দুটিই প্রয়োজনীয়। এটি একটি চূড়ান্ত মন্তব্য এবং কয়েকজন দিকপাল স্নায়ুবিজ্ঞানী এখন এই মত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছেন।

কয়েক দশক আগে পর্যন্ত, মনস্তত্ত্ব ও স্নায়ুতত্ত্ব দুটিই ছিল ঘোর জড়বাদী। মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তখন তাদের এমন কোন সত্যের প্রয়োজন হতো না যা জড়-জগতের বাইরে। কিন্তু, যে কথা বলেছি, বেশ কিছু স্নায়ুতত্ত্ববিদ এখন এই স্থূল জড়বাদ থেকে বেরিয়ে আসছেন। মস্তিষ্কের পিছনে যে মনই কাজ করে, এ সত্য তাঁরা পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা দেখানোর চেষ্টা করছেন। সুতরাং, পৃথিবী জুড়ে এখন মস্তিষ্ক নিয়ে নতুন ধরনের গবেষণা চলেছে। আগে মৃত মানুষের মস্তিষ্ক, মৃত মানুষের স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে গবেষণা চলত; *কিন্তু ইদানিংকালে তা হচ্ছে জীবিত মস্তিষ্ক, জীবিত স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে।* স্নায়ুবিজ্ঞানে এটি অভূতপূর্ব পরিবর্তন। তাছাড়া আরও একটি বিষয়েও উন্নতি হয়েছে। মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণাকালে আগে মানুষকে অচৈতন্য করে রাখা হত; এখন তা করা হয় মানুষকে চেতন অবস্থায় রেখে। মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করার সময়ে এখন বৈজ্ঞানিক ও রোগীর মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে শোনা যায়। এই অগ্রগতির ফলে মনের প্রকৃত স্বভাব সম্বন্ধে আমরা নতুন অনেককিছুই জানতে পারছি। এইসব বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম ছিলেন মন্ট্রেয়ল নিউরোলজিকাল ইনস্টিটিউটের অধুনা প্রয়াত ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড। তিনি টেবিলের ওপর রোগীকে শুইয়ে, তার মাথার খুলিটি সরিয়ে অপারেশন শুরু করেছিলেন। মস্তিষ্কে ব্যথা অনুভব না হওয়ায় রোগীকে অচৈতন্য করার দরকার হয়নি। এরপর রোগীর সঙ্গে ডাক্তারের কথাবার্তা শুরু হয়। এই পরীক্ষামূলক গবেষণা থেকে ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড বুঝতে পারলেন যে, মানুষের আচরণ শুধুমাত্র নিউরোন অর্থাৎ মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের কাজকর্মের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে তিনি লিখেছেন যে, মস্তিষ্কের পিছনে যে মন আছে, এইটি আমাদের বুঝতে হবে। আমি তাঁর বইয়ের সেই অংশটি পড়ে শোনাব যেখানে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। পেনফিল্ড-

এর আগে আমরা পেয়েছিলাম আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানের প্রবর্তক, স্যার চার্লস শেরিংটনকে। তাঁর প্রথমদিককার গ্রন্থ 'The Integrative Action of the Nervous System'-এ তিনি মনের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি, যদিও তিনি জানতেন যে মনের মতো কোন একটি বস্তু অবশ্যই আছে। কিন্তু যেহেতু স্নায়ুবিজ্ঞান সেই সত্য সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ দিতে পারত না, সেইহেতু এ ব্যাপারে তিনি নীরব ছিলেন।

আগেই বলেছি, সেই কোন্ প্রাচীনকাল থেকেই বেদান্ত বলে আসছে যে, মানুষ হলো *চিৎ-জড়গ্রন্থি*, অর্থাৎ চৈতন্য ও জড় পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত এক অখণ্ড সত্তা। যা কিছু চেতন তা হলো *চিৎ*, আর যা কিছু অচেতন পদার্থ, তা হলো *জড়*—দুটিই মানুষের দেহতন্ত্রে মিলে মিশে রয়েছে। তাতে যেমন পদার্থ বিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার স্যাপার রয়েছে, তেমনি তার থেকে উচ্চতর সত্যও কিছু আছে, বেদান্তের ভাষায়—*চিৎ জড় গ্রন্থি*। এই ধারণাটি স্যার চার্লস শেরিংটন ও ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড, দুজনের লেখার মধ্যেই আভাষিত। ওয়াইল্ডার পেনফিল্ডের গ্রন্থ থেকে একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'আমি জড়বাদী হিসাবেই শুরু করেছিলাম। আমাদের দৌড় তো ওই জড় পর্যন্তই। কিন্তু এমনকিছু বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হলাম যেগুলিকে, আমি দেখলাম, কিছুতেই শুধু মস্তিষ্কের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না; ফলে, মস্তিষ্কের পিছনে মনের অস্তিত্বকে বিবেচনা করতে আমি বাধ্য হলাম।'

শেরিংটনের চিন্তাধারার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছিল, পেনফিল্ড-এরও তাই হলো। এ যেন শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যা বলেছেন, তারই পুনরাবৃত্তি। উভয়ের চিন্তার এত সাদৃশ্য! সেইজন্যই এঁদের লেখার অংশবিশেষ আমি আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করতে চাই।

১৯৩৭ সালের জুন মাসে, স্যার চার্লস শেরিংটন তাঁর 'The Integrative Action of the Nervous System' শীর্ষক বইখানির একটি ভূমিকা লেখেন। তাঁর সম্মানে 'ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি' সেটিকে পুনর্মুদ্রিত করেছিল। ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদে এই বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায়। তিনি লিখেছেন :

'আমি মনে করি, আমাদের সত্তা যে মূলত দুটি মৌলিক উপাদানে গঠিত,

এই ধারণাটি মোটেই অসম্ভব নয়—অন্তত এই সিদ্ধান্তের থেকে তো নয়ই যে, এই সত্তা এক উপাদানে গঠিত।'

শেরিংটন বোঝাতে চাইছেন, *পরা প্রকৃতি* যেমন আছে, তেমনি *অপরা প্রকৃতিও* আছে; অন্তত থাকাটা মোটেই অসম্ভব নয়। অন্যদিকে বিখ্যাত স্নায়ুবিজ্ঞানী ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড তাঁর দীর্ঘদিনের স্নায়বিক শল্যচিকিৎসার ফলাফলগুলি সংক্ষেপে তাঁর বইতে লিখেছেন। বইটির নাম 'The Mystery of Mind—A Critical Study of Consciousness and the Human Brain : Relation between the Two'। আমি বইটি থেকে মাত্র দুটি অনুচ্ছেদ পড়ছি। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত All India Neurological Conference-এ 'Neurology and What lies Beyond'-শীর্ষক উদ্বোধনী বক্তৃতায় আমি এই অনুচ্ছেদ দুটি উদ্ধৃত করেছিলাম। এই বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছেন মুম্বাইয়ের ভারতীয় বিদ্যাভবন।

পেনফিল্ড বলছেন ঃ 'আমার কথা বলতে গেলে, এত বছর ধরে মনকে শুধু মস্তিষ্কের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কেউ যদি ধরে নেন যে আমাদের সত্তা দুটি মূল উপাদানে গঠিত, তবে গোটা ব্যাপারটির যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া অনেক সরল ও সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এটি যদি সত্য হয়, তাহলে এও সত্য হতে পারে যে, জাগ্রতাবস্থায় আমাদের মনে যে প্রয়োজনীয় শক্তি আসছে, তা আসে মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ যান্ত্রিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে। আমাদের সচেতনতার জন্য এরাই শক্তি সরবরাহ করে। ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার যে প্রক্রিয়া, সে সম্পর্কে বলা যায়, এই আবিষ্কারের দ্বারা সেটি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না, কারণ আমি নিশ্চিত যে মস্তিষ্কের নিউরোন ক্রিয়ার ভিত্তিতে মনের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।'

জড়বাদী স্নায়ুতত্ত্ববিদরা দাবি করেন যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন নিউরোন ও তাদের কার্যকলাপ দিয়েই চৈতন্যের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু পেনফিল্ড এই সম্বন্ধে বলছেন ঃ

'না, এটি অসম্ভব। কারণ, সারা জীবন ধরে একটি মানুষের মন, যেভাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে উন্নত ও পরিণত হতে থাকে, তাতে আমার মনে হয় যে মন যেন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বা উপাদান এবং যেহেতু মস্তিষ্ক কার্যত একটি কম্পিউটার, সেই হেতু স্বাধীন বোধসম্পন্ন এক কর্তার দ্বারা তার কার্যক্রম

নির্ধারিত ও পরিচালিত না হয়ে পারে না। অতএব আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের সত্তাকে দুটি মূল উপাদানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তা করলে আমার মনে হয়, চূড়ান্ত সত্য লাভের জন্য বহু ... বৈজ্ঞানিক সাগ্রহে যে চেষ্টা করছেন, তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।'

পেনফিল্ড কী সুন্দরভাবেই না তাঁর মনোভাবটিকে ব্যক্ত করেছেন! তিনি বলছেন—*বহু বৈজ্ঞানিকই চরম সত্য কী তা জানার চেষ্টা করছেন।* বাস্তবিক, আপনি যদি মুক্ত মনের মানুষ হন এবং নতুন তথ্যের আলোকে পুরনো তত্ত্বকে পরিমার্জিত করে নেন, তবে সেটিই প্রকৃত বিজ্ঞান। মনে করুন, একটি তত্ত্ব রয়েছে আর তার বিপরীত একটি তথ্য রয়েছে; একটিমাত্র বিপরীত তথ্যই ওই তত্ত্বটিকে নস্যাৎ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। নিউটনের আমলের মেকানিকাল ফিজিক্সের (যান্ত্রিক ভৌতবিজ্ঞানের) এই অবস্থাই হয়েছে আধুনিক নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের (পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের) যুগে। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স মেকানিকাল ফিজিক্সের অনেক সিদ্ধান্তকেই উল্টে দিয়েছে। অনুরূপভাবে, স্নায়ুবিজ্ঞানেও বিশেষ কয়েকটি পুরনো তত্ত্ব আছে, যেগুলিকে আঁকড়ে থাকার জন্য বাস্তব সত্যগুলিকে আমরা বিকৃত করি; উদ্দেশ্য—পুরনো তত্ত্বগুলি যে অভ্রান্ত তা দেখানো। তত্ত্ববিরোধী সত্যকে বিকৃত করা—তাকে কিন্তু বিজ্ঞান বলে না। সত্যকে স্বীকৃতি দিতেই হবে; সত্যের আলোকে তত্ত্বকে অবশ্যই বদলাতে হবে। পেনফিল্ড-এর মতো এই সব আধুনিক বৈজ্ঞানিক এই কাজটিই করছেন এবং এই কাজ করে তাঁরা বহুপূর্বে গীতার এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যা বলে গেছেন, তারই পুনরাবৃত্তি করছেন।

ক্রমবিকাশের সময়, *পরা* ও *অপরা,* প্রকৃতির এই দুটি দিকই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু *পরা* প্রকৃতি অনেক দেরিতে প্রকাশিত হয়। জীবকোষের জন্মলগ্ন থেকেই পরা প্রকৃতির প্রকাশ শুরু হলো; তার আগে এটি *অপরা* প্রকৃতির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মিশে ছিল। সমস্ত বিবর্তনটাই হলো *অপরা প্রকৃতিতে নিহিত পরা প্রকৃতির মুক্তি।* এইভাবে, নিম্ন প্রকৃতির বন্ধন বা কবল থেকে উচ্চ বা শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি, অর্থাৎ চৈতন্যকে আমরা উদ্ধার করতে চাই যাতে, বেদান্তের ভাষায়, সে আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ করতে পারে। এই হলো চৈতন্য বা বুদ্ধির স্বস্বরূপে ফিরে যাবার সংগ্রাম, সমগ্র জগৎকে বিশুদ্ধ চৈতন্যের সমুদ্ররূপে আবিষ্কারের জন্য সংগ্রাম। 'এই ব্যক্ত বিশ্বের সবকিছুই সেই অবিনশ্বর ব্রহ্ম'—মুণ্ডকোপনিষদে বলা হচ্ছে—*ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতম্* ।

আমরা 'experience' নামক একটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি। সংস্কৃতে তাকেই বলা হয় *অনুভব*। জড়বাদী সৃষ্টিতত্ত্বের গোটা ইতিহাসে অনুভব কোথাও স্থান পায়নি। সূর্যের বা তারকামণ্ডলের কোন অনুভূতি নেই। কিন্তু ক্রমবিকাশ যখন জীবকোষের স্তরে উন্নীত হলো তখনই *অনুভবের* উন্মেষ হলো—খুলে গেলো বিবর্তনের এক নতুন দিগন্ত। যেখানেই *দৃক্* অর্থাৎ দ্রষ্টা ও *দৃশ্যম্* অর্থাৎ দৃষ্টবস্তু আছে, যেখানে দ্রষ্টা দৃশ্যকে জানতে পারে, সেখানেই অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এই অনুভূতির অস্তিত্ব যে বিশ্বের বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে একেবারেই ছিল না, সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু জীবকোষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই অনুভূতি ব্রহ্মাণ্ড-বিষয়ক জ্ঞান বা অনুমানের এক প্রগাঢ় ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় এবং বিবর্তনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভিত্তিটি উত্তরোত্তর স্বচ্ছ হতে থাকে। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে, দ্রষ্টার অনেকটাই দৃশ্যের মধ্যে ধরা থাকে। মনুষ্য স্তরে, যেখানে এই দুটি দিক ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, সেখানে আমরা দৃক্ থেকে দৃশ্যকে অথবা বিষয় থেকে বিষয়ীকে আলাদা করার চেষ্টা করছি। যদিও আমরা 'চিৎ', অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ, তবু শুরুতে আমরা *চিৎ-জড়-গ্রন্থি, চিৎ* ও *জড়*-এর এক বিচিত্র মিশ্রণ। এই চিৎ ও জড়ের বন্ধনেই মানুষের জীবন বাঁধা। তাই আমাদের এই দুটিকে পৃথক করে নিজেদের প্রকৃত স্বরূপকে আত্মারূপে, নিত্যশুদ্ধ চৈতন্যরূপে উপলব্ধি করতে বলা হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে তাই এই মহাবাক্য ঝংকৃত হয়েছে ঃ *তৎ ত্বম্ অসি, তৎ ত্বম্ অসি,* 'তুমিই সেই, তুমিই সেই'। তুমি জড়পদার্থ নও, তুমি হলে জড়পিণ্ডে আবদ্ধ সেই অনন্ত চৈতন্য। *তৎ ত্বম্ অসি,* 'তুমিই সেই'; কী অতলান্ত এই বাণী! মানুষের যথার্থ উন্নতি ও পরিপূর্ণতা বলতে এই উপলব্ধিকেই বোঝায়। শ্রোডিংগার (Schrodinger)-এর মতো পারমাণবিক বিজ্ঞানীও এই *তত্ত্বমসি* মহাবাক্যটি খুব পছন্দ করতেন।

বেদান্ত দৃষ্টিতে মানুষের ক্রমবিকাশ হলো, এই দেহতন্ত্রে বা জড়তন্ত্রে নিহিত সমস্ত মূল্যবোধের যে উৎস, সেই শুদ্ধ চৈতন্যের মুক্তি। আমরা এইভাবেই ক্রমবিকাশের প্রকৃতিকে মহাজাগতিক, জৈবিক ও মানবিক, এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে থাকি। প্রথমে মহাজগতের ক্রমবিকাশ হলো, তারপর জীবকোষ থেকে শুরু করে জীবের ক্রমবিকাশ, সবশেষে মনুষ্যজীবনে আরম্ভ হয় এক নতুন ধরনের ক্রমবিকাশ। এটিকে আমরা আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ বলে থাকি। এই বিবর্তনের একটিই লক্ষ্য—কীভাবে এই শুদ্ধ চৈতন্যকে জড়জগৎ ও জড়দেহের কবল থেকে মুক্ত করা যায়।

আমরা মুক্তি চাই, আমাদের মুক্ত হতেই হবে। বাস্তবিক, সকলেই মুক্ত হবার জন্য সংগ্রাম করছে। কিন্তু এই মুক্তির স্বরূপ কী? মুক্তি হলো জড়ের বন্ধন থেকে চৈতন্যের মুক্তি এবং এ কাজে সফল হলে আপনি এখানে, এ মুহূর্তেই, এই দেহেই মুক্ত হবেন। আপনার বিবর্তন সম্পূর্ণ হওয়ায় আপনি তখন জ্ঞানের দীপ্তিতে জ্বলজ্বল করবেন। যিনি অনন্ত আত্মাকে একবার উপলব্ধি করেছেন, তিনি জড়প্রকৃতির দাসত্ব থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে গেছেন। জড় পদার্থ তখন তাঁর দাস, তিনি জড়ের দাস নন। কিন্তু আজকের সভ্যতা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে জড়ের ভৃত্য করে তুলেছে, জড়ের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে রেখেছে। বল্গাহীন ভোগলিপ্সা ও পণ্যউপভোগের আগ্রাসী তৃষ্ণা মানুষকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে, তার অশুভ ফলে মানুষ ও প্রকৃতি উভয়েই বিপর্যস্ত। আশা করা যায়, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষকে যেমন এই সংকট থেকে বাঁচাবে, তেমনি গীতা ও উপনিষদের মহিমা জগৎ আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করবে। উপনিষদ, গীতা ও বিবেকানন্দ সাহিত্য—এই তিনটির মধ্য থেকেই জড়বস্তুর হাত থেকে কীভাবে মানুষকে বাঁচান যায়, তার পথনির্দেশ পাওয়া যাবে। মানুষ আজ জড়বস্তুর ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে এবং এটি তার লাগামছাড়া পণ্যগ্রাহীতায় প্রকাশ পাচ্ছে। সে নিজের দিব্যস্বরূপ ভুলে গেছে। তাই, কোন অন্ধ ধর্মবিশ্বাস নয়, মানুষকে আজ আত্মসত্য বা মহত্তম সত্যটিকেই জানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে।

১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন। সেখানে বক্তৃতায় তিনি *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, আমাদের ঋষিরা সমগ্র মনুষ্যজাতিকে 'অমৃতের সন্তান'—*অমৃতস্য পুত্রাঃ* বলে সম্বোধন করেছেন, তাঁরা অন্ধকারের সন্তান বলেননি, জড়ের সন্তান বলেননি, বলেছেন 'অমৃতের সন্তান'। আপনারা সকলেই অমৃতের সন্তান। স্বামীজীর এই ঘোষণা পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে নতুন এক সংকেত বয়ে আনলো। কারণ, তাঁরা এরকম কথা আগে কখনও শোনেননি। কিন্তু এই বাণীর আকর্ষণ অমোঘ। মস্কো স্টেট ইউনিভারসিটিতে এবং পশ্চিম বার্লিনে একটি সাধারণ সভায় ভাষণ দেবার সময়ে এধরনের মন্তব্য আমিও শুনেছি। এই বাণীর কদর এখন সারা বিশ্বে। মানুষের মর্যাদা, মহত্ত্ব, গৌরব, সমস্ত কিছুর উৎস যে তার অনন্ত ঈশ্বরীয় সত্তা, মানুষ তা জানে না। কিন্তু না জানলেই সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না। তাই এ সত্য যত শীঘ্র উপলব্ধি করা যায়, ততই মঙ্গল।

তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর 'নিকৃষ্টা প্রকৃতি'কে চতুর্থ শ্লোকে এবং 'প্রকৃষ্টা প্রকৃতিকে' পঞ্চম শ্লোকে বর্ণনা করেছেন; ষষ্ঠ শ্লোকে দুটিকে সমন্বিত করেছেন। সমগ্র প্রকৃতি এই দুয়ের মিলনে গঠিত এবং এর মাধ্যমেই ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণ এই বিশ্বের প্রকাশ, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণস্বরূপ। জগৎ শুদ্ধচৈতন্য থেকে এসেছে, শুদ্ধচৈতন্যরূপে বর্তমান, আবার শুদ্ধচৈতন্যেই ফিরে যাবে, উপনিষদ অনুসারে এই হলো বিশ্বের প্রকৃতি।

শঙ্করাচার্য পরম সত্যের একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তাই হলো পরম সত্য যা থেকে বিশ্বকে—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—কোন সময়েই বিচ্ছিন্ন করা যায় না।' তা যদি হয়, তবে সেটিই পরম সত্য। চৈতন্যই সেই পরম সত্য, কারণ কোন কিছুকে তার থেকে পৃথক করা যায় না; সমস্ত কিছুই সর্বদা তার মধ্যে অনুস্যূত, কখনও ব্যক্তরূপে, কখনও অব্যক্তরূপে। কিন্তু চৈতন্য আছেই; এবং তাঁকেই আমরা ব্রহ্ম বলি। ব্রহ্ম কোন স্থূলবস্তু নন, ব্রহ্ম হলেন শুদ্ধ চৈতন্য। উপনিষদের অপূর্ব সব শ্লোকের উপজীব্যই এই ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য তাঁর *বৃহদারণ্যক উপনিষদ-এর* ভাষ্যে বলেছেন, 'আত্মা শব্দটি ও ব্রহ্ম শব্দটির কোন বিশেষ অর্থ নেই; আপনি অন্য যেকোন শব্দও ব্যবহার করতে পারেন; কারণ পরম সত্যের তো কোন নাম হয় না। একটি শব্দ দিয়ে সত্যকে বোঝাতে হবে, তাই আমরা ব্রহ্ম বা আত্মা শব্দটি ব্যবহার করি।' প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্ম ও আত্মা এক। যে চৈতন্য আপনার দেহ-মন নামক যৌগিক বস্তুটির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে ও যে চৈতন্য বিশ্বের পিছনে রয়েছে, দুই-ই এক ও অভিন্ন। *আত্মৈব ইদং সর্বম্* ও *ব্রহ্মৈব ইদং সর্বম্,* 'কেবল আত্মাই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ হয়েছেন', ও 'কেবল ব্রহ্মাই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ হয়েছেন'। কথা একই। সমগ্র বিশ্ব নিত্যশুদ্ধ চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।

'এইভাবে, মানুষ মূলত সেই অবিনশ্বর আত্মা; তার বাদবাকি সমস্ত কিছুই নিকৃষ্ট বা *অপরা প্রকৃতি।'*

শঙ্করাচার্য চতুর্থ শ্লোকের ভাষ্যে বলেছেন ঃ '(শ্লোকে যে) ভূমির কথা বলা হয়েছে, তা স্থূল পৃথিবী নয়, তা পৃথিবীর সূক্ষ্ম উপাদান;... অনুরূপভাবে অপ, ইত্যাদি পদার্থ অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের সূক্ষ্ম উপাদানগুলিকেই বোঝায়। মন অর্থে, মনের কারণ বা অহংকারকে বোঝাচ্ছে। বুদ্ধির দ্বারা বোঝানো হচ্ছে অহংকারের কারণ বা (সাংখ্য দর্শনের) *মহৎ-তত্ত্বকে।*

মন, বুদ্ধি ও অহংকারের পিছনে যে শাশ্বত আত্মা নিত্য বিরাজমান. তাঁর

আলোকেই এরা সব আলোকিত ও কর্মক্ষম হয়। কিন্তু বেদান্ত বলে, এগুলি সবই অতি সূক্ষ্ম জড় পদার্থ যা আত্মার আলোক প্রতিফলিত করতে পারে। প্রগতিশীল আধুনিক স্নায়ুতত্ত্ববিদরা মন ও মস্তিষ্ককে যে আলাদা করে দেখতে শুরু করেছেন, তা মানুষের অন্তরের অন্তঃস্তলে ও সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে নিহিত যে অদ্বিতীয় চৈতন্য তত্ত্ব, তথা আত্মার কাছে পৌঁছবার পূর্বাভাস মাত্র। শঙ্করাচার্য তাঁর 'নির্বাণষট্‌কং'-এ গেয়েছেন ঃ

মনোবুদ্ধ্যহংকারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়ুঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥

—'আমি মন, বুদ্ধি, চিত্ত বা অহংকার নই—...আমি চিৎস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ শিব'।

কঠোপনিষদ বলছেন (২।২।১৫), কেবল মনুষ্যদেহই নয়, সমগ্র বিশ্বই আত্মার আলোকে আলোকিত ঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

—'সেখানে (আত্মায়) সূর্য কিরণ দেয় না, চন্দ্রতারকাও নয়, বিদ্যুৎও সেই স্থানকে আলোকিত করে না, এই (জাগতিক) অগ্নির তো কথাই নেই; আত্মার দীপ্তিতেই সমস্ত কিছু আলোকিত হয়; তাঁর জ্যোতিতেই এই সমস্ত (ব্যক্ত বিশ্ব) বিভাসিত।'

তাই, এই সপ্তম অধ্যায়ের গোড়ায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ 'আমি তোমাকে *জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের* কথা বলবো', *জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানম্,* 'জ্ঞানের সঙ্গে অপরোক্ষ অনুভূতির কথা'; *বক্ষ্যামি অশেষতঃ,* 'তোমাকে সম্পূর্ণরূপে বলবো'।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেলের উপমা দিয়ে বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন : সাধারণত, লোকে বেল থেকে শাঁসটি বার করে, তাই দিয়েই শরবৎ তৈরি করে খায়। শাঁসটাই বেলের সার। কিন্তু আস্ত বেলকে যদি জানতে চান, তার ওজনটা যদি জানতে চান, তাহলে তার শাঁস, বিচি, খোলা, সবটাই নিতে

হবে; সব নিয়েই বেলের ওজন, যদিও খাদ্য হিসাবে শুধু শাঁসটাই দরকার। সেই রকম, এই বিশ্বে সামগ্রিক সত্য বলে একটি বস্তু আছে। *পরা প্রকৃতি* ও *অপরা প্রকৃতি* দুটিকে ধরলে তবেই আপনি সেই সামগ্রিক সত্যের সন্ধান পাবেন। এই অধ্যায়ের শুরু থেকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলে চলেছেন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই অধ্যায়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তারপরে তিনি বলছেন *যৎ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যৎ জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্যতে,* 'যা জানলে আর অন্য কিছু জানার বাকি থাকে না।' কী দুঃসাহসিক এবং বলিষ্ঠ ঘোষণা! বস্তুত, *ব্রহ্মবিদ্যা* শব্দটিকে মুণ্ডকোপনিষদ *সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা,* বা 'সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সব জ্ঞানের সার এই *ব্রহ্মবিদ্যা,* কারণ ব্রহ্মই পূর্ণতার প্রতীক। এমনকি ব্যুৎপত্তিগত অর্থেও 'ব্রহ্ম' হলো সেই বস্তু, যা বিস্তৃত হয়ে সমস্ত কিছুকে পূর্ণ করে। সুতরাং, সমগ্রতাই ব্রহ্ম বা বৃহত্তম। আধুনিক পাশ্চাত্য সৃষ্টিতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্রতা (totality) হলো একটি ক্ষুদ্র ব্যাকগ্রাউন্ড মেটিরিয়াল বা আদি পদার্থ, যার মধ্যে সমস্ত বিশ্ব এককালে সুপ্ত ছিল। এক সময় সেই ক্ষুদ্র আদি পদার্থের বিস্ফোরণ ঘটে এবং তার পর থেকে ধীরে ধীরে বিশ্ব উন্মোচিত হতে থাকে। নভোবস্তু বিদ্যার (এ্যাস্ট্রো-ফিজিক্সের) ভাষায়, সৃষ্টির আদিতে একটি বস্তুই ছিল। অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন প্রভৃতির পৃথক অস্তিত্ব ছিল না, বস্তুত স্থূল পদার্থ বলে তখন কিছুই ছিল না; যা ছিল, তা হলো অবিমিশ্র শক্তি বা এনার্জি। তারপর ধীরে ধীরে বিভাজন শুরু হলো, একত্ব থেকে বহুত্ব, তার থেকে আরও অনেক প্রকার বৈচিত্র্যের উদ্ভব হলো। বেদান্তও বলে, বিবর্তন হলো একত্ব বা ঐক্য থেকে বহুত্বে রূপান্তর। এ অতি সরল ভাষা। এ ভাষা বুঝতে কষ্ট হয় না। ধরা যাক, বিজ্ঞান যাকে ব্যাকগ্রাউন্ড মেটিরিয়াল বা আদি পদার্থ আখ্যা দিচ্ছে, সে যদি কথা বলতে পারতো, তাহলে সে কী বলতো? বলতো—*একোঽহং বহুস্যাম্,* 'আমি এক আছি, বহু হতে চাই'। উপনিষদ তাই বলে। এক-এর বহু হওয়া, অভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে বিশেষিত হওয়াই হলো সৃষ্টি যা প্রকৃত পক্ষে প্রকাশিত হওয়া; একেই বিবর্তন বলে। বেদান্ত ও আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্ব এক্ষেত্রে একই কথা বলে, শুধু আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্বের মতে, আদি পদার্থটি হলো প্রাণহীন অচেতন জড়পিণ্ড। এই বিশ্বের পিছনে যে চৈতন্য রয়েছে, সে সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের এখনও কোন ধারণা নেই। আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞান যখন আরও উন্নত হবে এবং দেখবে যে মস্তিষ্ক থেকে মন আলাদা, তখন সেই ধারণাটি আসবে। এই তত্ত্ব ব্যাপকভাবে গৃহীত হলে সৃষ্টিতত্ত্বের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যাবে এবং

দেখা যাবে বেদান্তের সুরের সঙ্গে বিজ্ঞানের সুর মিলে গেছে। বেদান্তে বলা হয়েছে—*সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,* 'ব্রহ্ম বা আত্মা হলেন সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত'। সেই ব্রহ্ম থেকেই সমগ্র বিশ্বের আবির্ভাব হয়েছে। সেইজন্য আমরা বলি যে, আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি, ঈশ্বরের মধ্যেই রয়েছি এবং ঈশ্বরের কাছেই ফিরে যাব। এখানে ঈশ্বর শব্দটি বৈদান্তিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, একেশ্বরবাদের অতিজাগতিক ঈশ্বরের অর্থে নয়। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় সূত্রে ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছেঃ *জন্মাদ্যস্য যতঃ,* 'যাঁর থেকে সমগ্র জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়।' তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই চরম সত্য, যাঁর প্রতি আমরা অনুরক্ত। তিনিই ধর্মের মূল তত্ত্ব। বিশ্বরূপে প্রকাশিত সেই তত্ত্বটিই জড়বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নেই। ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যের পিছনে একত্বকে অনুভব করেছে বলেই এদেশে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। পাশ্চাত্যেও এই ভাব আসবে যখন তাঁরা বুঝবেন যে ঐ আদি বস্তুটি হলো চৈতন্যতত্ত্ব বা চিৎস্বরূপ, যা মূর্ত হয়ে ব্যক্ত বিশ্বের রূপ ধারণ করেছে। মানুষকে যে শুধু একটিমাত্র উপাদান, অর্থাৎ জড় উপাদানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, তার জন্য দ্বিতীয় উপাদান অর্থাৎ চৈতন্যেরও যে প্রয়োজন, এই নতুন সত্যটি যেদিন স্নায়ুবিজ্ঞানীদের কাছে উদ্ভাসিত হবে, সেদিন আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্বে এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আসার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। একবার দ্বিতীয় উপাদানটি স্বীকৃত হলে সম্পূর্ণ সৃষ্টিতত্ত্বকেই পাল্টাতে হবে, কারণ তখন এই উপাদানটিকে মূল আদি পদার্থেও (ব্যাকগ্রাউন্ড মেটিরিয়ালেও) বর্তমান থাকতে হবে। সর্বশেষে, আমরা যখন চরম সত্যে এই চৈতন্যতত্ত্বের অস্তিত্ব উপলব্ধি করব, তখন সমগ্র প্রকৃতি এবং ঈশ্বর সম্পর্কে ধ্যানধারণাই বদলে যাবে। মোটকথা এই, বিশ্বকে কে প্রকাশ করে? ঐ ব্যাকগ্রাউন্ড মেটিরিয়াল বা আদি পদার্থ। এমনকি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহগুলির নড়াচড়াও ঐ মহাজাগতিক আদি পদার্থে যে শক্তি নিহিত আছে, তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই যদি হয়, তবে সেই তো ঈশ্বর। বর্তমানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেরকম, তাতে অবশ্য আমরা এটিকে ঈশ্বর বলতে পারি না; কারণ, আমাদের চোখে এখন এটি হলো অচেতন জড় পদার্থ। কিন্তু যখন এই সত্যগুলি, যা পাশ্চাত্য স্নায়ুবিজ্ঞান আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে, সর্বসাধারণে গ্রহণ করবে, তখন সমস্ত পরিস্থিতিটাই বদলে যাবে। আশা করা যায়, আগামী শতাব্দীতে বিজ্ঞানচিন্তায় এক বিরাট বিপ্লব ঘটে যাবে।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যা বলেছিলেন, সেইটিই আমি আবার উদ্ধৃত করছি। আধুনিক বিজ্ঞানের বিরাট অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেছিলেন[১] ঃ

'আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ *সৃষ্টি* না বলিয়া *বিকাশ* শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। হিন্দু যুগ যুগ ধরিয়া যে-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে, সেই ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নতুনতর আলোকে আরও জোরালো ভাষায় প্রচারিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে।'

আমরা এই সত্যগুলি আধ্যাত্মিক অনুভূতির মাধ্যমে আবিষ্কার করেছিলাম, আর পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা এখন সেগুলি আবিষ্কার করছেন বাহ্য বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। কাছের জিনিস জেনে তাঁরা দূরের অজ্ঞাত বিষয়কে জানছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যের মধ্য দিয়ে ওঁরা এগিয়ে চলেছেন, কিন্তু গিয়ে পৌঁছচ্ছেন একই জায়গায়। বেদান্ত বনাম আধুনিক বিজ্ঞানের আজ যে সম্পর্ক এসে দাঁড়িয়েছে তাতে এটিই প্রতিভাত হচ্ছে। পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলাতে হয়তো আরো কিছু সময় লাগবে, কারণ বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের মনে এখনও অনেক গোঁড়ামি আছে, যেমন ধর্মের ক্ষেত্রেও আছে। জড়বাদ হলো এমন একটি গোঁড়ামি যা আধুনিক বিজ্ঞানকে পেয়ে বসেছে। এই অমার্জিত জড়বাদ দূর হলেই নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে যাবে। মানুষের উন্নতি ও পূর্ণতা লাভের জন্য তখন ধর্ম এক অসাধারণ বিজ্ঞানসম্মত উপায় বলে গণ্য হবে। অধ্যাত্মচিন্তার জগতে বেদান্ত বহুযুগ আগেই এই বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শ্রীকৃষ্ণ তাই এখানে একটি সরল সত্যকে তুলে ধরেছেন যার নিষ্কর্ষ হলো এই যে ঃ বৈদান্তিক চিন্তায় অতিপ্রাকৃত বলে কিছু নেই; সমস্ত কিছুই প্রাকৃতিক, কিন্তু দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে—*অপরা* ও *পরা।* জড়বিজ্ঞানের বিশ্বাসও তাই। সে অলৌকিক কোন কিছু বরদাস্ত করে না; স্বাভাবিক যা, কেবল সেটুকুই তার কাছে গ্রাহ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা সমর্থন করি। বেদান্তেও অলৌকিক কিছু নেই, সবই স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক। তবে প্রকৃতি বলতে বেদান্ত পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতিই বুঝিয়ে থাকে, যার মধ্যে *পরা প্রকৃতি* আছে, আবার *অপরা প্রকৃতিও* আছে; 'পরা বিদ্যা'ও আছে, 'অপরা বিদ্যা'ও আছে, উচ্চতর বিজ্ঞানও আছে এবং সাধারণ বিজ্ঞানও আছে। প্রকৃতির দুটি দিককে গ্রহণ করলে, তখন আর বিশ্বের ঘটনা পরম্পরাগুলির ব্যাখ্যায় কোন সমস্যা থাকে না।

---

১ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮

এই হলো ভগবদ্‌গীতার সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমদুটি শ্লোকের গুরুত্ব। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়েও এসব প্রসঙ্গ আসবে। আর উপনিষদের তো কথাই নেই; সেখানে এই ধরনের প্রচুর শ্লোক আছে। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য শুরু করেছেন এই বলে যে, আমরা *চিৎ* ও *অচিৎ*-এর, *বিষয়ী* ও *বিষয়ের* মিশ্রণ এবং সমস্ত *লোকব্যবহার* বা 'জাগতিক কর্ম' এই মিশ্রণকে ভিত্তি করেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আমাদের মধ্যে স্থূল, অচেতন পদার্থ এবং চৈতন্য এখন মিশ্রিত হয়ে রয়েছে; এই দুটিকে আলাদা করতে হবে; দুটির পার্থক্য আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, বালি আর চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে রাখলে, পিঁপড়ে এসে বালিকে আলাদা করে শুধু চিনিটুকুই নেবে। পিঁপড়ের বিবেক বা বিচারশক্তি আছে যা আমাদের নেই। কিন্তু আজ আমাদের ঐ বিবেকের একান্ত প্রয়োজন। তাই প্রথম বাক্যেই শঙ্করাচার্য মানব মনের স্বাভাবিক অবস্থার উল্লেখ করে বলেছেন যে, আমরা চৈতন্য ও জড়বস্তুকে মিশিয়ে ফেলি। আমাদের কর্তব্য দুটিকে আলাদা করে নিজেদের শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বলে উপলব্ধি করা। আমরা *নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব পরমাত্মা,* সেই হলো আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, এ কথাই শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন। সুতরাং, ভাষ্যের প্রথমেই *জিজ্ঞাসা* বা অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। যেহেতু চিৎ ও জড় মিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে, সেইহেতু অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। *ব্রহ্মসূত্র*-এর ভাষায় এটি হলো *ব্রহ্মজিজ্ঞাসা,* 'ব্রহ্মের স্বরূপ কী, তার অনুসন্ধান'। জিজ্ঞাসা কেন? কারণ, সমস্ত কিছু একসঙ্গে মিশে রয়েছে। আপনাকে তাই প্রশ্ন করতে হবে, অনুসন্ধান করতে হবে, খুঁজতে হবে। জগতে সমস্ত কিছু এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে রয়েছে যে আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই জিজ্ঞাসার প্রয়োজন। এছাড়া আর বিজ্ঞান কী? বিজ্ঞান মানেই তো অনুসন্ধান। বিজ্ঞান অনুসন্ধান করে, বিচার করে, তারপর বলে, 'এই হলো সত্য'।

সুতরাং সপ্তম অধ্যায়ের গোড়ার এই শ্লোকগুলির অর্থ হলো পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি নিয়েই এই জগতের পূর্ণাঙ্গ সত্য যার সাহায্যে আমরা সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন।

সমুদ্রের একটি ঢেউ দেখে আপনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, 'এই যে ঢেউটি আসছে ও যাচ্ছে দেখছি, এটি আসলে কী?' 'ঢেউ' শব্দটি উচ্চারণ করার আগেই দেখবেন, সেটি মিলিয়ে গেছে। ঢেউ একটি নাম; তার একটি

বিশেষ রূপও আছে; কিন্তু ঢেউ বস্তুটি আসলে কী? প্রকৃতপক্ষে, ওটি হলো সমুদ্র। সমুদ্র ও ঢেউ অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। ঢেউটির উদ্ভব সমুদ্র থেকেই, এক মুহূর্ত ঢেউ-রূপে থেকে আবার সে সমুদ্রে মিশে গেল। সমুদ্রই মূল সত্য। ঢেউটি সমুদ্রের ক্ষণিক প্রকাশমাত্র। সেইরকম, ব্রহ্মই এই বিশ্বের সার সত্য। তিনিই নিজেকে চেতন ও অচেতন বস্তুরূপে জগতে অভিব্যক্ত করছেন এবং এই বস্তুগুলি বাস্তবিকই সেই অনন্ত পুরুষ, যাঁর থেকে জগৎ উত্থিত হচ্ছে, কিছুকাল থাকছে, আবার তাঁতেই লয় হয়ে যাচ্ছে।

অত্যন্ত গভীর ও জ্ঞানপূর্ণ *তৈত্তিরীয় উপনিষদ* ব্রহ্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন (৩।১।১) ঃ *যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,* 'যাঁর থেকে এইসব বিভিন্ন জীব ও বস্তু জন্মায়'; *যেন জাতানি জীবন্তি,* 'যাঁর সহায়ে জন্মাবার পর তারা জীবিত থাকে'; *যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি,* 'বিনাশকালে তারা যে-সত্তায় ফিরে যায়'; সেই সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর, তিনিই ব্রহ্ম। এই হলো উক্তিটি। কারণের সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা দিয়েছেন আচার্য শঙ্কর। তিনি বলেছেন 'তাই হলো কারণ, যার থেকে কার্য কোন সময়ে বিচ্ছিন্ন হয় না', বর্তমান, ভবিষ্যৎ অথবা অতীত, কোনকালেই নয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে একক সত্তারূপে ধরা হয় এবং ব্রহ্মই তার কারণ। সেইজন্যই সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আমরা ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশের সময় দেখতে পাই, ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতিকালেও তিনি বিরাজমান এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কালেও একমাত্র তিনিই থাকেন। সেই অনন্ত, অপরিবর্তনশীল সত্যই স্থূলরূপে প্রকাশিত হয়, আবার তার আদি স্বরূপে ফিরে যায়। বেদান্ত এইভাবেই চরম অথবা আত্যন্তিক সত্যের স্বরূপ বর্ণনা করে এবং বলে যে, শুদ্ধচৈতন্যই এই সত্যের প্রকৃতি, তা ঘনীভূত জড়পদার্থ নয়, যেমন আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয়ে থাকে।

অতএব, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বেদান্ত চরম সত্যের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়। যুক্তিমূলক অনুসন্ধান চালিয়ে যে-বিষয়ের চর্চা করা যায়, যা আমাদের যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে, একমাত্র সেই বিষয়কেই বিজ্ঞানসম্মত বলা চলে। আপনি যখন কোন মত প্রকাশ করেন, হয় আপনি সে সম্পর্কে আদৌ কোন প্রশ্নই তোলেন না, নয়তো প্রশ্ন তুললেই সেই মত ধূলিসাৎ হয়ে যায়। দুটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের ছিটেফোঁটাও নেই। ওটিকে বলা হয় dogma, অথবা অযৌক্তিক অন্ধ মতবাদ। কোন অন্ধ মতবাদই প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে পারে না। শুধু ব্যক্তিগতভাবে আপনি যদি কোন কিছু বিশ্বাস করেন, তা

ভালো; বিনা প্রশ্নে তা আপনি নিজের মধ্যেই গচ্ছিত রাখুন—মনুষ্যজীবনে তারও একটা স্থান আছে।

কিন্তু সত্য এমন জাজ্জ্বল্যমান বস্তু যে, আপনি যতই প্রশ্ন করবেন, সে ততই দীপ্তিমান হয়ে উঠবে; সোনা আগুনে দিলে যেমন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়, ঠিক তেমনি। এই কারণেই বৈজ্ঞানিক সত্য এবং বৈদান্তিক সত্য এতো কাছাকাছি। দুটিই বিজ্ঞান। শুধু তফাৎ এই, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যায় গণিতকে অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অধ্যাত্ম বা পরা বিজ্ঞানে অঙ্ক এবং পরিমাণের কোন স্থান নেই, কারণ এখানে আমাদের বিচার্য মানুষের সহজাত উৎকর্ষ বা পরা প্রকৃতি। মানুষ যত বিবর্তিত হবে, যত উচ্চে উঠবে, গণিতের স্থান তার জীবনে ততই গৌণ হয়ে যাবে। যে কোন সমাজে, যে কোন গবেষণায়, একমাত্র স্থূল, ভৌতস্তরেই পরিমাণগত পরিমাপ করা চলে; উচ্চতর স্তরে পরিমাণগত মানদণ্ডের স্থান গ্রহণ করে উৎকর্ষ। মনুষ্যস্তরে উৎকর্ষের মূল্যই সবচেয়ে বেশি। পরিমাণেরও মূল্য অবশ্যই আছে, কিন্তু উৎকর্ষের স্থান সবার উপরে।

বিংশ শতাব্দীর জীববিজ্ঞানও সেই কথাই বলছে। আজ তো জীববিজ্ঞানের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু সেই ১৯৫৯ সালে, যখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ডারউইন শতবার্ষিকী পালন করে, তখন সাতদিনব্যাপী এক আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়েছিল। আলোচনার বিষয় ছিল 'Events and Issues in Evolution—100 Years of Evolution'। বিবর্তনের শতবর্ষের ওপর সেই আলোচনাচক্রে স্যার জুলিয়ান হাক্সলের মতো বক্তারা বলেন যে, মনুষ্যস্তরের আগে পর্যন্ত বিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিমাণই ছিল মানদণ্ড, কিন্তু মনুষ্যস্তর থেকে উৎকর্ষই পরিমাণের স্থান দখল করেছে। পরিমাণের ওপর গুণের স্থান, স্থূল পদার্থের ওপর মনের স্থান—জুলিয়ান হাক্সলে ঠিক এই শব্দগুলিই ব্যবহার করেছিলেন। এখন এই মূল্যবোধ বিজ্ঞান এবং আমাদের বোধে প্রবিষ্ট হওয়া দরকার। তা যেদিন হবে, সেদিন গীতা ও উপনিষদের বাণীগুলি বিজ্ঞানের আলোকে অত্যুজ্জ্বল হয়ে আমাদের কাছে ধরা দেবে। বেদান্ত পাশ্চাত্যের ধর্মের মতো জড়বিজ্ঞানকে শত্রু মনে করে না, মনে করে বন্ধু। কেবল বিজ্ঞান কেন, সত্যের যে-কোন অনুসন্ধানকেই সতীর্থের মনোভাব নিয়ে বেদান্ত স্বাগত জানায়। বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই নতুন মূল্যবোধ যে স্নায়ুবিজ্ঞানের অগ্রগতির দ্বারা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে তা দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আর কয়েক দশক

অপেক্ষা করুন, দেখবেন পরিস্থিতির আরও উন্নতি হবে; জড়বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার ক্রমে আরও অনেক সত্যের ব্যাখ্যা দেবে, যা বৈদান্তিক অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সনাতন সিদ্ধান্তগুলিকেই সমর্থন করবে।

১৯৮১ সালে শিকাগোর বেদান্ত সোসাইটি তার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এক সাধারণ সভার আয়োজন করে; শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও নভোবস্তুবিদ, ডঃ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে আমিও সেখানে একজন বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। ডঃ চন্দ্রশেখর 'বিজ্ঞানে সত্যের অনুসন্ধান' বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। আমি বললাম 'বেদান্তে সত্যের অনুসন্ধান'-এর ওপর। সভায় বিশাল ভিড় হয়েছিল। আমাদের বক্তব্য বিষয়টিও ছিল অতি সুন্দর—সত্যান্বেষণ, একটি অনুসন্ধান বিজ্ঞানের স্তরে, অন্যটি বেদান্তের স্তরে। ডঃ চন্দ্রশেখর খোলাখুলি বললেন, 'বেদান্ত সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। আমি শুধু আমার পদার্থবিজ্ঞান ও নভোবস্তুবিদ্যাই জানি, অন্য কিছু জানি না।' তিনি খুবই দিলখোলা মানুষ ছিলেন। তাই তাঁর এই অকপট স্বীকারোক্তি। কিন্তু তবুও বিষয়টি তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। তিনি সবিনয়ে তাঁর দৈন্য স্বীকার করে বললেন— 'এটিকে (সত্যকে) আমি আমার বৈজ্ঞানিক ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না, কারণ তা আমার বিজ্ঞানের ধারণার বাইরে'। আমার বক্তৃতাটি কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশ করেছে।

সে যাই হোক, কালে সারা পৃথিবী যে এই যুক্তিসম্পন্ন বেদান্ত দর্শনভিত্তিক মহান *সনাতন ধর্মের* মহত্ত্বকে উপলব্ধি করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বামী বিবেকানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, বেদান্তই ভবিষ্যতে চিন্তাশীল মানুষের ধর্ম হবে। গ্রীক সভ্যতার যুগ থেকে জ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে এগিয়ে থেকেও পাশ্চাত্য কীভাবে যে হাজার হাজার বছর এই সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের থেকে পিছিয়ে থাকল, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ম্যাক্সমূলার তাঁর Three Lectures on the Vedanta Philosophy তে (London, 1894, p.7) বলেছেন ঃ

'প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকরা যে গ্রীক অথবা মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক দার্শনিকদের থেকে আত্মা সম্বন্ধে বেশি জানতেন, একথা শুনে যদি আপনারা আশ্চর্য হন, তাহলে আমরা যেন মনে রাখি, নক্ষত্র-পর্যবেক্ষণকারী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের যত উন্নতি হয়ে থাকুক না কেন, আত্মা-পর্যবেক্ষণকারী মানমন্দিরগুলির দশা প্রায় আগের মতোই রয়ে গেছে।'

গীতা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞ'-শব্দদুটি ব্যবহার করে এই বিষয়টির ওপর আরও আলোকপাত করবেন। *'ক্ষেত্র'* অর্থাৎ এই (শরীররূপী) দৃশ্য এবং *'ক্ষেত্রজ্ঞ'* অর্থাৎ 'যিনি এই (শরীররূপী) ক্ষেত্রকে জানেন।' শুধুমাত্র শরীরই যথেষ্ট নয়, শরীরকে যিনি জানেন তাঁকেও প্রয়োজন। *ক্ষেত্র* শব্দটি আজকের কোয়ান্টাম ফিজিক্সে (quantum physics)[১] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত সমস্ত জগৎটাই শক্তির একটি ক্ষেত্র। সেই শক্তি-ক্ষেত্রটি এক আত্মসচেতন *দ্রষ্টা* পুরুষ পর্যবেক্ষণ করেন। এইখানেই দ্বিতীয় উপাদানটি এসে যাচ্ছে, যা আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশই স্বীকার করে নিচ্ছে। আশা করা যায়, আর কয়েক দশকের মধ্যে এই সিদ্ধান্তটি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে যে, দৃশ্যমান বিশ্বের সঙ্গে একজন দ্রষ্টাও আছেন এবং এই দ্রষ্টা হলেন এক অদ্বিতীয় স্বতন্ত্র সত্তা। দেহের মধ্যে এঁকে অত্যন্ত সান্ত ও সীমিত দেখালেও স্বরূপত তিনি অনন্ত। সেইজন্য উপনিষদে—'আত্মাই ব্রহ্ম'—এই সমীকরণটি করা হয়েছে। আপনার ভিতরে যে আত্মা রয়েছেন, তিনি বিশ্বেরও আত্মা; দুটি আত্মাই এক ও অভিন্ন। আমাদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে চেতনা বা মনরূপ উপাদানটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করলে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে আজকের বিজ্ঞানও ঐ এক সিদ্ধান্তে আসবে।

চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোকে এইসব আলোচনার পর এবার আমরা সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে যাব। শ্রীকৃষ্ণ এখানে এমন একটি মহামূল্যবান কথা বলেছেন, যা আমাদের ভারতীয় চিন্তাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। চরম সত্যের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা দেখিয়ে তিনি বলছেন, 'অতএব, আমি সর্বভূতে বিরাজ করি'। আমরা সীমিত, একে অন্যের থেকে আলাদা। কিন্তু *ভগবান* শ্রীকৃষ্ণ তা নন। তাই তিনি বলতে পারেন যে তিনি সব কিছুর মধ্যেই আছেন। এই কারণেই তিনি বলেছেন ঃ

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

—'হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমার থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য আর কিছু নেই। সূত্রে যেমন সারিবদ্ধভাবে মুক্তা গ্রথিত থাকে, তেমনি জগতের সমস্ত কিছুই আমার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে।'

এই শ্লোকটি অতি গভীর অর্থপূর্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আমার থেকে

১ পদার্থবিজ্ঞানের এই বিভাগ অনুযায়ী আণবিক ও পারমাণবিক শক্তির স্ফুরণ ও বিলয় অবিশ্রান্তভাবে না হয়ে নিয়মিত পর্যায়ক্রমে হয়।

শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই; আমিই সেই পরম সত্য, অনন্ত শুদ্ধচৈতন্য, যাকে তোমরা ব্রহ্ম বল। অন্য কোন কিছু *পরতরম্* অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ' বা 'উচ্চতর' নেই; *ন অন্যৎ কিঞ্চিৎ অস্তি*, 'সেই সত্য ছাড়া আর অন্য বস্তু নেই'। এই কারণে, এই অধ্যায়ের প্রথমে তিনি বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে সামগ্রিক সত্য সম্বন্ধে বলব, যার বাইরে অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই'। এই পূর্ণ সত্য দুটি উপাদানে গঠিত—বিষয় ও বিষয়ী অথবা *ক্ষেত্র* ও *ক্ষেত্রজ্ঞ*—'জ্ঞেয় ও তার জ্ঞাতা', অথবা পদার্থবিদ্যায় যেমন বলা হয়, quantum phenomena (কোয়ান্টাম প্রপঞ্চ) ও তার observer (দ্রষ্টা)। সুতরাং, এই একত্বই হলো চূড়ান্ত সত্য, তার বাইরে আর কিছুই নেই; *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিৎ অস্তি ধনঞ্জয়*, 'হে অর্জুন, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ বা আমার অতীত অন্য কোন বস্তু নেই'। পরের পংক্তিটি অসাধারণ ঃ *ময়ি সর্বম্ ইদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব*, 'সুতোয় গাঁথা মুক্তার মতো সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমাতে গাঁথা'। সবকটি মুক্তা একটি সুতোয় অনুবিদ্ধ হয়ে একটি মালায় পরিণত হয়। সুতোটিকে দেখা যায় না, শুধু মুক্তাগুলিই দৃষ্টিগোচর হয়। ওই অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় 'সূত্রটিই *অন্তর্যামী* আমি, যিনি সবার হৃদয়ে অবস্থান করেন'।

সুতরাং, *ময়ি সর্বমিদং প্রোতং; ইদং* অর্থাৎ 'এই', এই দৃশ্যমান বিশ্ব; *সর্বম্* অর্থাৎ 'সবকিছু'। এই আমাদের বেদান্তের মহৎ শিক্ষা; এবং এর অভাবেই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির আশমানজমিন ফারাক হয়ে যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি এই শিক্ষা থেকেই এসেছে। সাধারণত আমরা মানুষকে বাইরে থেকে দেখি; তার দৈহিক উচ্চতা অথবা গায়ের রং দিয়েই তার বিচার করি। এসব ছাড়াও মানুষের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বা উপাধি থাকে, যা দিয়ে তার মূল্যায়ন করা হয়। এই যে সব বৈশিষ্ট্য, তা চোখে দেখা যায়; কিন্তু এমন একটি অপরিবর্তনীয় সত্তা আছে যা চোখে দেখা যায় না। সেটি কী? তা হলো দিব্য অন্তরাত্মা, যা সুতোর মতো সকলকে ভিতর থেকে ধরে রেখেছে। সেখানে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সকলে এক। অতএব কাউকে বিচার করতে গেলে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিচার করবেন।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গোড়ার দিকেই ভারতীয়রা এই সত্য উপলব্ধি করেছিল এবং ঐক্যের সেই উপলব্ধিই প্রাচীন যুগটিকে এক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করে তুলেছিল যার মূল আমাদের সংস্কৃতির ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্বজনীনতায় প্রোথিত ছিল। যুগ যুগ ধরে ভারত এমন সব অসাধারণ ঋষি ও মনীষীর জন্ম

দিয়ে এসেছে, যাঁরা বিশ্বজনীনতা ও অভিন্নতার ভাবটি কাজে লাগিয়েছেন। লৌকিক বাহ্য দৃষ্টিতে আমরা আলাদা আলাদা হলেও অন্তরের গভীরে আমরা সকলেই এক। ইতিহাসের অতি প্রারম্ভেই এই *অদ্বৈত দৃষ্টি* আমরা লাভ করেছিলাম। এই দৃষ্টিই ভারতবর্ষকে সর্বজনীন, সংবেদনশীল, সহিষ্ণু ও উপলব্ধির দেশ করে তুলেছিল। যে মহান ঋষিরা এই বিশাল উপমহাদেশের জনসাধারণকে এই প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টিতে ঋদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। আজ সমস্ত বিশ্বের মানুষ ঠিক এই মানবীয় ঐক্য ও সমন্বয়পূর্ণ দৃষ্টিরই অন্বেষণ করছে।

ময়ি, 'আমাতে'; *সর্বম্ ইদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। মণি* অর্থাৎ 'রত্ন' বা মুক্তো; *মণিগণা ইব*, 'রত্নরাজির মতো', 'সমস্ত সারিবদ্ধভাবে গাঁথা আছে, যেমন সুতোর ওপর মালা গাঁথা থাকে।' সংস্কৃতে *সূত্র* মানে 'সুতো'। সকলের অন্তরে বর্তমান সেই এক বস্তু বা ঐশ্বরিক সত্তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়, যেমন *সূত্রাত্মা, অন্তরাত্মা, অন্তর্যামী* ইত্যাদি। বাহ্যত আমরা সকলে আলাদা হলেও ওই সূত্রটি আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে। রাজনীতির ভাষায় আমরা বলি যে আমরা সকলে একে অপরের থেকে পৃথক, কিন্তু ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে আমরা সকলেই এক, একই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিবাসী। নাগরিকত্বের দিক দিয়ে বিচার না করে যদি আমরা শারীরিক দিক থেকে দেখি, তাহলে আমরা সকলেই পৃথক ব্যক্তি। এই একত্বের সত্যই উপনিষদের মহান আবিষ্কার। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ-এ অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ-এর* অন্তর্ভুক্ত একটি অসাধারণ অনুচ্ছেদ আছে যার উপজীব্য *অন্তর্যামিরূপ* পরমেশ্বর, যিনি সকলের ভিতরে থেকে সমস্তকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। একটি জীবকোষের কথাই ধরা যাক। কোষটিকে কে নিয়ন্ত্রণ করে? এর উত্তরে বলা যায়, কোষটির ভিতরেই এমন কোন বস্তু আছে, যে এই কাজটি করছে। আপনি চেষ্টা করছেন সেই বস্তুটি কী, তা খুঁজে বার করতে। জেনেটিকসে আমরা বলি এটি হলো DNA, RNA। কিন্তু এগুলিও বাইরের স্থূল বস্তু বা দৃষ্টিগোচর বাহ্য প্রপঞ্চ। কিন্তু গভীরে, সম্ভব হলে আরও গভীরে যান, আপনি সত্যিই দেখবেন যে আভ্যন্তরীণ শক্তিরূপ-ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই, যা জীবন্ত কোষের, এই শরীরের, এই ব্রহ্মাণ্ডের ও সর্বত্র সর্বভূতের নিয়ামক। তিনিই একমাত্র চরম সত্য। এই ভাবটিকেই শ্রীকৃষ্ণ এখানে একটি ছোট্ট শ্লোকে প্রকাশ করেছেন।

অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ-এ (৩।৭।৩) এই ভাবটি একটি সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদে ব্যক্ত হয়েছে; তার প্রথম পংক্তিটি হলো ঃ

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ—

যাজ্ঞবল্ক্য এখানে এক খুবই মহত্ত্ব ব্যঞ্জক উক্তি করলেন ঃ 'যিনি পৃথিবীতে আছেন, কিন্তু পৃথিবীর ভিতরে আছেন, অথচ পৃথিবী যাঁকে জানে না; পৃথিবী যাঁর শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থেকে পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই শাশ্বত আত্মা।'

একমাত্র অন্তর্নিহিত এই বস্তুটির সত্তাই অবিনাশী; বাদবাকি পৃথিবীর সব কিছুই নশ্বর। বায়ু ও অন্যান্য বস্তুর দৃষ্টান্তও অনুরূপভাবে দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষে এসেছে শেষ পংক্তিটি (ঐ অনুচ্ছেদ, ৩।৭।১৫) ঃ *যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্*, 'যিনি সমস্ত জীবের মধ্যে আছেন', 'যিনি সমস্ত জীবের মধ্যে থাকলেও জীব যাঁকে জানে না, যিনি অভ্যন্তরে থেকে সমস্ত জীবকে নিয়ন্ত্রণ করেন'; *এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ*, 'এই হলো তোমার আত্মা, যিনি *অন্তর্যামী* ও অবিনাশী'।

এইটিই হলো *বৃহদারণ্যক উপনিষদ-এর* বিখ্যাত *অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ।* আচার্য শঙ্কর এই অনুচ্ছেদগুলির অতি সুন্দর ভাষ্য দিয়েছেন। এখানে সরল অথচ সুললিত সংস্কৃত গদ্যে কী গভীর তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে! অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ-এর এই অংশটি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা, পরবর্তী বেদান্তাচার্য রামানুজেরও অত্যন্ত প্রিয় ছিল

*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-*এ (৪।৩) একটি সুন্দর কথা আছে। নিজের ভিতরে সত্য আবিষ্কার করার পর ঋষি যখন চারিদিকে তাকালেন এবং সেই অসীম সত্যকে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে দেখতে পেলেন, তখন তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥

ত্বং স্ত্রী, 'তুমিই নারী'; *ত্বং পুমান্ অসি*, 'তুমিই পুরুষ'; *ত্বং কুমার*, 'তুমিই কুমার'; *উত বা কুমারী*, 'এবং কুমারীও'; *ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি*, 'তুমিই দণ্ড হাতে চলেছ জীর্ণদেহ বৃদ্ধ'; *ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ*, 'এই বিশ্বে তুমি নানারূপে প্রকাশিত রয়েছ'। অর্থাৎ, এক কথায়, সকলের মধ্যে আমরা তোমাকেই দেখি। এইটিই আধ্যাত্মিক কবিতায় ব্যক্ত সর্বোচ্চ দর্শন।

মুণ্ডকোপনিষদ-এর একটি অনুচ্ছেদেও (২।২।৭) এই ভাবটি পাওয়া যায়।

সেখানে দেখি ঋষি নিজের অন্তরে আত্মাকে আবিষ্কার করার পর যখন বাইরে তাকালেন, তখন সর্বভূতে, সর্বত্র সেই একই আত্মাকে দর্শন করলেন। এই দর্শনের পর তিনি আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে বলছেন—*আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যৎ বিভাতি,* 'তিনি পরমানন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ, তিনি জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই প্রকাশিত হন'। সংস্কৃতে ঈশ্বরের আর এক নাম হলো *কবি।* ঈশ্বরকে *কবি* বলা হয়। গীতায়ও (৮।৯) বলা হয়েছেঃ *কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্,* 'ঈশ্বর হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, তাঁর দৃষ্টি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত'। শঙ্করাচার্য কবির সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, কবি হলেন *ক্রান্তদর্শী,* 'ভূত, ভবিষ্যৎ সব তিনি দেখতে পান।' এই ধরনের মানুষকেই আমরা কবি বলি এবং এই কারণেই কবি ও তাঁর কবিতাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। যিনি যত উঁচুদরের কবি, তাঁর উপলব্ধির গভীরতা ও সেই উপলব্ধিকে ব্যক্ত করার ক্ষমতাও তাঁর তত বেশি। ইংরেজিতে একটি কবিতা আছে যা আমার ভালো লাগে। সেখানে শেক্সপীয়ার-এর মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তবিক, শেক্সপীয়ারকে মানুষ এত শ্রদ্ধা করে কেন? বিশ্বজুড়ে তাঁর রচনার অনুরাগীরা ছড়িয়ে আছেন। আজ ৫০০ বছর পরেও তাঁর সাহিত্য আমরা পড়ে চলেছি; তাঁর নাটক আমরা অভিনয় করছি, তাঁর কথা উদ্ধৃত করছি। তাঁর সাহিত্যে ভাবের কত না মণিমুক্তা ছড়ানো। শেক্সপীয়ার-এর বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে কেউ এক ছোট্ট কবিতায় লিখেছেন :

The poem hangs on the berry bush,
when comes the poet's eyes;
The street begins to masquerade
when Shakespeare passes by.

কবি সম্বন্ধে শেক্সপীয়ার-এর নিজের কবিতাও আছে (A Midsummer Night's Dream, vol.2) :

The poet's eye, in a fine frenzy rolling,
doth glance from heaven to earth,
from earth to heaven,
and as imagination bodies forth
The forms of things unknown,
the poet's pen turns them to shapes
and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

অতএব, ঐ কবি-দৃষ্টি আমাদেরও খানিকটা আয়ত্ত করা দরকার। ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ কবি এবং এইসব কবিরা ঈশ্বরের সেই কবি-দৃষ্টির ছিটেফোঁটা পেয়ে থাকেন মাত্র। কবি যত মহৎ হবেন, ততই তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে যাবে। কবি সম্পর্কে ভারতবর্ষের মানুষের এইরকমই ধারণা। তাই উপনিষদগুলিও ঈশ্বরকে কবি বলে সম্বোধন করেছেন।

বৈদিক ঋষিরা যে অসীম সত্যকে একদা উপলব্ধি করেছিলেন, তার সত্যতা ও যাথার্থ্য আগামী দশকগুলিতে আরও বেশি করে স্বীকৃত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান চিন্তাধারার প্রবণতাও ওই দিকে। সত্য কখনও পুরনো হয় না। সত্য চির নতুন, তিনকালেই তা সত্য। গোঁড়া মতবাদ ও ধর্মবিশ্বাস কিছুকাল পরে অযৌক্তিক বা অপ্রাসঙ্গিক বলে বর্জিত হতে পারে, কারণ কালের বিচারে তখন তার কোন মূল্য থাকে না। কিন্তু পরম যে সত্য, তা শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় এবং বিশ্বজনীন। মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে বেদে যেসব গূঢ় সত্যের কথা বলা হয়েছে, তা এই ধরনের ত্রিকাল-অবাধিত, অপরিবর্তনীয় সত্য। বেদ বলতে বোঝায় জ্ঞানের সমষ্টি যা মানুষ ও জগৎ সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে ঋষিরা অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ঋষিদের উপলব্ধ সেই সত্য আজ চার-পাঁচ হাজার বছর পরেও অটুট রয়েছে। তাদের মূল্য কিছুমাত্র কমেনি, কারণ সেই সত্য নিত্য সত্য। আমরা তাই এই সত্যকে বলি *সনাতন ধর্ম,* চিরকালের ধর্ম। অলডাস হাক্সলে (Aldous Huxley) এই সত্যধর্মকে Perennial Philosophy নামে অভিহিত করেছেন। ঐ নামে তাঁর একটি গ্রন্থও আছে।

এইবার শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করবেন, কীভাবে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন। এই অধ্যায়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি তত্ত্বটি বুঝিয়েছেন। আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে ১০ম অধ্যায় অর্থাৎ *বিভূতিযোগে। বিভূতি* মানে ভগবানের শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ বলবেন, ব্যক্ত জগতের সর্বত্রই তিনি বিদ্যমান।

এই অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক থেকে তিনি সেসব বিভূতির কিছু কিছু উদাহরণ দিয়েছেন ঃ

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

—'হে কৌন্তেয়, আমি জলে রস, চন্দ্র ও সূর্যে জ্যোতিঃ, সমগ্র বেদে আমি ওঁকার, আকাশে শব্দ ও মানুষের মধ্যে পুরুষকাররূপে বিরাজ করি।'

রসঃ অহম্ অপ্সু, 'আমি জলে রস'; *রসঃ* অর্থাৎ 'স্বাদ'। সংস্কৃতে, *রসঃ* শব্দটি প্রসঙ্গ অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হলো সূক্ষ্ম সৌন্দর্য উপভোগের আনন্দ, যা পাওয়া যায় নাটকে, কবিতায়, সঙ্গীতে এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্যে, বিশেষত ভক্তিপথের নির্গুণ-সগুণ ঈশ্বরের সগুণ সত্তার প্রতি ভক্তির মাধ্যমে। এরপর বলছেন, *প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ,* আমি 'চন্দ্র ও সূর্যের জ্যোতিঃ'; *প্রণবঃ সর্ব বেদেষু,* 'চারটি বেদের মধ্যে আমি *প্রণব* বা *ওঁকার'; শব্দঃ খে,* 'আকাশ বা অন্তরীক্ষে আমি শব্দ'। অর্থাৎ আকাশের মাধ্যমেই শব্দ প্রেরিত হয় তাই সেইখানে আমি শব্দ। *পৌরুষং নৃষু,* 'মানুষের ভিতর আমি পৌরুষ', অর্থাৎ শক্তি, শৌর্য, বীর্য, ইত্যাদি এবং যার মধ্যে এইগুলি আছে, জেনো তার মধ্যে ঈশ্বরের কিছুটা শক্তি আছে। এই কথাটি শ্রীকৃষ্ণ পরেও একটি শ্লোকে বলবেন (১০/৪১)।

এরপর :

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

—'আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ এবং অগ্নিতে দীপ্তি; আমি সর্বজীবে প্রাণ ও তপস্বিগণের তপঃশক্তিরূপে বিরাজমান।'

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ, 'আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে বিরাজিত'। পৃথিবীর স্বাভাবিক ধর্ম হলো *গন্ধঃ,* অর্থাৎ 'সুগন্ধ'; *পুণ্যো গন্ধঃ,* 'অতি পবিত্র গন্ধ'; *তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ,* 'আগুনে আমি দীপ্তি', *তেজস্।* তারপর, *জীবনং সর্বভূতেষু,* 'সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আমিই হলাম প্রাণতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব'; এবং *তপশ্চাস্মি তপস্বিষু,* 'যাঁরা তপশ্চর্যা করেন, তাঁদের মধ্যে আমি যথার্থই সেই *তপস্* বা 'তপঃতত্ত্ব', অর্থাৎ যা মানুষকে মহৎ বস্তু লাভের জন্য তপস্যায় অনুপ্রাণিত করে।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।
বুদ্ধিবুর্দ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

—'হে পৃথাপুত্র, আমাকে সকল ভূতের বীজ বা কারণ বলে জেনো। আমিই বিবেকীদের বুদ্ধি ও বীরের বীরত্ব।'

সনাতনম্ বীজম্, 'চিরন্তন কারণ'; *মাং বিদ্ধি,* 'আমাকে জানবে'; *পার্থ*

সর্ব ভূতানাম্, 'সর্বভূতের, হে অর্জুন'; *বুদ্ধিঃ বুদ্ধিমতাম্ অস্মি,* 'বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যে আমিই হলাম বুদ্ধি'; *তেজঃ তেজস্বিনাম্ অহম্,* 'দীপ্তিমান বা তেজস্বীদের মধ্যে আমিই তাদের দীপ্তি বা তেজ'। এইভাবেই আমরা ব্যক্ত বিশ্বে, বেদান্তে যে ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে, তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। সুতরাং, ঈশ্বর শুধু অতীন্দ্রিয়ই নন, তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ সর্বত্র পরিব্যাপ্তও বটে। তিনি ভিতরে, আবার তিনিই বাইরে।

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্ ।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

—'বলবানদের মধ্যে আমি তাদের কাম ও আসক্তিবর্জিত শক্তি। হে ভরতশ্রেষ্ঠ, প্রাণীদের মধ্যে আমি ধর্মের অবিরোধী কামস্বরূপ।'

বলং বলবতাং চাহম্, 'যারা বলবান, তাদের মধ্যে আমি বল,' কিন্তু, *কামরাগবিবর্জিতম্,* 'ইন্দ্রিয় ভোগবাসনা ও আসক্তি থেকে মুক্ত' যারা; যে শক্তি মানুষের কল্যাণ করে, তাকে উন্নত করে, এই ধরনের মানুষদের মধ্যে আমি সেই শক্তি। পরবর্তী উক্তিটিও খুব লক্ষণীয় ঃ *ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামঃ অস্মি ভরতর্ষভ। কাম* অথবা ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনা মানুষ ও জন্তুর মজ্জাগত। এই *কাম* সাধারণত সব বৈরাগ্যমূলক শাস্ত্রেই নিন্দিত, কিন্তু বেদান্তে নয়, *সনাতন ধর্মে* নয় এবং গীতাতেও নয়। কামকে উচ্চস্থানই দেওয়া হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'প্রাণীদের মধ্যে আমি সেই কাম যা ধর্মের অবিরোধী।' 'আমি সেই কাম যা অন্যের অকল্যাণ করে না'। তাই, কামকে এখানে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। কেবল একটিই শর্ত—সেই কামকে অবশ্যই পরিশীলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হতে হবে যাতে তা অপরের পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে বিনষ্ট করতে না পারে। তাই বলা হয়েছে, *ধর্মাবিরুদ্ধো কামঃ,* 'ধর্মের অবিরোধী কাম'।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে ।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

—'এবং যতপ্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আছে, জেনো সেগুলির উৎস একমাত্র আমিই। তা সত্ত্বেও আমি তাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তারাই সকলে আমার মধ্যে অবস্থিত।'

এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ *যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ*

ভাবা রাজসাঃ তামসাঃ চ যে, 'যে কোন সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক ভাব'; *মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি,* 'জেনো প্রত্যেকটি কেবলমাত্র আমার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে'। এমনকি তামসিক ভাবেরও একমাত্র উৎস আমি। যেমন ধরুন, যখন আমরা ঘুমে ঢুলছি অথবা হাই তুলছি, তখন তার মধ্যে প্রচুর তমঃ-র প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু এগুলিকে আমরা নিন্দা করি না। কারণ এটি আমাদের জীবনেরই একটি অঙ্গ, এটিও ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। অতএব, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ সবই, *মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি,* 'জেনো কেবলমাত্র আমার থেকেই এসেছে'; কিন্তু, *ন ত্বহং তেষু,* 'আমি তাদের মধ্যে নেই', অর্থাৎ আমি তাদের মধ্যে বদ্ধ নই, যদিও তারা আমার থেকে নিঃসৃত; *তে ময়ি,* 'তারা আমাতে অবস্থিত'।

ঈশ্বর নিজের ভিতর থেকেই বিশ্বকে প্রকাশ করেন। জগৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ—তার মধ্যে ভালো ও মন্দ সবই আছে এবং সেই অর্থে ঈশ্বরও যেমন জগতে রয়েছেন, তেমনি জগৎও ঈশ্বরের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বের মধ্যে আছেন, একথার অর্থ এই নয় যে তিনি বিশ্বে আবদ্ধ হয়ে আছেন। তিনি নিত্যমুক্ত। কোন কিছুই তাঁকে বাঁধতে পারে না। আকাশকে কি ঘট অথবা একটা বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ করা যায়? যায় না। আকাশ সব কিছুর ভিতরে থেকেও সব কিছুর বাইরে। ঈশ্বরও সেইরকম নিত্যমুক্ত।

পরবর্তী শ্লোক থেকে শুরু হচ্ছে 'মায়া'র আলোচনা, যে 'মায়া' সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ নামক তিনটি গুণ দিয়ে রচিত এবং পরম 'এক' কে বহুরূপে প্রকাশিত করবার কারণ :

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

—'(প্রকৃতির) তিনটি গুণের রূপান্তর এই সব ভাবের দ্বারা মোহিত হয়ে, সমস্ত জগৎ এই ভাবের অতীত আমার অপরিবর্তনীয় স্বরূপ জানতে পারে না।'

ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ, 'সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড', *সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ* —'এই তিন গুণ দিয়ে তৈরি'; *এভিঃ সর্বম্ ইদং জগৎ মোহিতম্,* 'এগুলির দ্বারা এই সমস্ত জগৎ মোহিত হয়ে আছে'; *নাভিজানাতি,* পৃথিবীর মানুষ এই তিনগুণের দ্বারা বিভ্রান্ত, 'সুতরাং তারা' এই গুণরাজির অধিষ্ঠান 'আমাকে জানতে পারে না।' তারা

তিনগুণের দ্বারা এমনই বশীভূত যে, গুণের ভিতর গুণাতীত আমাকে দেখতে পায় না। এই দিব্য চৈতন্য গুণের মধ্যে থেকেও সদামুক্ত। *মোহিতম্,* 'যেহেতু মানুষ বিভ্রান্ত'; *নাভিজানাতি মাম্,* 'আমাকে তারা জানতে পারে না'; *এভ্যঃ পরম্,* 'এসবের ঊর্ধ্বে'; এবং *অব্যয়ম্,* 'অবিনাশী' হলো আমার স্বরূপ; সেই অখণ্ড অনন্ত সত্তাই ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। কীভাবে প্রকাশিত হয়েছেন? সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণের মাধ্যমে।

সাংখ্যদর্শনের কিছু উক্তি ও গীতার কিছু উক্তি প্রায় একইরকম। ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে, এই তিন গুণ যখন সাম্য অবস্থায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন জগৎ বলে আলাদা কিছু থাকে না। তারপর, এই তিনটি গুণের ভারসাম্য একটু নষ্ট হলে বৈচিত্র্যময় জগতের প্রকাশ আরম্ভ হয় ; তিনগুণের পঞ্চীকরণ চলতে থাকে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এই পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ারই অভিব্যক্তি। তিন গুণের পিছনে অনন্ত চৈতন্য ব্রহ্মই হলো মূল বস্তু বা অধিষ্ঠান। সুতরাং, সেই চৈতন্য ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিরাজ করলেও, তিনটি গুণ মানুষের মনকে এমন মোহিত করে রাখে যে, তার পক্ষে আমাকে, পরম অবিনাশী সত্যকে, জানা সম্ভব হয় না—*মোহিতম্ নাভিজানাতি মাম্ এভ্যঃ পরম্ অব্যয়ম্। এভ্যঃ পরম্,* আমি 'এই সবকিছুর অতীত'; আমি *অব্যয়। ব্যয়* মানে খরচ অথবা ক্ষয়, *অব্যয়* অর্থাৎ যা ক্ষয় হয় না, যা সর্বকালে একইরকম থাকে; ওই অক্ষয় সত্তাই আমার প্রকৃত স্বরূপ।

এর পর আসছে ১৪শ শ্লোক যেটি শত শত বছর ধরে আমাদের আচার্যরা উদ্ধৃত করে এসেছেন ঃ

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

—'আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করা সত্যই অত্যন্ত দুরূহ; যারা কেবল আমার শরণাগত হয়, তারাই এই দুস্তর মায়া অতিক্রম করতে পারে।'

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এই ত্রিগুণাত্মিকা *মায়া* হলো ঐশ্বরিক; *দৈবী হ্যেষা,* 'এই (মায়া) হলো দৈবী', অর্থাৎ ঈশ্বরের; *দুরত্যয়া,* 'যা পার হওয়া দুঃসাধ্য', যা অতিক্রম করা কঠিন। একবার মায়ার জালে পড়লে তার থেকে বার হওয়া অত্যন্ত শক্ত; এইটিই মায়ার প্রকৃতি। ভক্তিমার্গে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উক্তি। আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'এক কী করে বহু হলো?' তার উত্তর এই, 'মায়ার মাধ্যমে'। বস্তুতপক্ষে 'এক' একই আছে, বহু হয়নি, তবু বহুর প্রতীতি হচ্ছে,

বহুত্বের অনুভব হচ্ছে। বিচার করে দেখলে বহুর মধ্যেই আপনি 'এক'কেই পাবেন। এই মুহূর্তে, এই সমস্ত বৈচিত্র্যের পিছনে সেই একই বর্তমান। ইংল্যান্ডে তাঁর জ্ঞানযোগের ওপর দেওয়া বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'মায়া সংসার-রহস্যের ব্যাখ্যার নিমিত্ত একটি মতবাদ নহে; সংসারের ঘটনা যেভাবে ঘটে চলেছে, আমার বা আমাদের চারপাশে যা দেখছি, মায়া তারই বর্ণনামাত্র।' আমরা মনে করি আমরা মুক্ত, কিন্তু সেই মুক্তিকে জীবনে প্রকাশ করতে পারি না। না পারার কারণ, মুক্তি ও আমাদের মাঝখানে এই মায়া এসে দাঁড়ায়। সর্বত্রই মায়া কাজ করে চলেছে। সমগ্র ব্যক্ত জগৎই মায়ার অন্তর্গত। সুতরাং মায়া হলো দৈবী *শক্তি।* আমরা বলি ব্রহ্মের *শক্তি।* তত্ত্বদৃষ্টিতে কিন্তু ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশে মায়ার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে মনে রাখার মতো। সমস্ত কিছুই মায়ার অন্তর্ভুক্ত হলেও মায়ার দুটি দিক আছে; একটি হলো *অবিদ্যামায়া,* অন্যটি হলো *বিদ্যামায়া—অজ্ঞানযুক্ত মায়া* ও *জ্ঞানযুক্ত মায়া।* প্রথম *মায়াটি* আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগের দিকে, এমনকি তারও নিচে টেনে নামায়; একে বলে *অবিদ্যামায়া।* সমাজের যত পাপ, কলুষতা, অপরাধ ও দুর্নীতি, সব আসে *অবিদ্যামায়ার* প্রাধান্য থেকে। কিন্তু যখন *বিদ্যামায়ার* আবির্ভাব হয়, তখন আমরা শুদ্ধ হই, ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ হই, অন্যের কল্যাণচিন্তা করি, এবং সচ্চরিত্র হই; একে বলা হয় *বিদ্যামায়া।* সুতরাং, বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সৎ জীবন এবং অসৎ জীবন—দুইই মায়ার অধীন। দুটিই মায়া। কিন্তু মানুষের কর্তব্য হলো *অবিদ্যামায়ার* পরিবর্তে নিজের মধ্যে *বিদ্যামায়ার* অনুশীলন করা। আপনার সে স্বাধীনতা আছে যা জন্তুদের নেই। সব নরনারীর এই স্বাধীনতা আছে। আপনি যদি *অবিদ্যামায়ার* হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য *বিদ্যামায়াকে* আশ্রয় করার চেষ্টা না করেন, তবে আপনার জীবন ব্যর্থ হবে; আপনি মায়ার জালে জড়িয়ে পড়বেন।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী, 'এই দৈবী শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা'; *মম মায়া,* 'আমার মায়া'; *দুরত্যয়া* 'অতিক্রম করা দুষ্কর', কষ্টসাধ্য। কিন্তু একে আপনি অতিক্রম করতে পারেন, করা সম্ভব। কীভাবে? *মাম্ এব যে প্রপদ্যন্তে মায়াম্ এতাং তরন্তি তে,* 'যারা আমার শরণাগত হয়, শুধু তারাই এই মায়া অতিক্রম করতে পারে', কারণ এই মায়া আমারই। সাধারণত মায়ার এই অত্যাচার থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু জগৎ যাঁর মায়া, সেই ঈশ্বরের শরণাগত হন।

তাহলেই মায়া অতিক্রম করতে পারবেন। সুতরাং *মায়া* রয়েছে এবং তার ঊর্ধ্বে *মায়াবিরূপে,* 'মায়ার নিয়ন্তারূপে', ঈশ্বর আছেন।

জাদুকরের দৃষ্টান্ত দিয়ে তত্ত্বটিকে চমৎকারভাবে বুঝিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন, 'জাদু দেখে তোমরা মুগ্ধ হও। ওই মায়াতে ভুলে তোমরা ভাব যে, যা দেখছ তা বুঝি অভ্রান্ত সত্য। কিন্তু জাদুকরের দিকে তাকাও, তাকে লক্ষ্য কর। তাহলেই বুঝবে, যা দেখছ তার সবটাই *মায়া;* সবটাই জাদু এবং কিছুই সত্য নয়। সুতরাং যখন আপনি সব ভুলে জাদুতে মনোনিবেশ করেন, তখনই মায়ার ফাঁদে পড়েন। জাদুকরের ওপর মনোনিবেশ করলে কিন্তু আপনি কিছুতেই ফাঁদে পড়বেন না। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলছেন, *মাম্ এব যে প্রপদ্যন্তে মায়াম্ এতাং তরন্তি তে,* 'যাঁর মায়া, শুধু তাঁরই কৃপায় তুমি এই মায়া অতিক্রম করতে পার'। আমাদের সব পুরাণেও মায়ার কথা পাবেন, যে-মায়ায় মানুষ মুগ্ধ হয়ে আছে। অবশ্য কিছু মানুষ আছেন যাঁরা ভক্তি, জ্ঞান অথবা ঈশ্বরচেতনার দ্বারা এই মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান।

সুতরাং এই হলো মনুষ্যজীবনের একটি বাস্তব দিক। প্রশ্ন হতে পারে, আমি কেনই বা খারাপ কাজ করি, আবার কেনই বা ভালো কাজ করি? তার উত্তর এই, মায়া আমার মধ্যে কাজ করছে। একটি মায়া আমাকে টেনে নিচে নামাচ্ছে, অন্য একটি মায়া আমাকে ঠেলে ওপরে ওঠাচ্ছে। দুটিই কিন্তু *মায়া।* আপনি যখন কাউকে হত্যা করেন, সেটি *মায়া।* আবার যখন কাউকে আপনি বাঁচান, সেটিও মায়া। কিন্তু শেষেরটি দিব্য *মায়া, বিদ্যামায়া,* বা জ্ঞানযুক্ত মায়া। প্রথমটি *অবিদ্যামায়া,* অর্থাৎ অজ্ঞানযুক্ত মায়া, যা আপনাকে টেনে নিচে নামায়। অতএব, আমাদের হৃদয়কে *বিদ্যামায়ার* হাতে সঁপে দেব, না *অবিদ্যামায়ার* হাতে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা সব মানুষেরই আছে। এই সত্য সকলকেই বুঝতে হবে যে এটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে আমার ওপর, অন্য কারুর ওপর নয়। আপনি যদি বলেন, 'আমার হৃদয়কে আমি বিদ্যামায়ার লীলাক্ষেত্রে পরিণত করব', হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি তা করতে পারেন। আর আপনি যদি *অবিদ্যামায়া* নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে আপনার বরাতে তাই জুটবে। এইভাবে প্রত্যেকেরই এই মায়ার মধ্যে হাবুডুবু খাওয়ার অথবা একে অতিক্রম করার স্বাধীনতা আছে।

সূর্য স্থানচ্যুত হতে পারে, এ ভয় মানুষ করে না, কারণ সে জানে সূর্যের স্থান পরিবর্তনের কোন ক্ষমতা নেই; আপন ক্ষেত্রে সূর্য অটল। জগতে সমস্ত

কিছুই নির্দিষ্ট; একমাত্র মানুষেরই মায়ার কবল থেকে মুক্ত হবার, মায়াতীত সত্যকে উপলব্ধি করবার স্বাধীনতা আছে। সেই স্বাধীনতাকে কাজে লাগাতে শুরু করলে মায়ার এক নতুন দিক আপনার সামনে উন্মোচিত হবে। সেই দিকটার নাম *বিদ্যামায়া* বা উন্নতিবিধানকারী মায়া, যা অধিক দীপ্তিসম্পন্না, অধিক সাত্ত্বিকভাবাপন্না। *তমোগুণ* আপনাকে *ঠেলে* নিচে নামাবে; রজোগুণও মোটামুটি নিচেই নামিয়ে রাখে; কিন্তু যখন সত্ত্বের প্রাবল্য হয়, তখন আপনি স্বাধীনভাবে বাঁচতে শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে মুক্তির দিকে এগিয়ে যান। সত্ত্বগুণও *মায়া*, কিন্তু সেই মায়া যা আপনাকে মায়ার পারে যেতে সাহায্য করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যখন পায়ে একটি কাঁটা ফোটে, তখন আর একটি কাঁটা দিয়ে সেই কাঁটাটি তুলে তারপর দুটি কাঁটাই ফেলে দিতে হয়'। সুতরাং, *মায়ার* কবলে পড়লে আপনি কী করবেন? আপনি মায়ার সত্ত্বদিকটি অবলম্বন করে অকল্যাণকর রজঃ ও তমঃকে দূর করবেন, সবশেষে সত্ত্বকেও ত্যাগ করবেন। সত্ত্বগুণকেও পেরিয়ে যাওয়া চাই, কারণ সত্ত্বও আপেক্ষিক, সর্বোচ্চ অবস্থা নয়। তাই বলা হয়, ঈশ্বর তিনগুণের পার। সত্ত্ব হলো মায়ার শেষ ধাপ।

পুরাণে এই সত্ত্বকে নিয়ে অনেক গল্প আছে। সত্ত্বগুণের অভ্যাস করলে কী করে তা আমাদের এই মায়া অতিক্রম করতে সাহায্য করে, এইসব গল্পে তা বলা হয়েছে। রজোগুণ আপনাকে কর্মচঞ্চল করে সংসারে বেঁধে রাখে, আর তমোগুণ আপনাকে দুষ্ট ও অলস করে তোলে। সুতরাং যেখানেই তমোগুণের আধিক্য, সেখানেই নিম্নস্তরের জীবন চোখে পড়ে। তারপরে আসে রজঃ—কর্মশক্তি, প্রবল সক্রিয়তা। কিন্তু প্রায়শই এসব কর্ম স্বার্থান্ধ ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। তারপর একটু সত্ত্বের প্রকাশ হলে সৎচরিত্র, অন্যের কল্যাণচিন্তা ইত্যাদি গুণগুলি ফুটে ওঠে। সক্রিয়তা তখনও বর্তমান, কিন্তু সে কর্মতৎপরতা বিশুদ্ধ শক্তির আকারে সকলের কল্যাণার্থে উৎসারিত হয়। তাই তাকে সাত্ত্বিকী শক্তি বলে। এইভাবে আমরা নিজেরাই মায়াশক্তিকে আত্মোন্নতির কাজে লাগাতে পারি। যখন আমরা সে কাজে লেগে যাই, তখনই আমাদের উন্নতি শুরু হয়। তারপর এমন একটা সময় আসে যখন আমরা মায়া অতিক্রম করে মায়াধীশ বা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারি। এইটিই মোক্ষ, মানুষের চরম মুক্তি। কিন্তু মায়া উত্তীর্ণ হওয়া খুব কঠিন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ *গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*, 'আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করা অতিশয় দুষ্কর'।

মায়া ও তার মোহিনী শক্তি নিয়ে চমৎকার সব কাহিনী আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ নারদ সম্পর্কে এমনই একটি কাহিনী বলেছেন। দেবর্ষি নারদ হলেন নিত্যমুক্ত, নিত্যশুদ্ধ—সর্বদাই ঈশ্বরের গুণকীর্তন করে বেড়ান। একদিন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'প্রভু আপনার মায়া কী বস্তু, তা আমি একটু দেখতে চাই, মায়ার স্বাদ একটু পেতে চাই'। সেকথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'সে চেষ্টা করতে যেও না, কেননা ওপথ অতি বিপজ্জনক। একবার মায়ার অভিজ্ঞতা পেতে গেলেই তার জালে জড়িয়ে পড়বে। বড় দুর্গম ঐ পথ।' এখানেও ঠিক ঐ ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে—*মম মায়া দুরত্যয়া।* কিন্তু নারদের মন মানবে কেন? দুজনেই মাঠ দিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় নারদ আবার মায়াদর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে চেপে ধরতে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, এত করে যখন বলছ, তখন মায়ার অভিজ্ঞতা তোমাকে একটু দিচ্ছি।' কিছুক্ষণ পর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'নারদ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত, একটু জল চাই। পাশের গ্রাম থেকে আমাকে একঘটি খাবার জল এনে দাও।' নারদ সেই গ্রামে গিয়ে বিশেষ একটি বাড়ির সামনে উপস্থিত হলেন। সেই পরিবারের একটি যুবতী কন্যা নারদকে একঘটি জল এনে দিল। মেয়েটিকে দেখেই নারদ একেবারে মুগ্ধ! তারপর মেয়েটির বাবাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনার এই কন্যাকে কি আমি বিবাহ করতে পারি?' কন্যার পিতা বললেন, 'বেশতো, আমি এখনই বিয়ের সব বন্দোবস্ত করছি'। অতঃপর নারদ সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে সংসার পাতলেন, তাঁদের সন্তানসন্ততিও হলো। কয়েক বছর পর বন্যা এল; একে একে সবকটি সন্তান ভেসে গেল, এমনকি বাড়িটিও ভেসে গেল। নারদের স্ত্রী প্রাণপণে তাঁকে ধরেছিলেন, শেষে তিনিও ভেসে গেলেন। নারদ তো নিদারুণ শোক ও যন্ত্রণায় মুহ্যমান হলেন। ঠিক তখনই কেউ একজন তাঁর পিঠে মৃদু চাপড় মেরে বললেন, 'কি নারদ, আমার জল কোথায়?' 'অ্যাঁ, জল?' নারদ যেন ঘোরের মধ্যে বলে উঠলেন। 'গত আধঘণ্টা ধরে আমি জলের জন্য অপেক্ষা করে আছি', বললেন শ্রীকৃষ্ণ। 'আধঘণ্টা! বলেন কী! আমার তো মনে হলো সারাটা জীবন কেটে গেল! ঠাকুর, আমার যথেষ্ট হয়েছে। আমি আর আপনার *মায়া* দেখতে চাই না।' এখন, দেবর্ষি নারদের যদি এই দুরবস্থা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের আর কথা কী! *মম মায়া দুরত্যয়া,* 'আমার মায়া অতিক্রম করা অতিশয় কষ্টকর', এই উক্তিটি কতই না সত্য! অতএব মায়া জয় করা, মায়ার পারে যাওয়ার চেষ্টা করা, সেইটিই প্রকৃত ও সঠিক উদ্যোগ।

এই তো গেল নারদের উপাখ্যান। কিন্তু স্বয়ং ভগবানও একবার এই মায়ার

ফাঁদে পড়েছিলেন। এই কাহিনীটিও শ্রীরামকৃষ্ণের বলা। উপাখ্যানটি এইরকম ঃ ভগবান বিষ্ণু যখন বরাহ অবতার রূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন, তখন কাজ শেষ হয়ে গেলেও তিনি বরাহ শরীরেই রয়ে গেলেন! ঐ শরীরে স্ত্রী এবং ছোট ছোট শূকর সন্তান পরিবৃত থেকে তিনি খুবই সুখানুভব করতে লাগলেন। দেবতারা ওদিকে সন্ত্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন, 'ভগবান বিষ্ণুর কী হলো? তাঁর সর্বোত্তম লোক, বৈকুণ্ঠে, তিনি আর থাকেন না!' তাই তাঁরা দেবাদিদেব শিবের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'দয়া করে ওঁর এই ভ্রান্তি দূর করুন, যাতে উনি ঐ শূকর শরীর ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠে ফিরে আসেন।' তাই, শিব মর্ত্যে এসে বিষ্ণুকে বললেন, 'আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন এই শরীর ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠে চলুন।' 'না, না, আমি বেশ ভালই আছি', এই বলে বরাহরূপী বিষ্ণু ঘোঁত ঘোঁত করে অন্যদিকে চলে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, 'কী ব্যাপার? আমি তো বেশ আনন্দেই আছি। কোন অসুবিধেই নেই, তবুও...'। তখন শিব নিজের মনে বললেন, 'এ তো দেখছি গুরুতর অবস্থা! আশ্চর্য! বিষ্ণু বরাহ শরীর ধারণ করে এখন দেখছি তাতে আসক্ত হয়ে পড়েছেন এবং তার মধ্যে অতি আনন্দে বসবাস করছেন!' শিব দেখলেন, বিষ্ণু সত্যিই খুব সঙ্কটে পড়েছেন। তখন কী করলেন? তিনি তাঁর ত্রিশূল দিয়ে ওই বরাহ শরীর ভেঙে দিলেন। শরীরটি ভগ্ন হতেই বিষ্ণু হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আরে! আমি কী করে এই শরীরটার ভিতর আটকে ছিলাম? আমি টেরই পাইনি যে বরাহ শরীরের মায়ায় জড়িয়ে পড়েছি।' এই বলে তিনি স্বধাম *বৈকুণ্ঠে* ফিরে গেলেন।

গল্পটি যখন প্রথম পড়েছিলাম, তখন মজা লেগেছিল। কিন্তু পরে এর অন্তর্নিহিত সত্যটি বুঝতে পারি। একদিন পথের ধারে দেখলাম একটা বিরাট শুয়োর শুয়ে আরামে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা যাচ্ছে, আর সাত-আটটা ছানাপোনা তার দুধ খাচ্ছে। ওঃ, এতেই দেখলাম তার কী শান্তি আর আনন্দ! সেদিন বুঝলাম, ভগবান বিষ্ণু যা বলেছেন তা সত্য—শরীরধারণের নিজস্ব একটা সুখ ও আনন্দ আছে বটে।

এখন এই সব কাহিনী থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, *মায়া* অনুভবসিদ্ধা; তার বাস্তব (ব্যবহারিক) সত্যতা যেমন আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তেমনি তার হাত থেকে রেহাই পাওয়াও অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু নিরন্তর চেষ্টা ও সংগ্রামের দ্বারা *বিদ্যামায়ার সাহায্যে অবিদ্যামায়াকে* অতিক্রম করা

যায় এবং তারপর *বিদ্যামায়া* আপনিই খসে পড়ে। এইভাবেই আমরা মায়ার পারে যেতে পারি। সমস্ত মানুষের মধ্যেই এই সম্ভাবনা আছে। যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনটিকেই অতিক্রম করতে হবে—তমঃ থেকে রজঃতে, রজঃ থেকে সত্ত্বে উঠতে হবে, তারপর সত্ত্বেরও পারে যেতে হবে; সত্ত্বগুণকেও জয় করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আর একটি সুন্দর রূপক কাহিনীর মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। গল্পটি এই ঃ একটি লোক বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তিনটি ডাকাত তার ওপর চড়াও হয়ে, তার হাত-পা বেঁধে, সর্বস্ব লুটে নিল। ওই তিনটি ডাকাত হলো *সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।* লুটপাট করার পর একটি ডাকাত বললে, 'একে রেখে আর কী হবে? একে মেরে পালিয়ে যাই চলো'। এ হলো তমঃ। সে বললে, 'একে শেষ করে দিই।' তখন অন্য দুজনের মধ্যে একজন বললে, 'ওকে মেরে ফেলার কী দরকার? ওর সবকিছু তো আমরা আগেই লুটে নিয়েছি। বরং ওর হাত-পা বেঁধে এখানে ফেলে রেখে সরে পড়া যাক।' এ হলো রজঃ। তখন সকলে লোকটিকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর তৃতীয় ডাকাত, সত্ত্ব, লোকটির কাছে ফিরে এসে বলল, 'আহা, তুমি কত যন্ত্রণা ভোগ করলে, এর জন্য সত্যিই দুঃখিত।' এই বলে, সে পথিকের বাঁধন খুলে দিল আর বলল, 'এবার বাড়ি চলে যাও, আমি তোমায় পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।' তারপর তাকে শহরের দিকে নিয়ে গিয়ে সত্ত্বগুণী ডাকাতটি বলল, 'ঐ দেখ তোমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ঐ দিক দিয়ে চলে যাও। তুমি এখন মুক্ত'। একথা শুনে পথিক বলল, 'ভাই, তুমি আমার কত উপকার করলে। দয়া করে আমার সঙ্গে চল। আমার বাড়িতে তোমার আদর-যত্ন করব'। কিন্তু ডাকাতটি বলল, 'সে উপায় নেই। পুলিশ আমাকেও খুঁজছে, কারণ আমিও একজন ডাকাত; আমি কেবল তোমার বাড়ি দেখিয়ে দিতে পারি'। তাই, এই ডাকাতটি, অর্থাৎ 'সত্ত্ব', পথিককে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যটি দেখিয়ে দিয়েই চলে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাবে তিনগুণের তত্ত্বটি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তমঃ ক্ষতিকারক, রজঃও অনেকটা তাই, আর সত্ত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। কিন্তু সত্ত্ব সর্বোচ্চ অবস্থা নয়, সে শুধু সর্বোচ্চ সত্য কোথায়, তা দেখিয়ে দিতে পারে। আপনাকে নিজেই সেখানে যেতে হবে। সুতরাং তিনগুণের পারে যান। তাই গীতায় আগেই বলা হয়েছে (২।৪৫) *নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন,* 'অর্জুন,

তিনগুণকে অতিক্রম করে মনের সর্বোচ্চ অবস্থায় যাও'। এই দিকে গেলেই আমাদের কল্যাণ।

শুধু জ্ঞানমার্গেরই নয়, ভক্তিমার্গের সাহিত্যেও মায়ার প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩।১) আছে ঃ *পরস্য বিষ্ণোঃ ঈশস্য মায়িনাম্ অপি মোহিনীং মায়াম্*, 'এই মায়া হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান মহাবিষ্ণুর ঐশ্বরিক শক্তি, যা অপরের মনকে বিভ্রান্ত করতে পারে।' মানুষ এটা করে, ওটা করে। কিন্তু আসলে এ সবই মায়ার খেলা। মায়া আপনাকে, আমাকে নিয়ে খেলছেন। এটি অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য। কিন্তু যেকথা বারবার বলছি, আমরা সম্পূর্ণরূপে মায়ার অধীন নই। এর থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি, কারণ স্বরূপত আমরা ঈশ্বর। আমাদের মুক্ত হওয়ায় স্বাধীনতা আছে, শুধু আমরা তাকে কাজে লাগাই না, আমরা সংগ্রাম করি না, এই যা। যখন আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করি, তখন আমাদের হৃদয় *অবিদ্যামায়ার* পরিবর্তে *বিদ্যামায়ার* ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই চান, মানুষ এই সত্য উপলব্ধি করে নেতিবাচক *মায়ার* কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করুক, যাতে ইতিবাচক *মায়া* স্বয়ং তাদের মায়ার পারে নিয়ে যেতে পারে। এটি আমাদেরই করতে হবে; এ সুযোগ কেবল আমাদেরই আছে। কোন জন্তুর পক্ষে এটি করা সম্ভব নয়। এই হলো চতুর্দশ শ্লোকের তাৎপর্য।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, *মাম্ এব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*, 'যারা আমার শরণাপন্ন হয়, তারা এই দুস্তর মায়ার পারে চলে যায়; তারা মুক্ত হয়ে যায়।' *ভক্তি* পথে ভক্তের ভাব ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা, ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়া। কী চমৎকার ভাব! এই ধরনের ভক্তির মাধ্যমে খ্রিস্টান, সুফী, বৌদ্ধ, হিন্দু অনেকেই মুক্তিলাভ করেছেন। প্রত্যেক ধর্মেই দেখবেন, যাঁরা নিজের চেষ্টায় মায়ামুক্ত হয়েছেন, তাঁদের সকলকেই শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকৃপার উপর নির্ভর করতে হয়েছে এবং সেই কৃপা এসেছে তাঁদের সাধন-জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে। পরবর্তী শ্লোকটি হলো ঃ

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

—'দুষ্কর্মকারী, মোহগ্রস্ত, নিকৃষ্ট মানুষ, মায়ার প্রভাবে যারা বিবেকবুদ্ধি হারিয়েছে ও যারা আসুরিক স্বভাব আশ্রয় করে, তারা আমাকে ভজনা করে না।'

মানুষ কেন এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে না? *ন মাং প্রপদ্যন্তে,* 'কারণ এই সব মানুষ আমার কাছে আসে না, আমার শরণ নেয় না।' তারা কারা? *দুষ্কৃতিনো,* 'যারা পাপকর্ম করে', তারা মায়াতে এমন আচ্ছন্ন যে তারা কোন উচ্চতর চিন্তা করতে পারে না; *মূঢ়াঃ,* 'যারা মোহগ্রস্ত'। এরা নির্বোধ অথচ নিজেদের বুদ্ধিমান মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, এইসব নির্বোধ ব্যক্তি মায়ার বন্ধনে বাঁধা; *নরাধমাঃ,* 'নরনারীদের মধ্যে এরা নিকৃষ্ট।' শ্রীকৃষ্ণ আরও বলছেন, *মায়য়া অপহৃতজ্ঞানা,* 'এদের বোধবুদ্ধি মায়াশক্তির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অপহৃত হয়েছে'। *আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ,* 'এরা দুষ্ট আসুরিক স্বভাবকে আশ্রয় করে'। ১৬শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ *দৈবী সম্পদ* বা দৈবী প্রকৃতি বনাম *আসুরী সম্পদ* বা আসুরী প্রকৃতির আলোচনাকালে আমাদের আসুরী প্রকৃতির লক্ষণগুলি বলবেন। কী নিখুঁত এই শ্রেণিবিন্যাস! কত মানুষ আছেন যাঁরা *দৈবী সম্পদের* অধিকারী। দয়া, প্রেম, অন্যের কল্যাণচিন্তা, পরহিতৈষণা—এইগুলি সব *দৈবী সম্পদ।* অন্যদিকে *আসুরী সম্পদ* হলো অপরকে কষ্ট দেওয়া, শোষণ করা, অন্যের সর্বনাশ করা। সংসারে দৈবী সম্পদ এবং আসুরী সম্পদ—দুই আছে। সুতরাং, যারা এইধরনের মানুষ, যারা অন্তর্যামী ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত নয়, তারা *আসুরী* স্বভাবের।

পরের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ চাররকমের মানুষ আমার আরাধনা করে। যারা আসুরী প্রকৃতির, তারা আমার ভজনা করবে না, কারণ মায়ার মধ্যে থেকেই তারা সন্তুষ্ট। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরের ভজনা করেন, তাঁরা চার থাকের মানুষ। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

—'হে ভরত শ্রেষ্ঠ অর্জুন—আর্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থকামী ও তত্ত্বজ্ঞানী—এই চাররকম পুণ্যকর্মা আমাকে ভজনা করেন।'

চতুর্বিধা, 'চাররকমের (মানুষ)'; *ভজন্তে মাং,* 'আমাকে ভজনা করেন'; *জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন,* 'হে অর্জুন, যাঁরা পুণ্যকর্মা।' *দুষ্কৃতিনঃ,* অর্থাৎ 'দুষ্কর্মকারীদের' কথা আগের শ্লোকে বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে আমরা *সুকৃতিনঃ,* অর্থাৎ 'সৎকর্মকারী'দের কথাই আলোচনা করছি। তাঁদের মধ্যেও আবার চারটি শ্রেণি আছে। তাঁরা কে? *আর্তঃ জিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী জ্ঞানী চ।* এক

দল হলো *আর্তঃ*, 'যারা বিপদগ্রস্ত'। সাধারণত আমরা কষ্টে পড়লেই ঈশ্বরকে স্মরণ করি। অবশ্য সেটাও মন্দের ভালো। কারণ, অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও মন তখন মায়াতীত কোন উচ্চতর বস্তুর চিন্তা করে। *আর্তিঃ* শব্দটির অর্থ হলো 'ক্লেশ, দুঃখদুর্দশা, উদ্বেগ'। সুতরাং, যখনই আমাদের *আর্তি* হয়, তখনই আমরা ঈশ্বরের কথা মনে করি। ঈশ্বরের চিন্তা করার এটিও একটি প্রেরণা। দ্বিতীয় হলো *জিজ্ঞাসুঃ*, 'যাঁরা জ্ঞান অন্বেষণ করেন', যাঁরা জানতে চান, যাঁদের মনে জিজ্ঞাসা আছে। যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু সেও কিন্তু ঈশ্বরের ভক্ত। পরবর্তী শ্রেণিটি হলো *অর্থার্থী*, 'যাঁরা অর্থের অনুসন্ধান করেন'। এই ধরনের মানুষও ঈশ্বরচিন্তা করেন। একথা সত্য, তাঁরা বিষয়ী, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ, তাঁরা যেভাবেই হোক ধীরে ধীরে অবিদ্যামায়া ছেড়ে বিদ্যামায়ার সঙ্গে যুক্ত তো হচ্ছেন। সুতরাং সামান্য হলেও এই ঊর্ধ্বগতিকে উৎসাহ দিতে হবে। এই হলো প্রথম তিনশ্রেণী : *আর্তঃ জিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী।* এই যে শিক্ষা, এতে আচার্য ও তাঁর শিক্ষার মহত্ত্ব ও উদারতা ফুটে উঠছে। এরপর *জ্ঞানী চ*, সর্বশেষ শ্রেণিতে পড়েন *জ্ঞানী*, 'যিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করতে চান এবং তত্ত্বজ্ঞানী'। তিনি এমন এক অসাধারণ মানুষ যিনি ভালবাসার জন্যই ঈশ্বরকে ভালবাসেন। তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ জেনেছেন এবং তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ ঈশ্বরে সমর্পিত। এই ধরনের মানুষকেই *জ্ঞানী* বলা হচ্ছে।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, জ্ঞানী বলতে ভক্তকেও বোঝানো হচ্ছে। কারণ সর্বোচ্চ *জ্ঞান* ও সর্বোচ্চ *ভক্তি*, দুটি একই বস্তু; দুটিই মায়ার কবল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। সুতরাং, জ্ঞান শব্দটি এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সে যাই হোক, এই হলো ঈশ্বরের চার রকম ভক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে একটি বিখ্যাত শ্লোক আছে (১১/২০/৮)। সেখানে প্রশ্ন উঠেছে, কী করে মানুষ ঈশ্বরের ভক্ত হয়? তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : দৈবক্রমে হয়তো একজন ঘোর বিষয়ী ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা শুনতে পেলেন। ফলে, সাময়িক হলেও তাঁর মধ্যে ঈশ্বর সম্পর্কে একটু আগ্রহ জন্মাল। জগতের প্রতি, অর্থ বা ক্ষমতার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তাঁর মনে একটু ঈশ্বরপ্রীতিরও সঞ্চার হয়। তাঁর হয়তো তীব্র বৈরাগ্য নেই, কিন্তু জগতের প্রতি তখন তাঁর অতিরিক্ত আসক্তিও নেই। এই ধরনের মানুষের ভক্তিপথই প্রশস্ত। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ
জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো
ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥

ভক্তিযোগ মানুষকে পরম পূর্ণতায় পৌঁছে দেয়! কিন্তু কীভাবে? *যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধঃ,* 'দৈবাৎ, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কেউ হয়তো দেখলেন কোথাও ভজন বা হরিকথা হচ্ছে। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য না নিয়েই তিনি সেখানে গিয়ে সব শুনলেন। শুনতে শুনতে তাঁর মনে কিছু উচ্চ চিন্তার উদয় হলো; ঈষৎ আধ্যাত্মিক জাগরণ অথবা অনুভূতি হলো।' এই ভাবে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই ভক্তিপথে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। এই ধরনের বিষয় বাসনাপূর্ণ মানুষের মনে ত্যাগের ভাব অল্পই থাকে; কিন্তু তবু তিনি ভক্তিপথে প্রবেশ করেছেন যা তাঁকে একদিন আত্মোপলব্ধিতে পৌঁছে দেবে। এই *যদৃচ্ছয়া,* অর্থাৎ 'দৈবাৎ' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কখনো কখনো অপ্রত্যাশিতভাবেও আপনি অধ্যাত্ম প্রেরণা লাভ করতে পারেন। এই অপ্রত্যাশিত প্রেরণা লাভ করে কত মানুষের জীবন পাল্টে গেছে যে তার ইয়ত্তা নেই। এ নিয়ে অনেক গল্পও আছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে এমনই একটি সত্য ঘটনা জানা যায়। তিনি সুপণ্ডিত অথচ সমৃদ্ধ জমিদার ছিলেন। তিনি তাঁর আত্মকথায় বলেছেন, বোধহয় দার্জিলিঙে অথবা অন্য কোথাও তাঁর জমিদারিতে, একদিন তিনি বসে বসে সন্ধ্যার শান্ত সৌন্দর্য উপভোগ করছেন। এমন সময়ে হঠাৎ হাওয়ায় তাঁর পায়ের কাছে একটি কাগজের টুকরো উড়ে এল। সেটিকে কুড়িয়ে নিয়ে তিনি পড়লেন; দেখা গেল সেটি *ঈশোপনিষদ-এর* সুবিখ্যাত প্রথম শ্লোক। এটি পড়ে তিনি এমনই অনুপ্রাণিত হলেন যে, তাঁর গোটা জীবনটাই পাল্টে গেল। সেই শ্লোকটি কী?

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥

'ব্যক্ত জগতের সমস্ত বস্তুকেই ঈশ্বরীয় ভাবে আবৃত করতে হবে।' এইটিই প্রথম পংক্তি। এইটি পড়েই তিনি আরো গভীরে ডুব দেবার প্রেরণা পান এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনকে তিনি এই বৈদিক ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা রামমোহন রায়কে তিনি ঐ আন্দোলন শুরু করতে সাহায্য করেছিলেন ও তাঁর মৃত্যুর পর তিনি ঐ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ

করেন। এই হলো দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-কাহিনী। এই *যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধঃ*-এর আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দৈবক্রমে হরিকথা শুনে ঈশ্বরে আপনার বিশ্বাস এলো। আপনি যেন একটা নাড়া খেলেন। এর আগে আপনি ঈশ্বরকে চাননি, প্রত্যাশাও করেননি যে এমনটি কখনো ঘটবে; কিন্তু তাই ঘটে গেল। আপনি একটা ভাব পেলেন এবং সেই ভাবই আপনাকে *ভক্তিপথে টেনে নিয়ে গেল*। *এই ভক্তি* থেকেই আপনি এক পা এক পা করে একদিন আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠবেন।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, এই চাররকম পুণ্যকর্মা মানুষের মধ্যে যাঁরা চতুর্থ থাকের, অর্থাৎ যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরাই শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁরা যথার্থই ঈশ্বরকে ভালবাসেন; ঈশ্বরের সত্য স্বরূপটিকে ভালবাসেন। এই কারণেই তাঁদের স্থান অন্য সকলের ঊর্ধ্বে। পরবর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানীকে সর্বোচ্চ সম্মান দিচ্ছেন এবং বলছেন :

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

—'এঁদের [চাররকম ভক্তের] মধ্যে নিত্যযুক্ত, একনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারা (উদ্দীপ্ত) তত্ত্বজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; কারণ জ্ঞানীর কাছে আমি অতিশয় প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়।'

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ, 'এই সকল [পুণ্যাত্মাদের] মধ্যে জ্ঞানীই *নিত্যযুক্তঃ,* 'সদাযোগী'; আর্তদের মতো পাঁচ মিনিটের *যোগী* নন, যিনি অন্য সময়ে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না। সাধারণত দুর্দশাগ্রস্ত হলেই আর্তরা ঈশ্বরের শরণ নেন, তাঁকে ডাকেন। ঝঞ্ঝাট চুকে গেলে আর ঈশ্বরচিন্তা করেন না। এই ধরনের ভক্তদের *আর্ত* বলা হয়। কিন্তু তাঁদের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণ কত উদার। তাঁর মতে এই ধরনের ভক্তরাও ভালো, কারণ তাঁরা মায়াতীত সর্বোচ্চ সত্যকে স্মরণ তো করেছেন! এরপর আসছে *একান্ত ভক্তিঃ, একভক্তিঃ*-র কথা, এগুলি ভক্তিশাস্ত্রের অপূর্ব সব অভিব্যক্তি। ভক্তিশাস্ত্রের মহান গ্রন্থ *নারদীয় ভক্তিসূত্র-এ* (৬৭তম শ্লোকে) আছে : *ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ,* 'ভক্তদের মধ্যে *একান্ত ভক্তেরা,* একনিষ্ঠ ভক্তেরাই শ্রেষ্ঠ'। *বিশিষ্যতে,* 'সর্বোৎকৃষ্ট', এই চারশ্রেণির মধ্যে। *প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহম্,* 'জ্ঞানীর কাছে আমি অত্যন্ত প্রিয়'। ঈশ্বরের অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ *অহম্,* 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করছেন। *স চ মম প্রিয়ঃ,*

'তিনিও আমার অতীব প্রিয়'। আমি এইরকম ভক্তকে অত্যন্ত ভালবাসি, তিনিও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন; আমাদের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নেই—স্বরূপত আমরা অভিন্ন।

এই হলো সর্বোচ্চ *ভক্তি* বা সর্বোচ্চ *জ্ঞানের* স্বভাব। যেমন ধরুন বালক প্রহ্লাদ, যার কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে আছে। ভগবানের কাছে সে কখনো কিছু চায়নি। সে চাইত কেবল শুদ্ধাভক্তি, শুধু ভালবাসার জন্যই ভালবাসা। ভগবানও এই ছোট্ট পাঁচ বছরের বালকটির উপর খুব প্রসন্ন ছিলেন। তিনি যখন নৃসিংহ অবতাররূপে অবতীর্ণ হলেন, তখন তাঁর সেই রূপ দেখে সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। একমাত্র বালক প্রহ্লাদই ছিল সম্পূর্ণ শান্ত ও নির্ভয়, কারণ তার হৃদয় নিষ্কলুষ, মায়ামুক্ত ও সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। পরম দয়াময় ভগবান নৃসিংহ প্রহ্লাদকে বর দিতে চাইলেন, কারণ সে তার পিতা হিরণ্যকশিপুর নানা উৎপীড়ন সহ্য করেছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।৫২) আছে যে নৃসিংহদেব বললেন, 'প্রহ্লাদ, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তুমি আমার কাছে বর চাও' ঃ *প্রহ্লাদ ভদ্র ভদ্রং তে প্রীতোঽহং তেঽসুরোত্তম,* 'হে প্রহ্লাদ, অসুর কুলশ্রেষ্ঠ, তোমার মঙ্গল হোক, তোমার কল্যাণ হোক, আমি তোমার প্রতি যারপরনাই প্রীত।' তিনি আরও বললেন, 'আমি আনন্দিতমনে তোমাকে বরদান করতে চাই, তুমি যে-কোন বর প্রার্থনা কর'। এর উত্তরে প্রহ্লাদ বলছেন, 'আমি ব্যবসাদার নই যে ভক্তি-ভালবাসা কেনাবেচা করব। আমার ভক্তি একনিষ্ঠ। এর পরিবর্তে আমি কিছুই চাই না।' প্রহ্লাদের মুখের কথাগুলি এই, 'আমি ভক্তির *বণিক* বা সওদাগর বা ব্যবসাদার নই'। এই কারণেই ভক্তিরাজ্যে, শুদ্ধ ভক্ত হিসাবে প্রহ্লাদ চিহ্নিত হয়ে আছেন।

এই জন্যই এখানে, জ্ঞানীর সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ,* 'জ্ঞানী আমার প্রিয়, আমিও তাঁর প্রিয়'। পরের শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের মহত্ত্ব ফুটে উঠেছে। তিনি বলছেন ঃ

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌ ।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্‌ ॥ ১৮ ॥

—'এঁরা সকলেই মহান, কিন্তু জ্ঞানীকে আমি আমার আত্মস্বরূপ মনে করি; কারণ যোগযুক্ত মনের সাহায্যে পরম গতি একমাত্র আমাতেই তিনি প্রতিষ্ঠিত।'

এই চার শ্রেণির ভক্তরা সকলেই পুণ্যকর্মা, সকলেই *উদার-চেতা,* অর্থাৎ

মহৎ। সংস্কৃতে *উদারতা* হলো মহত্ত্ব। ভারী চমৎকার শব্দ। একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকে আছে :

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥

—'এটি আমার, ওটি অন্যের, এটি সংকীর্ণ ব্যক্তির মনোভাব। কিন্তু উদারচিত্ত ব্যক্তির কাছে সমগ্র জগৎই পরিবারস্বরূপ'।

মনুষ্যজাতির আধ্যাত্মিক ঐক্যই সমস্ত *বসুধা* বা জগৎকে *কুটুম্ব* বা একটি পরিবারে পরিণত করে। বৈদিক যুগ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ পর্যন্ত এইটিই আমাদের সাহিত্যের সনাতন ভাব। বেদে বলা হয়েছে, *যস্য বিশ্বম্ ভবতি একং নীড়ম্,* 'সমগ্র পৃথিবীই যাঁর কাছে একটি নীড় বা বাসস্থানে রূপান্তরিত হয়।'

এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : এই চার রকমের ভক্তই মহান, *উদারাঃ,* যদিও প্রথমশ্রেণির ভক্তরা স্বার্থপর। কিছু পাবার আশায় তাঁরা ঈশ্বরকে ডাকেন। অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁদের কাছে উপায়, উদ্দেশ্য নয়; ঈশ্বরকে তাঁরা ভালবাসেন না। কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'তারা সকলেই মহান'। কী চমৎকার ভাব! *উদারাঃ সর্ব এবৈতে;* কিন্তু, *জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতম্,* 'জ্ঞানী অবশ্যই আমার আত্মস্বরূপ।' *আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মাম্ এব অনুত্তমাং গতিম্,* কারণ, 'তত্ত্বজ্ঞানী দৃঢ় প্রত্যয়ী, সেই নর বা নারী একমাত্র আমাকেই পরম গতিরূপে আশ্রয় করেছেন।' এই হলো শুদ্ধ জ্ঞানী বা শুদ্ধ ভক্তের চরিত্র। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন তারই পুনরাবৃত্তি করে বলছি, 'শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি এক'। পরম পদে সমস্ত ভেদ লোপ পায়। একমাত্র ঈশ্বরই আছেন; তিনিই একমাত্র সত্য—এই হলো সর্বোচ্চ জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ।

কী করে এই সর্বোৎকৃষ্ট ভাবটি আয়ত্ত করা যায়? পরবর্তী শ্লোকটি আমাদের সেই উপায় বলে দেবে। আসল কথা হলো, এর জন্য আপনাকে হয়ত অনেক জন্ম খাটতে হবে; কঠোর সংগ্রাম করতে করতে তবেই শেষকালে এই অবস্থা লাভ করতে পারবেন। একদিনে হয় না; জাদুবলে অধ্যাত্মজীবন গড়ে ওঠে না। পরের শ্লোকটি তাই বলবে : 'ধৈর্যের সঙ্গে, ঐকান্তিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনকে অল্প অল্প করে গড়ে তুলুন'। ভেবে দেখুন তো, বাল্যকাল থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েরা একটু একটু করে আধ্যাত্মিক হবার চেষ্টা করছে, ঠিক যেমন করে প্রবাল-কীট সমুদ্রের তলদেশ থেকে ওপর পর্যন্ত প্রবালদ্বীপ তৈরি করে, ঠিক তেমনি! ভাবনাটি কি অসাধারণ নয়?

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

—'বহু জন্মের শেষে, জ্ঞানী [পুরুষ বা নারী] আমাকে আশ্রয় করে এই উপলব্ধি করে যে, সমগ্র জীবজগৎই বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ অথবা সমগ্র জীবজগতের অন্তরাত্মা); এই ধরনের মহাত্মা অতি দুর্লভ।'

জন্মজন্মান্তর ধরে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবার জন্য কঠোর সাধনা করতে করতে শেষ জন্মে মানুষ এই পরম সত্য উপলব্ধি করে, *বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি*, 'বাসুদেবই সব হয়েছেন, ঈশ্বরই সকল বস্তুর মধ্যে বর্তমান'; কিন্তু এই ধরনের ভক্ত অতি দুর্লভ। যাঁর সেই উপলব্ধি হয়েছে, *স মহাত্মা*, 'তিনি মহাত্মা'; *সুদুর্লভঃ*, '(কিন্তু তাঁর) সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন'। দুর্লভ এই জন্য যে, এটি পূর্ণতার অতি উচ্চ অবস্থা। কিন্তু তাহলেও সর্বত্রই কেউ না কেউ এই উচ্চাবস্থা লাভ করে থাকেন, ঠিক যেমন সকলেই মাউন্ট এভারেস্টে উঠতে না পারলেও কেউ কেউ তো পেরেছেন। তেমনই, আধ্যাত্মিক অনুভূতিরও একটি মাউন্ট এভারেস্ট আছে, যেখানে উঠলে সমস্ত বস্তুতে, অন্তরে ও বাইরে ঈশ্বরদর্শন হয়। শ্লোকে এই কথাই বলা হয়েছে।

আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চাররকম ভক্তের বর্ণনা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, এঁরা সকলেই ভালো, সকলেই মহান, *উদারাঃ সর্ব এবৈতে*; এমনকি যাঁরা জাগতিক সুবিধালাভের জন্য আমার পূজা করেন, 'তাঁরাও উদার, উচ্চমনা'। *জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতম্*, 'কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ'; *আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মাম্ এব অনুত্তমাং গতিম্*, 'সর্বদা আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার দরুন জ্ঞানী উচ্চ অবস্থা লাভ করেন'।

আগে এই কথা বলার পর ঊনবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ আধ্যাত্মিক জীবন অভ্যাস করলে, জীবনের শেষে তোমার কিছু লাভ হবে। তোমার স্থূল শরীর মরবে ঠিকই, কিন্তু তোমার সংস্কারগুলি সূক্ষ্ম শরীরে থেকে যাবে। সেই থেকেই তোমার আবার জন্ম হবে, এবং তোমার পূর্ণতালাভের সংগ্রাম চলতে থাকবে যাতে তোমার আরও উন্নতি হয়।

তাই ভগবান বলছেন, *বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে*, 'বহু জন্মের শেষে'। জন্ম জন্ম সাধনা করে একেবারে শেষ জন্মে জ্ঞানী চরম সত্য উপলব্ধি করেন। কী উপলব্ধি করেন? *বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি*, 'সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই বাসুদেব', অথবা সেই অনাদি শুদ্ধচৈতন্য, যাঁকে আমরা ব্রহ্ম, আত্মা, বিষ্ণু, আদ্যাশক্তি, বা অন্যান্য

নামে ডাকি। কিন্তু যে নামেই ডাকি না কেন, সত্য এক ও অভিন্ন এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সেই পরম সত্যেরই প্রকাশ। ভক্তিমার্গে সেই পরম সত্যকে 'বাসুদেব' বলা হয়। বাসুদেব, নারায়ণ, এই বিভিন্ন শব্দগুলি একই সত্যকে বোঝায়। এইটিই চরম উপলব্ধি এবং এই ধরনের উপলব্ধিবান মানুষ দুর্লভ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যে-সমাজ এমন মহৎ মানুষের জন্ম দেয়না, তার ভাগ্যে দুঃখকষ্ট অবধারিত, কারণ সেই সমাজের কোন লক্ষ্য নেই; তা ধীরে ধীরে অধঃপতিত হয়ে লুপ্ত হবে। কিন্তু যদি মাত্র কয়েকজনও এইরকম মহাত্মা থাকেন, তাহলে তাঁরাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, সমাজের সংস্কৃতি স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। জীবন্ত দৃষ্টান্ত সামনে থাকার ফলে এধরনের সমাজ নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। *বাসুদেবঃ সর্বমিতি*, 'সমস্তই বাসুদেব', একথার এই হলো অন্তর্নিহিত ভাব। সমস্ত জগৎ হলো *ব্রহ্মময়ং*, 'ব্রহ্মের দ্বারা পরিপূর্ণ'। আমাদের কালে দেখছি *কথামৃত*-এ শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'আমার সামনে যা কিছু দেখছি, দেখছি সবই নারায়ণ।'

সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউ সমুদ্রের এক একটি স্পন্দন। সমুদ্রই সত্য, স্পন্দনগুলি আসে ও যায়। সমুদ্রকে জানলেই সমুদ্র ও ঢেউয়ের প্রকৃত স্বরূপ জানা হলো। সেই অনন্ত ব্রহ্ম, সেই বাসুদেব, সেই শুদ্ধচৈতন্য আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। অন্য সব রূপের মধ্যে এই মনুষ্যরূপও রয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৯।২৮) আছে যে, সৃষ্টির পর ক্রমবিকাশের সময় নানাধরনের জৈবিক ও মহাজাগতিক বস্তুর আবির্ভাব হলো। অবশেষে, পরম চৈতন্য বা ব্রহ্ম মনুষ্যরূপে প্রকাশিত হলে, *মুদমাপ দেবঃ*, 'ঈশ্বর অত্যন্ত তৃপ্ত হলেন।'। শ্রীমদ্ভাগবত এই আনন্দের কারণ দেখিয়ে বলেছেন ঃ *ব্রহ্মাবলোক ধিষণম্*, 'কারণ এই নরদেহের মধ্যেই রয়েছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মানবসত্তার উৎসস্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার জৈব ক্ষমতা'। এটি অসামান্য উক্তি যা থেকে মানুষের উত্তুঙ্গ মহিমার আঁচ করা যায়।

জীববিজ্ঞানী স্যার জুলিয়ান হাক্সলের লেখা একটি গ্রন্থের শিরোনাম হলো 'The Uniqueness of Man' (মানবের অনন্যতা)। সেখানে লেখক বলছেন, 'Man is unique in more ways than one' ('মানুষ একাধিক দিক থেকেই অনন্য')। পাশ্চাত্য জীববিজ্ঞান মানুষ সম্বন্ধে এই যে অনন্যতার কথা বলছেন, বেদান্ত সেই বোধকেই একেবারে তুঙ্গে নিয়ে গেছে। বেদান্ত বলে, মানুষ প্রশ্ন

করতে পারে, সে চাইলে ব্রহ্মাণ্ডের মূল উৎসটিকেও জানতে পারে। সে ক্ষমতা তার আছে।

তাই, *বাসুদেবঃ সর্বমিতি*, এই বাক্যটি এত গুরুত্বপূর্ণ। একেবারে শেষ জন্মে আমাদের এই উপলব্ধি হয়। জন্মজন্মান্তর ধরে নিজেকে শোধন করতে করতে, শেষ জন্মে এসে একেবারে তৈরি জমি পেয়ে যাই। তখন একটু চেষ্টা করলেই আত্মোপলব্ধি হয়। ওই হলো মানুষের শেষ জন্ম, যখন পরম সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু 'এই রকম মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ', *স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।* সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের এই মহান দেশে সর্বদাই এই ধরনের কিছু মহাপুরুষ আবির্ভূত হন। আমরা তাঁদের কখনো কখনো চিনতে পারি, বেশির ভাগ সময়েই পারি না। শ্রীকৃষ্ণই পরে (৯।১১) একথা বলবেন। আমাদের শাস্ত্রগুলি বারবার বলছে, *সর্বং ব্রহ্মময়ম্, সর্বং বাসুদেব ময়ম্,* 'সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম, সমস্ত কিছুই শ্রীকৃষ্ণ'। সুতরাং, এই শ্লোকে আমরা চরম আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা পাচ্ছি। সবই ব্রহ্ম, সব কিছুর ভিতরেই সেই পরম সত্য লুকিয়ে রয়েছে। অহংবোধ দ্বারা খণ্ডিত মানুষ তার বিশেষত্ব বা অহংকার ত্যাগ করলে এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে; এইটিই হলো চরম উপলব্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন, এই আত্মোপলব্ধিই হলো অধ্যাত্ম অনুভূতির শেষ কথা।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

—'অন্যেরা আবার নানা ভোগবাসনার দরুণ বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে, নিজেদের প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে, বিভিন্ন ব্রত পালনের মাধ্যমে অন্যান্য পৌরাণিক দেবতার ভজনা করে।'

মানুষ তার নিজের *প্রকৃতি* বা স্বভাবের দ্বারাই চালিত হয়। আমাদের সঞ্চিত *সংস্কারগুলিই* আমাদের জীবনের গতি নির্ধারিত করে, একটি বিশেষ দিকে চালিত করে। এই কারণেই বিভিন্ন কামনা মানুষকে বিভিন্নদিকে আকৃষ্ট করে। ফলে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ,* 'স্বরূপের জ্ঞান আবৃত হয় ও মানুষ নানা কামনা-বাসনার প্রতি আকৃষ্ট হয়'। হৃদয় ও মনের সাগ্রহ আকুতি ছাড়াও, এইসব *কামনা*-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যই, মানুষ বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে। ভাবে—'তাঁর কাছে কিছু চেয়ে দেখি না কেন, তিনি হয়ত দিতে পারেন'। তাই তারা বলে, 'আচ্ছা বেশ, আমি এই দেবতার বা ঐ দেবতার পূজা করব'। বহু

পৌরাণিক দেবদেবী থেকে মানুষ নিজেরাই একটা ধর্ম খাড়া করে এবং নিজেদের মনস্কামনার বশে চালিত হয়ে বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজা করে। *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*, 'এই সব কামনা-বাসনার আকর্ষণে প্রকৃত জ্ঞান দূরে সরে যায়'; সেই জন্য, *প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*, তারা 'নানাবিধ দেবতার অর্চনা করে'। কিন্তু সেই পরম ঈশ্বর, যাঁর থেকে সমস্ত কিছুর উৎপত্তি, যাঁর মধ্যে জীবন ধারণ করে আছি এবং যাঁর কাছে ফিরে যাব, তাঁর পূজা করি না কেন? অন্যান্য দেবতাদের দ্বারস্থ হই কেন? কারণ আমাদের হৃদয়ে বাসনা গিজগিজ করছে। আমরা ভাবি, 'হয়ত উনি আমাকে সাহায্য করবেন।' এই কারণেই আমাদের ধর্মে অজস্র পৌরাণিক দেবদেবীর পূজার চল রয়েছে। অবশ্য, শুধু আমাদের ধর্মেই নয়, অন্য ধর্মেও নানারকম দেবদেবী আছেন। এইভাবে এক পরমেশ্বরের কাছ থেকে সরে এসে অন্য ছোটখাট নানা দেবতার পূজা—এ সব ধর্মেই আছে।

তং তং নিয়মম্ আস্থায়, 'সেইসব ধর্মের নিয়ম পালন করে'; *নিয়ম* অর্থাৎ 'আচার অনুষ্ঠান'। বিশেষ কোন দেবতার পূজা করতে চাইলে, তার জন্য বিশেষ নিয়ম আছে; সব দেবদেবীর ক্ষেত্রেই তাই প্রযোজ্য। দেবদেবীরা যে এক অনন্ত ব্রহ্মেরই বিভিন্ন রূপ, তা না জেনেই আমরা নানারকম আচার-অনুষ্ঠান পালন করি। আমরা মূল ঈশ্বরীয় সত্তা থেকে এইসব দেবদেবীকে আলাদা করে দেখি, কারণ *কাম* বা কামনা দ্বারা আমাদের হৃদয় অভিভূত হয়ে আছে। হৃদয়ের বাসনা 'আমাদের জ্ঞান অপহরণ করেছে', *হৃতজ্ঞানাঃ।* কেবল *বিবেক* বা বিচারের দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি যে, এক অনন্ত ঈশ্বরই আছেন; নানান দেবদেবী তাঁরই বিভিন্ন নাম ও রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। এই সত্য কেবল বিচারের দ্বারাই লাভ করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই এই বিবেক নেই। বিবেক বিনষ্ট হলো কী করে? বাসনার অতিশয্যে। বাসনার জন্যই মানুষ পৃথক পৃথক ভেবে বিভিন্ন দেবতার ভজনা করে এবং সাধারণত জাগতিক হিসাব নিকাশ করে ভাবে যে, 'এই দেবতা আমাকে এই দেবেন, আর ঐ দেবতা ঐ দেবেন'। এই হলো লৌকিক ধর্ম অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ধর্ম এবং এই ধর্মের চেহারা সর্বত্রই এক। প্রকৃত ধর্মের ক্ষুধা অতি অল্প মানুষেরই থাকে। প্রকৃত ধর্মের লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিক বিকাশ, উন্নতি ও পরম সত্যের উপলব্ধি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ জগতের অধিকাংশ মানুষের মনোভাবটি তুলে ধরছেন। চাররকমের মানুষ ঈশ্বরের আরাধনা করে, এই কথা বলার পর তিনি আরও বলেছেন যে তারা সকলেই *উদার* বা 'মহৎ'।

সেখানেও না থেমে, তিনি তাদের আচরণ ব্যাখ্যা করে দেখাচ্ছেন তাঁদের সমস্যাটি কোথায় এবং জানাচ্ছেন যে, তাদের প্রকৃতিই পরমেশ্বরের কাছ থেকে তাঁদের অন্যদিকে টেনে নিয়ে যায়।

বাসনাতাড়িত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা এবং তাঁদের সম্পর্কে ভুল ধারণার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে উপনিষদে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যের যে ইংরেজি অনুবাদ স্বামী মাধবানন্দ করেছেন, তাতে আছে (১।৪।১০) ঃ 'যেহেতু তুমি আত্মা, এইসব দেবতারা বা অন্যান্য শক্তি তোমার কী করতে পারে?' কিছুই না। কারণ *ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে অথবা বামদেবের মতো (আধ্যাত্মিক) দিকপাল ও আজকের ক্ষুদ্র দুর্বলচেতা মানুষের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই।* ভাবগতিক দেখে মনে হয় দেবতারা যেন মানুষকে তাঁদের কব্জায় রাখতে চান। মানুষ যেন 'দেবতাদের গোধন', *পশুরেবং স দেবানাম্;* উপনিষদে ঠিক এই ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। একটি উদাহরণ দিয়ে উপনিষদ বলছেন ঃ মনে কর, একজন রাখালের একশোটি গরু আছে এবং সে বেশ সুখেই আছে। হঠাৎ একদিন একটা বাঘ এসে একটা গরু ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় রাখাল মুষড়ে পড়লো। উপনিষদ বলছেন, আমরাও যেন দেবতাদের গরু। দেবতারা চান না যে তাঁদের পূজাপাঠ ও বাহ্য অনুষ্ঠানগুলো বন্ধ করে কেউ তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। উপনিষদ দেবদেবীর প্রাধান্য উড়িয়ে দিয়ে ঠিক এই কাজটিই করতে চেয়েছেন। খুব আধুনিক শোনালেও, চিন্তাটি কিন্তু অতি প্রাচীন। উপনিষদ বলছেন, কেন আপনি দেবতাদের গরু ভেড়া হয়ে থাকবেন? আপনার প্রকৃত স্বরূপ কি অনন্ত নয়? যে অসীম সত্তা থেকে এই ব্রহ্মাণ্ড এসেছে, সেটিই তো আপনার প্রকৃত সত্তা, আপনার সত্যিকারের পরিচয়। কেন আপনি এই সত্য জানার চেষ্টা করবেন না? হ্যাঁ, একথা ঠিক যে সেই চেষ্টা করলে দেবতারা আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেন। কারণ, তাঁরা চান না যে আপনি তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যান। উপনিষদ ও শাঙ্কর ভাষ্যের ভাষার বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করুন; দুটিই মানুষের অনন্ত ও নিত্যমুক্ত স্বরূপের অতুলনীয় ব্যাখ্যা।

এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য মহাভারতের একটি শ্লোক (১৪।১৯।৫৪, ভাণ্ডারকর সংস্করণ) উদ্ধৃত করেছেন, যার দ্বিতীয় পংক্তিতে আছে ঃ *ন চ এতদ্ ইষ্টং দেবানাং মর্তৈঃ উপরিবর্তনম্,* 'দেবতারা চান না যে মানুষ তাঁদের উর্ধ্বে উঠুক'।

আধুনিক যুগে, আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আমরা শত শত পৌরাণিক দেবদেবীতে বিশ্বাস করে এসেছি। কিন্তু তাতে আমাদের বেশি কিছু লাভ হয় নি—লাভের মধ্যে সহ্য করতে হয়েছে বিদেশী আক্রমণ; একবার নয়, বহুবার। তাই বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'প্রথমে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ, তারপর ঈশ্বরে বা অন্য মানুষে বিশ্বাস।' বাস্তবিক, আমাদের নিজেদের ওপর কোন বিশ্বাস ছিল না, সেইজন্যই আমাদের এত কষ্ট পেতে হয়েছে। স্বামীজীর মাধ্যমে বেদান্তের এই ভাবটি আমাদের আপামর দেশবাসীর কাছে এই প্রথম প্রচারিত হচ্ছে। তাই বলছি, *আত্মশ্রদ্ধা* রাখুন। 'আমি পারি, আমি পারি। আমার মধ্যে মহাশক্তি আছে। দৈবসত্তা আমার হৃদয়ে সুপ্ত রয়েছেন,' এই মনোভাব রাখুন। এই হলো নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। তাই বিবেকানন্দ কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'প্রাচীন ধর্ম বলিত, যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করে সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম বলে, যে আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন না করে সেই নাস্তিক'। প্রথমে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন; তবেই ঈশ্বরে ও অপর মানুষে দৃঢ়, প্রবল বিশ্বাস হওয়া সম্ভব। এতদিন আমরা নিজেদের নানারকম দেবদেবীর ক্রীতদাস ভেবে ভেবে সত্যের থেকে বহু দূরে সরে গেছি।

অতএব, আজ আমাদের দেশবাসীকে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে, সেই এক অনন্ত ঈশ্বর বা পরমাত্মাই সকলের আত্মা এবং সকলেই এই আত্মাকে সবচেয়ে ভালবাসে। অন্য সব ভালবাসাগুলি এই প্রেমেরই আংশিক প্রকাশ এবং ঐ পরমাত্মাই হলেন শাশ্বত আত্মা—আপনার আত্মার আত্মা। সকলের মধ্যে যে পরমাত্মা রয়েছেন তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিন; তাহলে সকলকেই ভালবাসতে পারবেন। স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক যুগে উপনিষদের এই দর্শনটিকেই প্রচার করেছেন। এই দর্শন বিশ্বজনীন। জাতি, ধর্ম, ইত্যাদি কোন কিছুর সীমাবদ্ধতা এই দর্শন বরদাস্ত করে না। এই দর্শনের একটাই কথা—আপনি স্বরূপত আত্মা। রাশিয়া, চীন, সর্বত্র নারী ও পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ হলো আত্মা—অনন্ত আত্মা। কী গগনচুম্বী সত্য ঘোষণা যার প্রভাবে সমস্ত দাসত্ব, সবরকম ভয়ের শৃঙ্খল খসে পড়ে। এই নির্ভীকতার ধর্মই হলো উপনিষদের মহান শিক্ষা। স্বামীজী বলেছেন যে, পৃথিবীতে এই একটিমাত্র শাস্ত্র সর্বদা *অভয়* ও *শক্তির* শিক্ষা দিয়ে এসেছে। আমাদের প্রথমে এই শিক্ষাটিকে আয়ত্ত করতে হবে। 'আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম, আত্মার এই ব্রহ্মভাবকে ব্যক্ত বা বিকাশ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য'[১] : এইটিই হলো স্বামীজীর মুখে বৈদান্তিক সত্যের প্রথম ঘোষণা। নিজের নিজের ধর্মকে প্রথমে এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; তারপর ইচ্ছা

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬০

হলে মানুষ অন্য দেবতার পূজা করতে পারে, তবে এই কথা জেনে যে সমস্ত পূজাই শেষ পর্যন্ত সেই একই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। নাম নিয়ে ঝগড়া করবেন না। স্বর্গলোকনিবাসী আমাদের পিতা, আল্লা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—সবই সেই এক অনন্ত সত্তারই বিভিন্ন নাম।

অতএব, কলহ করবেন না, কারণ সত্য এক। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে আমাদের বলছেন যে, 'হৃদয় যখন নানা কামনায় আকৃষ্ট হয়, তখন প্রথমেই তোমার বিবেকবুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়; জ্ঞান নষ্ট হয়'; তখনই আমরা দুর্বল হয়ে দেবতাদের কাছে গাভীতুল্য আচরণ করি। 'দেবতাদের কাছে গাভীর মতো আচরণ করো না!' এইটিই উপনিষদের বাণী। মানুষ এতকাল ধরে দুর্বল হয়ে থেকেছে, নিজেদের সম্মোহিত করে রেখেছে, এখন আর এ ভাব নিয়ে চলা উচিত নয়। নিজেকে আর অযথা সম্মোহিত করে রাখবেন না। শক্তিমান হোন, অন্তরের দিব্যতাকে প্রকাশ করুন। উঠে পড়ে লাগুন।

২০শ শ্লোকে এই মহান সত্য বলার পর ২১তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি ।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

—'যে যে দেবমূর্তি যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করতে চান, তাঁর সেই শ্রদ্ধাকে আমি অবিচলিত রাখার ব্যবস্থা করি।'

শ্রীকৃষ্ণ কত উদার দেখুন। বলছেন, *যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়া অর্চিতুম্ ইচ্ছতি,* 'যে ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে কোন বিশেষ দেব বা দেবীমূর্তির পূজা করতে চান,' আমি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করতে সাহায্য করি। *তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্,* 'আমি তাঁর অন্তরের সেই শ্রদ্ধাকে আরও দৃঢ় করি'। কোন ভক্ত ওইভাবেই তার ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যক্ত করছেন। এখন যদি আমি তাঁর মনে সংশয় সৃষ্টি করি, তাহলে সে সমস্ত কিছু হারাবে। সুতরাং, এ অবস্থায় আমি তাঁর বিশ্বাস নষ্ট করি না। ঈশ্বরের কাছে মানুষকে ধীরে ধীরে, বিবেকবিচার ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসতে হবে। এরপর শ্রীকৃষ্ণ উদারতা শিক্ষা দিয়ে বলছেন—'কারোর নিন্দা কর না'। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীতেও আমরা এই ভাবটি পাই, 'কারও নিন্দা কর না।' যদি কাউকে ভালো কিছু দেখাতে পার, দেখাও, কিন্তু নিন্দা কর না। প্রত্যেককে তার আপন শ্রদ্ধায়, আপন বিশ্বাসে শক্তিশালী কর; তাহলে দেখবে পরে তার

মধ্যে পরিবর্তন আসছে। তাই 'নিন্দা কর না', এটি হলো স্বামীজীর দেওয়া একটি মহান ধর্মাদেশ। শ্রীরামকৃষ্ণও তাই বলেছেন। বাস্তবিক, এই উদার ভাবটি হিন্দু ধর্মে বরাবরই রয়েছে। তাই কোন সাধনকেই নিন্দা করবেন না।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে নরেন, ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ, তখনকার কলকাতার একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিন্দা করেছিলেন। সবকিছু শোনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদুভাবে বলেছিলেন, 'নরেন, তাদের স্বাগত জানাও। তারা তাদের বোধশক্তি অনুযায়ী সাধন করছে। প্রত্যেক বাড়িতে ঢোকার যেমন সদর দরজা আছে, তেমনি খিড়কির দরজাও আছে। কিছু লোক ঢোকে সদর দরজা দিয়ে, আর কিছু লোকের খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকতে ভালো লাগে, যেখানে শৌচাগার আছে। খিড়কির দরজা দিয়েও তো ঢোকা যায়। তাই, নিন্দা কর না। এটি, এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিন্দা না করার যে শিক্ষা দিচ্ছেন, তারই প্রতিধ্বনি। এ শিক্ষা আমাদের অনুসরণ করতে হবে। এ যুগে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার সময় এই শিক্ষাটি আমরা নিজেরা যেন মনে রাখি। ছেলেমেয়েরা সামান্য ভুল করলে যদি তাদের ভর্ৎসনা করতে শুরু করেন, তাহলে তারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারাবে ও দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়বে। অতএব, তাদের উৎসাহ দিন। তাদের সঙ্গে মিশে বন্ধুর মতো খেলা করুন, তাহলেই তারা উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠবে। শিক্ষাদানের এইটিই সঠিক পন্থা এবং ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই। শিক্ষা ও ধর্ম, এই দুটি হলো মানুষের অগ্রগতির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সোপান। সুতরাং নিন্দা না করা একটি মহৎ ভাব। শ্রীকৃষ্ণ এখানে সেই মহৎ ভাবটি দিচ্ছেন। আপনি যদি সহানুভূতি ও নম্রতার সঙ্গে মহত্তর কিছু না দেখাতে পারেন এবং যদি একজন মানুষকে তার জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে দোষারোপ করতে থাকেন, তাহলে তার ফল বিষময় হবে, কারণ এতে তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে।

সুতরাং, 'তার অন্তরের এই শ্রদ্ধাকে আমি দৃঢ়তর করি'। কিন্তু তাতে ঐ ভক্তের কী লাভ হয়? পরের শ্লোকটিতে তারই উত্তর দেওয়া হচ্ছে ঃ

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে ।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২॥

—'শ্রদ্ধাযুক্ত সেই ভক্ত সেই বিশেষ দেবতার আরাধনায় রত হন এবং তাঁর কাছ থেকে আমারই বিহিত কাম্যবস্তু লাভ করেন।'

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ তস্যারাধনম্ ঈহতে, 'সেই শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্ত সেই বিশেষ দেবমূর্তির আরাধনা করে'; *লভতে চ ততঃ কামান্,* 'তার বাঞ্ছিত ফল লাভ করে'। কিন্তু কে ভক্তকে অভীষ্ট ফল দেয়? *ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্,* 'অনন্ত উৎস একমাত্র আমার কাছ থেকেই এই কর্মফল আসে'; একমাত্র আমার কাছ থেকেই, কোন দেবতার কাছ থেকে নয়। সুতরাং, আপনি যে পূজাই করুন আর যে ফলই পান, শেষ পর্যন্ত তা আসে ঐ এক শাশ্বত উৎসস্থল থেকে।

পরের শ্লোকে ভগবান বলবেন, বিচার করে দেখলে আমরা বুঝতে পারব যে এইসব সুখ-সুবিধাগুলি ক্ষণস্থায়ী, খুবই সীমিত; দেখতে পাব যে, এই সব দেবতার আরাধনা করে যে প্রাপ্তি হয়, সেগুলি উচ্চবস্তু নয়, মহান আধ্যাত্মিক উন্নতি বা জ্ঞান বা প্রত্যক্ষানুভূতি নয়। প্রশ্ন হতে পারে, দেবতাদের অথবা পরমেশ্বরের পূজা করলে আপনি কী ফল লাভ করবেন? তার উত্তর পরের শ্লোকে দেওয়া হচ্ছে ঃ

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

—'কিন্তু এইসব অল্পবুদ্ধি নরনারী দেবতাদের পূজা করে যে ফল অর্জন করেন তা অস্থায়ী। দেবতাদের উপাসকরা নিজ নিজ দেবতার কাছে যান এবং আমার ভক্তেরা আমার কাছে আসেন।'

অন্তবত্তু ফলং তেষাং, 'তাঁরা যে সব ফল পান, তা সবই অস্থায়ী প্রকৃতির'; কিছুকাল পরে সেই অর্জিত ফল শেষ হয়ে যায়। যে সিদ্ধিই তাঁদের কাছে আসুক না কেন, তার স্থায়িত্ব কিছুকালের জন্য। তৎ *ভবতি অল্পমেধসাম্,* 'কারণ তাঁরা অল্পবুদ্ধি'। তাঁদের বৈষয়িক বুদ্ধি হয়ত খুব বেশি, কিন্তু 'তাঁদের আধ্যাত্মিক বুদ্ধি অতি সীমিত', *অল্পমেধসাম্;* কারণ অন্তরের মোহান্ধকার তাঁরা ভেদ করতে পারেন না এবং বাসনার স্রোতে তাঁদের বিবেক ভেসে গেছে। অতএব নিজেদেরই প্রশ্ন করতে হবে—দেবতাদের পূজা করে আমরা কী ফল পাব, আর অনন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করেই বা কী ফল পাব? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদেরই খুঁজে পেতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *দেবান্ দেব যজো যান্তি,* 'দেবতাদের উপাসকরা তাঁদের উপাস্য দেবতার কাছে যান'; এবং মদ্ভক্তা *যান্তি মাম্ অপি,* 'আমার ভক্তেরা আমার কাছে আসেন।'

এখানে, *মাম্ অপি* শব্দদুটি লক্ষণীয়। অর্থাৎ, পরমেশ্বরের মানবাবতাররূপে

'তাঁরা একমাত্র আমাকেই (শ্রীকৃষ্ণকেই) লাভ করেন'। অনুরূপভাবে একথা ভগবান বুদ্ধ, যিশু খ্রিস্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীরাম সম্পর্কেও প্রযোজ্য, কারণ এঁরা সকলেই মানবদেহধারী ঈশ্বরাবতার। কিন্তু সকলেই বোঝে না যে, এই ব্যক্তি বাস্তবে লীলাবিগ্রহধারী ঈশ্বর, কারণ বাইরের রূপ দেখে তাঁরা বিভ্রান্ত হন। চতুর্থ অধ্যায়ের ৪র্থ থেকে ৮ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলেছেন। এখানে তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, কেন সকলে ঈশ্বরাবতারকে চিনতে পারে না।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

—'আমার অব্যয়, তুরীয়, অপরিবর্তনীয় পরমাত্মস্বরূপ না জেনে অবিবেকিরা মনে করে যে, অব্যক্ত বা অপ্রকট আমি, ব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়েছি।'

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'প্রকৃতরূপে আমি *অব্যক্তম্* বা অপ্রকাশিত, জগৎপ্রপঞ্চের প্রকটিত লীলার অতীত; সেইটিই আমার যথার্থ স্বরূপ'। কিন্তু এখন মনুষ্যরূপে আমি ব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়েছি; অনন্ত ঈশ্বর সান্ত মনুষ্যরূপ ধারণ করেছি। সাধারণ মানুষ আমাকে এই মানুষরূপেই দেখে। তারা আমার *অব্যক্ত* দিকটি দেখে না, শুধু আমার *ব্যক্ত* রূপই দর্শন করে। *মন্যন্তে মাম্,* 'তারা আমাকে (ব্যক্ত) মনে করে'; *অবুদ্ধয়ঃ,* 'যাদের বুদ্ধি অল্প'; *অবুদ্ধিঃ,* 'যাদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিপক্ক নয়'; *পরং ভাবম্ অজানন্তঃ,* 'আমার উচ্চতর স্বরূপকে উপলব্ধি না করে'। সামনে যা দেখা যাচ্ছে, তা আমার মনুষ্যরূপ, কিন্তু আমার মধ্যে যে একটি ঐশীসত্তা আছে, সেটি তারা বোঝে না, দেখতে পায় না; *মম অব্যয়ম্ অনুত্তমম্,* 'আমার অপরিবর্তনীয়, তুরীয় স্বরূপ।' আমি সমস্ত জীবজগতের ঊর্ধ্বে পরম সত্য। আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। আমার সেই দিকটি তারা দেখতে পায় না। ইন্দ্রিয়গুলি তাদের যা দেখায়, তারা তাই দেখে ও মনে করে যে 'শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মতোই ক্ষুদ্র মানুষ। আমাদের মতোই খায়, দায়, থাকে। সুতরাং সে আমাদেরই একজন, ওর মধ্যে উচ্চতর বিশেষত্ব কিছু নেই।' এই অল্প বুদ্ধির জন্যই মানুষ মহত্ত্বের মূল্য দিতে পারে না। অপরের মহত্ত্ব অনুভব করতে হলে নিজের মধ্যেও কিছুটা মহত্ত্ব থাকা চাই। এই সত্য ও সুন্দর ভাবটি আমাদের সমাজে গৃহীত হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। আমরা সব সময়েই মানুষকে বিচার করি। সেটি হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু কীভাবে আমরা বিচার করি? আমরা বিচার করি আমাদের নিজের অভিজ্ঞতার মানদণ্ড দিয়ে। কিন্তু আমাদের

বোধবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার বাইরেও যে উচ্চতর দিক থাকতে পারে, সে কথা আমরা ভাবি না এবং ঐ মহৎ মানুষের মধ্যে কী প্রচণ্ড শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে, তাও আমরা দেখতে পাই না।

গান্ধীজী যখন ভারতবর্ষের দিগন্তে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আবির্ভূত হলেন, অনেক মানুষই তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—'এঁর মধ্যে কী আর এমন আছে?' অন্যতম কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু যখন ঠাট্টা করে তাঁর শীর্ণ শরীরকে মিকি মাউসের সঙ্গে তুলনা করলেন, গান্ধীজী মৃদু হেসে তা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই দেশবাসী জানতে পারল এই 'মিকি মাউসের' ভিতরে কত শক্তি, কত ক্ষমতা রয়েছে, যা সারা দেশ তথা দুনিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা আমাদের নিতে হবে যে আমরা যেভাবে ওপর ওপর মানুষকে বিচার করে ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকি, সেটি মোটেই অভিপ্রেত নয়। একটু সংশয় থাকা বরং ভালো—'আমি এটা মনে করি, কিন্তু আমার ভুলও হতে পারে'—এই ভাব। অবশ্য বিচার তো করতেই হয়, বিচারের ওপর নির্ভর করেই জীবনে চলতে হবে। কিন্তু একটা কথা, যখনই বুঝবেন আপনার বিচারধারা বদলানো প্রয়োজন, তখন সেই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পিছপা হবেন না। মনে রাখবেন, অবস্থা অনুসারে চটপট নিজের ভুল শুধরে নেওয়ার ক্ষমতা বড় মানুষের লক্ষণ।

তাই, অবতাররূপে ঈশ্বরের সর্বোচ্চ প্রকাশ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, অবতারপুরুষের পরিমাপ করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে, কারণ তিনি অসামান্য, অ-সাধারণ। রোমাঁ রোলাঁ তাঁর লেখা 'Life Of Ramakrishna' গ্রন্থের ভূমিকাতেই শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনা দিয়েছেন। রোমাঁ রোলাঁ-র মতো একজন বিদগ্ধ শৈল্পিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন লেখকই শ্রীরামকৃষ্ণের মতো অলোকসামান্য মহাপুরুষের স্থূল রূপ ভেদ করে আভ্যন্তরীণ বিশাল শক্তির কিছুটা আঁচ পেতে পারেন, কারণ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি স্থূল, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই জন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের কথা লেখবার আগে তিনি তাঁর ভূমিকায় এই চমৎকার কথাটি লিখতে পেরেছিলেন ঃ

'সমসাময়িক যুগের প্রবাহ ও ঘূর্ণাবর্ত থেকে বহু দূরে অত্যন্ত সীমিত গণ্ডির মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের বাহ্য জীবন আবদ্ধ ছিল।'

অতি সত্য কথা! প্রায়-নিরক্ষর এক পূজারি ব্রাহ্মণ, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের এক কোণে পড়ে থাকতেন। বাইরে থেকে দেখলে, তাঁর মধ্যে আর কী বিশেষত্ব ছিল? কিন্তু পরের লাইনেই রোলাঁ লিখছেন ঃ

'তাঁর অন্তর্জীবন (কিন্তু) সবরকম দেবদেবী ও মানুষে পরিপূর্ণ ছিল।'

অনুরূপভাবে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে বুদ্ধ 'মহা শ্রমণ' বা একজন মহাভিক্ষু ছিলেন। কিন্তু তিনি সমগ্র এশিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কোথা থেকে তিনি এই শক্তি পেয়েছিলেন? এ শক্তি তাঁর মধ্যেই ছিল, কিন্তু তিনি দেখতে এতই সাধারণ ছিলেন যে সেই সময়ে মানুষ তা বুঝতে পারেনি। সেইজন্য, কখনও কখনও মহান ব্যক্তিদের কাছ থেকে না দেখে, কিছু সময়ের ব্যবধানে দেখা বা বিচার করাই ভাল।

এই সত্যটি শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্পের মাধ্যমে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। একজনের একটি হীরে ছিল। সে সেটি নিয়ে সবজিওয়ালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল : 'এই হীরের বদলে আমাকে কতটা সবজি দেবে?' 'দশকিলো আলু দিতে পারি, তার বেশি নয়'। তারপর সে কাপড় বিক্রেতার কাছে গেল। কাপড়ওয়ালা বলল, সে ন গজ কাপড় দিতে পারে, তার বেশি নয়। শেষকালে জহুরির কাছে গিয়ে সে বলল, 'এর বিনিময়ে আমাকে কত টাকা দিতে পার'? জহুরি হীরেটা দেখেই বললে, 'আমি তোমায় দশ হাজার টাকা দেব।' আধ্যাত্মিক জীবনেও ঠিক এইরকমই ঘটে থাকে। তাই, যখন অপরকে বিচার করতে যাই, সর্বদা এই সত্যটি মনে রাখতে হবে যে, বিচার বিচারকের অভিজ্ঞতার সীমার উপর নির্ভরশীল। কেবল সেই সীমার মধ্যেই একজনের বিচার বা মূল্যায়ন হয়ে থাকে। সুতরাং, নিজের বিচারক্ষমতার ব্যাপারে একটু দ্বিধা থাকা ভালো; তাতে আমাদের মধ্যে গোঁড়ামি আসবে না। আমরা যা কিছু ভাবি শুধু সেটাই ঠিক, আর সব যে ভুল—এই ধরনের চিন্তা করাই গোঁড়ামি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক মনোভাব হলো, 'আমার এখন মনে হচ্ছে—এটুকুই জোরের সঙ্গে বলতে পারি, যদি পরে অন্যরকম বুঝি, নিশ্চয়ই আমার মত পাল্টাব'। অতএব বলুন, 'উপস্থিত যে তথ্য আমার হাতে আছে, সেই অনুযায়ী মনে হচ্ছে ঐটিই সত্য; কিন্তু যদি আরও তথ্য হাতে আসে যা আমার বর্তমান সিদ্ধান্তের পরিপন্থী, তাহলে আমি সিদ্ধান্ত বদলাতে প্রস্তুত।' একেই প্রবুদ্ধ মন বলে। সমাজে আজ এই যুক্তিঋদ্ধ বৈজ্ঞানিক মানসিকতার একান্ত প্রয়োজন। সত্যের অন্বেষণ করাই আমাদের ব্রত, নিজেদের মতামতের ঢাক পেটানো আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা আমাদের মতামতকে সর্বদা সত্যের কষ্টিপাথরে ঘষে দেখব। যখন গোটা দেশ এই বৈজ্ঞানিক মানসিকতাকে সাদরে বরণ করে নেবে, তখনই মানবীয়

অগ্রগতির একটি নতুন অধ্যায় রচিত হবে। আমাদের সমাজে এখন এটিরই অত্যন্ত প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ *অব্যক্তং ব্যক্তিম্ আপন্নম্,* 'যা *অব্যক্ত* তা *ব্যক্ত* হয়েছে, যা অপ্রকাশিত তা প্রকাশিত হয়েছে'; *মন্যন্তে মাম্ অবুদ্ধয়ঃ,* 'যারা অল্পবুদ্ধি তারা আমার সম্বন্ধে এইরকম ভাবে'; তারা ভাবে যে জগতের অন্য সকলের মতো শ্রীকৃষ্ণও একজন ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ মানুষ; *পরং ভাবম্ অজানন্তঃ,* 'আমার পরম প্রকৃতি না জেনে'। যিশুর সময়কার কিছু লোক বলেছিল, 'উনি ছুতোর মিস্ত্রির ছেলে না?' শব্দগত কিছু পার্থক্য বাদ দিলে ৯ম অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকটির সঙ্গে এই শ্লোকটির সাদৃশ্য আছে। ঐ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবম্ অজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

—*মাম্ অবজানন্তি মূঢ়াঃ,* 'যারা মূঢ়, তারা উপহাস করে আমাকে'; *মানুষীং তনুম্ আশ্রিতম্,* 'যে মনুষ্য শরীর ধারণ করেছে'; *পরং ভাবম্ অজানন্তঃ,* 'আমার উচ্চতর স্বরূপ না জেনে'; *মম ভূতমহেশ্বরম্,* 'এই ব্রহ্মাণ্ডের মহেশ্বররূপ আমার শ্রেষ্ঠ ভাবটি (না জেনে)'।

এই হলো *পরং ভাবম্ অজানন্তো মমাব্যয়ম্ অনুত্তমম্* শ্লোকটির অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এই আমার প্রকৃত স্বরূপ। আমি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। জগতের উদ্ধারকার্যের জন্য মনুষ্যদেহ অবলম্বন করেছি, কিন্তু এই নরলোক আমার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। বাস্তবিক, অন্তর্দৃষ্টির অভাবে অবতারকে আমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি। অন্যান্য দেশে যিশুর ন্যায় অবতারদের ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। ভারতবর্ষে অন্তত সেটা হয় না, কিন্তু শুরু থেকে মানুষ তাঁদের নিন্দা করে, যদিও ধীরে ধীরে বোঝে যে, 'হাঁ, এঁরা যা বলছেন, তা ঠিক।' কলকাতার কিছু মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলত, 'আচ্ছা, দক্ষিণেশ্বরের ঐ পূজারি বামুনটি কে? শুনেছি, মাঝে মাঝে স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি নাকি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন?' কিন্তু যাঁরা বুঝতেন, তাঁরা এই ব্যক্তির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছিলেন। যেমন কেশবচন্দ্র সেন। তিনি আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতেন। তিনি ঈশ্বরের ভক্ত ছিলেন, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা ছড়াতে লাগলেন; বললেন, 'ইনি সাধারণ মানুষ নন; ইনি অসাধারণ'। তাঁর কথাতেই কলকাতার লোকের শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে চৈতন্য হলো ও অন্তরঙ্গ ভক্তরা, বিশেষত তরুণ ভক্তরা, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এই ভক্তদের মধ্যেই ছিলেন পরবর্তিকালের স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্যরা।

এরপর ২৫ তম শ্লোকে ভগবান বলছেন ঃ

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

—'আমি *যোগমায়া* বা ঐশী মায়া দ্বারা আবৃত থাকায় সকলের কাছে প্রকাশিত হই না। এই মোহান্ধ জগৎ জন্মহীন ও অপরিবর্তনীয় আমাকে জানতে পারে না।'

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য, 'আমি সকলের কাছে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত নই'। কেন? *যোগমায়াসমাবৃতঃ*, 'কারণ, আমি আমার নিজের যোগমায়া দ্বারা আবৃত', *যোগমায়া* হলো আমারই বিস্ময়কর *মায়া*, যার সাহায্যে আমি যে-কোন রূপধারণ করতে পারি; *মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মাম্*, 'এই মোহান্ধ মূর্খ জগৎ আমাকে জানে না'; *অজম্ অব্যয়ম্*, '(যে) আমি *অজম্*, জন্মহীন ও *অব্যয়ম্*, অবিনাশী।' আমার এই পরিচয়টি *মূঢ়ঃ অয়ং লোকঃ*, 'এই মোহাবৃত জগৎ'; *নাভিজানাতি*, 'জানতে পারে না'। শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই এখানে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এবং এই কারণেই তাঁকে কত দুঃখকষ্ট পেতে হয়েছিল। এমনকি একজন তাঁকে 'স্যমন্তক' মণি চুরির দায়ে অভিযুক্ত করেছিল এবং কিছু লোক তাঁকে সত্যসত্যই চোর ভাবতে শুরু করেছিল। এই কারণে, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে তাঁকে স্যমন্তক মণি খুঁজে বার করে, তার মালিক সত্যজিতের কাছে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, কিন্তু তাঁকেও সাধারণ মানুষের মতো এইসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। বুদ্ধদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণেরও নানা সমস্যা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তো গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দেহরক্ষা করলেন। এইসব দেখে আপনাদের মনে হতেই পারে যে, 'এই ব্যক্তি কেমন করে ঈশ্বর হতে পারেন? তা হতে পারে না। তিনি একজন সাধারণ মানুষ মাত্র'। এই ধরনের চিন্তা অনেকের মনেই উদিত হবে। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধে সচেতন, তাঁরাই কেবল বাইরের আবরণ সরিয়ে ভিতরের মানুষটিকে দেখতে পারেন, পারেন তাঁর প্রকৃত মূল্য অনুভব করতে।

তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, 'অন্যের কাছে সাধারণ মানুষরূপে প্রতীয়মান হওয়ার জন্য আমি আমার *যোগমায়া* দিয়ে আমাকে এবং আমার অক্ষয়, অবিনাশী, অনন্ত সত্তাকে আবৃত করে রাখি।' এই কারণে তারা শুধু আমার সান্ত মূর্তি দেখে, অনন্ত সত্তাকে দেখতে পায় না। এই হলো মায়ার প্রকৃতি।

মায়ার জন্য অসীমকে সসীম মনে হয়, অবিনাশীকে বিনাশী মনে হয়। আমরা সকলেই এই মায়ার অধীনে। এইজন্যই আমরা অবতারের ঐশ্বরিক ভাব বুঝতে পারি না। ২৫ তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই অসাধারণ গুহ্য সত্যটি ব্যক্ত করেছেন।

পরবর্তী শ্লোকে এবং বাকি ৪টি শ্লোকের মধ্যে তিনটিতে বেশ কিছু সুন্দর সত্য পরিবেশিত হয়েছে। ২৭ তম ও ২৮ তম শ্লোকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

—'হে অর্জুন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত ভূতবস্তুকেই আমি জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না।'

বেদাহং সমতীতানি ভূতানি বর্তমানানি চ অর্জুন, 'হে অর্জুন, অতীত ও বর্তমানের সমস্ত ভূতবস্তুকে আমি জানি'; *ভবিষ্যাণি চ,* 'এবং ভবিষ্যতেরও'; *মাং তু বেদ ন কশ্চন,* 'কিন্তু আমাকে কেউ জানে না'; আমার প্রকৃত স্বরূপ কেউ জানে না। এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ ২৬ তম শ্লোকে বলছেন।

এরপর বৈজ্ঞানিক মনোভাব বা প্রবুদ্ধ মনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে দুটি বিখ্যাত শ্লোকে, যার উপর শঙ্করাচার্য ভাষ্য দিয়েছেন এবং কিছু বৈজ্ঞানিক সত্যের ওপর এমন আলোকপাত করেছেন, যা বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের অন্যতম অবদান। বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও অনুসন্ধান আমাদের বৈজ্ঞানিক সত্যের দিকে নিয়ে যায়। ভারতবর্ষ যতদিন বিজ্ঞানকে ধরে ছিল, ততদিন তার উন্নতি অব্যাহত ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে আমরা বিজ্ঞান ছেড়ে পৌরাণিক ও কুসংস্কারযুক্ত ভাব পোষণ করতে শুরু করলাম, সেদিন থেকেই দুর্বলতা আমাদের পেয়ে বসলো। লক্ষ্য করে দেখবেন যে, নবম শতাব্দী থেকেই ভারতবর্ষে এই দুর্বলতা প্রবেশ করেছিল। আজ আমরা সেই দুর্বলতা থেকে বেরিয়ে আসছি। সুতরাং বলা চলে যে, আজকের আমাদের যে বিজ্ঞানচর্চা, তা এক অর্থে বিজ্ঞানের পুনঃপর্যালোচনা। কারণ, বিজ্ঞান আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়; আমরা বহু পূর্বে তার যথেষ্ট চর্চা করেছি। কয়েক শতাব্দী বিজ্ঞানকে বিস্মৃত হয়ে ছিলাম, এই যা। আজ ভারতবর্ষ আবার এক নতুন বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে প্রবেশ করছে।

এবার আমরা ২৭তম ও ২৮তম শ্লোকে প্রবেশ করব। আমি এই দুটি

শ্লোকের গুরুত্ব বিশেষভাবে দেখাতে চাই। দেখাতে চাই কীভাবে শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে গীতার বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছেন ও তার উপর জোর দিয়েছেন। গীতায় শুধু এইটুকু বলা হয়েছে ঃ

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

—'হে ভারত, হে পরন্তপ, *ইচ্ছা* ও *দ্বেষ* থেকে জাত দ্বন্দ্বই মোহ সৃষ্টি করে এবং সকল প্রাণী উৎপত্তিকালে মোহগ্রস্ত হয়।'

হে অর্জুন, ইচ্ছা ও দ্বেষ, মনের এই দুটি আবেগের জন্য জন্মকাল থেকেই সমস্ত প্রাণী মোহাচ্ছন্ন হয়। প্রথম হলো *ইচ্ছা ঃ* 'আমি এটি চাই, আমি ওটি চাই, এই কামনা করি, ওই কামনা করি'। দ্বিতীয়টি *দ্বেষ ঃ* 'এটি না পেলে আমি রেগে যাব, সমস্ত কিছু তছনছ করব'। এইগুলিকেই বলে *ইচ্ছা* ও *দ্বেষ।* 'এই দুটি মোহের কারণে' মানুষ সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। *দ্বন্দ্ব মোহেন,* 'এই দ্বিবিধ মোহ দ্বারা', মানুষ সর্বদা বিভ্রান্ত। ইচ্ছা ও দ্বেষ বা ক্রোধ—এই দুটি মোহ সর্বদা একসঙ্গে থাকে। যেখানেই ইচ্ছা, সেখানে দ্বেষ অথবা ক্রোধও থাকবে। ইচ্ছাপূরণের পথে বাধা সৃষ্টি হলে আপনা থেকেই ক্রোধ আসে। এই হলো দুটি *মোহ বা* 'ভ্রান্তি'; *ভারত,* 'হে অর্জুন'; *সর্বভূতানি,* 'সকল প্রাণী'; *সম্মোহং সর্গে যান্তি,* 'উৎপত্তিকালে এই প্রচণ্ড মোহে আচ্ছন্ন হয়'; *পরন্তপ,* 'হে শত্রুদমনকারী', অর্থাৎ অর্জুন। ইচ্ছা-দ্বেষ রূপ এই দুই ভ্রান্তিতে পড়ে নরনারী অশেষ কষ্ট ভোগ করে। এখন, গীতার এই বিশেষ ভাবটির তাৎপর্য বা ব্যঞ্জনা উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য যা বলেছেন, তা অতি বিস্ময়কর। তিনি বলছেন ঃ ইচ্ছা ও দ্বেষজাত মোহে আচ্ছন্ন হয়ে শুধু যে আধ্যাত্মিক জীবনে মানুষ যন্ত্রণা ভোগ করে তাই নয়, দৈনন্দিন জীবনেও, যেখানে আমাদের বাহ্য প্রকৃতির মুখোমুখি হতে হয় এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে কাজের সম্পর্কে আসতে হয়, সেখানেও আমরা ইচ্ছা ও দ্বেষ দ্বারা মোহিত হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করি। চিন্তাটি তিনি সুললিত সংস্কৃত বাক্যে প্রকাশ করেছেন এইভাবে ঃ

ন হি ইচ্ছা দ্বেষ দোষ বশীকৃত চিত্তস্য যথাভূতার্থ
বিষয়জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে বহিরপি—

বহিরপি, 'আমাদের বাহ্য জীবনেও'; *জ্ঞানম্,* 'সঠিক জ্ঞান'; *ন উৎপদ্যতে,* 'আসে না'; *ইচ্ছা দ্বেষ দোষ বশীকৃত চিত্তস্য,* 'ইচ্ছা ও দ্বেষ দ্বারা দুষ্ট অথবা

বশীভূত মনে'; *যথাভূত অর্থ বিষয়জ্ঞানম্ ন উৎপদ্যতে,* 'কোন বস্তুর যথার্থ স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয় না'; *বহিরপি,* 'এমনকি বাহ্য জগতেও'।

এই কারণেই বৈজ্ঞানিকরা আমাদের আবেগবর্জিত হয়ে মনের অনুশীলন করতে বলেন, অভ্যস্ত হতে বলেন নিরপেক্ষ বিচারধারায়। তাই, ইচ্ছা এবং আবেগের স্রোতে ভেসে যাবেন না। মনে করুন, আপনি কোন কিছুর ওপর গবেষণা করছেন। আপনি চাইছেন বিশেষ একটি সিদ্ধান্ত গবেষণার ফলের মধ্যে প্রতিফলিত হোক। ঐ ইচ্ছা যদি আপনাকে তাড়া করে ফেরে, তবে নিশ্চয় আপনি ঐ সিদ্ধান্তটি গবেষণার ফলাফলে খুঁজে পাবেন, কিন্তু সেটি সত্য হবে না। তাই ঐ আগাম-ইচ্ছাটিকে দূর করতে হবে। 'সত্য কী তা দেখে তবেই আমি তা বিশ্বাস করব'—এটিই বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং এইভাবে ইচ্ছা ও দ্বেষকে মন থেকে নির্মূল করতে হবে। ওদুটি থাকলে বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে বিচার নির্ভুল হবে না। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, হাইকোর্টের বিচারকের বিশেষ এক অভিযুক্তের প্রতি যদি পক্ষপাত থাকে, তবে তাঁর বিচারে ভুল হবে। তাঁর যদি কোন পক্ষপাত না থাকে, তবে তাঁর সামনে যে সব তথ্য রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে তিনি বিচার করবেন এবং সেটিই হবে ন্যায় বিচার।

এইভাবেই প্রবুদ্ধ বা বৈজ্ঞানিক মন বিকশিত হয়ে নানা বিষয়ের সত্য আবিষ্কার করে; আপনি যা দেখতে *চান* তা নয়, যা বাস্তবিক আছে তাই—যাকে শঙ্করাচার্য তার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের দ্বিতীয় সূত্রে বলছেন *বস্তুতন্ত্রজ্ঞান,* অর্থাৎ 'অস্তিমান সত্য থেকে উৎসারিত জ্ঞান'। কী অপূর্ব অভিব্যক্তি! *বস্তুতন্ত্রজ্ঞান। বস্তু* হলো সংস্কৃতের একটি পারিভাষিক শব্দ যার অর্থ হলো 'একটি জিনিস যেমন আছে তেমন'; *তন্ত্র* অর্থাৎ 'নির্ভর'; *জ্ঞান,* 'বস্তুনির্ভর জ্ঞান'। একেই বলা হয় *বস্তুতন্ত্রজ্ঞান।* বিজ্ঞান এমন সত্য আবিষ্কার করতে চায়, যা সকলের জন্যই সত্য। আর এক ধরনের জ্ঞান আছে, তা হলো *পুরুষতন্ত্রজ্ঞান,* 'ব্যক্তিগত ভাল-লাগা থেকে উদ্ভূত জ্ঞান।' এই জ্ঞানে যে সত্য নিহিত তা 'একান্ত ব্যক্তিগত', তাই বলা হচ্ছে, *পুরুষতন্ত্র।* 'আমি আম বা অন্য কোন ফল ভালবাসি।' এগুলি সবই আমাদের পছন্দের ব্যাপার। মানুষের জীবনে এরও স্থান আছে, প্রয়োজন আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসন্ধানের সময় আমাদের মনকে সমস্ত আসক্তি ও দ্বেষ থেকে মুক্ত করতে হবে। অন্য মানুষকে বিচার করার সময়েও এটি করা দরকার। তবেই সেই বিচার যথাযথ হবে।

সর্বভূতানি, 'সমস্ত প্রাণী'; *সম্মোহং সর্গে যান্তি*, 'ব্যক্ত জগতে, এই মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়'। তাঁর ভাষ্যে শঙ্কর বলেছেন *বহিরপি*, 'বাহ্য জগতেও'। বাহ্যজগতেও এই দ্বিবিধ মোহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সত্য আবিষ্কার করা যদি শক্ত হয়, তাহলে অন্তর্জগতে, পরমাত্মজ্ঞান লাভের জগতে, তা না জানি আরও কত কঠিন! কারণ, অন্তর্জগতে আপনার মনই সত্যের অনুসন্ধান করে, আবার সেই মনই বিবেচ্য; সুতরাং সিদ্ধান্তে পৌঁছানো রীতিমতো কঠিন। তাই, শঙ্করাচার্য প্রথমে বহির্জগতে সত্যানুসন্ধানের সমস্যার কথা বলেছেন। তারপর বলছেন :

কিমু বক্তব্যম্ তাভ্যাম্ আবিষ্টবুদ্ধেঃ সম্মূঢ়স্য
প্রত্যগাত্মনি বহু প্রতিবন্ধে জ্ঞানং ন উৎপদ্যতে ইতি—

কিমু বক্তব্যম্, 'কী আর বলা যাবে?' *তাভ্যাম্ আবিষ্টবুদ্ধেঃ*, 'সেই মন সম্বন্ধে যা এই দুটি [ইচ্ছা ও দ্বেষ] দ্বারা বশীভূত'; *সম্মূঢ়স্য*, 'মোহগ্রস্তের'; *প্রত্যগাত্মনি*, 'আমাদের অন্তরাত্মাকে জানার'; *বহু প্রতিবন্ধে*, 'বহু অন্তরায়'। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার পথে বহু বাধা এবং সেই কারণেই, *জ্ঞানম্ ন উৎপদ্যতে ইতি*, 'জ্ঞান আমাদের করতলগত হয় না'। কেন? এই দুটি বাধা থাকার জন্য। সুতরাং ভৌতবিজ্ঞানের অথবা মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রেই হোক, কিংবা আত্মাকে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বলে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্রেই হোক, আমাদের মন থেকে *ইচ্ছা* ও *দ্বেষ* এই দুটি হৃদয়াবেগকে দূর করতে হবে; তবেই তুমি পরম সত্যকে অনুভব করবে। *দুটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকের উপর আচার্য শঙ্করের দেওয়া এটি এক চমৎকার ভাষ্য*।

পরের শ্লোকটিতে বলা হবে, 'যাঁরা এই দুটি দোষ কাটিয়ে উঠেছেন, তাঁরাই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন'। সত্য সম্বন্ধে তাদের স্পষ্ট জ্ঞান হয়, কারণ সত্য নিত্যবস্তু। আমাদের কাজ শুধু সেই সত্যকে আবিষ্কার করা, চিনে নেওয়া। তা করতে হলে মন থেকে ইচ্ছা ও দ্বেষ নির্মূল করতে হবে।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

—'যে সকল পুণ্যকর্মা নরনারীর পাপ ক্ষয় হয়ে গেছে, তাঁরা (ইচ্ছা ও দ্বেষ-রূপ) দুটি মোহ থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে একাগ্র ভক্তি সহকারে ভজনা করেন।'

'যে সব মানুষ, ইচ্ছা ও দ্বেষরূপ দুটি দোষ কাটিয়ে উঠেছেন, তাঁরা নিজের

ভিতরে সকলের আত্মারূপে আমাকে যথার্থ উপলব্ধি করে'। তাঁদের কোন সমস্যা হয় না, কারণ তাঁদের মন শুদ্ধ। ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পারলে মন শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। মন তখন সত্যকে ছাড়া আর কিছু চায় না, সর্বভূতে অবস্থিত শুদ্ধ আত্মাকে ছাড়া আর কিছু চায় না এবং এই সত্যকে জানতে হলে মনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে আজ এই সত্যাভিমুখী মনের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। আমরা সত্য জানতে আগ্রহী নই। আমাদের যত মাথাব্যথা অন্যের মতামত নিয়ে। তাছাড়া, নানারকমের কুসংস্কার তো রয়েছেই। এখন বেশ কিছুদিন ধরে ছেলেমেয়েদের সত্য অনুসন্ধানের প্রণালীটি শেখাতে হবে। সেইটিই ঠিক ঠিক জ্ঞান এবং তারই মাধ্যমে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় গড়ে উঠবে। জীবনে মতামতের মূল্য অবশ্যই আছে, কিন্তু যেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেসব ক্ষেত্রে শূন্যগর্ভ মতামতের তেমন কোন মূল্য নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'Great convictions are the mothers of great deeds', অর্থাৎ 'দৃঢ় প্রত্যয় থেকেই মহৎ কার্য সম্ভব হয়।' যথার্থ জ্ঞান হলো সত্যের অন্বেষণ। আমি একটি জিনিস দেখছি, কিন্তু তার সম্বন্ধে সত্য কী বা সেটি সত্য কিনা, সে সম্পর্কে আদৌ কিছু জানি না। সেটি জানতে হবে। কারণ, একমাত্র এই জিজ্ঞাসু মনই একটি দেশে প্রচণ্ড মানসিক শক্তির উদ্বোধন ঘটাতে পারে। কোন বস্তুর সত্যতা যাচাই না করে তাকে গ্রহণ করবেন না। কেবল মতামত জেনে আপনার কী হবে? আপনার প্রয়োজন সত্যকে জানা। যদি প্রাথমিক শ্রেণি থেকেই আমরা শিশুদের এই শিক্ষা দিতে থাকি, তাহলে আমাদের সমাজ ও রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আসবে।

তাই বলা হচ্ছে, *যেষাং ত্বন্তগতং পাপং,* 'কিন্তু যাঁদের মনের পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে'; *পাপং* অর্থাৎ 'মনের দোষ বা কলুষতা'; *অন্তগতং,* 'শেষ হয়েছে'; *জনানাং,* 'ব্যক্তির'; *পুণ্য কর্মনাম্,* 'যাঁরা ভালো কাজ করেছেন'। আপনি যখন সৎকর্ম করেন, তখন আসক্তি ও বিদ্বেষ—এই অশুভ শক্তিগুলির দাপট কমে আসে। মনকে পরিশীলিত করার এক অসাধারণ উপায় হলো অন্যের কল্যাণ চিন্তা করা। এরপর বলা হচ্ছে, *তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা,* 'যাঁরা এই দুটি মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন'; *ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ,* 'দৃঢ়তা ও সংকল্প নিয়ে আমার সত্য স্বরূপের উপাসনা করেন।' এইটিই ঈশ্বরের যথার্থ উপাসনা।

আমরা যে বহু বাসনায় জর্জরিত, তা আগের শ্লোকগুলি আলোচনার সময়

দেখেছি। তাই, দেখবেন কোন কোন শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'এই দেবতার পূজা কর, তিনি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।' আমরাও অমনি এক দেবতা ছেড়ে অন্য দেবতার আরাধনা শুরু করি। আমাদের অনেকেরই এই ধাত। কোন দেবতার কাছ থেকে প্রার্থিত বস্তু না পেলেই আমরা নতুন কোন দেবতার দ্বারস্থ হই। বহুদিন আগে, ব্যাঙ্গালোরে আমার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি অনেকগুলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। একদিন তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি এতগুলি ধর্মীয় সংস্থার সদস্য হয়েছেন কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'স্বামীজী, আপনি কি জানেন না যে একটি ব্যাঙ্ক ফেল করলে আর একটি ব্যাঙ্ক আমাকে সাহায্য করবে?' এই ছিল তাঁর মনোভাব এবং এ মনোভাব আমাদের অনেকেরই আছে। ফলে, *ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ*, অর্থাৎ 'ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপকে ভজনা করার ভাবটি' আসে না। এইসব বিভিন্ন দেবদেবীর পিছনে যে '*ব্রহ্মই* এক ও অদ্বিতীয় অনন্ত ঐশ্বরিক সত্তা'—*একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম*—তা আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু পারি আর নাই পারি, এইটিই বিশুদ্ধ ধর্ম; এই বিশুদ্ধ তত্ত্বের অন্বেষণই আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ২৭ ও ২৮তম শ্লোকদুটিতে এমন সব প্রেরণাদায়ক ভাব রয়েছে যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাস্তবিক, বেদান্তে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার প্রভূত সুযোগ রয়েছে। কিন্তু কীভাবে? তার উত্তর এই, আমরা সত্যকেই খুঁজছি। এই কারণেই শঙ্করাচার্য *বস্তু তন্ত্র জ্ঞানম্* বা '*বস্তুভিত্তিক জ্ঞান*'-এর কথা বলেছেন—অর্থাৎ 'স্বভাবত বস্তুটি যেমন' তেমনভাবে জানা, আপনার তাকে যেমন মনে হচ্ছে তেমনভাবে নয়। বেদান্তবাদীরা এভাবেই সত্যের অন্বেষণ করেন। উপনিষদে শুধু সত্যের বিচার। 'সত্য কী?'—সেখানে শুধু এই প্রশ্নের ছড়াছড়ি। *মুণ্ডকোপনিষদে* একটি মহান ঘোষণা আছে : *সত্যমেব জয়তে*, 'একমাত্র সত্যেরই জয় হয়।' সত্য হলো সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ, তার মূল্যই সবচেয়ে বেশি। মহাভারতে ও আমাদের অন্যান্য সমস্ত ধর্ম সাহিত্যে দেখবেন সত্যের ওপর সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আপনার জীবনকে সত্যের আলোকে সার্থক করে তুলুন। মিথ্যার জীবন বরণ করবেন না। সত্য জ্ঞান অন্বেষণ করুন, মিথ্যা জ্ঞান নয়। এইভাবেই *সম্যক্ জ্ঞান* বা 'সত্য জ্ঞানের' উপর সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, যা আমাদের প্রকৃতিগত নয়, অর্থাৎ যা আমাদের স্বরূপে

নেই, তা অপসারিত করে মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মনকে তীক্ষ্ণ ও একাগ্র করে তুলতে হবে যাতে সে সত্যের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। মনের সেই ক্ষমতা বাড়াতে গেলে পছন্দ ও অপছন্দ, *ইচ্ছা* ও *দ্বেষ* ভাবের আবর্জনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

মনকে নিয়ন্ত্রণ করে শুদ্ধ করার এই অভ্যাস আমাদের প্রথম থেকেই আয়ত্ত করতে হবে। মনকে বলতে হবে, আপাতসত্য নয়, আমি পূর্ণ সত্যকে চাই। জ্ঞানের অনুসন্ধানকে তাই সত্যের অনুসন্ধানে পরিণত করতে হবে। এটি বহির্জগতে হতে পারে, সে ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলি *ভৌতবিজ্ঞান;* আবার অন্তর্জগতেও হতে পারে, তখন তাকে বলা হয় *অধ্যাত্মবিজ্ঞান।* দুটিই বিজ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ এই দুই বিজ্ঞানকে দুটি শ্লোকে (২৭ এবং ২৮) সমন্বিত করে, মনকে কীভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রশিক্ষিত করা যায়, তা চমৎকার ভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। মনের এই প্রশিক্ষণের ওপর আমাদের সর্বদা জোর দিতে হবে, কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এই দিকটি খুবই অবহেলিত। মনের অনুশীলন না শিখিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের মগজগুলোয় নানা তথ্য ঠেসে দেওয়া হয়। দুটি একেবারেই আলাদা জিনিস। কেবল তথ্যের ভারে মনের শক্তি বাড়ে না; তাতে বড়জোর মস্তিষ্কটি এক ধরনের অকেজো তথ্যভাণ্ডার বা Pandora's box হয়ে দাঁড়ায়, এই পর্যন্ত। চিন্তাশক্তি ছাড়া মন সমৃদ্ধ হয় না, জিজ্ঞাসা ছাড়া মনের বহুমুখী বিকাশ সম্ভব হয় না। কাজেকাজেই মনকে তালিম দেওয়া দরকার। তবেই চিন্তা স্বচ্ছ হবে। চিন্তা স্বচ্ছ হলে কথাবার্তাও স্পষ্ট এবং নিখুঁত হয়। বিভিন্ন সভায় অনেককে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে দেখেছি। কিন্তু ধন্যবাদ দিতে উঠে তাঁরা একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন এবং অনেকটা সময় নিয়ে নেন। যে বক্তব্য দুমিনিটেই শেষ করা যায়, সেখানে লেগে যায় আধঘণ্টা। কেন? কারণ মনের কোন শিক্ষা নেই। চিন্তার স্বচ্ছতা ও কথার স্পষ্টতা একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষা থেকেই আসে। তাই আমাদের মনকে ঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে আমরা যথাযথভাবে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে পারি—বেশি নয়, কমও নয়—অস্পষ্ট অনুমানভিত্তিক জ্ঞান নয়, নির্ভুল জ্ঞান। এখন আমাদের মন দুর্বল ও অস্বচ্ছ; চারপাশের জগৎকে প্রভাবিত করার কোন ক্ষমতাই তার নেই। সেইজন্যই মনের প্রশিক্ষণ একান্ত অপরিহার্য।

বাহ্য জগতের মতো অন্তর্জগতের ক্ষেত্রেও যদি এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

গ্রহণ করা যায়, তাহলে ধর্ম কখনই আর কুসংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হবে না। আজ ধর্মের নামে যত কুসংস্কার, তার একটাই কারণ—বৈজ্ঞানিক, যুক্তিপূর্ণ, সত্যান্বেষী মনের একান্তই অভাব। এটি হওয়া উচিত নয়। বিজ্ঞানমনস্ক হলে বেদান্ত বোঝা আপনার পক্ষে আরও সহজ হবে। কারণ বেদান্ত অতি সূক্ষ্ম বিচারের বস্তু। যাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যাঁদের মন স্বচ্ছ, তাঁরাই এই সূক্ষ্ম বিচার করতে পারেন। বিষয়টি যে খুব গোলমেলে তা নয়, বরং বলবো অত্যন্ত সহজ এবং একবার এই বৈদান্তিক সত্যকে জীবনে প্রয়োগ করতে শুরু করলে আপনার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি আসবে। আপনার চরিত্র মহান হবে। আগামী কয়েক দশকের মধ্যে আমাদের দেশে এই অগ্রগতি আনতেই হবে। কিন্তু তার জন্য প্রথমেই চাই বিজ্ঞানমনস্কতা বলতে কী বোঝায়, তা জানা, তারপর সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সনাতন ধর্ম ও বেদান্তের দিকে অগ্রসর হওয়া। খোদ উপনিষদই বলছেন, বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি হলো নির্ভেজাল সত্য এবং সেই সত্যের অনুসন্ধান। আপনি যখন সত্যের অনুসন্ধান করেন, তখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন; অন্যেরা তা পারে না। আপনি যদি কোন গোঁড়া মতবাদের সন্ধান করেন, তাহলে সেখানে প্রশ্ন করা চলবে না; কারণ গোঁড়া মতবাদে প্রশ্ন করা চলে না, সেখানে কোনরকম প্রশ্ন বরদাস্ত করা হয় না। কিন্তু সত্যকে বাজিয়ে নেওয়া চলে। আপনি যত প্রশ্ন করবেন, ততই ভালো। বেদান্ত সারা পৃথিবীকে ডঙ্কা মেরে আহ্বান জানিয়ে বলছে—আমার সিদ্ধান্তগুলি সত্য কিনা তা নিজেরা যাচাই করে নাও। *আজকের চিন্তাজগতে এই হলো বেদান্তের ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গি।* বেদান্ত আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানকে গ্রহণ করে, তাকে ভয় করে না। কিন্তু জড়বিজ্ঞানকে স্বীকৃতি দিয়ে, বেদান্ত সেখানেই থেমে যায় না। বেদান্ত মানুষকে ভৌতবিজ্ঞানেরও পারে নিয়ে যায়। যেখানে জড়বিজ্ঞানের শেষ, সেখান থেকে সে সযত্নে মানুষকে তার অন্তরে নিহিত সত্য উপলব্ধির পথে নিয়ে যায়। ভৌতবিজ্ঞানের বিষয় বিনাশশীল বাহ্য প্রকৃতি এবং বৈদান্তিক অনুসন্ধানের বিষয় হলো মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ও তার অবিনাশী সত্তা। মানুষের শরীরের ভিতর কোন্ গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে? উপনিষদ এবং বেদান্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সেই রহস্য উন্মোচন করেছে এবং এখানে গীতায় সেই সত্যই ঝংকৃত হচ্ছে। এই সত্যকে বরণ করলে অসাধারণ মানসিক ঐশ্বর্য ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় জীবনের আমূল রূপান্তর ঘটে যাবে। দেশের সামনে আজ এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রগতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সমন্বয়ে এক পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার অরুণোদয়ের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ

করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর রচনাবলীর ছত্রে ছত্রে তিনি দেখিয়েছেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও প্রণালীর সঙ্গে বেদান্তের চিন্তা ও প্রণালীর কী গভীর সাদৃশ্য! সুতরাং, বিবেকানন্দের দেখানো এই সমন্বয়ের পথ অনুসরণ করে ভারতবর্ষ এবার অবশ্যই বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতায় শক্তিশালী হবে।

পরবর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

—'যাঁরা আমাকে আশ্রয় করে জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করেন, তাঁরা ব্রহ্ম এবং সমগ্র *অধ্যাত্ম* ও সমস্ত কর্ম সম্বন্ধে অবগত হন।'

জরা ও মরণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে মানুষ ঈশ্বরের আশ্রয় নেয়। *জরা* অর্থাৎ 'বার্ধক্য' এবং *মরণ* হচ্ছে 'মৃত্যু'। আজকাল ইংরেজিতে একটি শব্দের চল হয়েছে—geriatrics। শব্দটি সংস্কৃত *জরা-র* ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ। জেরিয়াট্রিক্স-এর যাবতীয় চিন্তা বৃদ্ধবয়সের সমস্যা নিয়ে অর্থাৎ জরা নিয়ে। বাস্তবিক, জরা ও মরণ হলো আধুনিক যুগের দুটি বড় সমস্যা। *জরা মরণ মোক্ষায়* অর্থাৎ 'বার্ধক্য ও মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি'। ভারতীয় চিন্তার এটি এক বিশেষ অবদান। প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারা ডেলফির দৈববাণী বা প্রত্যাদেশ (ওরেক্ল অফ্ ডেলফি) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ঐ দৈববাণীর মর্মকথা ছিল—'মানুষ, নিজেকে জানো'। ঐ দৈববাণী অনুসরণ করে গ্রীসদেশের মানুষ প্রত্যাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যটি বুঝেছিল, কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনাটি বোঝেনি। তারা জীবন সম্বন্ধে জানত, কিন্তু *জরা ও মরণ* সম্বন্ধে বিলক্ষণ অজ্ঞ ছিল। সক্রেটিস ছাড়া আর কেউই কখনো এই বিষয়টি অনুসন্ধান করেনি। কিন্তু আমরা, ভারতীয়রা, বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করে এর অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কার করেছি এবং জেনেছি যে জরা ও মৃত্যু দেহের, অন্তর্নিহিত আত্মার তাতে কিছু যায় আসে না। দেহের মধ্যে যে অনন্ত আত্মা রয়েছেন তিনি সদামুক্ত, অপরিবর্তনীয় ও অবিনাশী। এটি এক বিস্ময়কর সত্য! প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী আত্মাকে শঙ্করাচার্য তাঁর *বিবেকচূড়ামণি-তে* এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন (২৫৬তম শ্লোক) ঃ

ষড়্ভিরূর্মিভিঃ অযোগি যোগিহৃদ্
ভাবিতং ন করণৈঃ বিভাবিতম্—

'অমৃতস্বরূপ আত্মতত্ত্ব পরিবর্তনের ছটি তরঙ্গ (অর্থাৎ ষড়বিকার) থেকে মুক্ত; একমাত্র যোগীর হৃদয়েই তা উপলব্ধ হয়, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তা লাভ করা যায় না।'

ছয়টি *উর্মি* বা 'পরিবর্তনের ষট্‌তরঙ্গ' আছে, যার দ্বারা জগতের সমস্ত কিছুই আক্রান্ত হয়, কেবল আত্মা তার ব্যতিক্রম। 'ঊর্মি' বা ঢেউ সংস্কৃত শব্দ যা শঙ্করাচার্য তাঁর *বিবেকচূড়ামণিতে* ব্যবহার করেছেন। ঊর্মির প্রথমটি হলো *জায়তে,* 'একটি বস্তুর জন্ম হলো'; তারপর *অস্তি*—অর্থাৎ যে বস্তুটি আগে ছিল না, তা এবার 'অস্তিমান হলো'। তারপর *বর্ধতে,* 'বাড়তে থাকে'। একটি শিশু জন্মাবার পর ধীরে ধীরে বড় হয়; পাঁচ বছরের মধ্যে সে কতই না সক্রিয় হয়ে ওঠে! এরপর, *বিপরিণমতে,* 'বিকশিত হয়'। ছেলেবেলা থেকে শিশুর ভিতর কতই না পরিবর্তন হতে থাকে। প্রতিনিয়তই তার রূপান্তর হয়। তারপর শুরু হয় নিম্নাভিমুখীগতি : *অপক্ষীয়তে,* 'ক্ষয় হতে থাকে'। অবশেষে *নশ্যতি,* 'মৃত্যু হয় বা সে আর ঐরূপে থাকে না।' এই হলো 'পরিবর্তনের ষট্‌তরঙ্গ' যা জগতের সমস্ত কিছুকেই গ্রাস করে, সৌরমণ্ডল ও ছায়াপথগুলিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। সব কিছুরই জন্ম, বৃদ্ধি, বিবর্ধন, অপক্ষয় ও মৃত্যু আছে।

কিন্তু এই যে পরিবর্তনশীল জগৎ, এর পিছনে রয়েছে অপরিণামী, অনন্ত, অমৃতময় সত্তা। মানুষের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভারতীয় ঋষিরা একদা এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেই সত্যই ব্যক্ত হয়েছে উপনিষদে। এই শাশ্বত সত্যই তাঁদের শক্তিমান করেছিল, অমর করেছে ভারতীয় সংস্কৃতিকে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এই 'এভারেস্টতুল্য' অভ্রভেদী চিন্তা ও অতলস্পর্শী অনুভূতির কথা পাওয়া যায় না।

বেদে বলা হয়েছে, 'জীবন ও মৃত্যু এক পরমেশ্বরের *ছায়া মাত্র'—যস্য ছায়া অমৃতম্, যস্য মৃত্যুঃ* (ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৮।১২১)। শুধু জীবন নয়, জীবন ও মৃত্যু, দুটি বাস্তব অবস্থাকেই বিশ্লেষণ করে তাঁরা এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি গড়ে তুলেছিলেন। এক সক্রেটিস ও প্লেটো ছাড়া গ্রীকরা কেউই জরা ও মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করেন নি। ব্রিটিশ পণ্ডিত লোয়েস ডিকিনসন (Lowes Dickinson) তাঁর 'The Greek View of Life'-গ্রন্থে এই মতামত প্রকাশ করেছেন।

তাই, এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *জরামরণমোক্ষায়,* 'জরা ও মরণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য।' যাঁরা জানেন আত্মা অব্যয় এবং মৃত্যু শুধু দেহেরেই হয়, তাঁরা অন্য মানুষের চেয়ে অনেকবেশি মানসিক শান্তি ও সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর

মুখোমুখি হন। 'আমার যাত্রা শেষ। এই দেহ এখন অকেজো হয়েছে, জরাগ্রস্ত হয়েছে; সুতরাং পরবর্তী অবস্থা মৃত্যু বা অপ্রকট হওয়া।' মৃত্যু যেন তাঁদের সখা। সেই বোধ নিয়েই তাঁরা মৃত্যুর মুখোমুখি হন। বলে ওঠেন, 'আচ্ছা, তুমি এসেছো, আমিও তৈরি। চলো।' এই মনোভাবটি জ্ঞান থেকে আসে, কারণ আমরা জানি যে আমাদের প্রকৃত সত্তা বা আত্মা পরিবর্তনের ষট্‌তরঙ্গের অতীত। যা কিছু জড় এবং ভৌতিক, তাই কেবল পরিবর্তনশীল। কিন্তু শুদ্ধচৈতন্য বা আত্মা অপরিবর্তনীয়। শঙ্করাচার্য তাঁর *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য*-এ লিখেছেন : *নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্ত পরমাত্মা। নিত্যশুদ্ধ,* অর্থাৎ 'সদা পবিত্র'; *নিত্যবুদ্ধ,* 'সদা জাগ্রত বা জ্ঞানদীপ্ত'; *নিত্যমুক্ত,* 'সদা মুক্ত'। এই হলো আত্মার স্বরূপ। আত্মা কোন অবস্থারই অধীন নয়। সত্য কী, তা আমরা জানি না বলেই নিজেদের পরাধীন মনে করি, বিনাশশীল মনে করি। কিন্তু একবার সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান হলে মৃত্যুর প্রতি আমাদের এই ভীতির মনোভাব দূরীভূত হবে। তখন আমরা বলতে পারবো 'মৃত্যু আসছে। তাতে কী? আমি মৃত্যুকে সাদরে বরণ করে নেব'। বিশ্বের সর্বত্রই আমরা শুনতে পাই বেশ কিছু মানুষ আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেন। বাস্তবিক, মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে বরং তার সম্মুখীন হওয়া উচিত। যেখানেই জন্ম, সেখানেই মৃত্যু। এ অবশ্যম্ভাবী। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এবিষয়ে অবহিত করেছেন। ঐখানেই এ কথাও বলা হয়েছে : *বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি,* 'কোনকিছুই এই অব্যয় সত্তা বা আত্মার বিনাশ ঘটাতে পারে না'। আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'এমনকি ঈশ্বরও আত্মাকে বিনষ্ট করতে পারেন না।' ভাষাটি একবার লক্ষ্য করুন, 'এমনকি ঈশ্বরও আমাদের প্রকৃত স্বরূপ সেই অনন্ত আত্মাকে বিনাশ করতে পারেন না।'

এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন : *মামাশ্রিত্য যতন্তি যে,* 'যারা আমাকে আশ্রয় করে সংগ্রাম করে'; *আশ্রিত্য* অর্থাৎ 'নির্ভর করে'। কাকে? আমাকে, সর্বজীবের অবিনশ্বর পরমাত্মাকে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে 'অন্তর্যামী' বা 'সকল জীবের অন্তরে অবস্থিত' এক অবিনশ্বর ও অব্যয় আত্মা রূপে বর্ণনা করছেন। *মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি যে,* 'যারা আমার ওপর নির্ভর করে সংগ্রাম করে চলে'; তে, 'তারা'; *বিদুঃ,* 'জানতে পারে'। কী জানতে পারে? *তে তৎ ব্রহ্ম বিদুঃ,* 'তারা সেই ব্রহ্ম, সেই অনন্ত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে।' তারপর বলা হচ্ছে, তৎ *কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্,* 'অন্তরাত্মা সম্বন্ধে সমগ্র সত্য'; *কর্ম চ অখিলম্,* এবং 'কর্ম সম্বন্ধেও সবকিছু'। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বলেছেন যে, আমি তোমার কাছে

সত্যের সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরব, কোন কিছুই বাদ দেব না; তাই পূর্ণ সত্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি অর্থাৎ সাধারণ ও শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির কথা বলেছিলেন। পরমেশ্বরের প্রতি শরণাগতির অবস্থায় এই জ্ঞান লাভ করা যায়। *অধ্যাত্মম্ কর্ম চাখিলম্,* 'উপরন্তু অধ্যাত্মবিষয়ক ও কর্মবিষয়ক সমগ্র জ্ঞানও হয়।' এককথায়, *অখিলম্* অর্থাৎ তাদের সামগ্রিক সত্য সম্পর্কে জ্ঞান হয়, এ কথাই এই বিশেষ শ্লোকে বলা হয়েছে।

শরীরের এই স্বাধীনতা নেই; সে সর্বদাই *জরা* ও *মরণের* অধীন। তাই কেউ যদি এই দেহকে খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী করতে চান তো তার ফল ভালো হবে না। অবশ্য প্রকৃতিও তা বরদাস্ত করবে না। প্রাচীন ভারতীয় মুনিঋষিরা এই নিয়মটি বুঝতেন। সেই সঙ্গে তাঁরা আরও আবিষ্কার করেছিলেন যে দেহের মৃত্যুতেই সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর পরও গভীরতর এক সত্য অম্লান থেকে যায়।

এবার বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিচার করে দেখা যাক। মৃত্যুসহ সব রকম পরিবর্তন যদি অভিজ্ঞতাই হয়, তাহলে কাউকে সেগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য হাজির থাকতে হবে। অর্থাৎ একজন দ্রষ্টা চাই, তা না হলে কেমন করে বলবেন যে মৃত্যু আছে? যে জীবিত সেই শুধু অন্য একজনের মৃত্যু দেখতে পায়। কিন্তু এই যে জীবিত ব্যক্তি, তারও তো একদিন মৃত্যু হবে; সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চেরই মৃত্যু হবে। কিন্তু সেই পর্যবেক্ষক, সেই চিরস্থায়ী দ্রষ্টা, সেই *সাক্ষী* নিত্য বর্তমান এবং তিনিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে আমরাই সেই শাশ্বত *সাক্ষী,* যে জগতের সব পরিবর্তন দেখে যাচ্ছে। একটি অপরিবর্তনীয় সত্তা না থাকলে কোন পরিবর্তন কখনওই প্রত্যক্ষ করা যায় না। জগতের সামনে বেদান্ত এই প্রশ্নটিই ছুঁড়ে দিয়েছে। আপনারা নিজেরাই ভেবে দেখুন। অপরিবর্তনীয় একটা কিছু না থাকলে কী করে পরিবর্তন দেখা সম্ভব? মনে করুন আপনি একটি ঘরে বসে আছেন। একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, কিছুক্ষণ থেকে তিনি চলে গেলেন। আপনিও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। এরপর ঐ ঘরে আর এক ব্যক্তি এলেন, আর একজনের সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। অবশেষে তাঁরাও দুজনে চলে গেলেন। কিন্তু কে নিশ্চিতভাবে বলতে পারে যে এইসব দেখাসাক্ষাৎ ঐ ঘরে ঘটেছে, যদি না কেউ সর্বদা ঐখানে থেকে মানুষের আসা যাওয়া প্রত্যক্ষ করে থাকে? যদি এইরকম একজন কেউ থাকে, তবেই সে বলতে পারবে যে, হ্যাঁ, এইসব

পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং, এই দৃশ্যমান পরিবর্তনশীল জগতের পিছনে একজন অদৃষ্ট পর্যবেক্ষক, *সাক্ষী* বা অপরিবর্তনীয় সত্তা আছেন। *সাক্ষী* শব্দটি অতীব সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে জাগ্রত অবস্থার যে অহং, তার নাশ হয় স্বপ্নাবস্থায়; স্বপ্নাবস্থার অহং-এর নাশ হয় সুষুপ্তিতে। কিন্তু কে এই অহং-এর আসা যাওয়া বুঝতে পারেন? যিনি পারেন, তিনিই সাক্ষিস্বরূপ শাশ্বত আত্মা। বেদান্ত যুক্তি দেখিয়ে জোরের সঙ্গে বলে—যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরিবর্তন দেখে যান, যিনি স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ড হয়েও ব্রহ্মাণ্ডের অতীত তত্ত্ব, তিনিই সাক্ষী, যেমন সমগ্র সৌরমণ্ডলের সাক্ষী হলো সূর্য। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকে (৮/৩/৩) এই সত্যটি অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্ ॥

—'যাঁর মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড, অর্থাৎ যাঁর থেকে এই ব্রহ্মাণ্ড, যিনি স্বয়ং এই ব্রহ্মাণ্ড, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুরও অতীত, তাঁতে আমি আশ্রয় নিলাম।'

অনন্ত অবিনাশী চৈতন্যকে আধুনিক পরমাণু-বিজ্ঞানীরা সবেমাত্র অল্পস্বল্প স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছেন। বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনার যখন আরো অগ্রগতি হবে তখন তাঁরাও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন। বাস্তবিক, চৈতন্য অখণ্ড ও অদ্বৈত। সেখানে দুই নেই, বহু নেই। পরমাণু-বিজ্ঞানী শ্রোডিঙ্গার (Schrodinger) চৈতন্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, 'চৈতন্য এক বচনাত্মক যার বহুবচন অজ্ঞাত' ঃ 'It is a singular of which the plural is unknown' অর্থাৎ, এটি একক, অনন্য বস্তু, যার বহুত্ব অসম্ভব। একে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের অতীত *তুরীয়* বা 'চতুর্থ' নামে বর্ণনা করে মাণ্ডূক্যোপনিষদের সপ্তম শ্লোকে বলা হয়েছে, *শান্তং শিবং অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ। শান্তম্* অর্থাৎ 'যাঁর পরিবর্তন নেই'; *শিবম্,* 'যা মঙ্গলজনক'; *অদ্বৈতম্,* 'যাঁর দুই নেই'; *মন্যন্তে,* 'তাঁকেই বিবেচনা করা হয়'; *চতুর্থম্,* 'তুরীয়রূপে'; *স আত্মা,* 'সেই হলো আত্মা'; *স বিজ্ঞেয়ঃ,* 'তাঁকেই উপলব্ধি করতে হবে'।

তাই, শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন; 'আমিই সেই অনন্ত শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। আমি সকল জীবের হৃদয়ে বাস করি। আমাকে আশ্রয় করলে তুমি অনায়াসেই মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারবে।' তাহলেই তুমি *অধিভূত, অধিদৈবম্* ও *অধিযজ্ঞ*

সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারবে। এই তিনটি শব্দ ৮ম অধ্যায়ের প্রথম দিকের শ্লোকগুলিতে আলোচিত হবে।

এখন সপ্তম অধ্যায়ের ৩০তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

—'যাঁরা *অধিভূত, অধিদৈব* ও *অধিযজ্ঞ*-এর সঙ্গে বিদ্যমান আমাকে জানে, সেই সব সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে প্রত্যক্ষ করবেন।'

যাঁদের মন *যুক্ত,* অর্থাৎ যোগযুক্ত, তাঁরা এই বিষয়গুলি বোঝেন। কোন্ বিষয়গুলি? *স অধিভূত অধিদৈবং অধিযজ্ঞং,* 'যিনি প্রকৃতির জড়বস্তুগুলির উপর কর্তৃত্ব করেন'; [তারপর,] যিনি দেবতা বা ''প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত দীপ্তিমান সত্তাগুলির ওপর কর্তৃত্ব করেন''; [এবং সর্বশেষে] যিনি যাগযজ্ঞাদিকে নিয়ন্ত্রণ করেন'—এরা সকলেই স্বরূপত ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। *বিষ্ণুসহস্রনাম*-এ বিষ্ণুকে 'যজ্ঞ' বলা হয়েছে। *যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ*—শঙ্করাচার্য এই ভাষাই ব্যবহার করেছেন। অতএব, সমস্ত বস্তুর পিছনে সেই এক ও অনন্ত সত্তা বা আত্মাই রয়েছেন। *সাধিভূত অধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ,* 'যাঁরা *অধিভূত, অধিদৈব* ও *অধিযজ্ঞ*-এর পিছনে এই নিত্য আত্ম-সত্যকে দেখতে পান'; *প্রয়াণকালেঽপি,* 'জীবনের শেষ মুহূর্তে, মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পূর্বেও'; *মাম্,* 'আমাকে'; *তে বিদুঃ,* 'তাঁরা জানতে পারেন', আমাকে উপলব্ধি করেন; *যুক্তচেতসঃ* 'যোগের ভাবে, আধ্যাত্মিক পথে অভ্যস্ত সুপরিশীলিত মনের দ্বারা'। *অধিভূত, অধিযজ্ঞ* ও *অধিদৈব* —এই তিনটি শব্দ যেন ভৌতিক ভূমি, নৈতিক ভূমি ও আধ্যাত্মিক ভূমিকে নির্দেশ করছে।

এইটিই সপ্তম অধ্যায়ের শেষ শ্লোক এবং এখানে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা দিয়েই অষ্টম অধ্যায়ের শুরু। আপনি ও আমি যে প্রশ্ন করি, অর্জুনও সেখানে সেই প্রশ্নই করছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন ঃ 'এই *অধিভূত, অধিদৈব,* এগুলির কী তাৎপর্য?' আমাদের মুনিঋষিরা এ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এবং তার উত্তরও দিয়েছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, মানুষ প্রকৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত, দেহাদি নশ্বর পদার্থ দ্বারা অধিকৃত। এই নশ্বর পদার্থগুলিকে *অধিভূতম্* বলা হয়। *অধিদৈবম্* হলো 'আমাদের অন্তরে বিদ্যমান আত্মা' যিনি জ্যোতির্ময়। আত্মারূপে বর্তমান যে আমি এই আনুষঙ্গিক বস্তু বা উপাধিগুলি

নিয়ে কর্ম করি, তাকেই বলা হয়েছে *অধিদৈবম্।* শেষেরটি *অধিযজ্ঞম্,* অর্থাৎ এমন 'কিছু নৈতিক মূল্যবোধ যা সমষ্টিগতভাবে মনুষ্যজাতিকে প্রভাবিত করে'। সংস্কৃতে *দেব* শব্দের প্রকৃত অর্থ দীপ্তিমান। কিন্তু পরে *দেব* বলতে মানুষ ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি পৌরাণিক দেবতাদের বুঝতে লাগলো, যাঁদের নিবাস স্বর্গে। আশ্চর্যের বিষয়, এই প্রাচীন ভারতীয় দেবভাবটি আধুনিক যুগের অভিজ্ঞতায় স্বীকৃত হচ্ছে। 'The Secret Life of Plants'-নামক একটি বই আছে। যতদূর মনে পড়ে, একজন বা দুজন আমেরিকান বইখানি লিখেছেন। ঐ গ্রন্থে উদ্ভিদ সম্বন্ধে আলোচনা কালে তাঁরা এই দেবভাবের প্রসঙ্গ এনেছেন। তারা বলেছেন, *দেবশক্তি* গাছপালাকে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে এবং এটি করবার বিশেষ উপায়ও আছে। পক্ষান্তরে পোড়াবার অভিপ্রায় নিয়ে যদি আপনি কোন গাছের কাছে যান তো দেখতে পাবেন একটি বিশেষ সংবেদন তার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে, যা অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদির মাধ্যমে পরীক্ষা করা যায়, ইত্যাদি। এ ধরনের আরও অনেক বিষয় ঐ বইতে আছে। রাশিয়া ও আমেরিকা, দুই দেশেই এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা হচ্ছে। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, *অধিদৈব* ধারণাটি ধীরে ধীরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের চারপাশের প্রকৃতি অচেতন বা মৃত নয়, তার একটি উচ্চতর সত্তা আছে, যাকে আমরা *পরাপ্রকৃতি* বলে থাকি। অতীতের ভৌতবিজ্ঞান বলত, এগুলি সমস্তই মৃত অথবা অচেতন জড়বস্তু। কিন্তু তা নয়; সর্বত্রই এক প্রাণ-তত্ত্ব সমস্ত বস্তুর ভিতর কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে আরো অনেক বৈজ্ঞানিক ক্রমশ আজ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছেন। আমি আগে প্রসঙ্গক্রমে ব্রিটিশ নভোবস্তুবিদ ফ্রেড হয়েলের কথা বলেছি। তিনি প্রথমে জড়বাদী ছিলেন। কিন্তু পরে নতুন বই লিখেছেন, যার নাম *The Intelligent Universe* (চেতন বিশ্ব)। সেখানেও *দেব* শব্দটির পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে *অধিদৈবং*-এর চিন্তাটি উত্তরোত্তর আধুনিক যুগের মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে।

•

ইতি জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

'জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ নামক সপ্তম অধ্যায়ের এখানেই সমাপ্তি।'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্মযোগ

অক্ষরব্রহ্মলাভের পথ

অর্জুনের একটি প্রশ্ন দিয়ে এই অধ্যায়টির সূচনা হচ্ছে।

অর্জুন বললেন :

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম ।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১॥

—'হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কী, *অধ্যাত্ম* কী ও *কর্ম* কী? *অধিভূত* ও *অধিদৈব-ই* বা কাকে বলে?'

এ কয়েকটি শব্দ আমরা আগেই পেয়েছি; এখানে তার সঙ্গে আরও নতুন কিছু শব্দ যুক্ত হচ্ছে। অর্জুন প্রশ্ন করে চলেছেন :

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন ।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

—'হে মধুসূদন, *অধিযজ্ঞ* কে এবং কীরূপে এই দেহে অবস্থান করেন? এবং প্রয়াণকালে, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের দ্বারা আপনি কীরূপে জ্ঞাত হন?'

অধিযজ্ঞঃ, 'যিনি যাগযজ্ঞ, পূজানুষ্ঠানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা'; *কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন*, 'এই দেহে তিনি কীভাবে রয়েছেন এবং কে এই অধিযজ্ঞ; হে শ্রীকৃষ্ণ?' *প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ*, 'কী করে একজন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মৃত্যুকালে আপনাকে উপলব্ধি করতে পারেন?' প্রয়াণকালে অর্থাৎ 'অন্তিম বিদায়কালে'। *প্রয়াণ*-এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'প্রস্থান'; এখানে বোঝাচ্ছে 'অন্তিম প্রস্থান, অর্থাৎ মৃত্যু'। সাধারণ প্রস্থানে আমরা যাই, আবার

ফিরে আসি। কিন্তু এই প্রস্থানের পর আর প্রত্যাবর্তন নেই; তাই একে বলা হচ্ছে 'অন্তিম প্রস্থান'। *নিয়তাত্মভিঃ* 'সংযতচিত্ত মানুষের দ্বারা'। মন তো সংযত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ চরম সঙ্কটের মুহূর্তে কী করে আমরা আপনাকে উপলব্ধি করতে পারি? দয়া করে আমাদের সংশয় নিরসন করুন। এইভাবে অর্জুন নানাভাবে তাঁর প্রশ্নগুলি উত্থাপন করলেন।

শ্রীভগবান্ উবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান বললেন ঃ

—'অক্ষর বা অবিনাশী পুরুষ হলেন পরম ব্রহ্ম। প্রত্যেক জীবদেহে তাঁর অবস্থানকে *স্বভাব* বা *অধ্যাত্ম বলা হয়; যজ্ঞে দ্রব্যাহুতি দেওয়া*—যার ফলে ভূত বস্তুসমূহের উৎপত্তি ও প্রতিপালন হয়—তাকে বলা হয় *কর্ম*।'

ব্রহ্ম পরমম্, 'পরম ব্রহ্ম'; তিনি হলেন *অক্ষরম্,* 'অবিনাশী'; *স্বভাবঃ,* 'নরনারীর ভিতর আত্মারূপে অবস্থানকারী ঐ ব্রহ্মই আমাদের *স্বভাব'; ঐটিই* আমাদের প্রকৃতি বা স্বরূপ। *স্বভাব* মানে *স্ব-ভাব*—অর্থাৎ আমাদের নিজেদের প্রকৃতি। *অধ্যাত্মম্ উচ্যতে,* 'আমাদের অন্তরস্থিত প্রত্যগাত্মাকেই *অধ্যাত্মম্* বলা হয়।' যখন আপনি বলেন, 'আমি দেখেছি', তখন বোঝায় দ্রষ্টা (আপনার) 'আমি'। শুধু 'দেখেছি' বললে, তার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু যখন বলেন 'আমি দেখেছি', তখন 'কর্তা' নামক আর একটি দিক উন্মোচিত হয়—যিনি দেখেছেন। নচেৎ, শুধু চোখ দিয়ে দেখা যায় না। কাউকে না কাউকে দেখতে হবে। মানুষই হোক আর জন্তুই হোক, দেখবার জন্য কাউকে থাকতে হবে। একজন দ্রষ্টা চাই। সুতরাং, যে আত্মা দেখছেন, যে আত্মা উপলব্ধি করছেন, তাঁর উপস্থিতি অনিবার্য।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ, 'কর্ম হচ্ছে এই জগতে ভূতবস্তুসমূহের উৎপাদন ও রূপান্তর ঘটানোর বিভিন্ন প্রক্রিয়া'। মহাজাগতিক ক্রমবিকাশের প্রারম্ভে একটি সৃষ্টি বা প্রকাশ হয়। সেই ক্রমবিকাশের ভিতরে আবার অন্যান্য অনেক ক্রিয়াকলাপ চলে—যেমন সৃষ্টির কাজ, এটা-সেটা তৈরির কাজ। তাকে বলা হয় *বিসর্গঃ,* যা কর্মভিত্তিক—আধুনিক পরিভাষায় যাকে 'process' বা 'প্রক্রিয়া' নামে অভিহিত করা হয়। জীবের দ্বারা প্রবর্তিত

বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলিকেই 'কর্ম' বলা হয়। যার পরিণতি *বিসর্গঃ* অর্থাৎ বিসর্জনে। এইটিই প্রথম সংজ্ঞা।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো :

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

—'বস্তুসমূহের নশ্বর ভাবই হলো *অধিভূত* এবং অন্তরস্থিত আত্মাই হচ্ছেন *অধিদৈবত*; হে শ্রেষ্ঠ নরদেহধারী, এই দেহে একমাত্র আমি *অধিযজ্ঞ*।'

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ। অধিভূত কী? যা 'সাধারণ প্রাকৃতিক' বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; *ক্ষরো ভাবঃ*, 'যা পরিবর্তনশীল'। যা কিছু পরিবর্তনশীল, বিনাশশীল, তাকেই বলা হয় *অধিভূত*। সমস্ত ভূতবস্তু, আমাদের চারপাশের সমগ্র প্রকৃতিই 'পরিবর্তনশীল' অর্থাৎ ক্ষরঃ। একমাত্র ব্রহ্মাই অক্ষর—অবিনাশী। এই *অধিভূত* বা দেহাদি পদার্থ সবকিছুই *ক্ষর পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্, 'অধিদৈবতম্* হলেন *পুরুষ*, অন্তরাত্মা'। *অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র; অধিযজ্ঞঃ*, 'সমস্ত যাগযজ্ঞ, পূজা অনুষ্ঠানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও ফলদাতা', *অহম্ এব*, 'আমিই সমস্ত জীবের অন্তর্যামী, সেই দিব্য সত্তা'; *অত্র দেহে*, 'এই দেহের ভিতরে'; *দেহভৃতাং বর*, 'হে শ্রেষ্ঠ নরদেহধারী' আমাকেই *অধিযজ্ঞ বলা হয়। অত্র*, 'এই বিশ্বে'। আমিই সেই, যিনি এই বিশ্বে সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব করছেন।

শাস্ত্র উদ্ধৃত করে শঙ্করাচার্য বলছেন, *যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ*, 'যজ্ঞই যে বিষ্ণু, তাতে কোন সন্দেহ নেই', বিষ্ণুই যজ্ঞে নিহিত পরম দিব্য সত্তা। ওপর ওপর দেখলে যজ্ঞকে শুধুই বৈদিক অনুষ্ঠান বা যজ্ঞাগ্নি বলে মনে হবে, কিন্তু গভীরতর তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, যজ্ঞই সেই অনন্ত পরমেশ্বর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অর্জুনের কিছু প্রশ্ন দিয়েই অষ্টম অধ্যায় শুরু হচ্ছে এবং শ্রীকৃষ্ণ সেসব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। *অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত*—এগুলি বেদান্তের পারিভাষিক শব্দ। সপ্তম অধ্যায়ের সর্বশেষ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ঐসব পরিভাষার কিছু কিছু উল্লেখ করেছিলেন। তাইতেই অর্জুনের মনে প্রশ্ন জেগেছে এবং ঐ শব্দগুলির অর্থ নির্ধারণের জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন।

কিং তদ্‌ব্রহ্ম, 'সেই ব্রহ্ম কী'? শ্রীকৃষ্ণ 'ব্রহ্ম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্জুন তাই প্রশ্ন করছেন, সেটি কি? এইটিই প্রথম প্রশ্ন। *কিমধ্যাত্মং*, 'অধ্যাত্ম কী?' 'আত্ম' শব্দের সঙ্গে 'অধি' উপসর্গ যুক্ত হয়ে হয়েছে *অধ্যাত্ম*। *কিং কর্ম*, 'কর্ম

কী?' *পুরুষোত্তম,* 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ'। *অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্, 'অধিভূতম্ কাকে বলে?'* ভূতম্ শব্দের দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি-দুই বোঝায়। একাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখবো বেদান্তের ঈশ্বরকে *ভূতভাবন এবং ভূতেশ,* অর্থাৎ 'জীবের সৃষ্টিকর্তা ও জীবের ঈশ্বর' বলা হবে। সে যাই হোক, এখন অর্জুনের প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। তিনি প্রশ্ন করছেন, *অধিদৈবং কিমুচ্যতে,* 'যাকে *অধিদৈবম্* বলা হয়, সেটি কী?' প্রকৃতির অন্তর্গত যেসব দেবতারা মানুষকে দেখা দিয়েছেন, সেই *অধিদৈবম্* কী?

তারপর প্রশ্ন হয়েছে, *অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র,* 'অধিযজ্ঞ কী?' *যজ্ঞ* হলো আহুতি; কিন্তু কে এই যজ্ঞানুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করেন? *দেহেঽস্মিন্,* 'এই শরীরে'; *মধুসূদন,* 'হে কৃষ্ণ'; *প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ,* এবং সর্বশেষে, 'জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কী করে মৃত্যুসময়ে আপনাকে জানতে পারেন?' *প্রয়াণকালে,* 'মৃত্যুকালে', কী করে তাঁদের ঈশ্বর-স্মরণ হয়? এই অধ্যায়ের প্রথম দুটি শ্লোকে এইগুলিই ছিল অর্জুনের প্রশ্ন।

এবার শ্রীকৃষ্ণ উত্তর শুরু করলেন। প্রথমে ব্রহ্ম কী? তার উত্তরে বললেন, *অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্,* 'পরম অবিনাশী সত্তাই ব্রহ্ম।' বিনাশশীল বা অনিত্য জগৎ যেমন রয়েছে, তেমনি তার পিছনে একটি নিত্যসত্তা আছেন; তিনিই ব্রহ্ম।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ-এর একটি অংশে এই বিষয়টিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে দেখি পণ্ডিতদের একটি আলোচনা সভায় দার্শনিক গার্গীকে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, *এতৎ অক্ষরং গার্গি,* 'হে গার্গী, ইনিই হলেন বিরাট অবিনশ্বর সত্তা'। *অক্ষর* বলতে 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' বর্ণগুলিকেও বোঝায়। কিন্তু, *অক্ষর* শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো 'যার ক্ষর নেই'; *ক্ষর* হলো 'নশ্বর'; কিন্তু যিনি অনন্ত, তিনি অবিনশ্বর; তিনিই পরম সত্য অথবা ব্রহ্ম। এরপর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে,* 'তোমার ও আমার অন্তরে সেই ব্রহ্মের আত্মারূপে অবস্থানই হলো আমাদের *স্বভাব* বা অন্তঃপ্রকৃতি এবং তাকেই *অধ্যাত্মম্* বলা হয়। স্বয়ং ব্রহ্মই তোমার ও আমার ভিতরে আত্মারূপে বর্তমান। *ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ, 'কর্ম* হলো কার্য বা আদি প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে এই বিরাট বিশ্ব প্রকাশিত হয়'; একের থেকে বহুর প্রকাশ ঘটে। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির নামই *কর্ম।* ইংরেজিতে দার্শনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে 'process' বা প্রক্রিয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিক, এই জগতটাই একটা প্রক্রিয়া; অর্থাৎ এর ভিতর এই যে নিরন্তর পরিবর্তনের ধারা ক্রমান্বয়ে ঘটেই

চলেছে, তাকেই বলা হচ্ছে প্রক্রিয়া। সুতরাং *কর্ম* এখানে প্রক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত। 'প্রক্রিয়া' ও 'প্রকৃত সত্য'—প্রকৃত সত্য হলো পরিবর্তনহীন অখণ্ড একক সত্তা। প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই অখণ্ড সত্তাই ব্রহ্মাণ্ডরূপে ব্যক্ত হন, প্রকাশিত হন ছায়াপথ, গ্রহাদি, প্রকৃতি ও মনুষ্যাদি জীবরূপে। এই যে বিচিত্র স্ফুটন, তাকেই *কর্ম* বলা হয়। এই পদার্থগুলির প্রত্যেকটিই নশ্বর। এই কারণে, এদের বলা হয় 'অধিভূত', যা ভৌতবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা ও সমস্ত দৃষ্টবাদমূলক বিজ্ঞানের পর্যালোচনার ক্ষেত্র—যে পরিবেশের মধ্যে আপনি ও আমি বাস করি; এমনকি আমাদের শরীরও এই অধিভূতের অন্তর্গত। প্রত্যগাত্মার দৃষ্টিকোণ থেকে শরীরও যে একটি পরিবেশ, তা মৃত্যুর বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা করবো, তখন দেখতে পাবেন। এই কারণে *তৈত্তিরীয় সংহিতা-য়,* বিষ্ণুকে *যজ্ঞ* বলা হয়েছে। *যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ,* 'বিষ্ণুই হলেন *যজ্ঞ*'। বিষ্ণু ও যজ্ঞ অভেদ। সেইজন্য *বিষ্ণুসহস্রনাম-এ* বিষ্ণুর নাম দেওয়া হয়েছে *যজ্ঞ।* অতএব, *অহম্ এব অধিযজ্ঞো,* 'আমিই *অধিযজ্ঞ*'; *অস্মিন্ দেহে,* 'এই দেহে'। অর্জুন এই সব প্রশ্নের উত্তরই চেয়েছিলেন।

এরপর প্রশ্ন হয়েছে : মৃত্যুকালে, সংযতচিত্ত ব্যক্তিরা কী করে আপনাতে মন স্থির করে মুক্তিলাভ করে? তার উত্তর ৫ম শ্লোকে দেওয়া হয়েছে :

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

—'এবং যিনি প্রয়াণকালে একমাত্র আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমার সত্তাই লাভ করেন : এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

যিনিই *অন্তকালে,* 'মৃত্যুর মুহূর্তে'; অন্তিম মুহূর্তটিকে বলা হয় *অন্তকাল; মামেব স্মরন্,* 'একমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে করতে'; *মুক্ত্বা কলেবরম্,* 'দেহত্যাগ করেন'। ভারতবর্ষে মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ হলো 'আত্মার শরীর পরিত্যাগ করা' : 'আমি আত্মা; আমি শরীর নই; এই শরীরে আমি অবস্থান করি, এই যা; শরীরটি আমার যন্ত্র'। সুতরাং ভারতবর্ষে মৃত্যুর অর্থ হলো আত্মার শরীর ত্যাগ করা—প্রায়শই যা যন্ত্রণাদায়ক, যা জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার পক্ষে একেবারেই অকেজো। তাই একে পরিত্যাগ করা দরকার। এই হলো মৃত্যুর তাৎপর্য। তাই, *অন্তকালে চ মামেব স্মরন্,* সেই মৃত্যুর মুহূর্তে, 'ঐ ব্যক্তি আমাকে' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে অথবা বিষ্ণুকে 'স্মরণ করতে করতে'; *মুক্ত্বা*

কলেবরম্, 'তাঁর দেহ পরিত্যাগ করেন।' এরপর কী হয়? *যঃ প্রয়াতি,* 'যিনি এইভাবে মৃত্যুবরণ করেন'; *স মদ্ভাবং যাতি,* 'তিনি আমার সত্তা লাভ করেন'। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে আমরা যা চিন্তা করি, তার প্রচণ্ড প্রভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যায়। অতএব, ভগবান বলছেন, যিনি অন্তিম মুহূর্তে আমার চিন্তা করেন, তিনি অবশ্যই আমার কাছে আসেন। *নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ,* 'এতে কোন সন্দেহ নেই।' প্রত্যেক ধর্মেই এই বিশ্বাসটি আছে। খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, প্রত্যেকেই মৃত্যুর মুহূর্তটিকে আপন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির মুহূর্ত হিসাবে দেখে থাকেন। বাস্তবিক, আমাদের সমগ্র ভবিষ্যৎই এর ওপর নির্ভরশীল। আপনি সুস্পষ্টভাবে আপনার ভবিষ্যৎ নাও জানতে পারেন, কিন্তু আমরা এটুকু জানি যে, যদি আমরা মনকে সর্বোচ্চ স্তরে, তথা ঈশ্বরে দৃঢ়রূপে ধারণ করে রাখতে পারি, তবে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে বাধ্য। এইটিই বিশ্বাস। সেইজন্য দেহত্যাগের সময় মানুষ ঈশ্বরচিন্তা করে, মন্ত্রোচ্চারণ করে অথবা ভজন গায়। আমরাও তাই করি যাতে, যিনি দেহত্যাগ করছেন, তিনি সুগভীর ঈশ্বরীয় ভাব অন্তরে নিয়ে উৎক্রমণ করতে পারেন। প্রায়শই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, কেবল জীবনের অন্তিম মুহূর্তটি কীভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে? খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু এটি আমাদের জানা উচিত যে, সারা জীবন ঈশ্বরচিন্তার অভ্যাস না করলে ঠিক শেষ সময়ে মন ভগবানে সমাহিত করা যায় না। অন্তিম মুহূর্তে যাতে আমাদের মনে ভগবানের চিন্তা আসে, তার জন্যই সমস্ত জীবন ধরে মনকে তালিম দেওয়া; ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ না থাকলে, শেষ মুহূর্তে তাঁর চিন্তা মনে ওঠে না। তাই নিরন্তর অভ্যাস করে এই সামর্থ্য আমাদের অর্জন করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণও এই কথাই বলেছেন। হাতির উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন ঃ 'হাতিকে স্নান করিয়ে দিলে পরক্ষণেই সে আবার ধুলো-কাদা মাখবে'। সেটাই হাতির স্বভাব। সেইরকম, আমরাও ঈশ্বরের নাম করে শুদ্ধ হই, কিন্তু পরমুহূর্তেই অসৎ কাজে প্রবৃত্ত হই। মানুষেরও ঐ এক স্বভাব। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ এও বলছেন যে, 'হাতিকে স্নান করিয়েই যদি আস্তাবলে ঢুকিয়ে দাও, তাহলে সে আর ধুলো-কাদা মাখতে পারে না'। মৃত্যুর সময় ঠিক এইটিই ঘটে। আমরা তখন আর শরীরের মধ্যে নেই যে অসৎ কর্ম করব; এই দেহটি আর নেই যে আবার তা মন্দ কাজের জন্য ব্যবহার করবো। শরীর ছাড়ার মুহূর্তে যদি আমরা মনকে ঈশ্বরে নিবিষ্ট করতে পারি, তাহলে চিরকালের জন্য পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে আমরা সর্বোত্তম বস্তুকে লাভ করবো। সব ধর্মেরই এই

এক বিশ্বাস। সুতরাং, মৃত্যুর মুহূর্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষে মৃত্যুকে আমরা ভয় করি না। আমাদের দর্শনকে যদি একবার সঠিকভাবে বুঝে নিতে পারি তাহলে আর আমাদের মৃত্যুর ভয় থাকবে না, কারণ তখন আমরা সত্যসত্যই জানব যে আত্মার মৃত্যু নেই এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে একমাত্র সেই ঈশ্বর, সেই *অক্ষর* ব্রহ্মই বিরাজ করছেন। আমরা প্রকৃতপক্ষে সেই পরম সত্তারই এক একটি স্ফুলিঙ্গ। এই উপলব্ধির দরুনই বৈদিক যুগ থেকে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মৃতব্যক্তির দেহ ভস্মীভূত করার রীতি ভারতবর্ষে চালু হয়েছে। মৃতদেহের তো আর কোন কাজ থাকে না। তাই যত শীঘ্র ঐ অবাঞ্ছিত দেহকে তার পঞ্চভৌতিক উপাদানে রূপান্তরিত করা যায়, ততই মঙ্গল। অন্য কোথাও মৃতদেহ সংকারের এই দার্শনিক ব্যাখ্যা পাবেন না। শরীর যেন একটি রসায়নাগার; জীবনের কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন করবার জন্য তাকে তৈরি করা হয়েছিল। এখন আর এটি ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। সে তার কাজ শেষ করেছে। সেইজন্য আমরা এটিকে ত্যাগ করে অগ্নিতে সমর্পণ করি যাতে সে তার ভৌতিক উপাদানে আবার ফিরে যেতে পারে। ভারতীয় চিন্তায় এইটিই মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণা।

প্রকৃতপক্ষে, মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে এটি এক বিরাট অগ্রগতি। সচরাচর দর্শন বলতে আমরা এই বুঝি যে, তা শুধু জীবন ও তার বিভিন্ন দিকগুলি নিয়েই আলোচনা করে। ফলে খুব অল্পসংখ্যক দর্শনেই মৃত্যুর স্বরূপ পর্যালোচনা করা হয়। কিন্তু সত্য এই, জীবন ও মৃত্যু দুটিকেই না জানা পর্যন্ত আমরা পূর্ণতা লাভ করতে পারি না। জীবনকে অবশ্যই জানতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে মৃত্যুকেও জানতে হবে। তাই, একমাত্র সেই দর্শনেরই গভীরতা আছে বলা যায়, যা মৃত্যুর স্বরূপ অনুসন্ধান করেছে। ভারতবর্ষে, সেই সুদূর ঋগ্বেদের যুগ থেকেই আমরা জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর দিকেও দৃষ্টি দিয়েছি এবং চরম সত্তাকে ঘোষণা করেছি 'সেই আলোকরূপে, জীবন ও মরণ যাঁর ছায়ামাত্র'—*যস্য ছায়া অমৃতং, যস্য মৃত্যুঃ* (ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০।৮।১২১)। সত্যের কী অপূর্ব অভিব্যক্তিই না ঘটেছে ঋগ্বেদের এই উক্তিটিতে : মৃত্যু ও অমরত্ব যাঁর ছায়া, তিনিই ব্রহ্ম। সেই একই ব্রহ্ম যেমন জীবনরূপে অভিব্যক্ত হয়েছেন, তেমনি মৃত্যুরূপেও। এই কারণেই *কাল*-এর অর্থ 'সময়'। কালের আর এক অর্থ হলো মৃত্যু; সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই এই *কাল*-এর নিয়ন্ত্রণে। এই ব্যক্ত জগতের সমস্ত কিছুই কাল এবং মৃত্যুর অধীন। এই *কাল* স্বয়ং ঈশ্বরেরই একটি অভিব্যক্তি। যখন আমরা এই সত্যটি উপলব্ধি করি, তখন মৃত্যুভয় কমে যায়।

মৃত্যু সম্বন্ধে সাধারণ ভীতি কমবেশি আমাদের সকলেরই থাকে, কিন্তু ভয়ানক আতঙ্কটি চলে যায়। এইখানেই ছিল প্রাচীন গ্রীক চিন্তার দুর্বলতা। গ্রীক সভ্যতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বহু বিশিষ্ট লেখকই এই দুর্বলতার উল্লেখ করেছেন। এল. ডিকিনসন (L. Dickinson) তাঁর *Greek View of Life*, ('গ্রীক জীবন দর্শন') গ্রন্থে এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে বলেছেন যে, গ্রীস দেশের মানুষ জীবনকে ভালবাসত, কর্ম ও শক্তিকে ভালবাসত; যা কিছু গতিশীল ও প্রাণচঞ্চল, তারই সমাদর করত; কিন্তু বার্ধক্য ও মৃত্যুকে তারা কখনওই মেনে নিতে পারেনি। কোন্ অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা তাদের প্রাণশক্তি নিষ্পেষিত হয়, তা তারা জানত না। ফলে মৃত্যুর সঙ্গে তাদের বিরোধ চিরকাল থেকেই গেছে; এখানেই গ্রীক-চিন্তার সীমাবদ্ধতা। সেই জন্যই তারা সক্রেটিসের চিন্তার গভীরতা ধরতে পারেনি। সক্রেটিস কিন্তু মৃত্যুর স্বরূপকে জেনেছিলেন, বুঝেছিলেন যে তিনি প্রকৃতই অমর; মৃত্যু হয় শুধু শরীরের, আত্মার নয়। এই উপলব্ধি সক্রেটিসের হয়েছিল, কিন্তু তাঁর স্বদেশবাসীরা তাঁকে বুঝতে পারেনি। তারা তাঁকে শাসিয়ে, সেকালের যুবসমাজকে বিপথে চালিত করার দায়ে অভিযুক্ত করে, বিষপান করতে বাধ্য করালো। এইভাবেই সেই মহত্তম গ্রীক দার্শনিক নিজের দেশবাসীর হাতে নিহত হলেন। এইখানেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা মৃত্যুর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনি, বোঝেনি সক্রেটিস-উপলব্ধ সেই আত্মতত্ত্ব, যা বলে, আত্মার মৃত্যু নেই। বিষপান করার সময় কিন্তু সক্রেটিস এই সত্যকে নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছিলেন। আবালবৃদ্ধ যত মানুষ তাঁর আশেপাশে সমবেত হয়েছিল, তাদের সকলকে সান্ত্বনা দিতে দিতে সম্পূর্ণ স্থির ও অচঞ্চল মনে তিনি বিষ পান করলেন। সেখানে ক্রিটো নামক সক্রেটিসের এক পুরনো বন্ধুও ছিলেন। বিষপানরত সক্রেটিসকে তিনি একটি প্রশ্ন করলেন। *Dialogues of Plato,* বা 'প্লেটোর কথোপকথন' নামক গ্রন্থে এই মর্মস্পর্শী ছবিটি ধরা আছে। ক্রিটো জিজ্ঞাসা করলেন, 'সক্রেটিস, আমরা তোমাকে কীভাবে কবর দেব?' সক্রেটিস শুধু হাসলেন! যে মানুষটি মরতে যাচ্ছেন, ঐ মুহূর্তেও তিনি মৃদু হেসে বললেন. 'এই প্রশ্ন করার আগে তো তোমাদের *আমাকে, আসল আমাকে* ধরতে হবে'। এইটি ছিল তাঁর প্রথম বাক্য। দ্বিতীয় বাক্যে বললেন, 'আনন্দে থাকো, ক্রিটো। তুমি শরীরের কথা বলছিলে; তা, অন্যান্য লোকের দেহ নিয়ে যা কর, আমার বেলাতেও তাই কোরো।'

দেখুন গীতা ও উপনিষদের সেই ভাব আপনারা এখানেও পাচ্ছেন। যখন আপনারা মৃত্যুর মুখোমুখি হবেন, তখন ভাবুন, মৃত্যু শুধু দেহের; আমরা কেবল

শরীরটাকে ত্যাগ করছি। এর অর্থ হলো, আমরা, অর্থাৎ আত্মা, ত্যাগ করছি দেহটিকে, যা কিছুকালের জন্য জীবনযাপনের যন্ত্ররূপে আমাদের সঙ্গে ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এইটিই পূর্ণ উপলব্ধি। গ্রীক সভ্যতায় ও আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা খুব অল্পই হয়েছে। কিন্তু এখন দিন পালটাচ্ছে। বেদান্তের ভাব যতই ছড়াচ্ছে, মানুষ ততই মৃত্যু সম্বন্ধে ভারতীয় চিন্তা গভীরভাবে অনুভব করছে। খ্রিস্টান ধর্মে আত্মার (soul-এর) ধারণা থাকলেও সেটি দার্শনিক তত্ত্বহিসাবে উপস্থাপিত করা হয়নি। মানুষ মারা গেলে তারা সযত্নে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে, যাতে মৃতব্যক্তির মন উচ্চ অবস্থা লাভ করতে পারে। এটি সুচারুভাবে করা হয়, কিন্তু এই ক্রিয়াকাণ্ডের দার্শনিক ব্যাখ্যাটি একমাত্র ভারতবর্ষে, তার বৈদান্তিক ঐতিহ্যেই মেলে।

অতএব, এখানে এই শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে ঃ

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

—'যিনি সচেতনভাবে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই আমাকে লাভ করেন'; *নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ,* 'এতে কোন সন্দেহ নেই।'

আমি অনেক মানুষের কথা শুনেছি, যাঁরা ভগবানকে ভালবাসার দরুন নির্ভয়ে, শান্তচিত্তে মৃত্যুবরণ করেছেন। বর্তমানেও এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। একজনের কথা বলি। কলকাতার একটি হাসপাতালে তিনমাস রোগশয্যায় তিনি শুয়ে ছিলেন। তিনি এতই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে ওঠার কোন ক্ষমতাই ছিল না। ডাক্তাররা তাঁর রোগ ধরতে পারেননি। তিনি কিছু খেতেও পারতেন না; এমনিই শুয়ে থাকতেন। হঠাৎ একদিন রাত তিনটে নাগাদ তিনি বিছানার উপর উঠে বসলেন। কী করে পারলেন, সে এক বিস্ময়; নার্সরাও তার ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। তারপর ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'আপনাদের মধ্যে কেউ জেগে আছেন কি?' কারও কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'আমি চললাম, আমি চললাম।' তারপর চতুর্দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মা, তুমি এসেছ! তুমি এসেছ! যাই মা, যাই'। এই কথা বলে তিনি বিছানার ওপর এলিয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। যে-সব নার্স তখনও জেগে সেখানে কাজ করছিলেন, এই ঘটনা তাঁদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। বাস্তবিক, কী সুন্দর মৃত্যু! এইভাবে মৃত্যুকে বরণ করার ঘটনা অনেক শোনা যায়।

অতএব, ভালোভাবে বাঁচার খুবই প্রয়োজন আছে। সেটি খুবই সুন্দর। বাস্তবিক, আমরা তো আর সর্বক্ষণ মৃত্যুর পিছনে ছুটছি না; আমরা ছুটছি জীবনের পিছনে, জীবনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু মৃত্যুও তো জীবনের একটি সত্য। তাকেও আমাদের মেনে নিতে হবে; তার তাৎপর্য বুঝতে হবে। মৃত্যুকে ভয় করলে চলবে না। যে মানুষ যথার্থ বীর, সে জীবন ও মৃত্যু, দুটিকেই সাগ্রহে বরণ করে।

স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় আপনারা এই ভাবটি পাবেন। সেখানে তিনি বলেছেন—মৃত্যুকে যে বাহুপাশে বাঁধতে পারে, একমাত্র তারই কাছে জগন্মাতা আসেন। আপনি যদি মৃত্যুকে অস্বীকার করে শুধু জীবনকেই গ্রহণ করতে চান, তাহলে বুঝতে হবে কেবল সত্যের অর্ধেকটাই আপনি প্রত্যক্ষ করছেন। পূর্ণ সত্য জানতে হলে জীবন ও মৃত্যু দুইই চাই। যাঁরা মৃত্যুর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন ও সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি হবার ক্ষমতা রাখেন, একমাত্র তাঁরাই মহৎ হতে পারেন। কিন্তু যাঁরা শুধু জীবনের পিছনেই ছুটে বেড়ান, তাঁরা সুন্দরভাবে বাঁচলেও অর্ধেকটা বাঁচেন—জীবনের বাকি অর্ধেকটি তাঁদের নাগালের বাইরেই থেকে যায়।

তাই বক্তব্য এই ঃ গ্রীকদের মতো পরিশ্রম করুন, কঠোর কর্মময় জীবনযাপন করুন, কিন্তু মনে রাখবেন সত্যিই আপনার মৃত্যু নেই; মৃত্যু শরীরের। তাই যখন চরম মুহূর্ত আসবে, যখন আমাকে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে, তখন যেন প্রসন্নচিত্তে বলতে পারি—হে মরণ, তুমি এসেছো। এসো, সখা এসো; তোমাকে আমি আলিঙ্গন করি। জীবন ও মৃত্যুর স্বরূপ ঠিক ঠিক উপলব্ধি হলে তবেই এই ধরনের মনোভাব ও নির্ভীকতা আসে। *ঈশোপনিষদ*-এর শেষ চারটি শ্লোকে এক ঋষির মৃত্যুর কথা আছে। সুন্দর জীবনযাপন করে এবার তিনি মৃত্যুকে বরণ করতে চলেছেন। উপনিষদের এই অংশে তিনি বলছেন ঃ 'এই সূর্য ও বিশ্বের পিছনে যে পরম সত্য আবৃত আছে, তা আমার কাছে উদ্ঘাটিত হোক। আমার জীবনের কাজ শেষ হয়েছে। এখন মৃত্যু আগত। এই শরীর আগুনে ভস্মীভূত হয়ে ভৌতিক উপাদানে পরিণত হোক। হে মন, এখন তোমার শুভকর্মের কথা স্মরণ কর।' এই বলে তিনি শান্তভাবে দেহত্যাগ করলেন।

সুতরাং, মৃত্যুর প্রতি এই হলো আমাদের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি। এই প্রসঙ্গে প্রচুর কাহিনীও প্রচলিত আছে। আর একটা কথা। আমরা সময় তথা কালকেও এক ব্যক্তিরূপে কল্পনা করে নিয়েছি। *কাল*-এর আর এক নাম *যম*—'যিনি মৃত্যুর

মুহূর্তে জীবন নির্বাপিত করেন'। প্রকৃত অর্থে *কাল* হলো সময়, কিন্তু তাকে এক বিশেষ পৌরাণিক চরিত্রের রূপ দেওয়া হয়েছে। তিনি সকলের কাছেই আসেন, কাউকে বাদ দেন না। সুতরাং *কাল*কে ভুললে চলবে না। *কাল* এক অনিবার্য বাস্তব সত্য। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র—সবই কালের অধীন। কাল সব কিছুকেই শাসন করে, নিয়ন্ত্রণ করে। একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ দেখানোর সময় স্বয়ং ঘোষণা করবেন (১১/৩২), *কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো,* 'আমিই প্রবল পরাক্রমশালী বিশ্ববিনাশকারী কাল, আমি এখন জগৎ নাশে প্রবৃত্ত হয়েছি।' প্রতি মুহূর্তেই জগৎ বিনাশের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সর্বক্ষণ এই বিনাশ ঘটে চলেছে; শুধু আমরা তা বুঝি না, কারণ আমাদের সত্য দৃষ্টি নেই। মৃত্যু আমাদের কাছে ভীতির বস্তু, সেইজন্য তাকে আমরা এড়িয়ে চলতে চাই। এই দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের দুর্বল করে। আমরা বাস্তবকে স্বীকার করতে চাই না কেন? মৃত্যু যখন বাস্তব সত্য, তখন কেন তাকে অস্বীকার করবো? যা অবধারিত, তার মুখোমুখি হওয়াই তো বীরত্ব। যে জাতি মৃত্যুকে ভয় পায়, সে জাতি কখনই বীরের মর্যাদা পেতে পারে না। যে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে, একমাত্র সেই বীর পদবাচ্য। পাশ্চাত্যের মানুষকে লক্ষ্য করুন; যদিও তারা কোনদিন মৃত্যুর মহিমা উপলব্ধি করতে পারেনি, মৃত্যুর পিছনে নিহিত যে উচ্চ তত্ত্ব, তা ধারণা করতে পারেনি, তবুও তারা মৃত্যুর সামনে নির্ভীক থেকেছে। তারা স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর গৌরবের জন্য সর্বদাই মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। এই কারণেই একদিন তারা বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পেরেছিল, হয়ে উঠেছিল বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু ভারতীয় সমাজ সেই মহত্ত্ব হারিয়ে হীনবীর্য হয়ে পড়েছে। মৃত্যুকে আমাদের এতই ভয় যে আমাদের সমাজে বা পরিবারে তার নামোচ্চারণও করতে দেওয়া হয় না। এই কারণেই আমরা এতো সঙ্কীর্ণ ও হীনবল হয়ে পড়েছি। আমি যখন ছোটো ছিলাম, মনে আছে, যখনই 'মৃত্যু' শব্দটি উচ্চারণ করতাম, তখনই আত্মীয়-স্বজন বলে উঠতেন, 'চুপ! ঐ সম্বন্ধে কোন কথা বলবে না।' এইভাবে তাঁরা সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে চাইতেন। কিন্তু এইভাবে কি মহৎ হওয়া যায়? যায় না। তাই বলা হচ্ছে, সত্যের সম্মুখীন হও, বাস্তবের মুখোমুখি হও। মৃত্যু এক অকাট্য সত্য, যা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

সুতরাং, শুধু জীবনই যে বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত তা নয়, মৃত্যুকেও সে স্বীকার করে। সেইজন্যই বেদান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন। এতে সামগ্রিক সত্য প্রতিফলিত। তা যদি না হতো, বেদান্ত একপেশে হয়ে যেত। এখানেই ছিল গ্রীক সংস্কৃতির দুর্বলতা। একদেশদর্শিতা তাকে পেয়ে বসেছিল। আর আমরা? আমরা মৃত্যুকে

বুঝেছিলাম বলে মুঠোর মধ্যে পাওয়া জীবনকে অবহেলা করে, নানাভাবে মৃত্যুর পিছনে ছুটতে শুরু করেছিলাম। এর ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে আমরা দুর্বল হয়ে পড়লাম। সুতরাং জীবন ও মৃত্যু, দুটির উপরেই আমাদের জোর দিতে হবে। গ্রীক সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমন্বিত করে গড়ে তুলতে হবে এক নিটোল ও পরিপূর্ণ মানবীয় সংস্কৃতি, যার ভিত্তি হবে এক অখণ্ড দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা। এই সমন্বয় সূত্র আমাদের বেদান্তে আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অপূর্ব সমন্বয়ের উদ্বোধন করে, স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক যুগে ঠিক এই কাজই করে গেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা মনে রাখা দরকার। কৃষ্ণকেই যে চিন্তা করতে হবে, তা নয়। ঈশ্বরের অন্যান্য রূপও চিন্তা করা যেতে পারে। কারণ ব্রহ্ম তো এক এবং সেই এক ব্রহ্মই ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে নানা রূপ ধারণ করতে পারেন। সুতরাং, 'যাঁরা আমাকে স্মরণ করেন তাঁরা আমাকে লাভ করেন'— এইটিই শ্রীকৃষ্ণের শেষ কথা নয়। আপনি ঈশ্বরের যে কোন সত্তার অনুধ্যান করেই, সেই অখণ্ড, অদ্বিতীয় সত্তাকে লাভ করতে পারেন। সেইজন্যই সংস্কৃতে বলা হয়, *ভক্তানাং হিতকাম্যয়া ব্রহ্মণোরূপকল্পনা,* 'ব্রহ্মের নির্দিষ্ট কোন রূপ বা আকার নেই, কিন্তু ভক্তের কল্যাণের জন্য তিনি নানা রূপ ধারণ করেন।'

ষষ্ঠ শ্লোকে এই বিষয়টি উত্থাপিত হচ্ছে ঃ

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

—'হে কৌন্তেয়, মৃত্যুকালে যে যে বস্তুর (ঈশ্বরীয় রূপের) কথা চিন্তা করতে করতে মানুষ শরীর ত্যাগ করে, অনুক্ষণ সেই বস্তুর চিন্তার ফলে একমাত্র তাঁকেই (সেই চরম সত্তাকেই) লাভ করে।'

প্রয়াণকালে, ভক্ত যে ঈশ্বরীয় রূপের ধ্যানই করুন না কেন, সেই বিশেষ রূপকেই তিনি লাভ করেন। সুতরাং, যে কোন ধর্মে, যখনই মনের এই ধরনের ঊর্ধ্বগতি হয় এবং ভক্ত কোন এক দিব্য সত্যের ধ্যানে তন্ময় হন, তখনই ফল একই হয়। অতএব, এটি এক সাধারণ উক্তি। *যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্,* 'যাঁরা মৃত্যুর সময় কোন দেবতাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন—তা, সে যে ঈশ্বরীয় রূপই তাঁদের মনে উদিত হোক না কেন'; *তং তমেবৈতি কৌন্তেয়,* 'হে কুন্তীপুত্র, তাঁরা সেই দেবতাকেই লাভ করেন'।

কেন? *সদা তং ভাব ভাবিতঃ,* 'নিরন্তর সেই বিশেষ দিব্যভাবটির চিন্তা করার ফলে' মনে তার ছাপ পড়ে যায় এবং এইজন্য পরবর্তী জন্মে সেই দেবতার সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে যান। সমস্ত ধর্মের ভক্তই একথা বিশ্বাস করেন। সুতরাং, এইটিই যখন সত্য, তখন মৃত্যুর সময় ঈশ্বরচিন্তার সামর্থ্য অর্জন করতে হলে অনেক আগে থেকেই আমাদের অভ্যাস শুরু করতে হবে। যিনি বুদ্ধিমান, তিনি কখনওই সুযোগের ভরসায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবেন না। জীবনের প্রতি মুহূর্তেই তিনি ঈশ্বরকে স্মরণ করার চেষ্টা করবেন, যাতে মৃত্যুকালে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে ঈশ্বর চিন্তা আসে।

তাই শ্রীকৃষ্ণ বললেন :

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

—'অতএব, সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। মন ও বুদ্ধি একান্তভাবে আমাতে মগ্ন থাকলে তুমি আমাকেই লাভ করবে—এতে সন্দেহ নেই।'

তস্মাৎ 'অতএব'; *সর্বেষু কালেষু,* 'সব সময়'; *মাম্ অনুস্মর,* 'আমাকে স্মরণ কর'; *অনু* অর্থাৎ 'অনবরত'; *মাম্ স্মর,* 'আমাকে স্মরণ কর।' তোমার ক্ষুদ্র জীবসত্তার পিছনে বিরাজমান যে পরমাত্মা, সে আমিই—আমিই সেই অনন্ত অদ্বিতীয় সত্তা, *অক্ষয় পুরুষ,* যে তোমার অন্তরে লুকিয়ে আছে। অতএব, *তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ,* 'সব সময় আমাকে স্মরণ কর এবং জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাও।' ঈশ্বরের স্মরণ মনন এবং জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া—দুটিই একসঙ্গে করতে হবে। নানা কাজে আপনাকে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে আপনি ঈশ্বরকে ভুলে থাকবেন—এ অজুহাত সমর্থনযোগ্য নয়। মনে রাখবেন, ঈশ্বর আপনার ভিতরেই আছেন। তিনি আপনার আত্মার আত্মা—অর্থাৎ পরমাত্মা। কেবল আপনার নয়, তিনি সমস্ত জীবেরই অন্তরাত্মা। এই ঈশ্বরচেতনা প্রত্যেকের মধ্যে অন্তত খানিকটা পরিমাণ থাকতেই হবে; সেই সঙ্গে, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে কঠোর পরিশ্রম, নিরলস প্রচেষ্টা এবং 'জীবনসংগ্রাম' চালিয়ে যেতে হবেই। *যুধ্য চ।* এটিই *গীতা*-র অতি গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান : *মামনুস্মর যুধ্য চ,* 'আমাকে স্মরণ কর ও জীবনযুদ্ধে রত হও'। বলা হচ্ছে—*অনুস্মর,* 'নিরবচ্ছিন্নভাবে স্মরণ কর'। *স্মরণম্* হচ্ছে 'স্মরণ'। *অনুস্মরণম্* হলো 'অবিচ্ছিন্ন স্মরণ'—একটি পাত্র থেকে আর একটি পাত্রে তেল ঢালার

মতো, অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ। *অনুস্মরণম্*-এর প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে আমাদের ধর্মজগতের আচার্যরা এই উদাহরণই দিয়েছেন। চিন্তাপ্রবাহ নিরন্তর ঈশ্বরের দিকেই যাবে। মনের একাংশ সর্বক্ষণই ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে। শ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে এমন মানুষ সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, তার মনের একটি অংশ সর্বক্ষণই দাঁতের দিকে থাকে। সেইরকমই যেন এখানে বলা হচ্ছে, *মামনুস্মর যুধ্য চ,* 'আমাকে স্মরণ কর ও জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যাও'। কাজ দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ নয়। দুটিই একসঙ্গে করা চলে। *এইটিই গীতার বিশেষ বাণী এবং এই বাণী আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য*। আমরা সকলেই খেটে খাওয়া মানুষ। আমাদের সকলকেই কাজ করতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই—কাজ করেও কি আমরা ঈশ্বরকে লাভ করতে পারি? হ্যাঁ, পারি। তার কারণ, ঈশ্বরই আমাদের স্বরূপ। তাঁকে উপলব্ধি করা আমাদের জন্মগত অধিকার। সকলেই তাঁকে লাভ করতে পারে। পরমেশ্বরকে গীতায় এইভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

ময্যর্পিত মনো বুদ্ধিঃ মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ, 'যাঁর মন আমাতে স্থির, যাঁর বুদ্ধি আমাতে স্থির'। মন ও বুদ্ধি 'আমাতে অর্পিত হয়েছে', *ময্যর্পিত; মামেবৈষ্যসি,* 'আমার কাছেই পৌঁছবেন'; *ন সংশয়ঃ,* 'এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই'। আপনি যেমন চিন্তা করবেন, আপনার জীবন তেমনিই হবে। চিন্তা যে জীবনকে প্রভাবিত করে তাকে আমূল পাল্টে দেয়, একথা খুব সত্যি এবং এক্ষেত্রে তো বর্ণে বর্ণে সত্য। বাস্তবিক, ঈশ্বরকে চিন্তা করতে করতে আমরাও ঈশ্বর হয়ে যাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যে রাতদিন "আমি পাপী", "আমি পাপী", এই চিন্তা করে, সে পাপীই হয়ে যায়, আর যে মনে করে "আমি ঈশ্বরের সন্তান", সে ঈশ্বরই হয়ে যায়'। মনই কোন না কোন ভাবে মানুষের জীবন গড়ে তোলে। আপনি যদি সমানে বলতে থাকেন, 'আমি অসুস্থ, আমি অসুস্থ', তবে একদিন আপনি সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়বেন, কারণ নিজেকে আপনি অষ্টপ্রহর তাই বোঝাচ্ছেন। মনে রাখবেন, মনই আমাদের ভাগ্যকে সাকার করে। অতএব, কখনও নেতিবাচক ভাবনা ভাববেন না। সর্বদা ইতিবাচক ভাবনাকে আশ্রয় করে জীবনের পথে চলবেন এবং সবচেয়ে মহৎ ইতিবাচক চিন্তা হলো সবার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরের চিন্তা, নশ্বর জগতের মধ্যে যিনি অবিনশ্বর।

কিন্তু কী করে আমরা তা করব? তার উত্তরে ভগবান বলছেন ঃ

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

—'হে পার্থ, অভ্যাসযোগ দ্বারা অনন্যচিত্ত হয়ে পরম জ্যোতির্ময় পুরুষের অনুধ্যান করলে তাঁর কাছে যাওয়া যায়, (তাঁকে লাভ করা যায়)'।

পরম সত্যকে লাভ করার এই হলো উপায়। *অভ্যাস যোগ যুক্তেন,* 'অভ্যাস যোগের মাধ্যমে, নিরন্তর অভ্যাসের মাধ্যমে'। সেই *অভ্যাসযোগ*-এর সঙ্গে, *চেতসা,* 'এমন মনের সাহায্যে'; *নান্যগামিনা,* 'যা অন্য কোন দিকে যায় না'। *পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি,* এই রকম ব্যক্তি 'সেই পরম পুরুষ ঈশ্বরকে লাভ করেন।' কীভাবে? *অনুচিন্তয়ন্,* 'সেই সত্যের অবিরাম অনুধ্যান করে'। আমরা অল্প করে শুরু করি বটে, কিন্তু ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে তা ব্যাপক হয়ে উঠে গোটা জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। মন তখন সর্বদাই ঈশ্বরমুখী, মনের একাংশ সর্বদাই তাঁতে ডুবে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাই বলেছেন, এই ভাষায়, 'এক হাতে সংসারের কাজকর্ম কর; আর এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাক। হাতের কাজ শেষ হলে দু'হাত দিয়েই ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম জড়িয়ে ধর।'

এরপর ৯ম ও ১০ম এই দুটি শ্লোকে, ঈশ্বরের অতি সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

—'সর্বজ্ঞ, সনাতন, বিশ্বনিয়ন্তা, অনুর থেকেও সূক্ষ্ম, সকলের পালনকর্তা, অচিন্ত্যরূপ, সূর্যের ন্যায় স্বয়ংজ্যোতিঃ ও মায়ান্ধকারের পারে বর্তমান— এইভাবে, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে, ভক্তিপূর্ণ হয়ে একাগ্রচিত্তে, যোগবলে ভ্রুযুগল

মধ্যে সমস্ত প্রাণকে সম্যক ধারণ করে তাঁর ধ্যান করেন, তিনি সেই পরম দিব্য পুরুষকে লাভ করেন।'

শ্লোক হিসাবে এগুলি অতীব সুন্দর। বহু মানুষ তাই প্রতিদিনের প্রার্থনায় এগুলি আবৃত্তি করে। প্রথম শব্দেই ভগবানকে *কবি* বলা হয়েছে। কবি শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো *ক্রান্তদর্শী*, 'যাঁর দূরদৃষ্টি আছে, যিনি সবকিছুর তলদেশ পর্যন্ত দেখতে সক্ষম', অর্থাৎ 'সর্বজ্ঞ'। ব্রহ্মাকে কেন সর্বজ্ঞ বলা হয়? কারণ ব্রহ্মই সব, সেইজন্যই তিনি সর্বজ্ঞ। ভাষাটি লক্ষ্য করুন। আমি যদি সব না হই, তবে কী করে সর্বজ্ঞ হব? যেহেতু আমিই সব, সেই হেতু আমি 'সর্বজ্ঞ'; এই হলো ঈশ্বরের প্রকৃতি। যেমন ধরুন, সৌরজগতের মধ্যে সূর্য। আমরা বলতে পারি যে সূর্য সমগ্র সৌরজগতের ক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ, কারণ তার বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি সর্বত্রগামী হয়ে সব কিছুকে প্রকাশ করে; সূর্যের কাছে কিছুই লুকানো থাকে না। অনুরূপভাবে ব্রহ্ম, যিনি সকল জ্যোতির জ্যোতি, শুদ্ধ চৈতন্যের জ্যোতি, তিনিই সব। তিনি সমস্ত কিছুর ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। তাই তিনি সব জানেন। সুতরাং সবকিছুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকার দরুন তাঁর পক্ষে সর্বজ্ঞ হওয়া সম্ভব। সূর্যের ক্ষেত্রে যেমন আমরা বলে থাকি, ব্রহ্মের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই ভাবই প্রযোজ্য। শৈলগুহার নিভৃত কোণেও সূর্যরশ্মি প্রবেশ করে। সূর্য জানে সেখানে কী ঘটছে। আপনি যদি সূর্যকে চেতন ভাবতে পারেন, তবে সূর্যকে সর্বজ্ঞ বলতে পারেন। কারণ সূর্যই সবকিছু, অতএব সে সবই জানে। সেইরকম, ব্রহ্মই সব, তাই তিনি সর্বজ্ঞ। সুতরাং ঈশ্বরকে 'কবি' বলা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং শোভন হয়েছে। *ঈশোপনিষদ*-এও পরম সত্য নিয়ে আলোচনাকালে 'কবি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই কারণেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও কবিকে মহান বলা হয়। কারণ সাধারণ মানুষের তুলনায় সত্যের গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা কবির অনেক বেশি। তাই তিনি 'কবি' বা 'ক্রান্তদর্শী'। শেলী (Shelley) ও অন্যান্যরা অনেকেই বলবেন, কবিরা হলেন পৃথিবীর বেসরকারী বিধায়ক। তাঁরা সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পান। সেই স্বচ্ছ দৃষ্টিতে প্রতিভাত সত্যগুলি তাঁরা সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে পারেন বলেই আমরা তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হই। আজকের দিনেও, সমস্ত ভাষায় কবিতা কী গভীরভাবে মানুষকে টানে! সংস্কৃত ভাষা তো মনোরম কাব্য-সম্পদে পরিপূর্ণ। উপনিষদেও কবিতার ছড়াছড়ি। উদাহরণস্বরূপ *মুণ্ডকোপনিষদ*-এর সেই শ্লোকটি দেখুন, যেখানে ব্রহ্মকে *জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ*, অর্থাৎ 'জ্যোতির জ্যোতি' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক আলো আমাদের আলো দেয়, কিন্তু তার পিছনে আছে সৌরশক্তি। আবার অন্যান্য নক্ষত্রও আছে। এগুলি সমস্তই আলো, কিন্তু

একটি আলো আছে, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করে। সেটি *জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ,* 'আলোর আলো'—এইভাবেই আত্মা বা ব্রহ্ম ঐ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছেন। কঠোপনিষদ-এও (২/২/১৫) ঐ একই কথা বলা হয়েছে ঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়ম্ অগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

—'সেই অসীম আত্মাকে সূর্য আলোকিত করে না, চন্দ্র বা তারকাও নয়, আমাদের নিজ গৃহে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিও তাকে আলোকিত করতে পারে না। সেই স্বয়ংজ্যোতি দেদীপ্যমান বলেই এই আলোগুলি দীপ্তিমান হয়। তাঁর প্রভাতেই সমগ্র জগৎ বিভাসিত'।

আত্মা বা ব্রহ্ম হলেন *জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ।* চরম সত্যের কী কবিত্বময় অভিব্যক্তি! *তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি,* 'তাঁর প্রভাতেই সমগ্র জগৎ আলোকিত'! চন্দ্র ও সূর্যের যে দীপ্তি, তা ব্রহ্ম থেকেই পাওয়া। তিনি জ্যোতির জ্যোতি। এইভাবে, কাব্য কেবল বাস্তব সত্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে না, তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষমতা ও মূল্যবোধকেও সম্প্রসারিত করে। কাব্য আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়, যার ফলে কেবল ওপর ওপর দেখা নয়, সত্যের গভীরে আমরা প্রবেশ করতে পারি। সকল জ্যোতির জ্যোতি যিনি, তাঁর জন্যই পার্থিব জগতে কবির কবিতায় সেই দ্যুতির সামান্য প্রকাশ দেখা যায়। সব ভাষাতেই তাই কবিতার এতো কদর। বস্তুত সব ভাষার আদি সাহিত্য মূলত কাব্য। গদ্যের আবির্ভাব অনেক পরে। এমনকি গদ্যের মধ্যেও যেটি আপনার মর্ম স্পর্শ করে, সেটি তার কাব্যিক উপাদান। সত্যি কথা বলতে কি, সুন্দর গদ্য কাব্যিক না হয়ে পারে না। একমাত্র গদ্য, যা সম্পূর্ণভাবে কাব্যের সুষমাবর্জিত, তা হলো আদালতের দলিল দস্তাবেজ; সেটি সর্বাংশে নিরস গদ্য-সাহিত্য। কিন্তু আর সব গদ্যের যদি কিছু মাত্র আকর্ষণ থেকে থাকে, তবে তা হলো তার কাব্যিক উপাদান।

অতএব, আলোচ্য শ্লোকে *কবিম্* হলো প্রথম শব্দ। তারপর পাচ্ছি *পুরাণম্,* 'সর্বাধিক প্রাচীন'। সর্বাধিক প্রাচীন হলেন ঈশ্বর। বাকি সমস্ত কিছু তাঁর পরে এসেছে। শঙ্করাচার্য *পুরাণ* শব্দটির অর্থ করেছেন—*পুরা অপি নব এব ইতি পুরাণঃ* —অর্থাৎ 'প্রাচীন হলেও তা সর্বদা সতেজ, নবীন,' সর্বদা নতুন।

পুরাণম্-এর এই হলো আর একটি অর্থ। ভারতবর্ষের কথাই ধরুন। অতি প্রাচীন সভ্যতা হয়েও সে চিরনবীন। কী সুন্দর ভাব! স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ও 'Positive Sciences of the Ancient Hindus'-এর লেখক ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন, ভারতবর্ষের বয়স বাড়ছে, কিন্তু সে বুড়িয়ে যাচ্ছে না। এই হলো ভারতবর্ষ, এরই নাম *পুরাণ।*

এরপর আসছে *অনুশাসিতারম্,* 'সমস্ত বিশ্বের শাসনকর্তা'। তাঁরই নিয়মে বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। পৃথিবীর বৃত্তাকারে ঘুরে চলা, নীহারিকার সঞ্চরণ, সমস্ত কিছুই তাঁর শাসনের অধীন। প্রকৃতির পারে যে সত্তা, তার দ্বারাই প্রাকৃতিক নিয়ম নিয়মিত হচ্ছে। *অণোরণীয়াংসম্,* 'অণু হতেও সূক্ষ্ম', সমস্ত সূক্ষ্ম পদার্থের থেকেও সূক্ষ্মতর। *অনুস্মরেদ্ যঃ,* 'যিনি এই সত্যের অনুধ্যান করেন'; *সর্বস্য ধাতারম্,* 'বিশ্বের সবকিছুর যিনি ধারক বা ভিত্তি।' এই জগতের সমস্ত কিছু যিনি ধারণ করে আছেন, যিনি অধিষ্ঠান, তিনিই হলেন ঈশ্বর, তিনিই পরম সত্য! শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, 'ঈশ্বর আছেন বলে সব আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। ১-এর পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়। ১-কে পুঁছে ফেললে শূন্যের কোনও মূল্যই থাকে না।' বাস্তবিক, একের জন্যই বহুর মূল্য। সেই এককে সরিয়ে দিন, দেখবেন শুধু শূন্যই পড়ে রয়েছে। তাই ভগবানকে *সর্বস্য ধাতারম্* নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। *অচিন্ত্যরূপম্,* 'অচিন্তনীয়'; তাঁকে চিন্তার পরিধির মধ্যে আনা যায় না, তাঁর স্বরূপ চিন্তার ঊর্ধ্বে, কারণ তিনি হলেন শুদ্ধ সত্তা। *আদিত্যবর্ণম্,* 'সূর্যের মতো জ্যোতিষ্মান,' সূর্যের মতো ভাস্বর, স্বয়ংজ্যোতি। *তমসঃ পরস্তাৎ,* 'সমস্ত মোহ ও অন্ধকারের পারে' তাঁর স্থিতি।

প্রয়াণকালে, 'প্রয়াণ বা মৃত্যুকালে'; *মনসা অচলেন,* 'অবিচলিত মনের দ্বারা', এই সত্যে, অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপে আমরা মন নিবদ্ধ করি। *ভক্ত্যা যুক্তো,* 'ভক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে'; *যোগবলেন চৈব,* এবং 'যোগবলের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে' যা একাগ্র মনকে সাহায্য করে। *ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য সম্যক্,* 'সেই অবস্থায় আভ্যন্তরীণ প্রাণশক্তিকে সম্যকভাবে ভ্রুযুগলের মধ্যে সংহত করে'। তা করলে সেই ব্যক্তির কী হয়? তাঁর উত্তরে বলা হচ্ছে, *স তং পরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্,* 'সেই ব্যক্তি পরম দিব্য পুরুষকে লাভ করেন', অর্থাৎ উপলব্ধি করেন।

বেদান্তে, সত্যের স্বরূপকে যতদূর সম্ভব স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনিই হলেন ব্রহ্ম, যাঁর থেকে বিশ্বের উৎপত্তি, যাঁর মধ্যে বিশ্বের

স্থিতি, আবার শেষকালে যাঁতে বিলয় হয়। একত্ব থেকেই বহুত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। বহু এখনও একের মধ্যেই আছে, কিন্তু শেষে তাঁতেই মিশে যাবে। এক হলেন চিৎস্বরূপ, অনন্ত ও অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্য। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ* খুবই যুক্তিসঙ্গত উপায়ে পরমসত্য বা ব্রহ্মকে এইভাবে উপস্থাপিত করেছে। কোন শব্দ দিয়েই তাঁর স্বরূপ বোঝানো যায় না, কিন্তু কোন একটি শব্দ তো ব্যবহার করতেই হবে। তাই 'ব্রহ্ম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ অনন্ত ব্যাপ্তি। *বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম*—বৃহত্তম, তাই ব্রহ্ম। সুতরাং, এই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সত্তাটিকে নির্দেশ করার জন্য যে সর্বোত্তম শব্দটি পাওয়া গেল তা হলো 'ব্রহ্ম', অথবা 'আত্মা'। আত্মা ব্রহ্মেরই একটি স্ফুলিঙ্গ যা আমাদের সবার মধ্যে বিরাজ করছে। যখন আপনার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করা হয়, তখন তা আত্মা নামে অভিহিত। যখন তা বাইরের দিকে নির্দেশিত, তখন তাকে প্রকৃতি বলা হয়। অতএব, অন্তর্নিহিত সত্য হলো *প্রত্যক্* এবং বাইরের ঐ সত্য হলো *পরাক্। প্রত্যক্* অর্থাৎ 'আপনার অন্তঃস্থ স্বরূপ'। এই কারণেই একে আত্মা বা *প্রত্যগাত্মা-ও* বলা হয়। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। সেই অদ্বিতীয় পরম সত্তা যখন দেহ-মন-সংঘাতের মধ্যে ধরা পড়েন তখন তাঁকে বলি আত্মা; প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই অনন্ত ব্রহ্মই। বেদান্তদর্শন ও স্বামী বিবেকানন্দ যতদূর সম্ভব যুক্তিপূর্ণভাবে আমাদের কাছে এই জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যদিও কারণ ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিগ্রাহ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রামাণ্য সত্যরূপে উপস্থাপিত করা যায় না। অবশ্য এই পরম সত্য যে আছে, তার আভাস অনেকটাই দেওয়া সম্ভব। আসল জিনিস হচ্ছে উপলব্ধি : 'আমি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছি, আত্মাকে উপলব্ধি করেছি', এই অবস্থায় পৌঁছতে হবে। এই হলো বৈদান্তিক সত্যের স্বরূপ। আত্যন্তিক সত্যের আলোচনা করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য *শ্রুতি, যুক্তি, অনুভব*-এর কথা বলেছেন। জ্ঞানের তিনটি উৎস আমাদের প্রয়োজন। প্রথমটি হলো *শ্রুতি*, অর্থাৎ অতীত ঋষিদের অভিজ্ঞতা যা উপনিষদে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় হলো *যুক্তি*, আমাদের নিজস্ব স্বচ্ছ বিচার দিয়ে ঐসব অভিজ্ঞতা যাচাই করে নেওয়া। সবশেষে দরকার আমাদের নিজস্ব *অনুভব* বা আপন অভিজ্ঞতা যার দ্বারা আমরা বলতে পারি, 'হ্যাঁ, এটি সত্য, আমিও ঐ সত্য উপলব্ধি করেছি'। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে ও আধ্যাত্মিক জীবনে তাই *শ্রুতি, যুক্তি* ও *অনুভব* একইসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে।

তাই বলা হচ্ছে, *স তং পরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্*, প্রয়াণকালে, 'এই ধরনের মানুষ সেই পরম *পুরুষ* ঈশ্বরকে লাভ করেন', কারণ এই সত্যকে

যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য তিনি মনকে দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুত করেছেন। আধ্যাত্মিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি তাঁর সমস্ত জীবনটি অতিবাহিত করেছেন। ধর্ম একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের ব্যাপার হলেও হতে পারে; কিন্তু ঐভাবে আধ্যাত্মিক হওয়া যায় না। তার জন্য অবিরাম প্রয়াস দরকার। দরকার এই জন্য যে, আমাদের প্রকৃত স্বরূপ নিত্য, কিন্তু ধর্মীয় ক্রিয়া ও আচার অনুষ্ঠান মাঝে মধ্যে করা চলে। সেইজন্যই রবিবার রবিবার গির্জায় যেতে বলা হয়; অন্য ছ'টি দিন চার্চ নিয়ে অধিকাংশ মানুষেরই কোন মাথাব্যথা থাকে না। আমাদের মধ্যেও বিশেষ পর্ব উপলক্ষ্যে মন্দিরে যাওয়ার রেওয়াজ আছে। এগুলি সমস্তই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ভিন্ন বস্তু। আধ্যাত্মিকতা হলো নিজের ভিতর যে দিব্য স্ফুলিঙ্গ রয়েছে, নিজের সেই সত্য স্বরূপ সম্পর্কে সচেতনতা। আমাদের দেহ-মন-বিশিষ্ট যে আমিত্ব, তার পিছনে মাংসপেশী, স্নায়ুতন্ত্র ও অন্তঃকরণের পিছনে রয়েছেন অনন্ত আত্মা, যিনি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। ঐটিই আমাদের স্বরূপ, যার কথা গীতা, উপনিষদ ও শঙ্করাচার্যের রচনায় বারবার অভিব্যক্ত হয়েছে। আজ বিবেকানন্দ-সাহিত্যেও এই বাণীর বিপুল উদ্‌ঘোষণা শোনা যায়। নানা ধর্মগ্রন্থে, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের কথা আছে। সেগুলি আপনি পালন করতেও পারেন, নাও পারেন; সে আপনার মর্জি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি সেই ধর্মের মানুষই থেকে যান। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক মূলত আপনার স্বরূপের সঙ্গে, আপনার প্রকৃত 'আমি'-কে নিয়েই তার কাজ। অতএব কেউই আধ্যাত্মিক পরিধির বাইরে নয়, সকলেই আধ্যাত্মিক। এইজন্য আমরা ভারতবর্ষে অনেককে বলতে শুনি যে, 'ঈশ্বর স্বর্গে বসে আছেন ও জগৎ সৃষ্টি করছেন, একথা আমি বিশ্বাস করি না; আমি নাস্তিক'। আমরা কখনও এমন মানুষের নিন্দা করি না, কারণ তিনি ধার্মিক না হতে পারেন, কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক। তিনি হয়তো ভগবান সম্পর্কে মানুষের যে চিরাচরিত ধারণা, তা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তিনি খুব উন্নত চরিত্রের মানুষ, দয়ালু ও সেবাপরায়ণ হতে পারেন। এসব থেকে প্রমাণিত হয়, তাঁর ক্ষুদ্র অহং-এর পশ্চাতে, নিজের ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন। আপন সত্তার দিব্যতা সম্পর্কে এই সচেতনতাই আধ্যাত্মিকতা। যখনই আপনি আপনার ক্ষুদ্র অহং-এর বাইরে একটি পদক্ষেপ নেবেন, তখনই আপনি ঈশ্বরের দিকে এক-পা এগিয়ে গেলেন। এইটিই আধ্যাত্মিকতা। সুতরাং সেবাকর্মে ব্যাপৃত থাকা ও আত্মনিবেদনই হলো আধ্যাত্মিক জীবন। এই অর্থে আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের অধিকার সকলেরই আছে। ধর্মীয় বিধিনিষেধের বাইরে গিয়েও কেউ আধ্যাত্মিক

পথে চলতে পারেন। তাই, এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'যিনি আধ্যাত্মিক নন, তাঁকে আমি হিন্দু বলি না।' বাস্তবিক, আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ আপনি না করতেও পারেন, কিন্তু আপনাকে অবশ্যই আধ্যাত্মিক হতে হবে, কারণ এটিই হলো উন্নতি ও বিকাশের পথ ও প্রকৃতি। এই আধ্যাত্মিক চেতনা দেহ ও মনের সঙ্গে লিপ্ত আমার অহং বা কাঁচা-আমিকে পাকা-আমি বা বৃহত্তর আমিতে রূপান্তরিত করে, যার ফলে আমি সকলের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারি। এই হলো আধ্যাত্মিকতার প্রসার, প্রকৃত অধ্যাত্ম-জীবনের সূচনা। এইভাবে ভাবিত হয়ে জীবন অতিবাহিত করলে তবেই প্রয়াণকালে, এখানে যেসব মহান সত্যগুলির কথা বলা হয়েছে, মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে। কাজকর্ম, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ সবই থাকবে, কিন্তু সবই এই অপূর্ব সত্যের আলোকে পরিমার্জিত হয়ে।

শ্রীশঙ্করাচার্য উপনিষদের ভাষ্যে বলেছেন, 'আত্মাকে জগতের প্রেক্ষাপট থেকে সরিয়ে নাও, জগৎ শূন্য হয়ে যাবে', *তদ্ আত্মানং বিমুক্তঃ জগৎ অসৎ সম্পদাতে।* তাই, আমি আত্মাকে জগৎ হতে আলাদা করব না। এই ধরনের মনোভাবকেই আধ্যাত্মিকতা বলে। বহুর পশ্চাতে সেই এককে দেখার চেষ্টা করতে হবে; প্রতি কর্মে, প্রতি চেষ্টায়, প্রতি সম্পর্কের ক্ষেত্রেই সেই একক অনুভব করার প্রয়াসী হতে হবে। আমাকে আত্ম-সচেতন হওয়ার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে সকলের সঙ্গে আমি মধুর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি, কারণ সকলের মধ্যেই তো সেই এক আত্মাই বিরাজ করছেন। এই হলো আধ্যাত্মিকতা। এর মধ্যে কোন ম্যাজিক বা অলৌকিক কিছু নেই। এটি প্রত্যেক মানুষের জীবন্ত অভিজ্ঞতা। এটি *অনুভবস্বরূপ।* আপনি প্রতিদিনের কাজের মধ্যেও এই সত্য অনুভব করতে পারেন। গৃহবধূ, যিনি বাড়িতে সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকেন, তিনি যদি মনে রাখেন যে তাঁর ভিতরেই ঈশ্বর বিরাজ করছেন, তাহলে তিনিও গভীরভাবে আধ্যাত্মিক হয়ে উঠতে পারেন। বেদান্তের ঈশ্বর দূর আকাশে বসে নেই, তিনি আপনার অন্তরেই আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ এখানে এইসব কথাই বললেন। এইভাবে আমাদের জীবন গড়ে তুললে, অবশেষে একদিন যখন মৃত্যু আসবে তখন আমাদের মন সহজেই অনন্ত ব্রহ্মে স্থির হয়ে যাবে এবং শরীরত্যাগের সময় আমরা তাঁর সঙ্গে আমাদের একত্ব উপলব্ধি করব। আমরা শরীর নই, শরীর আমাদের। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমাদের সেকথা বলা হয়েছে। আমরা জেনেছি, কাপড় পুরানো হলে

যেমন আমরা সেটি ফেলে দিয়ে একখানি নতুন কাপড় পরি, আত্মার সঙ্গে দেহের সম্পর্কও সেইরকম। ৯ম ও ১০ম এই শ্লোকদুটি অতি সুন্দর; ধ্যান ও প্রার্থনার সময় এগুলি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়।

মৃত্যুর সময় সত্য উপলব্ধি করলে কী হয়, শ্রীকৃষ্ণ দশম শ্লোকে তা বিস্তারিত ভাবে বলেছেন।

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।

প্রয়াণ-এর সময়, 'মৃত্যুকালে'; *মনসা অচলেন,* 'একাগ্রচিত্তে'; *ভক্ত্যা যুক্তো,* 'ভক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে'; *যোগবলেন চৈব,* 'এবং যোগবলের দ্বারাও'। সারা জীবন একাগ্রতা অভ্যাস করলে তবেই আপনি যোগবলে বলীয়ান হতে পারেন। এই *যোগবল* শক্তি সম্পর্কে একটি অসাধারণ চিন্তা। প্রসঙ্গক্রমে বলি, মহাভারতে মানুষের তিনরকম শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি হলো *বাহুবলম্,* দৈহিক শক্তি। জিনিসপত্র টানাটানি করে ছোট ছেলেমেয়েরা এই *বাহুবল* বাড়ায়। কিন্তু এটি সাধারণ শক্তি, কারণ একটা ষাঁড়ের আমাদের থেকেও বেশি *বাহুবল*; ঘোড়ার আছে তার থেকেও বেশি; একটি রকেটের আরও বেশি। সুতরাং *বাহুবল* হলো মানবিক শক্তি বা ক্ষমতার প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় শক্তিটি একমাত্র মানুষেরই আছে—তা হলো *বুদ্ধিবলম্,* যা আসে চিন্তা থেকে, বুদ্ধি থেকে, বিচার থেকে। এখানে মানুষ সবার ঊর্ধ্বে; কিন্তু এই বলটিই শ্রেষ্ঠ নয়। এর থেকেও মহত্তর কিছু আছে, যা ভারতীয় চিন্তায় ধরা পড়েছে। চিন্তাজগতে এটি ভারতবর্ষের মহত্তম অবদান। *বুদ্ধিবলই সব নয়*; অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিও দৈনন্দিন জীবনে অতি সাধারণ হতে পারেন। এইখানে শক্তির তৃতীয় একটি উৎসের কথা এসে পড়ে। সেটিকে আমরা *যোগবলং* বা *আত্মবলম্* বলে থাকি। এই *যোগবলম্* বা যোগবল আসে অধ্যাত্ম স্বরূপের অনুভূতি, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান থেকে। এই অনুভূতি বা জ্ঞানই অনন্ত শক্তির উৎস। দৈহিক ও বৌদ্ধিক শক্তিও সাধারণত আত্মা থেকেই আসে। অতএব, যখন আপনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তখন তো কথাই নেই; আপনার শক্তিও তখন অনন্ত। এই হলো *যোগবলং বা আত্মবলম্।* যদি শৈশবকাল থেকে আমরা প্রতিদিন এই তিনটি শক্তিকে একযোগে বাড়াতে পারি, তবে সেইটিই হবে শক্তির আদর্শ বিকাশ। বাহুবল বাড়াতে হলে শারীরিক ব্যায়াম ও পুষ্টিকর খাদ্যের খুব দরকার। কারণ তার দ্বারা আমরা দৃঢ় ও শক্তসমর্থ হয়ে উঠি, যাকে স্বামী বিবেকানন্দ

'লৌহ সদৃশ মাংসপেশি ও ইস্পাতের স্নায়ু' বলেছেন। ভারতবর্ষে তো বটেই, সর্বত্রই এইরকম শক্তসমর্থ যুব সম্প্রদায়ের প্রয়োজন। তিনি বলতেন, 'আমরা শরীরকে খুবই দুর্বল করে ফেলেছি; আমরা তাকে অযত্ন করেছি।' অতএব আমাদের আজ *বাহুবলের* প্রয়োজন। সেই সঙ্গে *বুদ্ধিবল*-ও চাই। স্কুলে যান, শিক্ষালাভ করুন, পড়াশুনা করুন, নিজে চিন্তা করুন; নিজের মন, বুদ্ধি ও যুক্তিকে শক্তিশালী করুন এবং একই সঙ্গে নিজের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে একটু উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। তাতে যোগবলের বিকাশ হবে। অল্প অল্প করে, শৈশবকাল থেকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া দরকার। *যোগবলেন চৈব*—এই কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ এইটিই বোঝাতে চেয়েছেন। তিনটি শক্তির বিকাশের জন্য চাই এক সামগ্রিক শিক্ষা এবং *যোগবল* বা *আত্মবল*-এর ঐ তৃতীয় দিকটিই হলো প্রকৃত শক্তি। একমাত্র এই শক্তিই আপনাকে জগতের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করার সামর্থ্য দেবে। আজকের সমাজে এই ধরনের চাপ প্রচুর, যা আমাদের মন ও স্নায়ুগুলিকে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করে তুলছে। সামান্য একটু যোগবল বা আত্মবল থাকলে ঐ সমস্ত মানসিক চাপের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। একমাত্র *আত্মবল* থেকেই মহৎ চরিত্রের সৃষ্টি হয়, *বুদ্ধিবল* থেকে নয়। *বুদ্ধিবল* সহজেই মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে, কিন্তু সামান্য আত্মবলের দ্বারা আমরা এধরনের সমস্ত দুর্বলতা কাটিয়ে নির্মল চরিত্র গঠন করতে পারি। এই কারণে ছেলেমেয়েদের এই তিনটি শক্তিই অর্জন করতে হবে। তৃতীয় শক্তিটি, অর্থাৎ আত্মবল, অল্প হলেও চলে। কারণ, শক্তি যত নিম্নস্তরের হবে, তার পরিমাণগত প্রয়োজন ততই বেশি। তুলনামূলকভাবে শক্তি যত উচ্চস্তরের হবে, তার স্বল্প পরিমাণেই আমাদের কাজ চলে যায়। বেশি থাকলে ভালোই। তবে আধ্যাত্মিক শক্তি বেশি মাত্রায় দরকার হয় না। পরিমাণের চেয়েও আমাদের কাছে গুণগত উৎকর্ষের মূল্য বেশি। সুতরাং, একটু আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারলেই আমরা জগৎ ও তার সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে পারি। তখন আমরা সত্যই স্বাধীন। তখন আর কেউ আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না, ক্রীতদাস করে রাখতে পারবে না। এইটিই হলো আধ্যাত্মিক মুক্তি। এই স্বাধীনতার আস্বাদন শিশুকেও করতে হবে এবং তাকে শিখতে হবে অন্যের স্বাধীনতাকেও কি করে শ্রদ্ধা করতে হয়। এখানেই যোগবলের গুরুত্ব। এর সামান্য পরিমাণ হলেই মানুষের জীবনে স্থিতি আসবে। আমাদের সমাজে যে সমস্ত তুচ্ছতা, সঙ্কীর্ণতা, দ্বন্দ্ববিবাদ রয়েছে, তা দূর করে এক শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলুন। কী মহৎ ভাবনা! বাস্তবিক, মানুষে মানুষে সহযোগিতা, পরস্পরের

মধ্যে মধুর সম্পর্ক, সুখী পারিবারিকজীবন—সবই আসতে পারে সামান্য যোগবল থাকলে। শুধু বুদ্ধিবলে তা হয় না। আমরা তো চোখের সামনে দেখছি, বুদ্ধিমান মানুষেরাই আজ সবচেয়ে নিকৃষ্ট। সমাজের সমস্ত দুর্বলতা ও দুর্বৃত্তির উৎস এই চালাক ব্যক্তিরা। যত দুর্নীতি ও সামাজিক সংঘাত, বেশিরভাগ তাদেরই সৃষ্টি। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের বাহ্য জীবনে স্থিতি আনতে গেলে, বুদ্ধিকে (যাকে শঙ্করাচার্য *নেদিষ্ঠং ব্রহ্ম*, 'ব্রহ্মের সবচেয়ে কাছে' বলেছেন) ছাড়িয়ে আরো গভীরে যেতে হবে নূতন শক্তির উৎস খুঁজতে। এইটিই হলো *যোগবল* বা *আত্মবল*-এর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক তাৎপর্য।

আমাদের শরীরে অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। তার মধ্যে যকৃৎ একটি বড় অঙ্গ। এই যকৃত ও অন্যান্য বড় বড় অঙ্গ থেকে প্রচুর রস নিঃসৃত হয়। কিন্তু মস্তিষ্কে পিটুইটারি ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র লালাগ্রন্থি থেকে যে সামান্য পরিমাণ রস বেরিয়ে আসে, তাতেই দেহ ও মনের ভারসাম্য বজায় থাকে। কী আশ্চর্য ব্যাপার! এই কারণেই গুণগত মানের গুরুত্ব বেশি, পরিমাণের নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পেশীগুলো হলো পরিমাণ, বুদ্ধি হলো উৎকর্ষ এবং আত্মা চরম উৎকর্ষ। এই কারণেই *যোগবলম্* শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, 'শিশুকাল থেকেই এই ধরনের যোগবল আয়ত্ত করার অভ্যাস করলে মৃত্যুকালে তা তোমার প্রভূত উপকার করবে; যোগের প্রবল শক্তি তোমাকে এমনভাবে সাহায্য করবে যে, মনকে বিষয়ান্তরে যেতে দেবে না'। এই শক্তি প্রত্যেকেই অর্জন করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি প্রথম থেকে, শৈশবকাল থেকেই এটি অর্জনের চেষ্টা না করেন, তবে ঠিক শেষ সময়ে, অর্থাৎ মৃত্যুকালে, এটি লাভ করা অত সহজসাধ্য নয়। সুতরাং অন্তিম মুহূর্তের জন্য বসে থাকবেন না। জীবনের গোড়া থেকেই যোগাভ্যাস শুরু করুন। তাহলে আমরা দেখলাম যে, বাহুবল, বুদ্ধিবল এবং সেই সঙ্গে যোগবলেরও যুগপৎ বিকাশ দরকার।

ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য সম্যক্, 'প্রাণকে ভ্রূযুগলের মধ্যে একাগ্র করে'। ভ্রূযুগলে আজ্ঞাচক্র আছে, যেটি মানসিক চেতনার ষষ্ঠ ভূমি। ওই ভূমিতে উঠে দেহত্যাগ করলে, আপনার পরম উপলব্ধি হবে। *স তং পরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্*, 'তিনি সেই পরম পুরুষ বা অবিনাশী সত্য ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব লাভ করেন'। এই হলো ৯ম ও ১০ম শ্লোকের অর্থ। এবার আমরা একাদশ শ্লোকে প্রবেশ করছি, যেখানে ভগবান বলছেন ঃ

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

—'বেদজ্ঞরা যাঁকে অক্ষর (অবিনাশী) বলেন, আত্মসংযত, অনাসক্ত যতিরা (সন্ন্যাসীরা) যাঁতে প্রবেশ করেন এবং যে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তাঁরা ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন করেন, তোমাকে তাঁর কথা এখন আমি সংক্ষেপে বলব।'

'এবার আমি তোমাকে সেই সর্বোচ্চ অবস্থার কথা বলব'। এই সর্বোচ্চ অবস্থাটি কী? *যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি*, 'একটি শব্দ যা বেদজ্ঞরা উচ্চারণ করে থাকেন।' সেটি হলো *ওঁ* বা *প্রণব*। *বিশন্তি যৎ যতয়ো বীতরাগাঃ*, 'যাঁরা *রাগ*, অর্থাৎ আসক্তি জয় করেন, তাঁরাই এই অবস্থা লাভ করেন। অনুরূপভাবে, *যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*, 'যা জানার জন্য মানুষ' গুরুকুলে, গুরুর তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকে। তাদের লক্ষ্য হলো এই : 'আমি *ব্রহ্মচারী।* কেন? কারণ আমি পরম সত্য উপলব্ধি করতে চাই।' এই মহান উপলব্ধিই ব্রহ্মচর্যের উদ্দেশ্য। তা না হলে ব্রহ্মচর্য নিরর্থক। *তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে*, 'সেই পরম পদ বা শ্রেষ্ঠ অবস্থা সম্বন্ধে আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলব'। তাঁকে আমরা ওঁ বলি। *কঠোপনিষদ্*-এও অনুরূপ একটি শ্লোক রয়েছে, যেখানে শেষদিকে বলা হয়েছে *ওঁ ইতি এতৎ* 'এটিই *ওঁ*' (১/২/১৫)। *ওঁ* কি? এটি হলো ঈশ্বরের সর্বোচ্চ প্রতীক, পরম সত্যের সর্বোত্তম প্রতীক, যা একই সঙ্গে নির্গুণও বটে আবার সগুণও বটে। এটি একটি প্রতীক, ঠিক প্রতিমার মতোই। আপনি ঈশ্বরের সগুণ রূপকে একটি প্রতিমায় পূজা করেন। প্রতিমাটি *ঈশ্বর* নয়, কিন্তু ওইটিই সেই অপূর্ব সত্যের সর্বোত্তম প্রতিমূর্তি। তাই, *কঠোপনিষদ্*-এর ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলছেন, *ওঁ শব্দ বাচ্যং, ওঁ শব্দ প্রতীকং চ। ওঁ শব্দ* হলো *বাচ্যম্*, অর্থবোধক শুধুই একটি শব্দ, যার অর্থ শব্দাতীত অন্য কিছু! এই শব্দটি সেই পরম সত্যের প্রতীকমাত্র। ভারতীয় ঐতিহ্যে সর্বত্রই এই ওঁ-এর সমাদর। ভারতে যে সব ধর্মের উদ্ভব হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটিতেই ওঁ-ই হলো ঈশ্বরের সর্বোৎকৃষ্ট নাম। গুরু নানকের *গুরু গ্রন্থ সাহেব* শুরুই হয়েছে এই *ওঁ-কার* দিয়ে, সেই পরম পুরুষ, যিনি *ওঁ-কার*, তাঁর বন্দনা দিয়ে। সহজে না হলেও, ধীরে ধীরে ভারতীয় খ্রিস্টানদের মধ্যেও ঐভাব প্রবেশ করছে। কিছু প্রতিবন্ধক অবশ্যই আছে, কারণ গোঁড়া খ্রিস্টানরা এর বিরুদ্ধে। কিন্তু যাঁরা অতীন্দ্রিয়বাদী খ্রিস্টান, তাঁরা

ওঁ-কারকে সর্বোচ্চ সত্যের সগুণ ও নির্গুণ সত্তার প্রতীক মনে করেন। তাঁরা যুক্তি দেখিয়ে বলেন ঃ সেন্ট জন (Saint John)-এর গসপেল[১]-এ ওঁ-কারকেই 'the Word' বা পরম শব্দ বলা হয়েছে। 'In the beginning was the Word'; 'আদিতে শব্দই ছিল'; পরম ব্রহ্মের দ্যোতক এই 'Word' বা শব্দটি হলো ওঁ। বলা হয়েছে, 'সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল শুধু শব্দ এবং এই শব্দ ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে অন্বিত, শব্দই ছিলেন ঈশ্বর এবং এই শব্দ রূপান্তরিত হলো শরীরে'[২], অর্থাৎ শব্দ ঈশ্বররূপে সাকার হলেন। সেন্ট জন-এর এই মরমিয়াবাদী গসপেল-এর প্রভাবে যেসব ভারতীয় খ্রিস্টানদের মধ্যে আধ্যাত্মিক মনোভাবের সঞ্চার হচ্ছে, তাঁরা ধীরে ধীরে *ওঁ* বা পরম সত্যের এই বিশ্বজনীন প্রতীকটিকে গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। অবশ্য পাশ্চাত্যে ওঁ অত্যন্ত জনপ্রিয়। যাঁরা ভারতীয় অধ্যাত্ম সাহিত্যের চর্চা করেছেন, তাঁরা ঈশ্বরের সর্বোচ্চ নাম ও প্রতীক হিসাবে এই *ওঁ* শব্দটির প্রতি খুবই অনুরক্ত। সে যাই হোক, বাক্য, মন, নাম ও রূপের অতীত যে তত্ত্ব, তাঁকে আমরা এইভাবেই উপলব্ধি করার চেষ্টা করি এবং সংক্ষিপ্ততম নাম দিয়ে বলি *ওঁ*। ওঁ-কে আমরা প্রণবও বলি। এই শব্দটি থেকেই সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত; তাই একে বলা হয় *শব্দব্রহ্ম,* অর্থাৎ কিনা, 'শব্দরূপ ব্রহ্ম'। *শব্দব্রহ্ম* ও *পরব্রহ্ম*—কী অপূর্ব ব্যঞ্জনা এই কথার মধ্যে। *পরব্রহ্ম-এর ভাবদ্যোতক হলো শব্দব্রহ্ম।* পরব্রহ্ম-কে উপলব্ধি করা যায় শব্দব্রহ্ম-এর মাধ্যমে। পরবর্তী শ্লোকদুটিতে কীভাবে দেহত্যাগ করা উচিত তা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

—'সকল ইন্দ্রিয় সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিবদ্ধ রেখে, প্রাণকে মস্তিষ্কে আকর্ষণ করে, যোগাভ্যাসে রত হয়ে, একাক্ষর শব্দব্রহ্ম *ওঁ* উচ্চারণ ও আমাকে স্মরণ করতে করতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি চরম লক্ষ্যে পৌঁছে যান (অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন)।'

---

১ সেন্ট জন-এর উপদেশাবলী

২ In the Beginning was the Word, and the Word was with God, the Word was God, and the Word became 'flesh.'

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুদ্ধ চ। কীভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করা যায় ও তাঁকে উপলব্ধি করা যায়? *দ্বারাণি,* দেহের বিভিন্ন দ্বারগুলিকে বলা হয় ইন্দ্রিয়; এগুলি হলো *দ্বার,* অর্থাৎ দরজা, দেউড়ি বা যাওয়া আসার পথ। মনুষ্যদেহকে বলা হয় 'পুর' বা নগর। বাইরের জগতে যাওয়ার জন্য এই নগরের অনেকগুলো দ্বার আছে, যেমন চোখ, নাক ইত্যাদি। এই সব পঞ্চেন্দ্রিয়কে বলা হয় *দ্বার।* অতএব, *সর্বদ্বারাণি সংযম্য,* 'পাঁচটি দ্বারকে সংযত করে'। এটি আপনি *অবশ্যই করতে পারেন।* বাস্তবিক, চরিত্র, ধার্মিকতা, নৈতিকতা—এ সমস্ত তখনই আসে যখন আমরা এই ইন্দ্রিয়দ্বারগুলিকে সংযত করার শক্তিকে কাজে লাগাই। *মনো হৃদি নিরুদ্ধ চ,* 'এবং মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে', অর্থাৎ হৃৎপদ্মে স্থির করে। যোগাভ্যাসের ক্ষেত্রে হৃদয়ের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। যোগশাস্ত্রে বলা হয়, এই শরীরের মেরুদণ্ডে সাতটি *চক্র,* পদ্ম বা কেন্দ্র আছে। তৃতীয় চক্রটি নাভির নিচে এবং অন্য দুটি আরও নিচে। চতুর্থ *চক্র* হলো *অনাহত,* যার স্থান হৃদয়ে। এটি ধ্যানের স্থান। তাই, মনকে হৃৎপদ্মে বা অনাহত চক্রে নিবদ্ধ করতে বলা হচ্ছে। *মূর্ধ্ন্যাধায় আত্মনঃ প্রাণম্,* প্রাণকে দুই ভ্রুর মাঝখানে অবস্থিত *আজ্ঞাচক্র*-এ কেন্দ্রীভূত করতে হবে'; *আস্থিতো যোগধারণাম্,* 'এই অবস্থায় তুমি যোগে স্থিত হয়েছ'; এই অবস্থায় মনের সমস্ত শক্তিকে তুমি সম্পূর্ণভাবে সংহত করেছ।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্, 'এই একাক্ষর ব্রহ্ম *ওঁ* উচ্চারণ করতে করতে'; *মাম্ অনুস্মরন্,* এবং সেই সঙ্গে 'আমার অনুধ্যানে মগ্ন হয়ে'। (শ্রীকৃষ্ণ এখানে সর্বজীবের অন্তরে বিরাজিত সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মার কথা বলছেন); *যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহম্,* 'যিনি দেহত্যাগ করেন'; *স যাতি পরমাং গতিম্,* 'তিনি পরম গতি, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।' মানুষ যে যোগারূঢ় হয়ে দেহত্যাগ করতে পারে, এমন অনেক দৃষ্টান্তই আছে, কিন্তু এটি সহজসাধ্য নয়। তার জন্য বহুদিনের অভ্যাস দরকার। বাস্তব সত্য এই, আমরা শরীরটিকে তখনই ত্যাগ করি, যখন সে জীবনের উদ্দেশ্যপালনে অক্ষম হয়ে পড়ে। সেইজন্যই আমরা সর্বদা *ত্যজন্ দেহম্* বা দেহত্যাগের কথা বলে থাকি। আপনি তো দেহ নন। সাময়িক কিছু উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই আপনি দেহ ধারণ করেছেন। সে পাট চুকে গেছে, তাই আপনি দেহটিকে পরিত্যাগ করবেন। সুতরাং প্রশান্তচিত্তে দেহত্যাগ করার সামর্থ্য সারা জীবন ধরে আমাদের অর্জন করতে হয়। তার ফলে শেষ সময়ে আমরা একমনে ব্রহ্ম চিন্তা করতে পারি।

'পৃথিবী কাঁদুক, কিন্তু আমি হাসতে হাসতে যাব', মরণাপন্ন ব্যক্তির এইরকম মনোভাবই হওয়া উচিত। যতদূর মনে পড়ে, হিন্দি কবি তুলসীদাস এইরকম একটা মন্তব্য করে তাঁর মনকে বলেছিলেন, 'তুলসী, জন্মাবার সময়ে তুমি কেঁদেছিলে এবং জগৎ হেসেছিল; এমনভাবে জীবন কাটাও যাতে মরণকালে তুমি হাসবে কিন্তু জগৎ কাঁদবে'। আপনি এমন মহৎ জীবনযাপন করেছেন যে পৃথিবী আপনার বিরহে কাঁদবে, কিন্তু আপনি আত্মতৃপ্ত—হাসতে হাসতে আপনি চলে যাবেন। সক্রেটিসের ক্ষেত্রেও এইটি ঘটেছিল।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

—'হে পার্থ, যে অনন্যচেতা যোগী একাগ্র মনে নিত্য ও নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, তিঁনি আমাকে সহজেই লাভ করেন।'

এই শ্লোকে বলা হচ্ছে ঃ *অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি*, 'যাঁরা একাগ্র মনে আমাকে স্মরণ করেন'; 'যাঁর মন একমাত্র আমাতেই নিবিষ্ট', অন্য কোন বিষয়ে নয়, তিনিই *অনন্যচেতাঃ। সততং*, 'নিরন্তর'; *মাং স্মরতি নিত্যশঃ*, 'আমাকে প্রতিদিন স্মরণ করেন'; *তস্যাহং সুলভঃ পার্থ*, 'এমন মানুষের কাছে, হে অর্জুন, আমি সহজবোধ্য'; *সুলভঃ* অর্থাৎ 'সহজে লভ্য'। কেন? *নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ*, কারণ 'তিনি *নিত্যযুক্ত* যোগী', সর্বদা যোগের অবস্থায় রয়েছেন—কিছু সময়ের জন্য নয়। খুব সত্যি কথা। দীর্ঘ, অবিরাম অভ্যাসের ফলে এইরকম মানুষের সমগ্র জীবনটিই একটি নিরবচ্ছিন্ন যোগসাধনা হয়ে দাঁড়ায়। কিছু মানুষ এই অপূর্ব অবস্থা লাভ করেছেন। তাঁদের কথা আমরা প্রাচীন ও আধুনিক নানা গ্রন্থে পাই।

এরপর আসছে পঞ্চদশ শ্লোক, সেখানে বলা হচ্ছে ঃ

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

—'পরম সিদ্ধি ও আমাকে লাভ করে মহাত্মারা এই দুঃখের আলয় অনিত্য জগতে আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না।'

মাম্ উপেত্য, 'আমাকে লাভ করে'; *পুনর্জন্ম*, 'পুনরায় জন্মগ্রহণ' করতে হয় না। এই পুনর্জন্মটি কী? *দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্*, 'দুঃখের আলয় ও অনিত্য'।

এই হলো মনুষ্যজীবনের প্রকৃতি—পাহাড়প্রমাণ দুঃখের সঙ্গে কিছু সুখ ও আরামের ছিটে। উচ্চতর কিছু জানি না বলে আমরা মনে করি এই সংসারই সব; আমরা বেশ তোফা আছি, আরামে আছি। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা মহত্তর বস্তুর সন্ধান পাবো, তখন বুঝবো যে আমরা মোটেই তোফা নেই। মূল সমস্যাটা হলো, আমাদের নিজেদের বদলাবার কোন স্পৃহা নেই, যেমন আছি তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। এই মানবশরীর আমাদের সুখ দেয়। শূকরও তার দেহ থেকে সুখ পায়। কোন শূকরকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার শরীর কি তুমি পাল্টাতে চাও?' সে বলবে, 'না, না, আমি এই শরীর নিয়ে বেশ আছি!' সকলেরই মনোভাব এই, কারণ আমরা জানি না যে এই দেহের অন্তরালে আত্মা আছেন এবং মুক্তির সুধাভাণ্ড নিয়ে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। বাস্তবিক, আত্মাকে উপলব্ধি করলেই আমরা চিরমুক্ত।

দুঃখালয়ম্ শব্দের অর্থ এই নয় যে জীবন আনন্দবর্জিত। আনন্দও আছে, সুখও আছে। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে এই বিষয়টি নিয়ে আজ পর্যন্ত অনেক সমীক্ষা হয়েছে। প্রশ্ন একটিই—জীবনে সুখ বেশি না দুঃখ বেশি? লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'গীতারহস্য' নামক গ্রন্থের দুটি খণ্ডে এই নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। সাধারণত লোকে বলে, 'তুমি যদি ভাব যে জগৎ দুঃখে পরিপূর্ণ, তবে তুমি নৈরাশ্যবাদী'! আর তা যদি না ভাব, তাহলে তুমি 'আশাবাদী'। কিন্তু এধরনের সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। কারণ একবার যদি জীবনের সত্যটি আপনি জানতে পারেন, তবে দেখবেন যে নৈরাশ্যবাদ বা আশাবাদের কোন প্রশ্নই ওঠে না; সংসার ও মনুষ্যজীবনের প্রকৃতি সম্বন্ধে যা সত্য, সেটি নিখাদ সত্যই।

এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর গ্রন্থে তিলক বলেছেন (১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫)ঃ

'ঐস্লামিক ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, স্পেনে মুসলমান শাসন কায়েম থাকার সময়, তৃতীয় আবদুল রহিমান নামে একজন ন্যায়পরায়ণ ও ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপনের একটি দিনপঞ্জী তিনি রেখেছিলেন। সেই দীর্ঘ দিনপঞ্জী থেকে পরিশেষে তিনি আবিষ্কার করেন যে, ৫০ বছরের রাজত্বকালে তিনি নিখাদ সুখভোগ করেছেন মাত্র ১৪ দিন...।'

তিলক বিষয়টিকে নিচের এই অনুপাতের আকারে দেখিয়েছেন (পৃঃ ১৪৪-৪৫)ঃ $\frac{\text{সুখভোগ}}{\text{সুখভোগের ইচ্ছা}}$

'এটি এমনই এক বিচিত্র ভগ্নাঙ্ক যে এর বিভাজক অর্থাৎ সুখভোগেচ্ছা, তার বিভাজ্য, অর্থাৎ সুখভোগের থেকে সবসময়েই দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে, ভগ্নাঙ্কটি যদি প্রথমে ১/২ হয়, পরে তা ৩/১০ হয়ে যায়, অর্থাৎ বিভাজ্য তিনগুণ বৃদ্ধি পেলে বিভাজক পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়।'

আমি ইতোপূর্বেই আমেরিকার 'হুভার কমিটি রিপোর্ট' উল্লেখ করে বলেছি যে, এমন কোন নতুন ইচ্ছা নেই যা পূরণ করা মাত্রই আবার নতুন নতুন ইচ্ছার জন্ম না দেয়। অন্যদিকে রানী বিদুলা সঞ্জয়কে বলেছেন যে, সমস্ত প্রগতি আসে একমাত্র অসন্তোষ থেকে (মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব, ১৩২-৩৩)। তিনি বলেছেন ঃ *সন্তোষ বৈ সুখং হন্তি*, 'সন্তোষ সংসারসুখ বিনষ্ট করে'।

ব্রিটিশ মনীষী জন স্টুয়ার্ট মিল-ও (John Stuart Mill), তাঁর গ্রন্থ *Utilitarianism*-এ এই বিষয়টির উল্লেখ করে বলেছেন (পৃঃ ১৪, ১৯১৭) ঃ

'একটি তৃপ্ত শূকর হওয়ার থেকে একটি অতৃপ্ত মানুষ হওয়াও শ্রেয়; তৃপ্ত মূর্খ অপেক্ষা অতৃপ্ত সক্রেটিস হওয়া শ্রেয়। এবিষয়ে যদি মূর্খের অথবা শূকরের ভিন্ন মত থাকে, তবে তার কারণ এই যে, তারা কেবল নিজের নিজের ব্যাপারটাই বোঝে।'

অনেক মানুষই এ-ব্যাপারে একমত যে, যদি সামাজিক সুখ ও দুঃখের হিসাব করা হয় তো দেখা যাবে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নয়, দুঃখবেদনার পরিমাণই বেশি। আনন্দ এবং সুখ যে নেই তা নয়; কিন্তু দুঃখবেদনারই প্রাধান্য। একটি যুবক বা যুবতী এটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু সত্তর বা আশি বছর পর পিছন ফিরে তাকিয়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করতে পারে, 'আমি জীবনটা কেমন কাটালাম? শুধু সুখ পেয়েছি, না শুধু দুঃখই পেয়েছি? নাকি সুখের চেয়ে দুঃখ বেশি পেয়েছি?' যাঁরা চিন্তাশীল তাঁরা সকলেই এই প্রশ্ন করেছেন। সুতরাং এটি নৈরাশ্যবাদ বা আশাবাদের কথা নয়। প্রশ্ন হলো—জীবনের সত্যটি কি? সত্যটি গীতায় এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ *দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্।* শরীরধারণ করাতেই সংসারের শতরকম চাপ আপনার ওপর এসে পড়ছে। আপনি সে চাপ প্রতিহত করে, নিজের ভাবে, স্বাধীনভাবে থাকার চেষ্টা করছেন। এই ভাবেই সুখদুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা আসে; টানাপোড়েন হয়, নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। এই সব মিলে মিশে যা দাঁড়ায়, তাকে বোঝাতে আমরা প্রায়শই বলে থাকি ঃ *সংসার হলো তাপত্রয়,* 'সংসার ত্রিতাপ দিয়ে গঠিত'। প্রত্যেক হিন্দুই *সংসার ও তাপত্রয়* শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত। তাঁরা এগুলি বলেও

থাকেন। কিন্তু সত্য বলতে গেলে বলতে হয় : হ্যাঁ, দুঃখযন্ত্রণাই বেশি এবং আনন্দ, আরাম ও সুখ নিতান্তই অল্প। তবুও কিন্তু বাঁচার নিজস্ব একটা মূল্য আছে। আমাদের শাস্ত্রগুলি এই শিক্ষাই দেয়। বেদান্ত বলে, বেঁচে থাকা দরকার এই কারণে যে, সুখদুঃখের ভিতর দিয়েই আমাদের অধ্যাত্মবিকাশ সম্ভব হয়। অধ্যাত্মবিকাশের ক্ষেত্রে কখনো কখনো সুখের থেকে দুঃখই আমাদের বেশি সাহায্য করে। এটি বহু পরীক্ষিত সত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায় এই বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ভারতের ঋষিরা আমাদের সামনে জীবনের একটি মহান উদ্দেশ্য তুলে ধরেছিলেন। সেটি এই, জীবনের উদ্দেশ্য সুখ বা দুঃখ নয়; জীবনের লক্ষ্য সুখদুঃখকে অতিক্রম করে অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করা। সদসৎ বিচার করলে, ঐ বিষয় নিয়ে চিন্তা ও ধ্যান করলে, তবেই জ্ঞান লাভ হয় এবং অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, প্রায়শই সুখ অপেক্ষা দুঃখ থেকেই বেশি জ্ঞান লাভ করা যায়। এইভাবেই আমরা সুখদুঃখের পারে চলে যাই। সংসারে সুখ বেশি না দুঃখ বেশি, সেটি প্রশ্ন নয়। সত্য এই, মানুষের মন একবার উচ্চতর লক্ষ্যে স্থির হলে সে সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে অনন্ত আত্মাকে, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে, যিনি সুখদুঃখাদি সকল দ্বন্দ্বের অতীত। শ্রীকৃষ্ণ একথাই বলবেন—সুখ ও দুঃখের পারে যাও, কারণ এরা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। একটি থাকলেই আরেকটি থাকবে। জীবন শুধু সুখের হতে পারে না, দুঃখও সেখানে থাকবে। আবার শুধু দুঃখময় হতে পারে না, সুখও থাকবে। গীতার ভাষায় এইগুলি দ্বন্দ্ব/ একটি থাকলে অপরটিও থাকবে। কেবল একটি থাকবে, সে আশা কর না। যেমন শীত ও গ্রীষ্ম, একটির পর আরেকটি আসবেই। এগুলি দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বগুলি সর্বদাই আমাদের ঘিরে আছে।

বেদান্ত তাই সকলকে বলে—জীবন যেরকম, তাকে সেভাবেই গ্রহণ কর। জীবন সুখ ও দুঃখের সংমিশ্রণ। জীবনে সুখ বেশি না দুঃখ বেশি, এটি নিছক একটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন। বাস্তব সত্য এই, আমাদের জীবনে সুখ ও দুঃখ দুই-ই আছে। কথা হচ্ছে, দুটির কোনটিতেই আটকে থাকবেন না। এইটিই বেদান্তের শিক্ষা। দুটি নিঙড়েই তা থেকে জ্ঞান আহরণ করুন। একমাত্র অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ জ্ঞানলাভ করে। দুঃখের অভিজ্ঞতা ছাড়া আপনি জগৎকে বুঝতে পারবেন না, মানুষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারবেন না। একটু উপোসের অভিজ্ঞতা না থাকলে বুঝতেই পারবেন না যে, দেশের তিরিশ কোটি মানুষ

সর্বদাই অর্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে। তাদের প্রতি না জাগবে আপনার সমবেদনা, না হবে বাস্তব সত্য সম্পর্কে কোন ধারণা। অতএব, সুখদুঃখের মুহূর্তগুলিকে জ্ঞান ও করুণা জাগ্রত করার চেষ্টায় ব্যয়িত করুন। সেইটিই হবে মানব ব্যক্তিত্বের যথার্থ আধ্যাত্মিক বিস্তার। এই হলো বৈদান্তিক শিক্ষা যা স্বামী বিবেকানন্দ অতি সুন্দরভাবে তাঁর *কর্মযোগ*-এর প্রথম অধ্যায়ে ব্যক্ত করেছেন।

অতএব, *মাম্ উপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্; নাপ্নুবন্তি,* 'একবার আমাকে উপলব্ধি করলে তুমি আর এই সুখদুঃখময় অনিশ্চিত জগতে থাকবে না,' যেখানে কেবল জন্ম আর মৃত্যু; *মহাত্মনঃ,* 'এরকম যাঁরা, তাঁরাই *মহাত্মা',* যাঁদের আত্মার ব্যাপ্তি শরীরের সীমা ছাড়িয়ে, সম্প্রসারিত হয়ে সকলের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এইরকম যে মানুষ, তাঁকেই বলা হয় *মহাত্মা।* একটি উপনিষদে স্বয়ং ঈশ্বরকেই 'মহাত্মা' বলা হয়েছে। সর্বব্যাপী আত্মসচেতনতার ফলে এরকম মহাত্মারা অনন্ত হয়ে গেছেন। *সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ,* 'তিনি এই জন্মেই পরম সিদ্ধিলাভ করেছেন'। ১৫শ শ্লোকের এটিই বক্তব্য।

পরবর্তী শ্লোকে সৃষ্টিতত্ত্ব বা সৃষ্টির পরে যে কোটি কোটি বছর পার হয়ে গেছে তারই আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

—'হে অর্জুন, পৃথিবী থেকে ব্রহ্মার লোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল। কিন্তু হে কুন্তীপুত্র, আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।'

বৈদান্তিক পরিভাষায় সমগ্র বিশ্বকে বলা হচ্ছে *আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ,* 'ব্রহ্মালোক থেকে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত লোকসমূহ', *ভুবনাঃ* বলতে এই সমস্ত লোকই বোঝাচ্ছে। যে পরিবেশের মধ্যে সকল বস্তু ও জীবের অস্তিত্ব ও প্রাণধারণ, তাই *ভুবনাঃ* রূপে আখ্যাত। বলা যায়, 'যে বিশেষ লোকে একটি বস্তুর অবস্থান, সেটিই ভুবন, যেমন ভূর্লোক, স্বর্গলোক, নক্ষত্রলোক ইত্যাদি। সবগুলিই *ভুবনাঃ*-র অন্তর্ভুক্ত। অতএব, ক্রমবিকাশের প্রথম সৃষ্ট বস্তু, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে অতি সাধারণ বস্তু তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সমস্তই *ভুবনাঃ।* শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ,* 'এই সমস্ত লোকের জীবেরা', *পুনরাবর্তিনঃ,* 'পুনর্জন্মের অধীন', তারা বার বার জন্মায়। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি লোকের বাসিন্দাদেরই এই দুর্দশা। ব্রহ্মার উচ্চ অবস্থার কথা একবার ভেবে দেখুন!

কিন্তু সেই ব্রহ্মারও পরিবর্তন আছে, কারণ এটিও অস্থায়ী পদমাত্র। ঈশ্বর যখন বিশ্বকে প্রকাশ করেন, তখন ক্রমবিকাশের প্রথম সৃষ্ট বস্তু হলো বিরাট মন। তিনিই চতুর্মুখ ব্রহ্মা। কিন্তু তাঁর ঐ পদও অস্থায়ী!

আমাদের পুরাণে বলা হয়েছে, চতুরানন এই দেবতা বেদের মূর্ত প্রতীক। বেদ মানে জ্ঞান, সমস্ত ভৌত ও অভৌতবস্তুর বিজ্ঞান। ব্রহ্মা হলেন *বেদমূর্তি*, তিনি *অজ*, অর্থাৎ, অনাদিকাল থেকে বর্তমান। এগুলি সব উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তবে পুরাণের ভাষায় বলা এই পর্যন্ত। নিত্যশুদ্ধ চৈতন্য পূর্বে *অপ্রকাশিত* ছিলেন, তিনি প্রথম প্রকাশিত হলেন ব্রহ্মারূপে। তাঁর থেকেই বিশ্বের যতকিছু বিবর্তন। তাঁর থেকেই সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর আর এক নাম *হিরণ্যগর্ভ*, যাঁর মধ্যে বহু জগৎ বিধৃত। সুতরাং, সৃষ্টির প্রথমে প্রকাশিত সত্তা ব্রহ্মা থেকে তুচ্ছ তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সমস্তই জন্মমৃত্যুর অধীন—পুনরাবর্তনশীল, *পুনরাবর্তিনঃ।* কিন্তু, *মাম্ উপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে*, 'একবার যদি তুমি আমাকে, এই ব্যক্ত জগতের অতীত সেই *অক্ষরকে*, সেই অবিনশ্বর ব্রহ্মকে লাভ কর, তবে হে অর্জুন, তোমার আর পুনর্জন্ম হবে না।' সেখানেই পুনর্জন্মের শেষ, বারবার এই আসা-যাওয়ার সমাপ্তি। তখন আপনি কার্যকারণ সম্পর্কের ঊর্ধ্বে চলে যান। এই জগৎ কার্য-কারণ সম্পর্কের অধীন। এখন আমরা বলি যে, এই জগৎ হলো আপেক্ষিক জগৎ[১]; কিন্তু আগে বলতাম নিয়তিবাদই[২] সব। এই হলো জগৎ-প্রকৃতি যার মধ্যে আমরা বদ্ধ হয়ে আছি। আমরা এর বাইরে যেতে চাই। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এর গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে যাবার প্রবণতা আছে। কেন? কারণ সেইটিই আমাদের প্রকৃতি। ঐ মুক্তিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। সেইটিই নিয়তিবাদের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসার এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। 'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।' *মানুষের কাছে আজ পর্যন্ত যত আহ্বান এসেছে, এই মুক্তির আহ্বানই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মুক্তিসংগ্রামই মনুষ্যজীবনের মহত্তম প্রচেষ্টা। কিন্তু, মনে রাখতে হবে*, সর্বোচ্চ মুক্তি হলো আধ্যাত্মিক মুক্তি। আমরা ক্ষুধা থেকে মুক্তি, উপবাস থেকে মুক্তি, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তির কথা বলে থাকি; এসব মুক্তির দারুন মূল্য আছে—সন্দেহ নেই। কিন্তু চরম মুক্তি হলো

---

১ 'World of relativity' : যে জগতে কোন কিছুর পূর্ণ স্বাধীনতা বা সার্বভৌমিকতা নেই, সমস্তই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল।

২ Determinism : যে দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী জগতের সকল ঘটনা, মানুষের কর্ম ও সংকল্প, তার ইচ্ছা-বহির্ভূত এক শক্তি বা কারণ দ্বারা পরিচালিত।

আধ্যাত্মিক মুক্তি। আপনি কি আধ্যাত্মিক দিক থেকে মুক্ত? তা যদি না হন, তাহলে সেইটিই আমাদের লাভ করার চেষ্টা করতে হবে।

সুতরাং, সর্বোচ্চ মুক্তি তখনই আসবে যখন আমরা আপেক্ষিক ও ব্যক্ত জগতের অতীত অসীম অনন্ত আত্মাকে, আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করব।

প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্বের প্রসঙ্গ আরও একটু আসছে ১৭শ শ্লোকে ঃ

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

—'যাঁরা দিন ও রাতের (প্রকৃত পরিমাপ) সম্বন্ধে অবগত, তাঁরা সহস্রযুগব্যাপী ব্রহ্মার দিন ও সহস্রযুগব্যাপী তাঁর রাত্রিকেও জানেন।'

কাল সম্পর্কে ভারতবর্ষের যে ধারণা, সেটি অসাধারণ। অন্য কোন প্রাচীন সভ্যতায় *দেশ* ও *কাল*-এর অসীমতার এই অসামান্য রূপটি ধরা পড়েনি। আমাদের চিন্তাভাবনা কখনও এমন অনুদার ও সঙ্কীর্ণ ছিল না যে, আমরা ভাবব ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জগতের উৎপত্তি হয়েছে। আমরা কোটি কোটি বছর আগেকার এমন সব কথা ভেবেছি, যা আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। বাস্তবিক, সময় সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে ধারণা, সেটি আপেক্ষিক; আমাদের পরিস্থিতির দিকে তাকালে সহজেই তা বুঝতে পারি। আমরা পৃথিবী নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রহে বাস করি; তাই পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারিদিকে আবর্তন ও সূর্যের চারিপাশে নিজ কক্ষপথে পরিক্রমণ দেখে সময়ের মাপ করি। তা থেকেই আমাদের দিন, রাত এবং বছরের হিসেব বা বোধ। কিন্তু আমরা একথা একবারও মনে করি না যে, সর্বত্রই এই একই নিয়ম। আমাদের এখানে যা একটি দিন অথবা একটি রাত, তাই হয়ত অন্য এক স্তরে একটি সেকেণ্ডমাত্র। এইজন্য একে আমরা পার্থিব সময় (terrestrial time) বলে থাকি। এই স্তরের উর্ধ্বে উঠলে আমরা অপার্থিব বা মহাজাগতিক সময়ে (celestial time) পৌছে যাই। ব্যাপারটাকে একটু বুঝিয়ে বলি। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে নেয় এক বছর। কিন্তু সূর্য নিজেও ছায়াপথ প্রদক্ষিণ করছে। তার জন্য লাগে কুড়ি কোটি বছর। সুতরাং, প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরনের সময় অথবা বছর সংক্রান্ত পার্থক্যের বিশ্লেষণ করেছিলেন। অতএব ব্রহ্মা, মহাজাগতিক মন বা হিরণ্যগর্ভ, যিনি ক্রমবিকাশের প্রথম সৃষ্ট বস্তু, তাঁর

সময় আপনার ও আমার সময় থেকে আলাদা হবেই। আমাদের সময় গণনার মাপকাঠি অত্যন্ত সাধারণ—মাত্র একটি বছর এবং ঐ হিসাবে আমাদের আয়ু ১০০ বছরের বেশি নয়। ব্রহ্মার জীবনও ১০০ বছর, কিন্তু তাঁর ১০০ বছর আমাদের ১০০ বছরের থেকে ভিন্ন। তাঁর ১০০ বছর কীরকম? প্রথমে তাঁর একটি দিনের কথাই ধরুন। ব্রহ্মার দিন দু'ভাগে বিভক্ত—দিন ও রাত। ব্রহ্মার দিন আরম্ভ হলে বিশ্বের প্রকাশ শুরু হয়। সারা দিন ধরে এই ক্রমবিকাশ চলে। কিন্তু যখন ব্রহ্মার সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তখন বিবর্তন, ক্রমবিকাশ বা সৃষ্টি তার মূল উৎসে ফিরে যায়। মূলে ফিরে যাওয়াকেই বলা হয় *প্রলয়, যেখানে* 'সৃষ্টিলীলাবিকাশের সমাপ্তি'। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এই মহাজাগতিক বিবর্তন ও প্রলয়কার্য নিশ্চয় আমাদের পার্থিব ১০০, ৫০০ বা ১০০০ বছরে সম্ভব নয়। তাই, ব্রহ্মার একটি দিনকে বলা হয় *কল্প*। এটি একটি পারিভাষিক শব্দ। শত শত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন; মহাভারতে এবং পুরাণেও এই নিয়ে আলোচনা রয়েছে। সে যাই হোক, আমরা এটির নাম দিয়েছি *কল্প*। ব্রহ্মার দিন হলো একটি কল্প, রাতও আর একটি কল্প। আমাদের পার্থিব হিসাবে গণনা করলে ব্রহ্মার একটি কল্প দাঁড়াবে ৪৩২ কোটি বছর। এটি হলো কাল সম্বন্ধে ব্যাপক ধারণা।

শ্লোকে তাই বলা হচ্ছে যে, ব্রহ্মার যখন রাত্রি আসে তখন সমগ্র মহাবিশ্ব ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে যায়। মহাবিশ্বের দুটি অবস্থা ঃ (১) নির্বিশেষ বা অব্যক্ত অবস্থা এবং (২) বিশিষ্ট, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা ব্যক্ত অবস্থা। আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে এই ধারণার অনেকখানি মিল আছে। আধুনিক নভোবস্তুবিদ্যাও বলে যে, সেই আদি মৌলিক পদার্থ অতি ঘনীভূত অবস্থায়, অতি অল্পপরিসরে সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে রেখেছিল। তারপর এটি বিস্ফোরিত হয় এবং সেই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের ক্রমবিকাশ শুরু হলো। সেই বিবর্তন এখনও চলেছে। সেই বিস্ফোরণের প্রক্ষিপ্ত শক্তি মহাবিশ্বের কোন কোন প্রত্যন্ত প্রদেশে এখনও সক্রিয় রয়েছে এবং সেখান থেকে আগত বিভিন্ন বেতার তরঙ্গের সাহায্যে আপনি সেসব দুরান্তরের গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পর্কে অনেককিছু জানতে পারেন। এইজন্য আজকাল সর্বত্র রেডিও এ্যাস্ট্রনমি-র উন্নতি ঘটছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এসব কাণ্ডকারখানা ধরা পড়ে না। কিন্তু বেতার তরঙ্গ ধরার যন্ত্রগুলি দূরবীক্ষণের চেয়েও শক্তিশালী হওয়ায় আজকের জ্যোতির্বিদ্যায় কালের ধারণাটি সমৃদ্ধ হচ্ছে। এই বিশ্বের ইতিহাসটি কী? অবশ্যই তা আপনার বা আমার ইতিহাসের মতো অতি সাধারণ ইতিহাস নয়। একটি

মানুষের ১০০ বছরের জীবনের তুলনায় যেমন একটি ক্ষুদ্র মশার দু'একদিনের জীবন অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ, তেমনি এই আপাতগুরুত্বপূর্ণ মনুষ্যজীবনও মহাজাগতিক সময়ের মাপে অতি নগণ্য।

তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *সহস্র যুগ পর্যন্তম্*, 'আমাদের এক হাজার যুগ'; *ব্রহ্মণঃ অহঃ*, 'ব্রহ্মার এক দিন'; *রাত্রিং যুগ সহস্রান্তাম্*, 'আরও এক হাজার যুগ হলো ব্রহ্মার রাত্রি'; *তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ*, যাঁরা এটি জানেন 'তাঁরা দিন ও রাত্রির তত্ত্ববেত্তা'। সুতরাং, ২০০০ যুগ হলো ব্রহ্মার গোটা একটা দিন এবং এইরকম ৩৬৫ দিনে ব্রহ্মার একটি বছর হয়। এইরকম ১০০ বছর হলো ব্রহ্মার পরমায়ু। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের গণনা অনুযায়ী বর্তমান ব্রহ্মার বয়স ৫১ বছর। তাহলেই একবার ভেবে দেখুন বিস্ময়কর সৃষ্টির উৎস যে ব্রহ্মা, তাঁর বয়স পর্যন্ত আমাদের শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে এবং এইসব বিশ্বাস আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। কোন ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের শুরুতে সংকল্পের যে বিধি আছে, তাতে বলা হয়, 'ব্রহ্মার ৫১ বর্ষে, এই বিশেষ নামে, আমি এই অনুষ্ঠান করছি।' এর অর্থ হলো, আমাদের মন এককালে এমনই বিকশিত হয়ে ছিল যে, তা দেশ ও কালের ক্ষুদ্র সীমানা পেরিয়ে এই দুইয়ের বিশালতা উপলব্ধি করতে পারত।

সব কিছুই কোন না কোন বস্তুর চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। পৃথিবী ও সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহগুলি আবর্তিত হচ্ছে সূর্যের চারপাশে; কিন্তু সূর্যও এই ছায়াপথের মধ্যে পাক খাচ্ছে। ছায়াপথটিও থেমে নেই, স্বয়ং সেও ঘুরছে। কিন্তু কাকে কেন্দ্র করে এই আবর্তন? এইটিই আমরা জানি না। আর এখানেই আমরা আবিষ্কার করেছি সেই অব্যক্ত সত্যকে, যাকে ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম বলা হয়। এখানে সেকথাই বলা হচ্ছে। সময়ের সীমা ব্রহ্মা পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্রহ্মাকে অতিক্রম করলে আপনি সময়কেও অতিক্রম করে গেলেন। সুতরাং, আমাদের সময়ের ধারণাও রয়েছে, আবার অসীমের বোধও রয়েছে। দুই-ই আছে। অসীম হলো অনন্ত, অর্থাৎ কালের অতীত হলো *অক্ষর* ব্রহ্ম, যা অবিনাশী। পূর্ণ সত্যে কাল ও কালাতীত দুইই আছে। কাল হলো যার মধ্যে ক্রমবিকাশের লীলা সঙ্ঘটিত হচ্ছে, কর্ম ও প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু কালের ঊর্ধ্বে রয়েছেন সেই এক, অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয় নিত্য সত্য। অতএব, আমাদের কাছে কাল ও কালাতীত সত্তা—দুই-ই সত্য। কাল সত্যের একটি দিক, নিত্যতা বা অক্ষয়ত্ব আর একটি দিক। এইভাবেই আমরা সত্যের পর্যালোচনা করি। সময়কেই *কাল*

বলা হয়। *কাল* হলো ঈশ্বরের একটি অভিব্যক্তি। এই কারণেই কালের খুব প্রশংসা করা হয়। পুরাণেও কালের খুব প্রশংসা আছে।

পরবর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

—'(ব্রহ্মার) দিন হলে, অব্যক্ত অবস্থা থেকে সকল বস্তু ব্যক্ত হয়; এবং তাঁর রাত্রি হলে তারা প্রলীন হয় তাঁরই মধ্যে, যাঁর নাম অব্যক্ত।'

ভারী সুন্দর কথা! *অব্যক্তাৎ*, 'অব্যক্ত থেকে'। *ব্যক্ত* অর্থাৎ 'প্রকাশিত'; *অব্যক্ত* হলো 'অপ্রকাশিত'। অব্যক্ত থেকে এই ব্যক্ত বা প্রকাশিত বিশ্বের উৎপত্তি। সকল প্রকাশিত বস্তু এসেছে অপ্রকাশিত অবস্থা থেকে। আমাদের সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের এটি একটি চমৎকার ভাব। বলা হচ্ছে, সত্যের দুটি রূপ—ব্যক্ত ও অব্যক্ত।

একটি কাঠের টুকরোর কথাই ধরুন। সজোরে ঘষলে ওটির মধ্য থেকেই আগুন বেরিয়ে আসবে। কিন্তু অব্যক্ত অবস্থায় থাকার দরুন ঐ আগুন আপনি দেখতে পারছেন না, তাকে ধরতে পারছেন না, যদিও আগুন তখনও ঐ কাঠের ভিতরেই রয়েছে। কাঠটি ঘষলে তবেই ওর ভেতর থেকে আগুন বেরোবে। অতএব, কাঠটি হলো অব্যক্ত অগ্নি এবং ব্যক্ত অগ্নি হলো যেটি আমি বা আপনি জ্বালাচ্ছি, কাজে লাগাচ্ছি। সুতরাং সমগ্র বিশ্বেরই এই দুটি দিক আছে—*অব্যক্ত ও ব্যক্ত—অব্যাকৃত প্রকৃতি ও ব্যাকৃত প্রকৃতি, অথবা বলা যায় প্রকৃতি ও বিকৃতি। প্রকৃতি* হলো আদি বা মূল প্রকৃতি; *বিকৃতি* হলো পরিবর্তিত প্রকৃতি। *বিকৃতি মানে বিকার।* এগুলি সবই পারিভাষিক শব্দ যা সৃষ্টিপ্রপঞ্চ পর্যালোচনা করতে সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনে ব্যবহৃত হয়। অতএব, *অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্তি*, 'সকল *ব্যক্তি* বা বস্তু ঐ সময়ে *অব্যক্ত* থেকে প্রকাশিত হয়েছিল'। কখন? তার উত্তরে বলা হচ্ছে—*অহরাগমে*, ব্রহ্মার 'দিন শুরু হলে'। *অহ* মানে দিন; *আগমে*, অর্থাৎ সমাগমে; এই সময়ে এইসব ব্যক্ত বস্তু অব্যক্ত সত্তা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর কী হয়? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *রাত্র্যাগমে*, 'যখন (ব্রহ্মার) রাত্রি সমাগম হয়'; *প্রলীয়ন্তে*, 'ব্যক্ত জগৎ লয় হয়ে যায়'; *প্রলয়*, অর্থাৎ বিলীন হওয়া, মিশে যাওয়া; *তত্রৈব অব্যক্ত সংজ্ঞকে*, 'সেই একই অব্যক্তে'।

এই হলো সৃষ্টির দুটি দিক। একটি স্পন্দন আমাদের বাইরে নিয়ে আসে,

আর একটি স্পন্দন আমাদের ভিতরে টেনে নেয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে—প্রচণ্ড অভ্যন্তরীণ চাপে সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে সৌরজগৎ কীভাবে আদি মৌলিক অবস্থায় ফিরে যায়? আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্বে এসব নিয়ে বিস্তর আলোচনা আছে। বিজ্ঞানীরা বলেন আদি বিস্ফোরণের পর ১০০০ বা ১১০০ কোটি বছর কেটে গেছে। আরও ৫০০ কি ৬০০ কোটি বছর পরে—সূর্য স্ফীত হয়ে এমন বিশালাকার ধারণ করবে যে, প্রত্যেকটি গ্রহকে সে একে একে গ্রাস করবে ও পরিশেষে নিজে একটি মৃত নক্ষত্রে পরিণত হবে। এই হলো সূর্যের ভবিষ্যৎ। এখন সূর্য এইভাবে ক্রমবিকশিত হচ্ছে, পরে আবার এইভাবে ক্রমসঙ্কুচিত হবে। আধুনিক নভোবস্তুবিদ্যায় এই ধরনের পর্যালোচনা চলেছে। প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিদরা কিন্তু *প্রলয়* অবস্থাটিকে যথার্থই বুঝেছিলেন। *লয়,* অর্থাৎ মিলিয়ে যাওয়া। মানুষ যখন মারা যায়, তার দেহটি লয় হয়ে থাকে—যেসব রাসায়নিক উপাদান থেকে দেহটি উদ্ভূত হয়েছিল, তাদের মধ্যেই সেটি মিলিয়ে যায়। সবকিছুই উৎসে ফিরে যায় এবং এই ফিরে যাওয়াকেই *প্রলয়* বলে। সমগ্র বিশ্বেরও ঐ একই গতি।

মহাভারতের 'শান্তিপর্বে' আছে, *অদর্শনাৎ আপতিতঃ পুনশ্চ অদর্শনম্ গতঃ,* '(আপনি ও আমি) এক অদৃশ্য বা অদৃষ্ট অবস্থা থেকে এসেছি এবং আবার (আমরা) সেই অদৃশ্য অবস্থাতেই ফিরে যাব'। এই দুই অবস্থার মাঝে যে কালটুকু, কেবল তখনই আমরা দৃশ্যমান অবস্থায় থাকি। দুই অদৃষ্ট অবস্থার মাঝে একটি পর্যায় শুধু দৃশ্যমান। অতীত অলক্ষিত, ভবিষ্যৎও অনবলোকনীয়; একমাত্র বর্তমানই সকলে দেখতে পায়। সম্বল বলতে আমাদের শুধু এইটুকুই। *অদর্শনাৎ আপতিতঃ,* একটি শিশু কোথা থেকে যেন আবির্ভূত হলো; *পুনশ্চ অদর্শনং গতঃ,* আবার এক সময় বৃদ্ধ হয়ে সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো! কোথা থেকে সে এসেছিল, আবার কোথায় বা চলে গেল, কিছু আমরা জানি না।

বেদান্ত বলে—আসুন, কোন কল্পনার রাজ্যে নয়, কুসংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে নয়, এই সত্যের আলোকেই আমরা আমাদের জীবন যাপন করি। সত্য এইঃ অল্পকালের জন্য এই জগতে, *ব্যক্ত* অবস্থায় আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু কীভাবে আপনি এই জীবনযাপন করবেন? তার উত্তর এই—জীবনের রহস্যটিকে জানার চেষ্টা করে ভালোভাবে এই জীবনকে কাজে লাগান। এই কারণেই এইসব ভাবগুলি আমাদের অধ্যাত্মচেতনার অঙ্গ। এগুলি আমাদের কাছে নিছক সৃষ্টিতত্ত্ব নয়। সূর্যের উপস্থিতি আমাদের কাছে শুধু নীরস তত্ত্ব

নয়, কারণ প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি জীব তার দ্বারা পুষ্ট হচ্ছে। আমাদের এই যে জীবন, তার সমস্ত কিছুই আসে সূর্য থেকে। সুতরাং, এটি আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বা জীবন-নিরপেক্ষ কোন সৃষ্টিতত্ত্ব নয়। বাস্তবিক, এই নিখিল বিশ্ব আমাদের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। এই কারণেই বিশ্বপ্রকৃতির একত্বের ধারণাটি ভারতীয় দর্শনগুলিতে এত সোচ্চার। পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে এটি এক নতুন অভিজ্ঞতা। বিশ্বের সমস্ত কিছুই যে অন্তরঙ্গভাবে সংযুক্ত ও সম্পর্কযুক্ত—এটা আজ তাঁরা বুঝতে পারছেন। কয়েকজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকও একই কথা বলেছেন। তাঁরা বলছেন, বিশ্বের কোন জায়গায় কোন অশুভ ঘটনা ঘটলে তা গোটা বিশ্বকেই প্রভাবিত করবে। আমরা সকলে যে পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ, আমরা যে অবিভাজ্য, তা এঁদের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। আপাত বৈচিত্র্যময় বহু অভিজ্ঞতার অবগুণ্ঠনটি সরিয়ে আমরা ধীরে ধীরে মূলগত ঐক্যটিকে দেখতে শিখছি। বর্তমান শ্লোকে এই একত্বের ভাবটি অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

বেদান্তে একটি সুন্দর কল্পনা আছে। সেখানে আমরা দেখি যে, অদৃশ্য মূল বস্তু যা সবকিছুর অধিষ্ঠান, তিনি যেন এই বলে স্বগতোক্তি করছেন, *একোঽহং বহুস্যাম,* 'আমি এক, বহু হব।' যিনি এখানে ব্রহ্মা নামে অভিহিত, সেই বিরাট মন হলেন সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ। যখন আপনি মাটিতে একটি বীজ পোঁতেন, তখন তার মধ্যে কোন বাহ্য বৈশিষ্ট্য থাকে না, সবকিছুই তখন তার ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রথম পৃথক্‌করণ হয় অঙ্কুরোদ্গমে এবং তারপর থেকে শুধুই পৃথক্‌করণ। ব্রহ্মা সৃষ্টির সেই প্রথম অঙ্কুর—*প্রথমজা,* 'প্রথম জাত'; এই ভাষাতেই ব্রহ্মার বর্ণনা করা হয়েছে। গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বোঝাতে আমরা অনেক সময় একটু পৌরাণিক কাহিনী ব্যবহার করি। কিন্তু আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানতেন যে এটি পৌরাণিক ভাষামাত্র, যার দ্বারা বিষয়টি সহজে বোঝা যায়। আজকের সৃষ্টিতত্ত্বেও অনেক পৌরাণিক ভাষা ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে। কিন্তু একবার চৈতন্যকে ক্রমবিকাশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করলে আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্বের ভাষা সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যাবে। সেটি তখন অনেকটা আমাদের বেদান্তের ভাষার মতোই শোনাবে—*একোঽহং বহুস্যাম,* 'আমি এক, বহু হব।'

আগের শ্লোকে ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের কথা বলা হয়েছে। ঐ প্রসঙ্গে আমি ইতোমধ্যেই বলেছি যে, ব্রহ্মার বয়স এখন ৫১ বছর। এখনও তিনি ৪৯ বছর

বাঁচবেন। তিনি চলে গেলে তাঁর জায়গায় আরেকজন বসবেন এবং তিনিই তখন জগৎ শাসন করবেন। তাহলেই দেখা যাচ্ছে আমাদের সময়ের মাপ এবং ব্রহ্মার সময়ের মাপে কত তফাত! এ প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প মনে পড়ছে। একজন খুব কঠোর তপস্যা করায় ভগবান ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'বলো, তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি? কী বর চাও তুমি?' ভক্তটি বললেন, 'আমাকে এই দিন, সেই দিন' ইত্যাদি। ব্রহ্মা তার উত্তরে বললেন, 'বেশ, এক মিনিট অপেক্ষা কর। তোমার যা চাই, সব দেব।' সে কথা শুনে ভক্তটি অপেক্ষা করছে তো করছেই! দিনের পর দিন কেটে গেল, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর! কিন্তু ঈপ্সিত বস্তুগুলি আর আসে না। তখন ভক্তটি জিজ্ঞাসা করলো, 'এ কী ব্যাপার? এত কাল কেটে গেল, তবুও...?' ব্রহ্মা বললেন, 'বৎস! আমি *আমার* এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলেছি, *তোমার* এক মিনিট বলিনি!'

সে যাই হোক, আধুনিক বিজ্ঞান কাল নিয়ে প্রচুর গবেষণা করছে। সময় নিয়ে অনেক বইপত্র লেখাও হচ্ছে। আমরা কিন্তু কাল নিয়ে যেমন অনুসন্ধান করেছি, তেমনি অনন্ত কালাতীত সত্তা নিয়েও। দুটিই আমাদের অনুসন্ধানের বস্তু।

তাই, গীতার এই অংশে আপনারা *অব্যক্ত* শব্দটি পেয়েছেন। *অব্যক্ত* অর্থাৎ নির্বিশেষ অবস্থা। এই অব্যক্তে কালের কোন সংবেদ নেই, কোন প্রক্রিয়া এবং গতি নেই; কাল লয় হয়ে গেছে অব্যক্ত অবস্থায়। যখনই প্রকাশ শুরু হয়, তখনই এই *ব্যক্ত* বা প্রকাশিত জগতের অস্তিত্ব। অতএব, প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ প্রকৃতির এই অব্যক্ত স্বরূপে বিলীন হয়ে যায়। আরও একটি *অব্যক্ত* আছেন, যিনি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম, যাঁর কথা শ্রীকৃষ্ণ পরে বলবেন। তিনি সর্বদা কালের অতীত, তিনি অনন্ত। একটি কি দুটি শ্লোকের পর আমরা এসব কথা পাব।

আমরা এখন ১৮শ তম শ্লোকটি পড়ছি। এর ভিতর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক সব ভাব রয়েছে। *অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।* *অহঃ*-এর অর্থ 'প্রভাত'; *আগমে,* অর্থাৎ 'প্রারম্ভে'; অর্থাৎ ব্রহ্মার সকাল শুরু হলে; *অব্যক্তাদ্,* 'অব্যক্ত থেকে'; *ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ,* 'সকল ব্যক্ত জীব ও বস্তু'; *প্রভবন্তি,* 'আবির্ভূত হতে শুরু করে'। বিশ্বের বিবর্তন এভাবে আরম্ভ হলো। কিন্তু, *রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে,* 'রাত্রির শুরুতে এই সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয়'; *তত্রৈব*

অব্যক্ত সংজ্ঞকে, 'সেই *অব্যক্ত* নামক সত্যে'। এইভাবে ব্রহ্মার রাত্রি এলে গোটা ব্যক্ত জগতের প্রলয় হয়। এইভাবে, এখানে দিন ও রাতের আলোচনা করা হয়েছে ব্রহ্মার মানদণ্ড অনুযায়ীই, আপনার বা আমার সময় সম্পর্কে যে ধারণা, সে অনুসারে নয়। অবশ্য আমাদের ক্ষুদ্র সময়সীমার মধ্যেও ব্রহ্মার মতো জাগ্রতাবস্থা আছে, আবার যখন রাত আসে, তখন গভীর ঘুমের মাধ্যমে নিজের কাছেই ফিরে যাই। একই অভিজ্ঞতা। ব্রহ্মা যখন নিদ্রিত হন তখন এই বিশাল বিশ্ব, এই শক্তিসমূহ, সমস্তই লয়প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমাদের মনোবিজ্ঞানে, দর্শনে এবং সৃষ্টিতত্ত্বে, সর্বত্রই অব্যক্তের এক বিরাট ভূমিকা। বিজ্ঞানও আজকাল এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করছে। বাস্তবিক, অব্যক্তের ধারণাটি অসাধারণ। যা আছে অথচ অপ্রকাশিত, তাই অব্যক্ত। একটা বটের বীজে সম্পূর্ণ গাছটিই রয়েছে, কিন্তু আপনি তা দেখতে পাচ্ছেন না। বীজের মধ্যে যে বিশাল বট গাছটি লুকিয়ে আছে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তা আপনি ধরতে পারছেন না। কারণ সেটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অব্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু যখন বীজটি বিকশিত হয়ে মহীরুহে পরিণত হয়, তখন আপনি অবাক হয়ে ভাবেন, 'কী আশ্চর্য! বটগাছটি এখন ব্যক্ত হয়েছে; আগে এটি অব্যক্ত ছিল।' একটি শিশুর কথাই ধরুন না কেন। তার ভিতরে তো কত শক্তি! কিন্তু শিশু অবস্থায় সেই শক্তির প্রকাশ নিতান্তই অল্প। তখন সে অতি কোমল ও দুর্বল। কিন্তু এই শিশুই ধীরে ধীরে বড় হয়ে একদিন মহম্মদ আলি কিংবা বিরাট ক্ষমতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কীভাবে এটা সম্ভব? সম্ভব এই জন্যই যে, ঐ শিশুর মধ্যে সব কিছুই ছিল। কেবল ধীরে ধীরে সেগুলির ক্রমবিকাশ হয়েছে। এইভাবেই আমরা বিশ্বের ক্ষুদ্র ও বিরাট, দুটি দিকের পর্যালোচনা করি। *অব্যক্ত ও ব্যক্ত*, প্রকৃতির এই যে দুটি শ্রেণিবিভাগ, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে প্রকৃতিকে বলা হয় *অব্যক্ত*—অর্থাৎ অভিন্ন প্রকৃতি। সেই অভিন্ন প্রকৃতিই বৈচিত্র্যময়ী হয়ে প্রকাশিত হয়।

পরের শ্লোকটিতে বলা হয়েছে :

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

—'হে পার্থ, সেই পূর্বোক্ত ভূতসমূহ (যা ব্রহ্মার দিবাকালে বিদ্যমান ছিল), রাত্রিকালে নিরুপায় হয়ে লয়প্রাপ্ত হয় এবং দিন হলে আবার জন্মগ্রহণ করে।'

এখানে দুটি ভাব রয়েছে যা পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকে। বিজ্ঞান এটিকে মানতে বাধ্য করলেও এই মেনে নেওয়াটি তাদের কাছে খুব কষ্টকর।

একটি ভাব হলো *ভূতগ্রামঃ,* 'সৃষ্ট সমগ্র জীবজগৎ'; *স এবায়ং,* 'সেই একই বস্তুগুলি'; ভূত্বা *ভূত্বা প্রলীয়তে,* 'বারবার আবির্ভূত হয় ও বারবার আদি অবস্থায় লয় হয়।' কখন? *রাত্র্যাগমে,* 'ব্রহ্মার রাত্রি এলে'। শ্রীকৃষ্ণ এরপর *অবশঃ* শব্দটি ব্যবহার করেছেন; এটি খুবই দুর্বোধ্য শব্দ। এর অর্থ হলো, 'যে ব্যাপারে আপনার মতামত প্রকাশের কোন স্বাধীনতা নেই।' এটি প্রকৃতি বা *অব্যক্ত* ঘটিয়ে থাকে এবং আমাদের সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করেই প্রকৃতি এটি ঘটায়। এই হলো *অবশঃ*। আমরা এ ব্যাপারে নিতান্ত অসহায়। সূর্য যেমন তার প্রকাশ বা লয়প্রাপ্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসহায়, আপনি ও আমিও তাই। আপনার জন্মের ওপর আপনার কি কোন হাত ছিল? ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'জন্ম ও মৃত্যু কারোর হাতে নয়'। কে যেন আমাদের জগতে টেনে এনেছে! তারপর এখানে ওখানে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিছু ইচ্ছাশক্তি আমাদের অবশ্যই আছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা আমরা প্রয়োগও করি। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে আমরা আমাদের স্বাধীনতা আদৌ প্রকাশ করতে পারি না, কারণ আমরা স্বাধীন নই। যা ঘটে, তার অনেক কিছুই বাইরে থেকে ঘটে চলেছে। *অবশঃ* শব্দটির অর্থ 'অসহায়ভাবে'। জীব অসহায়ভাবে এই জগতে আসে, আবার অসহায়ভাবে তাকে জগৎ থেকে চলে যেতে হয়। এই একটি ভাব যা পাশ্চাত্যের বহু মানুষ পছন্দ করে না। কিন্তু পছন্দ করুক আর না করুক, প্রকৃত সত্য এই যে আমরা সত্যি সত্যিই *অবশঃ,* অসহায়। এসব ব্যাপারে আমাদের কোন মতলব খাটে না। অনেক ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা চলে, কিন্তু সব ব্যাপারে নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'আমরা যেন গরু; তিরিশ হাত লম্বা দড়ি দিয়ে খুঁটিতে বাঁধা। ঐ তিরিশ হাতের মধ্যেই আমাদের স্বাধীনভাবে নড়াচড়া, ঘাস খাওয়া, শোয়া-বসা সব। ঐ নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে গরুর কোন স্বাধীনতা নেই। অন্যত্র যেতে হলে, অবশ্যই রাখালকে আসতে হবে এবং তাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিতে হবে।' অতএব স্বাধীনতা ও তার অভাব দুই-ই আমাদের জীবনে আছে। *অবশঃ*-র অর্থ হলো *কিছু* স্বাধীনতা অবশ্যই আছে, কিন্তু তা খুবই সামান্য।

দ্বিতীয় যে ভাবটি পাশ্চাত্যের মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন, তা হলো ঃ প্রতি সৃষ্টিতে বা কল্পে সেই একই জীবজগতের পুনরাবর্তন। পাশ্চাত্যের বহু মানুষের ধারণা এই যে পুনরাবর্তন, অর্থাৎ পূর্বকল্পে যা ছিল এই কল্পেও তাই-ই

আছে, এটি একটি হিন্দু চিন্তামাত্র। কিন্তু তাঁরা এটা বোঝেন না যে, এটি কোটি কোটি বছরের অস্তিত্বের বিশ্লেষণ। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই যে আদি মৌলিক বস্তুতে লয় পাওয়া এবং আবার ফিরে আসা, এটা কি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি? দুটি কল্প কি হুবহু একইরকম হবে? তার উত্তর এই—এটি জানার জন্য দুটি কল্পেই আপনার এখনকার আমিত্ব নিয়ে হাজির থাকতে হবে; কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। সংস্কৃতে দুটি পারিভাষিক শব্দ আছে ঃ *বিকাশ,* অর্থাৎ 'প্রসারণ' ও *সংকোচ,* অর্থাৎ 'সংকোচন'। এই সংকোচন ও প্রসারণ অনন্তকাল ধরে চলছে। বলতে পারেন—তাহলে এর মধ্যে সৃজনশীলতা কোথায়? তার উত্তরে বলা যায়, অস্তিত্বের এই অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্রেই আপনার ও আমার অনুভূতি সীমাবদ্ধ। প্রকৃত সত্য এই, সেই একই সৃজনীশক্তি বার বার নিজেকে প্রকাশ করছে, কিন্তু এই পুনরাবৃত্তি এত দীর্ঘকাল ধরে সংঘটিত হয় যে আপনার এটিকে পুনরাবৃত্তি বলে মনেই হয় না। শাস্ত্র বলছে, মনে হোক আর নাই হোক, এমনটিই ঘটে চলেছে। পাশ্চাত্যের মানুষ প্রশ্ন করেন—'কিন্তু কেন আমাকে একই জীবনযাপনে ক্রমাগত বাধ্য করা হবে?' আমরা বলি—যতক্ষণ না প্রমাণ করতে পারছেন যে, প্রত্যেকবারই নতুন নতুন জিনিসের আবির্ভাব হচ্ছে, ততক্ষণ এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। এটি তাস খেলার মতো; বার বার সব পুরনো তাসগুলিকে একসঙ্গে মিশিয়ে আপনি খেলোয়াড়দের মধ্যে বণ্টন করছেন। এর মধ্যে 'নতুনত্ব' কোথায়? পূর্ণ অস্তিত্ব এখনই বিরাজ করছে কিন্তু তা নির্বিশেষ ও অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এটি ভেদাবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে আবার অভেদ অবস্থায় ফিরে যায়—*স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে,* 'সেই একই *ভূতসমূহ* জন্মায় এবং নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে লয় হয়ে যায়।' এর মধ্যে 'নতুনত্ব' কোথায়? দেখায় নতুন, কিন্তু আসলে তারা সেই একই বস্তু। দৈনন্দিন জীবনের দিকেই একবার তাকিয়ে দেখুন না কেন। নিছক পুনরাবৃত্তি ঃ সকালে ঘুম থেকে ওঠা, স্নানাদি ও প্রাতরাশ সারা, কর্মস্থলে যাওয়া, তারপর মধ্যাহ্নভোজন, তারপর এটা-সেটা এবং পরিশেষে নিদ্রা। একই পুনরাবৃত্তি দিনের পর দিন চলছে, কিন্তু তা আপনার বিরক্তিকর মনে হয় না। কিন্তু মহাজাগতিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই পুনরাবৃত্তিকে আপনি মেনে নিতে পারেন না, এই পুনরাবৃত্তিকে তখন আপনার খারাপ মনে হয়। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে ঃ *স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।* এই *ভূতগ্রামঃ,* অর্থাৎ ভূতসমূহ অবিরামভাবে ব্যক্ত হতে থাকে এবং কোটি কোটি বছর পর আবার *অব্যক্ত* অবস্থায় ফিরে যায়। কখন? *রাত্র্যাগমে,* ব্রহ্মার রাত্রিকালে, সব কর্মের অবসানে। দিনের বেলায় ব্রহ্মা

কর্মচঞ্চল থাকেন। অতএব সৃষ্টিও চলতে থাকে। রাত এলে তিনি ফের নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে শুরু করেন, ফলে সৃষ্টজগৎও তাঁর কাছে ফিরে যায়। একেই *রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে* বলা হচ্ছে। *অবশঃ*, এই বিষয়ে আমাদের মতামত খাটবে না, আমরা নিরুপায়। সমস্ত বিশ্বজগৎই অসহায়! বিশ্ব কেবলই আসে ও যায়। এই হলো *অবশঃ* শব্দটির অর্থ। *প্রভবতি অহরাগমে*—ব্রহ্মার দিন শুরু হলে আবার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ শুরু হয়, বিবর্তন শুরু হয়! এই হলো বিশ্বের প্রকৃতি। আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্বে প্রশ্ন করা হয়—দ্বিতীয়বার সৃষ্টি কবে হবে এবং হলে সেই সৃষ্টি নতুন ধরনের হবে কিনা? তাঁরা চান নতুন কিছু হোক। কিন্তু আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেও শুধু সীমিত অর্থেই একে মৌলিক করতে পারেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বৈচিত্র্য আছে, সৃজনশীলতার সুযোগও আছে; কিন্তু সবমিলিয়ে সেই একই বস্তু ও জীবজগৎ আসছে যাচ্ছে, একই *অব্যক্ত ব্যক্ত* হয়ে আবার *অব্যক্ত* অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে—*প্রভবতি অহরাগমে।*

১৮শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ একটি *অব্যক্তের* উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে বিশ্ব বিলীন হয় এবং যা থেকে আবার সে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আরো একটি *অব্যক্ত* আছে ঃ *অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্ত* (২০-২১ শ্লোক)। এই যে দ্বিতীয় *অব্যক্ত*, তাঁর প্রকৃতি আলাদা। তিনি শুদ্ধ চৈতন্য বা ব্রহ্ম। এই দ্বিতীয় অব্যক্তকে আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝে না, স্বীকার করে না অথবা তা করার কোন প্রয়োজনীয়তাও বোধ করে না। কিন্তু বেদান্তে আমরা এই *অব্যক্তকে* বলি ব্রহ্ম—যিনি নির্গুণ, নিরপেক্ষ, নিত্য ও কালাতীত। ব্রহ্ম ও *মায়া। অব্যক্ত, মায়া,* এগুলি বেদান্তের বহু ব্যবহৃত শব্দ। *মায়ার* কারণে *অব্যক্ত, দৃশ্যমান ব্যক্ত* জগতে পরিণত হয়। সেই একই *মায়া* তাকে আবার ফিরিয়ে নেয়। এ সমস্তই কালের অধীন; কিন্তু অন্য *অব্যক্তটি* হলেন তিনকালের অতীত, নিত্যস্বরূপ—*নিত্যঃ, সর্বগতঃ স্থাণুঃ, অচলোঽয়ং সনাতনঃ*—যা গীতায় আগেই বলা হয়েছে (২।২৪) ঃ 'এই পুরুষ হলেন অবিকারী, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল ও সনাতন।'

এবার ২০তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

—'কিন্তু এই *অব্যক্ত* বা অনভিব্যক্তের পারে আছেন অন্য আর এক *অব্যক্ত*, অপ্রকাশিত, সনাতন সত্তা—সকল ভূতবস্তু ধ্বংস হলেও যিনি বিনষ্ট হন না।'

এই শ্লোকে এমন এক মহান সত্য নিহিত আছে, যা আধুনিক নভোপদার্থবিদ্যার কাছে অজ্ঞাত। *পরঃ তস্মাৎ তু ভাবঃ অন্যঃ অব্যক্তঃ অব্যক্তাৎ সনাতনঃ,* 'এই *অব্যক্ত* থেকেও মহত্তম আর এক *অব্যক্ত* আছেন'; সেই *অব্যক্ত* হলেন *সনাতনঃ,* অর্থাৎ 'শাশ্বত'; *পরঃ,* 'শ্রেষ্ঠ'। *যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি,* 'প্রলয়কালে জগতের সব জীব ধ্বংস হলেও যিনি বিনষ্ট হন না।' এইসব বস্তুর বিনাশ আছে, তারা আসে ও যায়, কিন্তু এই সর্বশ্রেষ্ঠ, বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, যাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়, তাঁর কোন পরিবর্তন নেই। তিনি অবিকারী। পরিবর্তন-টরিবর্তন যা কিছু, সেসব হয় কেবল প্রকৃতির মাধ্যমে, যিনি হলেন ব্রহ্মের *শক্তি*। আমরা বলি *শিব* ও *শক্তি*, ব্রহ্ম ও *শক্তি*, ব্রহ্ম ও *মায়া* ইত্যাদি। *মায়ার* যোগসাজসেই এই সব জাগতিক প্রকাশ ও তাদের বিনাশ ইত্যাদি ঘটছে, কিন্তু এর পিছনে রয়েছেন শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরম ব্রহ্ম, যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় *সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু,* 'সমস্ত ভূত নষ্ট হবার সময়েও' *ন বিনশ্যতি,* 'বিনষ্ট হন না'। ইনিই হলেন পরম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, যা নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, শাশ্বত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে এটি গ্রহণ করা শক্ত। চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ কী তা বুঝতে তাঁদের আরও অনেক সময় লাগবে। হয়ত আরও কয়েক দশক পর বহুর আপাত বৈচিত্র্যের পিছনে অবস্থিত সেই পরম এককে, অপরিবর্তনীয় শাশ্বতকে তাঁরা বুঝতে পারবেন। কিছু বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্বটিকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করছেন। পূর্ণ স্বীকৃতি পেতে সময় লাগবে, কিন্তু এই হলো বেদান্তের বাণী। বেদান্ত বলে, পরিবর্তনশীল জগতের পিছনে রয়েছেন অপরিবর্তনীয় সনাতন ব্রহ্ম। এটিই প্রমাণ করে যে, বিশ্বের একজন ঈশ্বর আছেন। পরিবর্তনশীল দেবতা কখনও ঈশ্বর হতে পারেন না। এইজন্য ব্রহ্মাকেও সেই অর্থে ঈশ্বর বলে গণ্য করা হয় না। সারা ভারতে কেউই ব্রহ্মার পূজা করে না। ব্রহ্মার একটি মাত্র মন্দির আছে। সেটি রাজস্থানের আজমীরে। আমার মনে হয় না ভাগ্যদেবতা হিসাবে কেউ ব্রহ্মাকে পূজা করবেন। এখানেই আপনারা কালের ঊর্ধ্বে কালাতীতের যে ভাব—সেটি দেখতে পাচ্ছেন। এই হলো ঈশ্বরের শাশ্বত অবিনাশী স্বরূপ। যে ঈশ্বরের মৃত্যু হয়, তিনি ঈশ্বরই নন। কিন্তু পাশ্চাত্যে ঈশ্বরকে অতিজাগতিক বা জগৎবহির্ভূত সত্তারূপে উপস্থাপিত করা হয়েছিল; সে ধারণা গোঁড়া মতবাদসর্বস্ব, যুক্তিপূর্ণ বিচার বা গভীর অনুভূতির স্থান সেখানে ছিল না। বিশ্বের বাইরে কোন এক স্থানে বসে থেকে ঈশ্বর জগৎ শাসন করেন, এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত এই বিশ্বাসই চলে আসছিল। কিন্তু তারপর পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল মানুষ বেঁকে বসলেন। তাঁরা

গতানুগতিক ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। জার্মান দার্শনিক নিৎসে (Nietzsche), এসব বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে এক অতিমানবের কথা বললেন, 'হিংসাত্মক কর্ম ও আচরণের' দ্বারা যিনি পৃথিবী কাঁপিয়ে দিতে পারেন—ঠিক পরবর্তিকালে হিটলার যেমন দিয়েছিলেন। এই নিৎসে বলেছিলেন, 'ঈশ্বর মৃত'। ঈশ্বর কেন মারা গেলেন? তার উত্তরে এই দার্শনিক বলেছিলেন যে, জগতের জন্য কিছু করতে না পেরে তিনি শুধু কেঁদেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল অনেক কিছু করবার, কিন্তু তাঁর কোন ক্ষমতা ছিল না। এইজন্য তিনি কেঁদে কেঁদেই মারা গেলেন। এই সময় থেকেই 'ঈশ্বর মৃত' এই কথাটি চালু হলো। পাশ্চাত্যের অনেক লেখকই এই কথা বলে থাকেন।

'ঈশ্বর কি মৃত?' এই নিয়ে টাইম ম্যাগাজিনে (Time Magazine) দশ পাতার একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। ১৯৬৮ সালে যখন আমি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ করছিলাম, তখন বেশ কয়েকটি স্থানে আমাকে এই বিষয়টি নিয়ে বক্তৃতা দিতে বলা হতো। এ ব্যাপারে হিন্দুদের চিন্তাটি আমি তাঁদের বলতাম। বলতাম—হ্যাঁ, অতিজাগতিক ঈশ্বর অবশ্যই মৃত। কিন্তু যিনি সকল হৃদয়ের শাশ্বত আত্মা, তিনি নিত্য সেখানে বিরাজমান। এটি যেন ঃ 'রাজা মারা গেছেন, কিন্তু রাজা দীর্ঘজীবী হোন!' বলার মতো। পরমাত্মা জন্ম-মৃত্যুর অতীত, অস্তিনাস্তির পারে। এই হলো পরম সত্যের স্বরূপ, যিনি সমস্ত কিছুর সাক্ষী। যদি মৃত্যু থাকে, তবে তিনি তার সাক্ষী। আত্মা অমর, চিরন্তন। এইভাবেই আমরা পরিবর্তনশীল জগতের নেপথ্যে চিরন্তন ঈশ্বরের তত্ত্বটি উপলব্ধি করেছি।

স্যার জুলিয়ান হাক্সলের সঙ্গে চিঠিপত্রে আমার এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেটি আমার লেখা *The Message of the Upanisads* (উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ 'উপনিষদের সন্দেশ') গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে। তিনি তাঁর বইতে লিখেছিলেন, ঈশ্বর যেন দিন দিন 'বিরাট Cheshire cat-এর বিলীয়মান হাসি'র মতো হয়ে উঠছেন। বিড়ালটি মরে গেলেও এক চিলতে হাসি তার মুখে লেগে রয়েছে। বুঝে দেখুন! পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এই হলো ঈশ্বরের স্থান! তাই আমি লিখেছিলাম, 'পাশ্চাত্যবাসীদের অতিজাগতিক ঈশ্বর সম্বন্ধে এটি সত্য হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের ঈশ্বরচিন্তা একেবারে অন্য ধরনের।' সেখানে শঙ্করাচার্যের *বিবেকচূড়ামণি*-র ৫৭২তম শ্লোকটি আমি উদ্ধৃত করেছিলাম ঃ

অস্তীতি প্রত্যয়ো যশ্চ যশ্চ নাস্তীতি বস্তুনি।
বুদ্ধেরেব গুণাবেতৌ ন তু নিত্যস্য বস্তুনঃ ॥

'(আস্তিকের) দৃঢ় প্রতীতি যে বস্তু বা ঈশ্বর আছেন এবং নাস্তিকের অস্বীকৃতি যে ঈশ্বর নেই, দুটিই মনুষ্যমনের তরঙ্গ; এগুলি (মনের পশ্চাতে যে) চিরন্তন সত্য বা আত্মা রয়েছেন, তাঁকে স্পর্শ করে না'। ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্বে ঈশ্বরের স্বরূপকে এভাবেই উপস্থাপিত করা হয়েছে।

তাই ২০তম শ্লোকে বলা হচ্ছে ঃ *পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ,* 'এই অব্যক্ত ছাড়াও আর একটি *পরঃ সনাতনঃ অব্যক্ত* আছেন'। তিনিই ব্রহ্ম। *যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু,* 'যিনি সমস্ত ভূতবস্তুর প্রলয়কালে'; *ন বিনশ্যতি,* 'বিনষ্ট হন না'; তিনি সর্বদা বর্তমান থাকেন। তাঁর মধ্যেই আমরা আবিষ্কার করেছি দিব্য সত্য বা সত্তাকে, চিরন্তন বিশ্বাত্মাকে, নরনারীর অন্তরে অবস্থিত শাশ্বত আত্মাকে। ব্রহ্ম ও আত্মা অভেদ। দুটি বস্তু নয়। সেই এক ব্রহ্ম চিরন্তন আত্মারূপে, আপনার ভিতর, আমার ভিতর রয়েছেন। বহু বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখক আজকাল এই ভারতীয় তত্ত্বটির সপ্রশংস উল্লেখ করছেন। এমন দু-তিনজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যাঁরা বিশ্বাস করেন, ব্রহ্ম ও আত্মা অভেদ। আপনার ও আমার মধ্যে বিরাজিত শুদ্ধচৈতন্যরূপ আত্মা এবং বিশ্বের অন্তরালে বিরাজমান শুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্ম, অভিন্ন। দুটি স্বরূপত একই বস্তু। হালে একাধিক বৈজ্ঞানিকের লেখা গ্রন্থে এই প্রগাঢ় সত্যটি স্বীকৃত হয়েছে ।

শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, *ন বিনশ্যতি,* 'সেই সনাতন, চিরন্তন সত্য বা আত্মা কখনও বিনষ্ট হন না'। ব্রিটিশ কবি শেলী (Shelley) তাঁর বিখ্যাত 'Adonais' কবিতায় লিখেছেন ঃ

> The One remains, the many change and pass;
> Heaven's light forever shines, Earth's shadows fly;
> Life, like a dome of many-coloured glass,
> Stains the white radiance of eternity,
> Until Death tramples it to fragments.

—'যিনি এক তিনি চিরস্থায়ী, বহুত্বেরই পরিবর্তন ও মৃত্যু হয়; স্বর্গের আলো চিরভাস্বর, কিন্তু পৃথিবীর ছায়া ক্ষণস্থায়ী; বর্ণাঢ্য স্ফটিকের মতো জীবন-গম্বুজ চিরন্তনের শুভ্র জ্যোতিকে বহু রঙে রঞ্জিত করে ততদিন, যতদিন না সে মৃত্যুর পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়।'

শেলীর এই বিখ্যাত পংক্তির মধ্যে বেদান্তের প্রভাব সোচ্চার। ব্রাউনিং এবং শেলী, এই দুজন ব্রিটিশ কবি বেদান্তের দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এবার পরের শ্লোকটি দেখা যাক। সেখানে বলা হচ্ছে ঃ

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

—'যাঁকে অব্যক্ত ও অবিনাশী বলা হয়েছে, তাঁকেই পরম লক্ষ্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটিই আমার শ্রেষ্ঠ অবস্থা, যা লাভ করলে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না।'

অব্যক্তঃ অক্ষর ইত্যুক্তঃ, 'এই *অব্যক্ত*—আগের শ্লোকে যাঁকে "*সনাতনঃ*" বলা হয়েছে, অর্থাৎ প্রলয়ের পরও যিনি বর্তমান থাকেন—তিনিই হলেন *অক্ষর*, অবিনাশী'। ক্ষর মানে বিনাশশীল, যা ধ্বংস হয়। ইনি হলেন *অক্ষর*, অর্থাৎ 'অবিনাশী'। *তং আহুঃ পরমাং গতিম্*, 'তাঁকেই সকল জীবের পরম গতি বলা হয়'। *প্রকৃতির* অতীত, *মায়ার* অতীত নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করাই মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য।

অতএব, এই শ্লোক আমাদের এমন একটি অসাধারণ অবস্থার কথা বলছে 'যেখানে পৌঁছলে আর ফিরে আসতে হয় না।' ১৯তম শ্লোকে আমরা *অবশঃ* বা 'অসহায়' শব্দটি পেয়েছি। কিন্তু যখন আপনি এই মহান সত্য, চরম সত্তা বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবেন, তখন ঐ অসহায় ভাবটি চলে যাবে। এই যে *অব্যক্ত*, তিনি হলেন *সনাতনঃ। তং আহুঃ পরমাং গতিম্*, 'তাঁকেই পরম *গতি* বা চরম লক্ষ্য বলা হয়'; *যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে*, 'যাঁকে পেলে আর জন্মমৃত্যুর দ্বারা গ্রস্ত এই সংসারে ফিরে আসতে হয় না'। *তদ্ধাম পরমং মম*, 'সেই হলো আমার শ্রেষ্ঠ *ধাম* অর্থাৎ নিলয় বা পদ।' শ্রীকৃষ্ণ এখানে চরম দিব্য সত্তা বা পরমাত্মার সঙ্গে নিজের অভেদত্ব জানিয়ে দিচ্ছেন এই কথা বলে যে, ঐ হলো আমার পরম ধাম বা আবাসস্থল।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

—'এবং সেই পরম পুরুষ, যাঁর মধ্যে সমগ্র জগৎ অবস্থিত ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু পরিব্যাপ্ত, একমাত্র তাঁকে অনন্যা ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়।'

এই সত্যকে *পুরুষ* বলা হয়। *পুরুষ*, অর্থাৎ পরম সত্তা, বা বেদান্তের সগুণ-নির্গুণ ঈশ্বর। এক অর্থে তিনি নৈর্ব্যক্তিক বা নির্গুণ, আবার আর এক অর্থে

তিনি সাকার বা সগুণ। সাকার সগুণ ঈশ্বর নিজেকে বিশ্বরূপে প্রকাশিত করেন, বিশ্বকে চালনা করেন—এক কথায় সবকিছুই করেন। কিন্তু এই সগুণ ঈশ্বরের পিছনে রয়েছে পুরুষের নির্গুণ, নৈর্ব্যক্তিক, তুরীয় পরব্রহ্মস্বরূপটি। অতএব, *পুরুষঃ স পরঃ পার্থ,* 'হে অর্জুন, ইনিই সেই পরমপুরুষ'। পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই বিষয়টির কথা আরো স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হবে। সেখানে *পুরুষোত্তম* বা পরম *পুরুষ* কথাটি আমরা পাব।

কীভাবে সেই পরমপুরুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়? *ভক্ত্যা লভ্যঃ তু অনন্যয়া,* 'একমাত্র ভক্তি দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়।' কীরকম ভক্তি? *অনন্যা ভক্তি,* 'একনিষ্ঠ ভক্তি'। যে ভক্তি হলে মন বিষয়ান্তরে যায় না, সেই ধরনের ভক্তি। এই ভক্তির অনেক নাম। কখনও তাকে *অনন্যা ভক্তি* বলা হয়, কখনও তাকে *একান্ত ভক্তি* বলা হয়। একমাত্র এইধরনের ভক্তির মাধ্যমেই সেই পরমপুরুষকে উপলব্ধি করা যায়। *পরা* শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ; এই শ্রেষ্ঠ *পুরুষ* সমস্ত প্রকৃতির ঊর্ধ্বে। এটি *কঠোপনিষদ্*-এও আছে। অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তর আছে; সব স্তরের ঊর্ধ্বে বিরাজমান শ্রেষ্ঠ সত্তা বা *পুরুষ*। এই *পুরুষ* হলেন *প্রকৃতির* অতীত, *অব্যক্তের* অতীত। *কঠোপনিষদ্*-এ (১।৩।১১) বলা হয়েছে, তিনি হলেন : *সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ,* 'তিনিই *কাষ্ঠা,* চরম'; *সা পরা গতিঃ,* 'তিনিই পরম গতি'। সত্য অনুসন্ধানের প্রারম্ভে আমরা স্থূল বস্তুর পর্যালোচনা করি, তারপর ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর স্তরে যাই। বস্তু যত সূক্ষ্ম হয়, তত তার বিশ্বজনীনতাও বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের বিচারাত্মক অন্বেষণের দ্বারা আমরা নামরূপের বাহ্য স্থূল জগৎ অতিক্রম করে, অন্তর্জগতের মন বুদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে, সবশেষে পৌঁছে যাই সেই পুরুষের কাছে, যিনি সূক্ষ্মতম ও সর্বব্যাপী, যাঁর মধ্যে সূক্ষ্মতা, বিশালতা ও গহনতার পরাকাষ্ঠা। সমস্ত কিছুই সেখানে তলিয়ে যায়। এইজন্যই উপনিষদে বলা হয়েছে—*সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।* এই পুরুষকে শুদ্ধাভক্তি বা অহৈতুকী ভক্তি দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। 'আমি ভক্তি ছাড়া আর কিছুই চাই না'—এই হলো *অনন্যা ভক্তি।* বিভিন্ন সাধকের জীবনবৃত্তান্তের মাধ্যমে এই ভক্তিভাবের বিশদ ব্যাখ্যা পুরাণে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে মহিমামণ্ডিত কাহিনীটি হলো প্রহ্লাদের। পাঁচ বছরের সেই বালকটির অন্তর ছিল অহৈতুকী ভক্তিতে পূর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর কথা আছে। ভক্তি দিয়েই তিনি ভগবানের দেখা পেয়েছিলেন। নৃসিংহ অবতার তার ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, 'প্রহ্লাদ, আমি তোমার ওপর অত্যন্ত খুশি হয়েছি। তোমার যা ইচ্ছা আমার কাছে সেই বর

চেয়ে নাও।' প্রহ্লাদ মৃদু হেসে বললেন, 'আমি দোকানদার নই যে বর চাইব। আমি শুধুই আপনাকে ভালবাসি এবং এর পরিবর্তে কিছুই চাই না'। এই কারণে আমাদের ভক্তিশাস্ত্রে প্রহ্লাদের এত কদর। 'নারদ-ভক্তিসূত্রে' (৬৭) বলা হয়েছে, *ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ,* 'ঈশ্বরের প্রতি যাঁদের ঐকান্তিক (একমুখী) ভালবাসা, তারাই শ্রেষ্ঠ ভক্ত'। একাগ্র ভক্তিকে কোনকিছুই টলাতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত-এর সপ্তম স্কন্ধে যেমন প্রহ্লাদের কাহিনী কীর্তিত হয়েছে, তেমনি চতুর্থ স্কন্ধে পাওয়া যায় ধ্রুবর উপাখ্যান। ধ্রুব চমৎকার বালক, চমৎকার তার জীবনও। কিন্তু, যখন সত্যই তার ঈশ্বর দর্শন হলো, তখন সে একটি উচ্চপদ চেয়ে বসলো। ভগবানও বললেন—তথাস্তু। ফলে বালক ধ্রুব মৃত্যুর পর ধ্রুবনক্ষত্র হলেন। ভগবান তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমাকে আমি এমন উচ্চ স্থান দেব যেখানে *সপ্তর্ষিরা* সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকবেন। তুমি তাঁদের মাঝখানে, সর্বদা একই স্থানে বিরাজ করবে। সেইটিই হবে সর্বোচ্চ স্থান এবং আমি তোমাকে সেই স্থিতি দেব।' এই কথায় ধ্রুব খুশি হলো এবং ভগবানও অদৃশ্য হলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ধ্রুবর মনে হলো, 'আমি কী নির্বোধ! ঈশ্বরের দর্শন পেয়ে কিনা আমি একটা সামান্য পদ চাইলাম!' এই ভেবে পরে তাঁর খুবই মনস্তাপ হলো। এ ব্যাপারে প্রহ্লাদ কিন্তু সম্পূর্ণ বাসনামুক্ত ছিল। তার একটাই কথা—'আমি কিছু চাই না, কারণ আমি দোকানদার বা ব্যবসাদার নই।' আমি আপনাকে এই জিনিসটি দিলাম, তার বিনিময়ে আপনি আমাকে একটি জিনিস দিলেন। এটি হলো ব্যবসা, লেনদেনের ব্যাপার। কিন্তু এখানে কোন বিনিময় নেই। এটি একনিষ্ঠা ভক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'ভালবাসার জন্যই ভালবাসা'। আমাদের ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এই ভাবটিরই ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু জানা ভালো যে এই ভাবটি অতি উচ্চ। নচেৎ, ভারতবর্ষের কিছু ভক্ত যেমন করে থাকে, আমরা সবকিছুকেই তেমনি করে নিজেদের স্তরে টেনে নামাব। একজন হয়ত প্রথমে গণেশের কাছে গেল। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে মনস্কামনা পূর্ণ না হলে, সে কার্তিকের কাছে যাবে, তারপর শিবের কাছে, তারপর আর একজনের কাছে। যা তার কামনা তা তাকে পেতেই হবে। ঈশ্বর যেন আমাদের দাস। আমাদের যখন যা চাই, তা তাঁকে দিতেই হবে। নইলে আর তিনি কিসের ভগবান? ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, 'আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি না, আমরা তাঁকে ব্যবহার করি।' প্রহ্লাদের ভক্তি কিন্তু এ ধরনের নয়। তার হলো শুদ্ধাভক্তি। *ভালোবাসার জন্য ভালোবাসা।* বেদান্তে একে *অহৈতুকী ভক্তি* বলা হয়। হরি, বিষ্ণু বা শিব একই পরমেশ্বরের বিভিন্ন

নাম। তাঁর স্বরূপের এমনই মহিমা যে, তিনি শুকদেবের মতো তরুণ আত্মজ্ঞানীদেরও হৃদয় আকর্ষণ করেন। তাঁরা সম্পূর্ণ বাসনামুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শ্রীহরির ভজনা করেন, ভগবানের এমনই মাধুর্য, তাঁর নামের এমনই গুণ। শ্রীমদ্ভাগবত-এর একটি সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকে (১।৭।১০) এমনইভাবে পরমেশ্বরের গুণকীর্তন করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ
নির্গ্রন্থা অপি উরুক্রমে।
কুর্বন্তি অহৈতুকীং ভক্তিম্
ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

—'তাঁরা হরি, অর্থাৎ পরমাত্মাতেই পরম আনন্দ লাভ করেন'; *নির্গ্রন্থা*, 'তাঁদের কোন বন্ধনই নেই'; 'তবু তাঁরা অবিরত এই *অহৈতুকী ভক্তি* অভ্যাস করেন। এই হলো হরির প্রকৃতি'। হরির এমনই মহিমা যে সাধারণ মানুষের কথা বাদই দেওয়া গেলো, শুক ও প্রহ্লাদের মতো অসাধারণ মানুষের হৃদয়ও তিনি হরণ করে নেন।

যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি, 'সেই পরমপুরুষ, যাঁর ভিতরেই সমগ্র জগৎ'। এ নিছক পৌরাণিক গল্প নয়, এর ভিতর গূঢ় সত্যও নিহিত আছে এবং আজকের দিনে পুরাণের এই সত্য আপনারা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। পাশ্চাত্যদেশীয় বেশ কিছু লেখকও হিন্দুধর্মের পৌরাণিক কাহিনী ও লোককাহিনীগুলিকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন এবং সেসবের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। ফ্রান্সের প্রখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক জিমার (Zimmer), যিনি কয়েক বছর আগে গত হয়েছেন, তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Myths and Symbols of the Hindu Religion*-এ কিছু কিছু হিন্দু পুরাণকথা ও প্রতীকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অতি চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। বিষ্ণুর কথাই ধরুন। বলা হয়, তিনি *শেষনাগ*-এর উপর শায়িত। নাগের নামটি লক্ষ্য করুন—শেষ। *শেষ* মানে 'যা অবশিষ্ট থাকে'। সমগ্র বিশ্বের বিলয় হলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই হলো *শেষ।* তার ওপর এই অনন্ত চৈতন্য সম্পূর্ণ নিশ্চলভাবে যোগনিদ্রায় নিমগ্ন। শ্রীমদ্ভাগবত-এ আছে, সৃষ্টির সময় হলে বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি পদ্ম উদ্গত হয় এবং সেই পদ্মের ওপর ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে ব্রহ্মা ভাবেন, 'আমাকে কী করতে হবে?' চতুর্দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে না পেয়ে তিনি পদ্মের নাল দিয়ে স্বয়ং বিষ্ণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন। তখন তাঁর

ধারণা হলো, 'প্রভু সর্বজ্ঞ, সুতরাং আমার নিশ্চয় কোন না কোন কাজ আছে।' এরপর তিনি বিষ্ণুর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতেই একটি ধ্বনি শুনতে পেলেন। ধ্বনি বলছে, *তপঃ তপঃ*। অর্থাৎ 'তপস্যা কর, তপস্যা কর।' শারীরিক তপস্যা নয়, *জ্ঞানময়ং তপঃ*, 'জ্ঞানতপস্যা'। তপস্যা তিনি করলেন এবং সেই তপস্যার মাধ্যমেই তিনি আসন্ন বিশ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি নিয়ম, প্রতিটি তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে জানতে পারলেন। এই কারণেই তাঁকে *বেদময়* বা *বেদমূর্তি* বলা হয়। বেদ মানে জ্ঞান। তার মধ্যে যেমন ভৌতবিজ্ঞান আছে, তেমনি মানব সম্ভাবনা বিকাশের বিজ্ঞান বা অধ্যাত্মবিজ্ঞানও আছে। পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকে বলা হয় 'বেদ'। ব্রহ্মা যখন *'তপঃ তপঃ'* এই ধ্বনিটি শুনলেন, তখনই তিনি এর গভীর ব্যঞ্জনাটি হৃদয়ঙ্গম করে তপস্যায় লেগে গেলেন। কী ধরনের তপস্যা? গভীর ধ্যানের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলেন তাঁর জন্য কী কর্তব্য অপেক্ষা করছে। এই তপস্যার পরই বিশ্ব প্রকাশিত হলো।

যে-কোন সৃষ্টিকর্মের আগেই তপস্যার প্রয়োজন। তপস্যা ছাড়া সৃষ্টি হয় না। শিল্পীরও তপস্যা চাই। তবেই তিনি শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন। ব্রহ্মাও তপস্যা করেছিলেন—এক 'বিস্ফোরণকারী' তপস্যা।

পৌরাণিক এই উপাখ্যানে আমরা প্রলয়ের কথাও পাই, যখন সমগ্র বিশ্ব বিষ্ণুতে লয় হয়ে যায়। সহস্রকোটি বছর তা সেখানে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তারপর ফের শুরু হয় সৃষ্টির কাজ। বিষ্ণু চোখ মেললেই সৃষ্টি। তিনি চোখ বুজলেই প্রলয়। তাহলে একবার চিন্তা করে দেখুন, এই পুরুষের ব্যাপ্তি ও গভীরতা কতখানি! যখন গল্প ভেবে পড়ি, তখন মনে হয় এটি যেন শিশুকাহিনী। কিন্তু যখন বিষয়টিকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করি, তখন দেখি যে পৌরাণিক ভাষায়, মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত হলেও কাহিনীর পিছনে একটি নিগূঢ় সত্য লুকিয়ে আছে। বিভিন্ন ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জিমার এই কথাই লিখেছেন। আমাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলির মধ্যে অতিকথা অবশ্যই আছে। কিন্তু কিছু কিছু কাহিনীর মধ্যে মহান সত্যের অভিব্যক্তিও ঝিলিক দিয়ে যায় বৈকি! শিবের বাহন নন্দীর কথাই ধরুন। শিব কেন ষাঁড়ে চড়ে ঘুরে বেড়ান? তার উত্তর হলো, ষাঁড় শক্তির প্রতীক—দৈহিক, মানসিক ও অহংশক্তিজাত দর্পের প্রতীক; এই শক্তিকে শিব সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। তামিলনাড়ুর চিদাম্বরম্ মন্দিরে নটরাজ শিবের নৃত্যের যে কাহিনীটি খোদিত আছে, বৈজ্ঞানিক কাপরা (Capra) সেটি তাঁর *Tao of Physics* নামক গ্রন্থে পারমাণবিক শক্তির দৃষ্টান্তরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিতই

আজ তাই করছেন, পৃথিবীর উপকথাগুলির পিছনে যে আধ্যাত্মিকতা, দর্শন ও তত্ত্ব আছে, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন। কয়েক মাসের জন্য এখানে *প্যারাবোলা* আসছে; এর মধ্যে মেক্সিকোর তো বটেই, পৃথিবীর অন্যান্য উপকথারও অতি উৎকৃষ্ট বর্ণনা আছে। তাই আপনাদের বলছি যে বৈজ্ঞানিক সত্যকে উপকথার মাধ্যমেও পরিবেশন করা যায়। সে কথা ভুলে গিয়ে কোন কোন পাশ্চাত্যদেশীয় লেখক প্রায়শই আমাদের পুরাণকাহিনীর নিন্দা করে বলেন যে, 'হিন্দুদের বিশ্বাস তো এই যে, কয়েকটা হাতি পৃথিবীকে ধারণ করে আছে!' এঁরা কয়েকটি শিশুপাঠ্যকাহিনী তুলে ধরে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, হিন্দুদের জ্ঞানের বহর কতটা! কিন্তু আজকাল অনেকের কাছেই হিন্দুপুরাণগুলি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাঁরা এইসব কাহিনীর আবরণ ভেদ করে মূল সত্যের দিকে যাচ্ছেন। বাস্তবিক, ভারতবর্ষ অতিকথা ও উপকথার জন্য বিখ্যাত। জীবজন্তু নিয়ে যে সব শ্রেষ্ঠ কাহিনী, তার জন্য সারা বিশ্বের শিশুরা ভারতের কাছে ঋণী। 'গজেন্দ্রমোক্ষ'-র কাহিনীটি সারা ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া, কাম্বোডিয়া ও অন্যান্য জায়গায় গিয়েও দেখেছি এই কাহিনি সুন্দরভাবে খোদাই করা আছে। দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। শিল্পকলার মধ্যেও যে এই কাহিনি তার স্থান করে নিয়েছে, তার কারণ এই উপাখ্যান মানুষের মন স্পর্শ করেছে—শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও।

পরবর্তী শ্লোকগুলিতেও এই প্রসঙ্গ আসবে। কোন কোন ধর্মীয় প্রথা ও বিশ্বাস এক এক সময়ে আমাদের বিব্রত করেছে। কিন্তু যেই না নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠলো, নতুন ভাবের উদয় হলো, অমনি আগের বিশ্বাস ও যন্ত্রণাদায়ক আচার বা প্রথাগুলি নিঃশব্দে অপসৃত হলো। এই প্রসঙ্গটি এই অধ্যায়েরই পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে উত্থাপিত হবে। এখানে কেবল একটা কথাই বলতে চাই যে, ধর্মীয় চিন্তাভাবনারও বিবর্তন হয়। আধ্যাত্মিকতা এক জিনিস, কিন্তু তার প্রকাশের প্রকারভেদ হতে পারে। শ্রাদ্ধ বা মৃত ব্যক্তির পারলৌকিকক্রিয়ার কথাই বিবেচনা করুন। আজকাল তো অনেক মানুষই ঐসব অনুষ্ঠান বিশেষ পছন্দ করেন না। তাঁরা বলেন, 'ওসব না করে আমরা বরং কোন অনাথাশ্রমের গরিব শিশুদের খাওয়াব; তাতে আমার বাবার আত্মার অনেক বেশি তৃপ্তি হবে'। ভালো কথা। আপনি আপনার নিয়ম এভাবে অবশ্যই পাল্টাতে পারেন। সে অধিকার আপনার আছে। একমাত্র অনন্ত সত্য বা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ছাড়া অন্য কোন কিছুই নিত্য বা অপরিবর্তনীয় নয়। সবই পরিবর্তনশীল। সবই

কালে বদলে যায়। ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে এই হলো হিন্দুর প্রজ্ঞা এবং একথা খুবই সত্যি যে, আমরা পরিবর্তনশীল বলেই আজও বেঁচে আছি। অনমনীয় হলে এতদিনে আমরা শেষ হয়ে যেতাম। ঋগ্বেদের সেই অতি প্রাচীন যুগেও আমাদের মধ্যে এই ভাবটি ছিল এবং সেইজন্যই আমাদের ধর্ম এই সত্যটি ঘোষণা করতে পেরেছিল—*একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি,* 'সত্য এক, ঋষিরা তাঁকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন'। এই সত্য আমরা আজও ধরে আছি। মূল ভাবটি একই আছে, শুধু অভিব্যক্তি পাল্টেছে। বস্তুত এই কারণেই যুগে যুগে ভারতবর্ষের পুনর্জীবন সম্ভব হয়েছে।

সে যাই হোক, এই অধ্যায়ের পরবর্তী শ্লোকগুলিতে দর্শনশাস্ত্রে যাকে পরলোকতত্ত্ব বলা হয়, অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মার কী গতি হয়, তা নিয়ে আলোচনা হবে। নানা ধর্মে এই বিষয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। এখানেও আপনি এ বিষয়ে বৈদিক যুগে প্রচলিত ভাবনাটির সঙ্গে পরিচিত হবেন। এই অধ্যায়ের মুখ্য বিষয়টি আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়টিরও উল্লেখ করেছেন।

মৃত্যুর পর মানুষ যে উর্ধ্বলোকে যায়, তা নিয়ে *উপনিষদে,* বিশেষ করে *ছান্দোগ্য উপনিষদ*-এ, দুটি মার্গের কথা বলা হয়েছে। এদের একটি হলো *দেবযান* বা 'দেবতাদের পথ'। আরেকটি হলো *পিতৃযান* বা 'পিতৃপুরুষদের পথ'। সূর্যের উত্তর গোলার্ধে ও দক্ষিণ গোলার্ধে গমনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পথ দুটিকে যথাক্রমে 'উত্তরায়ণ' ও 'দক্ষিণায়ন'ও বলা হয়। এমনকি ঋগ্বেদেও *পিতৃযান ও দেবযান*—এই দুটি পথের উল্লেখ আছে। কিন্তু মৃত্যুর পর জীবাত্মা এই দুই পথের কোন্ কোন্ স্তরের মধ্য দিয়ে গিয়ে সর্বশেষ অবস্থায় পৌছায়, তার বর্ণনা ঋগ্বেদে নেই। তিলক তাঁর *গীতারহস্য*-এ ও আগের লেখা বই *Arctic Home of the Vedas*-এ জলবায়ু এবং ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির পর্যালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমাদের আদি নিবাস যদি সুমেরু অঞ্চলের কোথাও হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রেই আমাদের ছ'মাস দিন ও ছ'মাস রাতের অভিজ্ঞতাটি হতে পারে। বাস্তবিক, আপনারা যদি এখনও সুইডেন, নরওয়ে বা আরও উত্তরে সুমেরু প্রদেশ বা সুমেরুবৃত্তে যান তো আপনাদের এই অভিজ্ঞতাই হবে। সেখানে একটানা ছ'মাস দিন, আবার রাতও ছ'মাস। শীতে বড়জোর কয়েক ঘণ্টা রোদ পাবেন। আবার গ্রীষ্মকালে অন্ধকারের নামগন্ধটি নেই। ১৯৬১ সালে ইউরোপের ১৭টি দেশের বক্তৃতা সফরকালে যখন সুইডেনের উত্তরে কিরুনা নামক একটি ছোট শহরে যাই,

তখন রাত ১২টায় গাড়িতে বসে, বিনা বাতিতে বই পড়েছি। সূর্য তখনও দিগন্তের নিচে দৃশ্যমান! ওদেশে সূর্য শুধু দিগন্তের এদিক থেকে ওদিকে যায়, আবার ওদিক থেকে এদিকে আসে—ঐ পর্যন্তই তার গতি। এই হলো উত্তরমেরুর অভিজ্ঞতা। এর বিপরীতদিকেই আবার দক্ষিণমেরু। সেখানে শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারও দীর্ঘতর হতে থাকে; এমনকি হল্যান্ডেও রাত ১০টার সময় মনে হয় যেন এখানকার সন্ধ্যে ৬টা। মনে আছে, রাত ১০টায় আমি একটা পার্কে বসে রাত্রের আহার সেরেছিলাম, কারণ সূর্যের আলো তখনও একটু রয়েছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছেন যে, মৃত্যুর পর আত্মা এই পথ দুটি ধরেই উর্ধ্বলোকে গমন করে। পরের চারটি শ্লোকে এই তত্ত্বেরই আলোচনা হবে।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

—'হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, এবার আমি তোমাকে সেই কালের (মার্গের বা পথের) কথা বলব, যে কালে প্রয়াণ করে যোগিরা আর প্রত্যাবর্তন করেন না, (এবং যে কালে গমন করে) তাঁরা আবার প্রত্যাবর্তন করেন।'

এখানে প্রথমে উত্তরায়ণের কথা বলা হচ্ছে ঃ

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

—'অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের ছ'মাস—এই মার্গে গমন করে ব্রহ্মবিদরা ব্রহ্মের কাছে যান।'

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'অগ্নি, দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণের ছ'মাস, *উত্তরায়ণম্,* বা উত্তরের পথ; এই পথে ব্রহ্মবিদরা ব্রহ্মলোকে যান'। পরবর্তিকালে আমাদের ঈশ্বরতত্ত্বে এই ভাবটি এসেছে *ক্রমমুক্তি* রূপে। *ক্রমমুক্তি* অর্থাৎ 'ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে মুক্তিলাভ'। আপনি প্রথমে একটু উচ্চলোকে গেলেন, সেখানে কিছুকাল থাকলেন, এরপর আরও একটু উচ্চলোকে, তারপর আরও উর্ধ্বে —এইভাবে জন্মমৃত্যুরূপ সংসারে আর না ফিরে 'ক্রমমুক্তির মাধ্যমে' আপনি ব্রহ্মোপলব্ধির পথে ক্রমশ এগিয়ে চললেন। এটি একটি পথ। একে *উত্তরায়ণ* মার্গ বলা হয়। দ্বিতীয় পথটি হলো *দক্ষিণায়ন*। সেটি কীরকম?

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ ॥

—'ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, [সূর্যের] দক্ষিণায়নের ছ'মাস—এই পথে গিয়ে *যোগী* চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং আবার সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন।'

দ্বিতীয় পথ বা মার্গটি গেছে দক্ষিণ দিকে। অগ্নিতত্ত্বে আগুন এবং ধোঁয়া দুই-ই আছে। অতএব, ধোঁয়াও আগুনের অংশ। জ্যোতির্মার্গের কথা আগেই বলা হয়েছে; এখন ধূম্রমার্গের বিষয় বলা হচ্ছে। ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নের ছ'মাস—এই নিয়ে হলো *দক্ষিণায়ন*; যোগী এই পথে গিয়ে চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত হন এবং আবার ফিরে আসেন। ছান্দোগ্য উপনিষদেও এই দুটি পথের বিশদ বিবরণ আছে।

এই বিষয়ে বিদেশে এক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ 'এসবের অর্থ আমি বুঝি না। সকলেই এব্যাপারে কিছু না কিছু বলে থাকেন। তাই আমিও বলছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না।' বাস্তবিক, যা কিছু আছে তার সবটাই গ্রহণ করবার দরকার নেই। তাছাড়া, কালে অনেক বিশ্বাসই বদলে যায়। বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রেও তাই হয়। প্রকৃতির কোন একটি বিশেষ দিক যখন আপনি জানতে পারেন, তখন পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কোন প্রণালী আপনি অবলম্বন করে থাকেন; কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে যখন আপনার জ্ঞান গভীরতর হয়, এবং আপনি গভীরতর স্তরে অনুসন্ধান করেন, তখন কাজের ধারা বদলে যায়। দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও তাই। সুতরাং, যখন উপনিষদের যুগ এল, তখন পুরনো কিছু ভাব থেকেই গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা মানুষকে মহত্তর কিছু তত্ত্ব দিয়ে গেলেন যা যুক্তিগ্রাহ্য, যা বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়, যা অভিজ্ঞতার মধ্যে আনা যায়, অনুভব করা যায়। কিন্তু এই অন্য বিষয়গুলি হেঁয়ালির মতো আপনার অভিজ্ঞতার বাইরেই থেকে যাবে। কেউই বলতে পারে না, 'আমাকে একবার মরতে দিন; মৃত্যুর পর আমি ঐ পথ ধরে যাব এবং ফিরে এসে বলব কী হলো'। এটি সম্ভব নয়; অতএব এর সত্যতা প্রমাণসিদ্ধ নয়। উপনিষদের সেই গভীর তত্ত্বগুলিই শুধু সত্য ও গ্রহণযোগ্য যা মনুষ্যজীবনে অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া যায়, যা প্রমাণযোগ্য ও বারবার প্রমাণিত। উপনিষদের মূল সত্যগুলিকে আপনি যাচাই করতে পারেন। এগুলি মিথ্যা কিনা বিচার করে দেখতে পারেন। বিজ্ঞানমনস্ক এক লেখকের মতে, আপনি এগুলি মিথ্যা কিনা প্রমাণ করতে পারেন। মোদ্দা কথা হলো এই ঃ প্রকৃত বেদান্ত শিক্ষার প্রণালীটি এমন যে,

সেটিকে সত্য বলে প্রমাণিত করা যায়, আবার সেটিকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে চান তো সে চেষ্টাও করতে পারেন। বেদান্তে আপনার সে সুযোগ আছে। শঙ্করাচার্য তাঁর *ব্রহ্মসূত্র*-ভাষ্যের প্রারম্ভে বলছেন যে এটি হলো *বস্তুতন্ত্রজ্ঞান;* 'সত্যের বাস্তব জ্ঞান'। এইটিই উপনিষদের প্রধান শিক্ষা। এর মধ্যে অনেক আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সত্য রয়েছে, আবার সেই সঙ্গে কিছু পুরানো, অথচ প্রমাণযোগ্য নয়, এমন বিশ্বাসও আছে। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন পথ সম্পর্কেও একথা সত্য। এমনকি *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*-এও যজ্ঞাদি সম্বন্ধে বেশ কিছু কথা পাবেন, যদিও তা আছে শুধু প্রথমদিকে। উপনিষদ যত অগ্রসর হয়েছে, তার সার সত্যগুলি ততই প্রকাশ পেয়েছে। এই সত্যগুলি সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক, যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে নরনারীর স্বরূপের অনন্তত্ব, সকলের সঙ্গে আমাদের একত্ব। এই যে সত্য, তা আপনি *এখানে এবং এখনই* উপলব্ধি করতে পারেন, কোন ভবিষ্যৎ জীবনে নয়, কোন সুদূর স্বর্গেও নয়। *ইহ এব* অর্থাৎ 'এখানেই'। শব্দটি উপনিষদে বার বার ঘুরে ফিরে আসে। সত্য যদি আপনার ভিতরেই লুকিয়ে থাকে, তবে তাকে উপলব্ধি করার জন্য আপনাকে আকাশে যেতে হবে না; সে কাজ আপনি এখানেই করতে পারেন। আপনি শ্রমজীবী হতে পারেন, গৃহবধূ হতে পারেন অথবা অন্য কোন পেশায় নিযুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু তা থেকেও এই পরম সত্য আপনার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব। পরবর্তিকালে উপনিষদ ও বেদান্তের মাধ্যমে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের মতো অধ্যাত্মসাধনার দুটি রাজপথ খুলে গেলে এই উদার শিক্ষাটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

জ্ঞান ও *ভক্তি* এই দুটি সাধনপথকে প্রণালীবদ্ধ করা হলে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন মার্গের প্রাসঙ্গিকতা ও আকর্ষণ হারায় এবং লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী নতুন আধ্যাত্মিক পথের অনুগামী হয়। মহাভারতে আমরা দেখি দেহত্যাগের জন্য ভীষ্ম উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করছেন। কঠিন শরশয্যায় শুয়েও তিনি বলছেন, 'সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হলে তবেই আমি দেহত্যাগ করব' এবং করলেনও তাই। মহাভারত ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে। কিন্তু এরপর উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন পথের কথা আর তেমন শোনা যায় না। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এসব ঘটনার মূল্য আজও আছে, কিন্তু পারলৌকিক তত্ত্ব হিসাবে এখন আর এগুলির কথা তেমন শোনা যায় না এবং শোনা গেলেও অল্প লোকই এসব বিশ্বাস করে। ভক্তি ও জ্ঞান মার্গের মাধ্যমেই আমরা ধর্মকে মানুষের জীবনের অনেক কাছাকাছি আনতে পেরেছি। স্বভাবতই অতীতের ঐ সমস্ত অবোধ্য রহস্যগুলি

নিঃশব্দে অপসারিত হয়েছে এবং পরলোকসম্পর্কে মানুষের ধারণা নতুন রূপ নিয়েছে। উপনিষদে ঐ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ মার্গের কথা আছে, তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে ওগুলির উল্লেখ করছেন। কিন্তু স্বয়ং তিনিও শেষকালে বলছেন যে এসব চরম কথা নয়। এই অধ্যায়ের সর্বশেষ শ্লোকটিতে এই কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সেকথা বলার আগে তিনি ২৬তম শ্লোকটিতে বলছেন ঃ

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

—'জগতের এই শুক্ল ও কৃষ্ণ পথ দুটি যথার্থই শাশ্বত বলে বিবেচিত হয় ঃ একটি জীবকে অপ্রত্যাবর্তন বা মুক্তির দিকে নিয়ে যায়; অন্যটি নিয়ে যায় প্রত্যাবর্তনের পথে।'

শুক্লকৃষ্ণে গতি হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে, 'এই শুক্ল ও কৃষ্ণ দুটিই হলো সনাতন পথ, যা অবলম্বন করে মানুষকে মৃত্যুর পর যাত্রা করতে হয়। *একয়া যাত্যনাবৃত্তিম্,* 'একটি পথে যাত্রা করলে আর এই সংসারে পুনরাগমন করতে হয় না', এই পথে ধীরে ধীরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। *অন্যয়া আবর্ততে পুনঃ,* 'অন্য পথটি দিয়ে গেলে, স্বর্গে সুকর্মের সুফল ভোগ করবার পর আবার ফিরে সংসারে আসতে হয়'। এইটিই *পিতৃযান* বা *দক্ষিণায়নের* বৈশিষ্ট্য। এখানে পুনরাবর্তন আছে। অন্যটি *দেবযান*। এই পথে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না। এবার, এই দুটি মার্গের কথা বলার পর, ২৭তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ একটি অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক সত্য উদ্ঘাটন করবেন যাকে আমরা ৯ম অধ্যায়ের ভূমিকারূপে গ্রহণ করতে পারি। সেখানে তিনি বলবেন যে, *ভক্তি* দ্বারা এখানেই পরম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। তার জন্য এখানে ওখানে যেতে হয় না। সেকথা বিস্তারিতভাবে পরে আসবে। এখানে শুধু তার উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন ।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥ ২৭ ॥

—'হে পার্থ, এই মার্গ দুটিকে জানলে, কোন যোগীই আর মোহগ্রস্ত হন না। অতএব, হে অর্জুন, তুমি সর্বদা যোগযুক্ত হও।'

এই শ্লোকে *যোগী* শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যিনি একটু আধটু অধ্যাত্মজীবন যাপন করেছেন, তাঁকেই সাধারণত *যোগী* বলা হয়। কিন্তু গীতার

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগের দুটি চমৎকার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে : *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্*, 'কর্মকুশলতাই হলো যোগ' (২।৫০); এবং *সমত্বং যোগ উচ্যতে*, 'চিত্তের সমতাকেই যোগ বলা হয়' (২।৪৮)। এইরকম অনেক সংজ্ঞাই পরে দেওয়া হবে। কিন্তু 'গীতার যোগী' সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কেন কী ভাবে?

তার উত্তরে বলা হচ্ছে, *নৈতে সৃতী পার্থ জানন্*, 'হে অর্জুন, এই পথদুটি কী ধরনের তা জেনে', গীতার যোগী, *ন মুহ্যতি কশ্চন*, 'আদৌ মোহগ্রস্ত হন না।' উত্তরায়ণ পথে যাত্রা করলে ধীরে ধীরে আপনার পরমার্থ লাভ হবে এবং অন্য পথ দিয়ে গেলে আপনি যাবেন, কিন্তু আবার ফিরে আসবেন। গীতার যোগী কিন্তু এই দুটি পথের কোনটির দ্বারাই মোহগ্রস্ত হন না। *তস্মাৎ*, 'সেই হেতু', *সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন*, 'হে অর্জুন, তুমি সর্বদা যোগের পথ অবলম্বন করে থাক।' এই হলো *গীতার মূল তত্ত্ব।* এই তত্ত্ব বলে যে, কর্মের মধ্য দিয়ে, মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সবার অন্তরে নিহিত সত্যটি উপলব্ধি করে, এখানেই আপনি চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন। মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম করতে থাকলে, ঐ সময়েই আপনি মানবজীবনের কাঙ্ক্ষিত পরম অনুভূতি লাভ করতে পারবেন। এই ভক্তিপথে পারলৌকিক ঐ পথগুলির কোনটি দিয়েই চলার বাধ্যবাধকতা আপনার নেই। এইটিই পরবর্তী ৯ম অধ্যায়ের মাহাত্ম্য।

অতএব, *তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু*, 'সেই হেতু, সর্বদা', এই পথগুলির দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে; *যোগযুক্তো ভবার্জুন*, 'হে অর্জুন, তুমি যোগী হও' এবং আধ্যাত্মিক জীবনযাপন কর। ঈশ্বর সুদূর কোন স্থানে রয়েছেন তা নয়, বস্তুত তাঁর মতো অত কাছে আর কেউ নেই। ইসলামের *কোরাণ* বলে, 'তিনি তোমার গলার শিরার থেকেও কাছে আছেন।' চমৎকার ভাব। এদিক ওদিক ছুটে বেড়ানো নয়; সেটি ধর্মের পথ নয়। তাঁকে এখানে এখনই লাভ কর, *ইহ এব, ইহ এব*—শ্রীকৃষ্ণ যা পরে বলবেন। আমরা আগেই ৫ম অধ্যায়ের ১৯ তম শ্লোকে একথা শুনেছি। এবার এই অধ্যায়ের সর্বশেষ শ্লোকটিতে তিনি বলছেন :

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

—'শাস্ত্রে বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপশ্চর্যা ও দানকর্মাদি থেকে যে সব পুণ্যফল লাভের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি জেনে যোগী এসবের ঊর্ধ্বে উঠে যান এবং

[এখানে (ইহজগতেই) এখনই (ইহজন্মেই)] আদিকারণ পরম ব্রহ্মপদ লাভ করেন।'

৮ম অধ্যায়ের এইটিই শেষ শ্লোক। শ্লোকের ভাষাটি একবার লক্ষ্য করুন। বলা হচ্ছে, শাস্ত্রে বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপশ্চর্যা থেকে যেসব পুণ্যফল প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, তা জেনে গীতোক্ত যোগী সেগুলির ঊর্ধ্বে চলে যান এবং *এখানেই, এখনই,* পরম ব্রহ্মপদ লাভ করেন। *এখানে* এবং *এখনই* শব্দদুটি মূল শ্লোকে নেই; তাই ব্র্যাকেটের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। কথাগুলি পরের অধ্যায়ে পাব। তাই বলা চলে, এই শ্লোকটি যেন পরবর্তী অধ্যায়ের ভূমিকাস্বরূপ।

যোগী *অত্যেতি* তৎ, 'এই সমস্ত কিছু অতিক্রম করে যান'; *সর্বম্ ইদং বিদিত্বা,* 'এই সব পথের কথা জানার পর'—অর্থাৎ, এই পথ এদিকে নিয়ে যায় আর ঐ পথ ওদিকে নিয়ে যায় ইত্যাদি, এটি জেনে—নর বা নারী আর মোহগ্রস্ত না হয়ে সত্য উপলব্ধি করেন। *যোগী পরং স্থানম্ উপৈতি,* 'যোগী পরমকারণ ব্রহ্মপদ লাভ করেন', এখানেই। এই অবস্থাকেই পরবর্তিকালে *জীবন্মুক্তি,* অর্থাৎ 'জীবৎকালেই মুক্তি' নামে অভিহিত করা হয়েছে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কোন বন্ধন নেই—তিনি এখানেই এবং এখনই মুক্ত।

সুতরাং এখানে-ওখানে যাবার কোন দরকারই নেই। সব এখানেই আছে। এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের বলেছেন, 'সেথা সেথা' হলো অজ্ঞান, 'হেথা হেথা' হলো জ্ঞান। যখনই মনে করা হয় যে কোন কিছু 'সেখানে' রয়েছে, সেটি অজ্ঞান। কারণ সমস্ত কিছু 'এখানেই' রয়েছে। *'এখানে এখানে জ্ঞান, সেখানে সেখানে অজ্ঞান'।* তিনি একথাই বলেছিলেন। অধ্যাত্মজগতের এই বিস্ময়কর সত্যটি উপনিষদের সর্বোচ্চ আবিষ্কার এবং ওই যুগ থেকেই আমরা *জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও ধ্যানের* মাধ্যমে ইহজগতেই ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করে আসছি। যদি আপনি কৃতকার্য না হন, তাহলে আপনাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে। এই সত্যটি আমরা আরো পরে জেনেছি। এভাবেই *যোগী পরং স্থানম্ উপৈতি চাদ্যম্; আদ্যম্* অর্থাৎ 'আদি কারণাবস্থা'। এই ব্রহ্মাণ্ড কেমন ছিল? শুরুতে তা কী ছিল? তার উত্তর ঃ ব্রহ্ম। আমরা সেই অবস্থা লাভ করি। বিবর্তনের সমস্ত ধাপগুলি পেরিয়ে, এই মনুষ্যশরীরেই আমরা সর্বোচ্চ সত্যকে উপলব্ধি করি। এই শ্লোকে সেকথাই বলা হচ্ছে।

ইতি অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

'অক্ষরব্রহ্মযোগনামক অষ্টম অধ্যায়ের এখানেই সমাপ্তি।'

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

নবম অধ্যায়

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ

রাজকীয় জ্ঞান ও রাজকীয় রহস্যের পথ

এখন আমরা নবম অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। এই অধ্যায়টির নাম *রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ*। প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে একে *জ্ঞান* এবং *বিজ্ঞান* অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি-সমন্বিত যোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম দুটি শ্লোক অসাধারণ ভাষায় এই অধ্যায়টির তাৎপর্য আমাদের কাছে উন্মোচিত করেছে। অর্জুনের কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে তাঁর ব্যাখ্যা অব্যাহত রেখেছেন।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১॥

শ্রীভগবান বলছেন—

—'দোষদৃষ্টিহীন তোমাকে এখন আমি পরমগুহ্য জ্ঞান ও উপলব্ধির কথা বলব, যা জেনে তুমি সংসারবন্ধনরূপ সকল কলুষতা থেকে মুক্ত হবে।'

এ অতি সহজ সরল সংস্কৃত। *ইদং তু গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যামি,* 'এবার তোমাকে আমি গভীরতম সত্যের কথা বলব'। কারণ তুমি হলে *অনসূয়বে,* অর্থাৎ 'তোমার কোন *অসূয়া* নেই, তুমি ঈর্ষা থেকে মুক্ত'। তুমি মুক্ত মনের মানুষ। মানুষের মনে যদি *অসূয়া* অর্থাৎ ঈর্ষা, তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা থাকে, তবে তার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক সত্য প্রবেশ করতে পারে না। এগুলিকে অবশ্যই দূর করতে হবে। আমাদের শাস্ত্রগুলি শতবার সাবধান করে দিয়ে বলেছে যে, যার ভিতর *অসূয়া* আছে, তাকে এই সত্য বলতে যাবে না, কারণ অসূয়া ভাব, অতি নীচ মনের পরিচায়ক। এরকম মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ, কোন মহৎ সত্য বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে সে, যে *অনসূয়বে,* 'ঈর্ষা থেকে মুক্ত'। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণ এই একই কথা বলবেন, 'যাদের চিত্ত *অসূয়াপূর্ণ,* তাদের এই গীতার শিক্ষা

দেবে না, কারণ তারা এর মর্মার্থ একেবারেই বুঝতে পারবে না।' তা হবে নিছক বেনাবনে মুক্তো ছড়ানোর সামিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'তুমি *অসূয়া* থেকে মুক্ত। অতএব, এই পরম গুহ্য সত্যের কথা আমি তোমাকে বলব'। *গুহ্যম্* এবং *গুহ্যতমম্*-এর অর্থ হলো 'গূঢ় এবং গূঢ়তম'। অর্থাৎ গভীর এবং গভীরতম। সংস্কৃতে 'তমম্' বলতে কোনকিছুর সর্বোচ্চ মানকে বোঝায় এবং 'তরম্' বলতে বোঝায় তুলনামূলক মান। সেই অনুযায়ী এখানে *গুহ্যম্, গুহ্যতরম্* এবং *গুহ্যতমম্* শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। *প্রবক্ষ্যামি,* 'আমি তোমাকে বলব'। কিন্তু এই গুহ্যতম যোগের বিশেষত্ব কী? *জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্,* 'এতে রয়েছে বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের কথা, অর্থাৎ ''জ্ঞান ও অনুভূতির অবগতির'' কথা।' ধরা যাক, আপনি কাউকে বললেন, 'এক গ্লাস দুধ নিন এবং তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করুন।' সেই ব্যক্তিও আপনার কথা মতো দুধ নিয়ে চর্চা করলেন। এ হলো *জ্ঞান।* দুধ সম্পর্কে সব তথ্যই আপনি জানলেন। কিন্তু আপনি যখন দুধ পান করেন, তার দ্বারা পুষ্টিলাভ করেন, তখন তা হলো *বিজ্ঞান,* কেবল দুধের প্রকৃতি জানার চেয়েও তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক তেমনি, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চাই আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা উপলব্ধি। প্রথম পর্যায়টি থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তরণ একান্ত প্রয়োজন। ব্রিটিশ চিন্তাবিদ বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell) তাঁর *Impact of Science on Society* গ্রন্থে বলেছেন, 'জ্ঞান বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি প্রজ্ঞা না বাড়াই, তবে সেই জ্ঞান আমাদের দুঃখ বাড়িয়ে তুলবে'। জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুই-ই প্রয়োজন, *জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্। যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে অশুভাৎ,* অর্থাৎ 'যা জেনে সব অশুভ থেকে তুমি মুক্ত হবে'। *শুভ* হলো যা কিছু মঙ্গলজনক এবং *অশুভ* হলো যা কিছু কলুষতাপূর্ণ। আপনি সমস্ত কলুষ বা পাপ থেকে মুক্ত হবেন। প্রথম শ্লোকটি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। দ্বিতীয় শ্লোকে এই বিষয়টিকে আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

—'এই বিদ্যা সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ, গভীরতার দিক থেকে গভীরতম এবং পবিত্রতার দিক থেকে পবিত্রতম; এই বিদ্যা প্রত্যক্ষ বোধগম্য, ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত, সহজসাধ্য এবং স্বভাবত অক্ষয়।'

প্রতিটি শব্দ এখানে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম শব্দটি হলো *রাজবিদ্যা* , অর্থাৎ 'সকল *বিদ্যার* রাজা এই *বিদ্যা'।* বিদ্যা মানে 'বিজ্ঞান', জ্ঞান। বস্তুত বিজ্ঞান

শব্দের অর্থও জ্ঞান। এর মধ্যে অস্পষ্টতা কিছু নেই। বিজ্ঞান মানেই পরীক্ষিত এবং পরীক্ষণীয়। অতএব, এখানে *বিদ্যা* শব্দের তাৎপর্য হলো বিজ্ঞান। *রাজবিদ্যা,* সব বিদ্যার মধ্যে এ হলো *রাজবিদ্যা।* রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং আরও বহুরকমের বিদ্যা আছে। এসবের মধ্যে এ হলো *রাজবিদ্যা।* বলা হচ্ছে— *রাজগুহ্যম্,* 'রাজোচিত গভীরতাসম্পন্ন'। গুহ্যম্ অর্থ, 'গভীর, রহস্যময় বা নিগূঢ়।' কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এর অর্থ, 'নিগূঢ়, গভীর'। এই বিদ্যা যেন গুহায়িত। মনে করুন, একটি গুহার মধ্যে এমন কিছু লুকানো আছে, আপনি যার অনুসন্ধান করছেন। অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে তবেই একসময় আপনি আপনার অন্বিষ্ট বস্তু খুঁজে পান। সব বৈজ্ঞানিক সত্যই প্রচ্ছন্ন থাকে; মানুষকে তা চাইতে হয় এবং আবিষ্কার করতে হয়। আপনি ঐ গুহ্য সত্যকে চোখ দিয়ে দেখতে বা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারেন না। সেই দিক থেকে *গুহ্যম্* শব্দের অর্থ 'অত্যন্ত নিগূঢ়'। একে লাভ করতে হলে আপনাকে গভীরে ডুব দিতে হবে। মুক্তো পেতে হলে যেমন আপনাকে সমুদ্রে ডুব দিতে হবে, এও তেমনি। তাই বলা হয়েছে, *রাজবিদ্যা, রাজগুহ্যম্*। তারপর আসছে, *পবিত্রম্ ইদম্ উত্তমম্,* এই (রাজবিদ্যা মানুষকে) পরম পবিত্র করে থাকে।

এরপর একটি আশ্চর্য কথা বলা হয়েছে, *প্রত্যক্ষাবগমম্,* 'দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই আপনি একে অনুভব করতে পারেন।' *প্রত্যক্ষ* মানে 'চোখের সামনে'। সরাসরি যে অনুভূতি হয়, তাকে বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষ। *প্রত্যক্ষাবগমম্* মানে, কোন বস্তুকে দেখে আপনার যে অভিজ্ঞতা হয়, সেভাবেই আপনি এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন। ভাষাটা একবার লক্ষ্য করুন, *প্রত্যক্ষাবগমম্*। এই শ্রেষ্ঠ, পবিত্র সত্য উপলব্ধির জন্য আপনাকে মহাশূন্যে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ পাড়ি দিয়ে স্বর্গে যেতে হবে না। এই পৃথিবীতে বসেই আপনি তা পেতে পারেন। তার জন্য দরকার শুধু আপনার অন্তর্দৃষ্টিকে উন্মোচিত করা। প্রাত্যহিক জীবনে, প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্য দিয়েই এই সত্যকে আপনি অনুভব করতে পারেন। এই হলো *প্রত্যক্ষ* শব্দের ব্যঞ্জনা। এই অনুভূতিলাভের জন্য আলাদা কোন জীবনের প্রয়োজন নেই। একজন গৃহবধূ হিসাবে, একজন শ্রমিক হিসাবে, একজন কর্মী হিসাবে, একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্র থেকেই আপনি এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন, কারণ এই সত্য প্রত্যেকের অন্তরেই নিহিত রয়েছে। এই হলো *প্রত্যক্ষাবগমম্* কথার তাৎপর্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'সেখানে সেখানে' নয়, *'এখানে এখানে'*। এই সত্যকে যথার্থ বোঝার জন্য, গ্রহণ করবার জন্য এবং

এর দ্বারা উপকৃত হবার জন্য—'এখানে এখানে'—এই ক্রিয়াবিশেষণটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, *ধর্ম্যম্*, '*ধর্মের* সঙ্গে তা অবিচ্ছিন্ন'। এর অর্থ, এই বিশেষ আধ্যাত্মিক সত্যটি সমাজের শক্তিবৃদ্ধি করবে, মানবিক সম্পর্কের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে। এমন কিছু কিছু ধর্মীয় আচার আছে, যা সমাজের ক্ষতি করতে পারে, মানবিক সম্পর্ক শিথিল করতে পারে। বাস্তবিক, নানারকমের সস্তা বাতিকগ্রস্ত দর্শন আছে, যা সমাজের ক্ষতি করতে পারে। শুনেছি, একজন মহিলার নাকি যখন-তখন নানারকমের দর্শন হয়। তাঁর শিশু সন্তানও আছে। তাকে ফেলেই তিনি ভজনের আসরে যান। এক্ষেত্রে বাড়িতে তাঁর শিশু সন্তানের দেখাশোনা করবে কে? সে বিষয়ে ওই মায়ের ভ্রুক্ষেপ নেই। এটি *অধর্মের* কাজ। এতে সমাজকে ভুগতে হয়। আপনার হয়তো কিছু অনুভূতি হলো, কিন্তু তার জন্য সমাজকে খেসারত দিতে হলো। যে শিক্ষার ফলে সমাজকে ভুগতে হয় না, সেই শিক্ষাকেই বলা হয় *ধর্ম্যম্* এবং অধ্যাত্মজগতের মহান আচার্যরা সর্বদা সেই শিক্ষাই দিয়ে থাকেন। তাঁদের শিক্ষা ও বাণী সমাজকে শক্তিশালী করে, মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ভিতকে দৃঢ়তর করে। গীতায় বারবার *ধর্ম্যম্ এবং অমৃতম্* (অর্থাৎ অমৃতত্ব) এই দুটি শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে এই ভাবটি পাব আমরা। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমার শিক্ষা হলো *ধর্ম্যম্* এবং *অমৃতম্* দুই-ই।' এই শিক্ষা গ্রহণ করলে আপনি সুস্থ সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠবেন, কারণ এই শিক্ষা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে দৃঢ়তর করে। ধর্ম্যম্ এবং অমৃতম্, এই দুটিকে গ্রহণ করলে সেই সঙ্গে আপনার অন্তর্নিহিত অবিনশ্বর দৈবসত্তার অনুভূতিও হবে। কোন কোন ধর্ম শুধু 'অমৃতম্'-এর ওপরই জোর দেয়। রহস্যমূলক, পারলৌকিক ধর্মগুলি তাই করে। অন্যরা কেবলমাত্র ধর্মম্ বা পার্থিব দিকটিকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে—তাদের লক্ষ্য একজন ভালো নাগরিক, একটি ভালো সমাজ গড়ে তোলা। মহত্তর অনুভূতি নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে আবার বলছেন, তাঁর বাণী হলো *ধর্ম্যম্* এবং *অমৃতম্* দুই-ই। বাস্তবিক, সংহত বা পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিকতায় দুটিরই গুরুত্ব আছে। আপনি সমাজে কাজ করছেন, আপনার দায়িত্ব পালন করছেন এবং সেই সঙ্গেই ধীরে ধীরে আপনার নিজের দৈব সত্তাটিকে উপলব্ধি করছেন। কী চমৎকার ধারণা এবং সমন্বয়, একবার ভেবে দেখুন তো! বাইরের জগতেও আপনি চলছেন, কিন্তু অন্তর্জগতেও আপনার চলা থেমে নেই। আপনার শাশ্বত স্বরূপ যে আত্মা, তারই দিকে আপনি শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে

চলেছেন। এই ভিতরের ও বাইরের যে যুগ্মযাত্রা তাকে সমন্বিত করে *ধর্ম্যম্* এবং *অমৃতম্*। বাহ্য কর্মের দ্বারা আপনি সমাজকে শক্তিশালী করেন, তাকে সমৃদ্ধ করেন। আবার অন্তরাভিমুখী যাত্রার দ্বারা আপনি আপনার অবিনশ্বর সত্তাকে উপলব্ধি করেন। একটি হলো *ধর্ম্যম্*, অন্যটি হলো *অমৃতম্*। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি তোমাকে এমন এক দর্শনের কথা বলব, যা *প্রত্যক্ষাবগমম্ ধর্ম্যম্*'। মনে হতে পারে যে, এই পথের যখন এত সব অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, তাহলে এই পথ অবশ্যই খুব কঠিন হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, না—মোটেই তা নয়, *সুসুখং কর্তুম্*, তা 'সহজসাধ্য'। যে জিনিসটি এখানে লক্ষ্য করবার তা এই যে, ধর্মের নামে এখানে কোন অর্থহীন বাক্য প্রয়োগ করা হয়নি, তুকতাক বা জাদুর কথা বলা হয়নি। কিছু কিছু মানুষ এমন ধর্ম চান, যা রহস্যময়, দুর্বোধ্য। তাঁদের কাছে গিয়ে আপনি যদি সহজকথা সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন, তাঁরা বলবেন, একি কোন ধর্ম হলো? ধর্ম তো বাপু অত সহজব্যাপার নয়! আমি বরং অন্য আচার্যের কাছে যাব, যিনি আমাকে রহস্যজনক ও দুর্বোধ্য কিছু বলবেন। তখনই আমার তৃপ্তি হবে, তার আগে নয়। এই হলো ধর্ম সম্পর্কে অনেকের ধারণা। বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমি এরকম বহু লোক দেখেছি যাঁরা সহজ সরল সত্য চান না। তাঁদের অবস্থা আমাদের গ্রামের সাধারণ মানুষের মতো, যারা ডাক্তারের কাছে এসে যদি দেখেন যে ডাক্তারবাবু একটি ছোট্ট বড়ি ওষুধ দিয়েছেন, তাহলে বলেন, 'না, আমাকে ইঞ্জেকশন দিন।' ধর্মের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু মানুষের মনোভাব এরকমই। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, পরিণত বুদ্ধির মানুষই সেই পথকে বুঝতে এবং গ্রহণ করতে পারেন, যে পথ *সুসুখং কর্তুম্*, অর্থাৎ 'সহজসাধ্য', অতি সরল। তবে শুধু সহজ বলেই যে এ পথের মূল্য, তা নয়। এই পথ *অব্যয়ম্*, এ পথে যে ফললাভ হয় তা 'শাশ্বত', 'অক্ষয়'।

এই নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে গভীর তত্ত্ব বলতে যাচ্ছেন, এ হলো তার ভূমিকা। এখানে তিনি বলবেন—জীবন, কর্ম ও পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গিয়ে এখানেই, এ জন্মেই আমাদের চরম অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করতে হবে। সব মানুষের কাছেই এই বিশ্বজনীন দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

একদল মানুষ আছে যারা ধর্মের মধ্যে কেবল রহস্য ও জাদু খোঁজে। ধর্ম বলতে তারা ঐসবই বোঝে। নিজের জীবনের একটা অভিজ্ঞতা বলি। ১৯৪৪ সালে এক বন্ধুর সঙ্গে আমি করাচি থেকে কাশ্মীর যাই। শ্রীনগরে কিছুদিন থাকার সময় এক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়; তিনি ছিলেন এক গুরুর

শিষ্য। তার সঙ্গে বসে একদিন চা খাচ্ছি। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একটি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, 'আমার গুরুদেব আমাকে একটি মন্ত্র দিয়েছেন এবং ধ্যানের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "ধ্যানের সময় তোমাকে অতি অবশ্যই ৩৫০০০ চক্কর লাগাতে হবে"। স্বামীজী, আমি খুব চেষ্টা করছি, কিন্তু ২৫০০০-এর বেশি পারছি না।' তাঁর কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝলাম না। ধ্যানের মধ্যে আবার চক্কর কী? বিজ্ঞানের কিছু দুর্বোধ্য কথা হয়তো সেই গুরুদেব তাঁর শিষ্যকে বলে থাকবেন এবং শিষ্যও তাতে খুব খুশি। সে যাই হোক, আমি তাঁকে কোন উত্তর দিতে পারিনি। কিছু কথাবার্তার পর আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিই। শঙ্করাচার্য পাহাড়ের কাছে যেতেই দেখি কতকগুলি শিশু একটি গাছে ঢিল ছুঁড়ছে এবং সেই ঢিল গিয়ে একটা বড় মৌচাকে লাগতেই মৌমাছিগুলি ওড়াওড়ি শুরু করলো। আমরা ভেবেছিলুম, আমরা নিরাপদেই স্থানটি অতিক্রম করে যেতে পারব। কিন্তু অনতিবিলম্বেই একটি মৌমাছি এসে আমাকে কামড়ালো এবং আর একটি মৌমাছি আমার বন্ধুর ঘাড়ের পিছনে কামড় দিল। আমরা মৌমাছিগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে পথ চলতে লাগলাম, যেন গুরুতর কিছুই ঘটেনি। প্রথমে মিনিটখানেক কোন অসুবিধাই হলো না। কিন্তু তারপরেই আমরা প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করলাম; মাথার যন্ত্রণাও শুরু হলো। তখন বন্ধুটি আমার দিকে ফিরে কৌতুক করে বললেন, 'এবার চক্করের ৩৫০০০ পূর্ণ হয়েছে মনে হচ্ছে'!

অতএব, *সুসুখং কর্তুম্* এবং *অব্যয়ম্* এই শব্দদুটির মানে 'সহজসাধ্য অথচ অক্ষয় ফলপ্রদ'। ভগবানকে ভালোবাসা সহজ ব্যাপার এবং তার ফলও অনন্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন আমরা এ ব্যাপারে মনোযোগী হই না! নিজেকে আত্মা বলে উপলব্ধি করা সহজ-সরল ব্যাপার। এর মধ্যে লুকোবার কিছু নেই, রহস্যজনক দুর্বোধ্যতা কিছু নেই। কিন্তু না। অনেক মানুষ ধর্ম-জীবনকে যতদূর সম্ভব জটিল করে তুলতে চান। যা দুর্বোধ্য, সেটিই তাঁদের কাছে *ব্রহ্মবিদ্যা!* মানুষ সহজে যা বোঝে, এঁদের দৃষ্টিতে তা ব্রহ্মবিদ্যা হতে পারে না। কারণ, তার মধ্যে রহস্যজনক কিছু নেই, কোন ধাঁধা নেই। এই হলো সাধারণ মানুষের মোটামুটি ধারণা। মজার কথা এই, *ব্রহ্মবিদ্যা* কথাটিকে আমাদের দেশের অনেক ব্যাখ্যাকারও 'অবোধ্য বিষয়' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আদপেই তা নয়। *ব্রহ্মবিদ্যা* অতি সরল, সহজ বিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণ এখানে এই কথাই বলবেন। কিন্তু মানুষ শোনে এবং বলে যে, এসব তাদের মাথায় কিছুই ঢোকে না; আবার একই সঙ্গে তারা এ কথাও বলে যে, বিষয়টি অপূর্ব। না বুঝলেই অপূর্ব! কিন্তু 'অপূর্ব', 'বিস্ময়কর'

এইসব শব্দ দিয়ে আপনারা কী বোঝাতে চান? ধর্ম সম্পর্কে অনেক মামুলী ব্যাখ্যাই এই গোছের। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ধর্মকে জলবৎতরল করে উপস্থাপিত করে বলছেন, *প্রত্যক্ষাবগমম্,* এবং *সুসুখং কর্তুম্*। বাস্তবিক, ধর্মবিজ্ঞানে জাদু ও রহস্যের কোন স্থানই নেই।

ইতিহাসের যে সময়ে দেশ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, তখনই এইসব জঞ্জালকে আমরা ধর্মে স্থান দিয়েছি। কিন্তু আজ আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি। পরীক্ষণীয় এবং আদানপ্রদানের উপযুক্ত সত্য নিয়েই বিজ্ঞানের কাজ। উপনিষদ এবং গীতাতেও ধর্মের যে ব্যাখ্যা পাই, সেটিও অনুরূপভাবে বিজ্ঞানসম্মত, কারণ তা পরখ করে দেখা যায়। পৃথিবীর অন্য কোথাও এই উপদেশ পাবেন না, যেখানে বলা হয়েছে—মানুষ স্বরূপত নিত্যমুক্ত, নিত্যশুদ্ধ আত্মা এবং প্রতিটি মানুষই তা উপলব্ধি করতে পারে। এই কথা *বৃহদারণ্যক উপনিষদেও* পাই ঃ *ঔপনিষদং পুরুষং প্রচ্ছামঃ।* শিষ্য আচার্যকে প্রশ্ন করছেন, 'উপনিষদে যে মহান *পুরুষ*-এর কথা বলা হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।' শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন ঃ *উপনিষৎসু এব বিজ্ঞায়তে, ন অন্যত্র,* 'একমাত্র উপনিষদেই এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, অন্য কোথাও নয়।' আজ তাই ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের লক্ষ লক্ষ মানুষকে এই শিক্ষা অনুপ্রাণিত করছে। কেন? তা এই কারণেই যে, এ হলো এমন এক সরল আধ্যাত্মিক শিক্ষা, যা বলে, 'তোমার অন্তরেই দৈব সত্তা নিত্য বিরাজমান; তাকে প্রকাশ কর'। এই শিক্ষাই এখন দেওয়া হচ্ছে অর্জুনকে, যিনি সবরকম অসূয়া (ঈর্ষা) থেকে মুক্ত; *অনসূয়বে,* 'তোমাকে, যার মনে কোন ঈর্ষা নেই'—কারণ এইরকম মনই আত্মাকে প্রকাশ করতে পারে। ছাই চাপা থাকলে আগুন প্রকাশিত হতে পারে না। ছাই সরিয়ে দিন, আগুন আপনিই প্রকাশিত হবে। আমিও তাই করি না কেন? এপথে চলা তো সহজ ঃ *সুসুখং কর্তুম্।* তবে চেষ্টা চাই এবং এ চেষ্টায় লাভও আছে। আপনি দেখতে পাবেন আপনার চেষ্টার ফল ফলছে। আপনি ক্রমশই উন্নত হচ্ছেন। যখন কারও মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তন আসে, তখন স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গেও এক সুখের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এইভাবেই গীতার শিক্ষাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি, যাচাই করতে পারি। যদি তা করি, তাহলে হাতে হাতে তার ফলও পাই। কী সেই ফল? মানুষে-মানুষে সুখের সম্পর্ক, মানসিক শান্তি ও শক্তি, হৃদয়ে ভালবাসার সঞ্চার। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন ঃ *প্রত্যক্ষাবগমম্, ধর্ম্যম্, সুসুখং কর্তুম্ অব্যয়ম্।* এর ফল হলো অসীম।

কয়েক বছর আগে কলকাতায় কয়েকজনের সঙ্গে এক সান্ধ্য বৈঠকে কিছু কথা বলেছিলাম। আলোচনার জন্য সেদিন যে বিষয়টি আমি বেছে নিয়েছিলাম তা হলো, 'Ecstasy in daily life' অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে আনন্দ। সকলেই বিষয়টি উপভোগ করেছিলেন। প্রশ্ন হলো—প্রাত্যহিক জীবনকে কীভাবে আমরা আনন্দমণ্ডিত করে তুলতে পারি? এখন, যে আনন্দোচ্ছ্বাস বা দিব্যানন্দের কথা আমি বলছি, সেটি হলো এক আশ্চর্য অনুভূতি। এই তীব্র আনন্দের অনুভূতি হলে সব পার্থিব আকর্ষণ আপনার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। মদ খেয়ে বা অন্য নেশা করেও আপনি আনন্দ পেতে পারেন। সেও একধরনের আনন্দের অবস্থা। কিন্তু আনন্দের ঐ উচ্ছ্বাস বিপজ্জনক এবং পরিণামে ক্ষতিকারক। এই আনন্দের উদ্বোধন ঘটানোর জন্য এক অধ্যাত্ম প্রক্রিয়াও আছে। তাকে ভক্তি বলা হয়। এই বিশেষ অধ্যায়ে সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে। এই পৃথিবীতে বাস করেই, এই জন্মেই আমাকে ভালোবাসতে হবে সেই পরমেশ্বরকে, যিনি আমার এবং সকল জীবের হৃদয়ে নিত্য বিরাজমান। আমার সমস্ত কর্ম আমি যেন তাঁকেই সমর্পণ করি। এইভাবে যখন আমরা আধ্যাত্মিকতার সাধন করি, তখন সারাটা দিন এক আনন্দের ভাবে আমরা বিভোর হয়ে থাকি। একজন গৃহবধূ যদি এভাবে জীবনযাপন করেন, তাহলে উদয়াস্ত সংসারের কাজ করেও তিনি আনন্দে থাকবেন। ঐ আনন্দের উৎস *ভক্তি*, অন্তর্যামী ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, সামান্য একটু অধ্যাত্মসাধনার মাধ্যমেই আমরা যার স্পর্শ পেয়ে থাকি। ক্ষণিক এই সুখস্পর্শও আমাদের মনকে উচ্চভূমিতে তুলে দিতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে আনন্দ বলতে এই বোঝায়। ভারতবর্ষে ভক্তিসাধনার যে মহান শিক্ষা প্রচলিত আছে তা এই কারণেই, যাতে আমরা আনন্দ আস্বাদন করতে পারি। ভক্ত দেখবেন সদানন্দ। গভীর ভাবের সঙ্গে তাঁরা ভজন করেন, একবার লক্ষ্য করে দেখবেন। পুব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে, ভারতের বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন মহান কবি এবং গায়কদের রচিত গানের মধ্য দিয়ে কী সুন্দর আনন্দের স্ফুরণই না ঘটে! অদ্ভুত আনন্দের ভাব তাঁদের গানে। তাঁদের সমস্ত অনুভূতি তাঁরা যেন গানে ঢেলে দিয়েছেন। এইগুলি থেকেই আজ আমাদের প্রেরণা নিতে হবে। চরিত্রের পরিবর্তন, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং তা তখনই ঘটবে যখন একটি মহৎ সত্য আমাদের জীবনে প্রবেশ করবে। সেই সত্যটি কী? তা হলো প্রেমস্বরূপ ঈশ্বর স্বয়ং। সর্বব্যাপী ঈশ্বর আমাদের জীবনে একবার প্রতিষ্ঠিত হলেই আমাদের সবকিছু পাল্টে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, 'শূন্যের পর শূন্য বসিয়ে যাও, তাদের আদৌ

কোন মূল্য নেই; কিন্তু যখনই তুমি তাদের আগে একটা '১' বসাবে, তখনই সবকিছু মূল্যবান হয়ে উঠবে।' তখন যত শূন্য বসাবে ততই তার মূল্য বেড়ে যাবে।

গীতায় যে মহান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার মর্মার্থ ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারলে দৈনন্দিন জীবন মধুময় হয়ে উঠবে। গীতা অনুসরণ করে চললে আমরা প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিকতা ও আনন্দের এক একটি কেন্দ্রে পরিণত হব। ঈশ্বর *আনন্দ-স্বরূপ* বলে সেই আনন্দের সামান্য স্পর্শ আমরাও পাব। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ* ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—*রসো বৈ সঃ।* 'তিনি যথার্থই *রস*', অর্থাৎ 'আনন্দ' এবং সেই আনন্দের সামান্য স্পর্শও সংসারে আবদ্ধ আমাদের মতো সব মানুষকে যথার্থ সুখী করতে পারে। সেই *রস* আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। এবার শ্রীকৃষ্ণ সরাসরি আমাদের এই রসের অন্বেষণে ব্রতী হতে বলছেন। এতদিন এই রস খাবারদাবার বা ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়গুলির মাধ্যমেই আমাদের কাছে আসছিল। এই যে আনন্দ, তা ঐ মূল আনন্দেরই ছিটেফোঁটা। শ্রীকৃষ্ণ এখন তাই আমাদের আহ্বান করে বলছেন—যিনি সর্বরসের উৎস, সেই পরম ঈশ্বরের কাছে সরাসরি চলে যাও। খুবই কার্যকর উপদেশ, সন্দেহ নেই। একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন, সেখানে ৫৫ সংখ্যক যে শ্লোকটি আছে, সে সম্পর্কে শঙ্করাচার্য বলছেন—*অধুনা সর্বস্য গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতঃ অর্থো নিঃশ্রেয়সার্থঃ অনুষ্ঠেয়ত্বেন সমুচ্চিত্য উচ্যতে,* 'মানুষকে এই পৃথিবীতে এবং ইহজীবনেই আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভের পথপ্রদর্শক সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সারবস্তুটি জানানোর উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন', (গীতা ১১।৫৫)

মৎকর্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মাম্ এতি পাণ্ডব ॥

কী সহজভাবে বলে দিচ্ছেন! 'হে অর্জুন, যিনি আমার উদ্দেশ্যেই সব কাজ করেন, যিনি আমাকেই জীবনের পরম লক্ষ্যরূপে বরণ করেছেন, যিনি আমার ভক্ত, যিনি সব আসক্তি থেকে মুক্ত, যিনি কারও প্রতি কোন বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না, তিনিই আমাকে উপলব্ধি করতে পারবেন।' তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এ এমন এক শিক্ষা, যাকে আমরা এ জীবনেই কাজে লাগাতে পারি। আমাদের সাহিত্য, পুরাণ এবং অজস্র স্তোত্র এ ব্যাপারে আমাদের প্রভূত প্রেরণা দিতে পারে। জাদু বা অলৌকিকতার পিছনে ছোটাছুটি না করে আমাদের উচিত এখন এই বিশেষ শিক্ষাটির প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং সে দিক থেকে গীতা

আমাদের কাছে এক অপূর্ব পথপ্রদর্শক। এ পথের সন্ধান দিতে গিয়ে ভূমিকা হিসাবে গীতা আমাদের দুটি শ্লোক উপহার দিয়েছেন যা আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি, সেখানে বলা হয়েছে, *প্রত্যক্ষাবগমম্*— 'এই রাজবিদ্যা সাক্ষাৎ ফলপ্রদ' অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনেই এই শিক্ষা অনুসরণ করা সম্ভব। এ এমন এক উপলব্ধি, যা আপনার দৈনন্দিন জীবনাচর্যাকে অনুপ্রাণিত করবে। এ এমন এক আহ্বান, যাতে সাড়া দিয়ে হয় আমরা তার সত্যতা যাচাই করে দেখব, নয়তো তার মিথ্যাত্ব প্রমাণ করব। দুটির একটি করতেই হবে। এই শিক্ষাকে যদি আমি মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারি, যা করার সম্ভাবনাই বেশি, তাহলে বুঝতে হবে আমি তার উপযুক্ত নই। সব বিজ্ঞানীর সামর্থ্য এক নয়। একটি বৈজ্ঞানিক সত্যকে কেউ হয়ত মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারেন, কিন্তু সেটা তাঁর পরীক্ষার পদ্ধতিগত ত্রুটির ফলেও ঘটতে পারে। অন্য বৈজ্ঞানিকরা, যাঁরা সঠিক পথে, সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়েছেন, তাঁরা বলতে পারেন যে, বৈজ্ঞানিক সত্য ঠিকই আছে, অমুকে বুঝতে ভুল করেছেন। অতএব, বৈজ্ঞানিক সত্য যাচাই এর ক্ষেত্রে বিরোধী প্রচেষ্টারও মূল্য আছে। অবশ্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সত্য যাচাই করে নেওয়াই সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। অতএব, গীতার শিক্ষাটি গ্রহণ করে তার সত্যতা আপনি যাচাই করতে পারেন, অথবা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করতে পারেন। কী করবেন, সে সিদ্ধান্ত আপনার। কিন্তু এই শিক্ষাকে সত্য বলে প্রমাণ করবার বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার যথেষ্ট যোগ্যতা আপনার আছে কিনা, তা আগে ভালো করে বিবেচনা করুন। যদি যথার্থই আপনার সে যোগ্যতা থাকে তাহলে আপনিও এর সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন, কারণ আপনার আগে আরও অনেকে এর সত্যতা প্রমাণ করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবম্ আগতাঃ*, '*জ্ঞান তপস্যার* দ্বারা আরও অনেকে এই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, সকল আপেক্ষিকতাকে অতিক্রম করেছেন'। *জ্ঞান তপস্যা, ভক্তি তপস্যা;* চরম পর্যায়ে দুই-ই সমান। *জ্ঞান-বিজ্ঞান* সম্পর্কিত নবম অধ্যায়ের সূচনায় এই প্রতিশ্রুতি আমাদের দেওয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয় শ্লোকে *প্রত্যক্ষাবগমম্* শব্দটির ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। *প্রত্যক্ষাবগমম্* অর্থাৎ 'দৈনন্দিন জীবনেই যা অনুভব করা সম্ভব'। সেই পরম ঈশ্বর আমাদের অন্তরাত্মা; তাই দৈনন্দিন জীবনের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁকে সবসময় আমরা মনে রাখতে পারি। এটা যে করা সম্ভব তা হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিস্টান ধর্মের বহু সাধকই নিজেদের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। এই শ্লোকটির

এটিই মর্মবাণী। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, 'সেখানে, সেখানে'—যেভাবে অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বর বা ধর্ম সম্পর্কে বলে থাকেন, তিনি যেন দূরের কোন বস্তু—তা হলো *অজ্ঞান।* যখন আমরা বলি, *এখানে-এখানে,* তখন সেটি *জ্ঞান। প্রত্যক্ষ অবগমম্* কথাটির এই হলো গুরুত্ব। যে-কোন খেটেখাওয়া মানুষই এই আধ্যাত্মিক সচেতনতার অধিকারী হতে পারেন। এই জ্ঞানে প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার। শুধু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের এই দেহ-মনের আড়ালে কোন মহামূল্যবান বস্তু লুকিয়ে আছে। আমাদের চোখ এবং ইন্দ্রিয়গুলি বাইরে ধেয়ে গিয়ে বাহ্য বস্তুগুলিকে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের ভিতরেও যে সত্য লুকিয়ে রয়েছে, তাকে খুঁজে বার করার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। তা যদি করতে পারি, তাহলেই বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্ভব হবে এবং তখনই আমাদের বাইরের জীবনটিও আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। *প্রত্যক্ষাবগমম্,* কথাটির এইখানেই গুরুত্ব। ভগবান যদি 'সেখানে', তথাকথিত কোন দূর দেশে থেকে থাকেন, তবে আমরা কখনওই তাঁকে *প্রত্যক্ষাবগমম্*-এর বিষয় করতে পারব না। *কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর বিশুদ্ধ চৈতন্য-রূপে সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন, তাই আমরা তাঁকে এই পৃথিবীতে, এই জীবনেই, আমাদের দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারি।* এই হলো গীতার বাণীর মাহাত্ম্য। এই বাণী সকলের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য—যেমন কর্মনিষ্ঠ মানুষের পক্ষে, তেমনি আবার কর্মত্যাগী তপস্বীর পক্ষেও। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব যে, কর্মনিষ্ঠ মানুষের জন্যই যেন এই বাণী বিশেষ করে দেওয়া হয়েছে। 'আধ্যাত্মিক জীবন' মানে যে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া, এটি অবশ্যই আমাদের বুঝতে হবে। এই চেতনা যাদের নেই, তারা দূরদৃষ্টিহীন, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নেই তাদের। লক্ষ্যবিহীন হয়ে কোনরকমে দিন গুজরান করাই তাদের কাজ। পরবর্তী শ্লোকে এই নিয়ে আলোচনা হবে।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

—'হে পরন্তপ, এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসহীন ব্যক্তিরা আমাকে লাভ না করে এই মৃত্যুময় পুনর্জন্মের পথে বারবার ফিরে আসে।'

যারা এই শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাহীন, এই শিক্ষার ফল সম্পর্কে যাদের কোন প্রত্যয় নেই, যারা নাস্তিক ধরনের মানুষ, যারা সংসারের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে ভাবে যে, যা ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়, তা-ই একমাত্র সত্য,

যারা সকলের অন্তরে নিহিত অপূর্ব সত্যের প্রতি বিশ্বাসহীন, *অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ*, 'সেই সব বিশ্বাসহীন মানুষ'; *ধর্মস্যাস্য*, 'এই ধর্ম সম্পর্কে' এই দর্শন সম্পর্কে বিশ্বাসহীন সেই সব মানুষ; *পরন্তপ*, 'হে অর্জুন'; *অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে*, 'আমাকে উপলব্ধি না করেই, আমাকে লাভ না করেই, তারা ফিরে আসে'। কোথায় ফিরে আসে? *মৃত্যু সংসার বর্ত্মনি*, 'এই মৃত্যুময় সংসারের পথে'। এই হলো অধ্যাত্মজগতের মূল ভাব। একদিক থেকে এই হলো সাধারণ মানুষের জীবন। কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা অনুভব করেন, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনটি জীবনের বাহ্যিক দিকমাত্র। এছাড়াও জীবনে অন্য একটি গভীরতর সত্য রয়েছে। উপনিষদের ঋষিরা সেই গভীরতার অনুসন্ধানকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মানুষের ব্যক্তিত্বের সেই গভীরতর মাত্রাটি কী? ওপর থেকে দেখলে দেহকেন্দ্রিক ও স্থূল সুখভোগাকাঙ্ক্ষায় স্থাপিত অহং-কেই ব্যক্তিত্ব বলে মনে হবে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অনন্ত আধ্যাত্মিক একটি দিক আছে। সেটিকে অনুভব করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। *হিতোপদেশে (মিত্রলাভ, ২৫)* বলা হয়েছে ঃ 'খাওয়া, পান করা এবং ইন্দ্রিয়ভোগের ব্যাপারে মানুষ আর পশুতে কোন তফাৎ নেই'। শুধু মানুষ কিছুটা মার্জিত রুচির সঙ্গে এগুলি করতে পারে, এই পর্যন্ত। অন্যথায়, এই সব কাজের ক্ষেত্রে মানুষও যেমন, পশুও তেমন। তাহলে কোন্ দিক থেকে মানুষের অনন্যতা? তার *ধর্ম*, যা প্রকৃতির এবং আত্মস্বরূপের অন্বেষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি এই বৈশিষ্ট্যটি সরিয়ে নেওয়া যায়, তবে মানুষ এবং পশু এক হয়ে গেল। বলা হয়েছে, *ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ*, 'জীবন থেকে *ধর্মকে* সরিয়ে নিলে মানুষ পশুর সমান হয়ে যায়'। এ হলো *হিতোপদেশ*-এর সিদ্ধান্ত। এই পরিণতি কাম্য নয়। যদিও আমরা মস্তিষ্করূপ এক মহৎ সম্পদের অধিকারী, তবুও আমরা আজকাল দেখতে পাই বহু নরনারীই পশুর স্তরে রয়েছে—বলা যায় শিকার-সন্ধানী পশুর মতো জীবনযাপন করে তারা। অন্যকে প্রতারণা করে, নির্বিচারে জীবজন্তু হত্যা করে এবং প্রকৃতিকে ধ্বংস করে। কিন্তু যদি তারা তাদের শক্তির অতি সামান্য অংশ খরচ করেও তাদের অন্তরের এই উচ্চতর আধ্যাত্মিক পরিচয়টির অনুসন্ধান করতো, তাহলে এই তারাই সৃষ্টিধর্মী এবং ইতিবাচক মানুষে রূপান্তরিত হতে পারতো। এই ভোগবাদী সভ্যতায় অধিকাংশ মানুষই আরও বেশি বেশি পার্থিব সম্পদ উপভোগ করতে চান এবং তার ফলে পৃথিবী থেকে অরণ্য সম্পদ এবং এমনকি পশু-পাখিরাও লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এইভাবেই মানুষ প্রকৃতির শত্রু হয়ে উঠছে এবং পরিশেষে

নিজের শত্রুও। আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংস করছি। কিন্তু কোন পশু প্রকৃতিকে নষ্ট করে না। তারা প্রকৃতির মধ্যেই বাস করে, তারা প্রকৃতিরই অঙ্গ। প্রকৃতিকে ধ্বংস করার বা তার উৎকর্ষ বিধানের ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে। কিন্তু যেহেতু মানুষ শুধুমাত্র তার দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই চিন্তিত, তাই সে হয়ে উঠেছে প্রকৃতির ধ্বংসকর্তা। মাথায় দেওয়ার জন্য বা টুপির শোভাবর্ধনের জন্য সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিদিন কত পাখিরই না মৃত্যু ঘটানো হয়! তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, *অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ,* 'হে অর্জুন, এই মহান *ধর্মের* প্রতি যাদের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নেই'। এই ধর্ম কী বলে? এই ধর্ম বলে যে, দেহমনের অতিরিক্ত এক উচ্চতর সত্তা আমাদের আছে; বলে যে, আমাদের সত্যিকারের প্রকৃতিটি হলো আধ্যাত্মিক এবং তা আমাদের সকলের মধ্যেই এক এবং অভিন্ন। এই ধর্ম আরো বলে যে, আমাদের সকলের মধ্যেই সেই এক ঈশ্বর লুকিয়ে আছেন। যারা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না, তাদের কী পরিণতি হয়? *অপ্রাপ্য মাম্,* 'তারা আমাকে পায় না'; যে আমি সকলের অন্তরে প্রত্যগাত্মারূপে বিরাজমান, সেই বিশুদ্ধ অনন্ত চৈতন্যকে তারা লাভ করতে পারে না; এবং *নিবর্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্ত্মনি,* 'তারা এই সংসারে ফিরে ফিরে আসে, যে-সংসার মৃত্যুময়, অর্থাৎ পরিবর্তনশীল ও বিনাশশীল।' এই জন্ম-মৃত্যুর বিবর্তনচক্রে তারা বারবার ঘুরপাক খায়। তৃতীয় শ্লোকের এইটিই বক্তব্য।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

—'এই বিশ্ব আমার অব্যক্ত মূর্তির দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে; সকল জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাদের কারও মধ্যেই (স্বতন্ত্রভাবে) অবস্থান করি না।'

আমি এই সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে আছি। *ময়া ততম্ ইদং সর্বম্,* 'এই ব্যক্ত বিশ্ব সম্পূর্ণভাবে আমার দ্বারাই পূর্ণ'। *ততম্,* মানে 'পরিব্যাপ্ত', অর্থাৎ 'সেই অনন্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত'। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন ঃ এই সৌরজগৎ কি কোন অদৃশ্য মৌল পদার্থের দ্বারা আকীর্ণ হয়ে আছে? এমন কি আধুনিক নভোবস্তুবিদ্যাও বলে থাকে যে, সেই আদিম মৌল পদার্থ, যা একদা বিস্ফোরিত হয়ে এই বিশ্বের রূপ নিয়েছিল, তা *এখনও* এই বিশ্বে

বিদ্যমান। সেই পদার্থ, যা আদিতে ছিল, আজও তা সমগ্র বিশ্বতে অনুস্যূত হয়ে আছে। তা যদি *সেখানে* না থাকত, তবে *এখানেও* থাকত না। কারণের মধ্যে যা নেই, কার্যের মধ্যে তা কখনওই প্রকাশিত হতে পারে না। কোন কিছুই আকাশ থেকে পড়ে না। কারণই কার্যরূপে ব্যক্ত হয়। একটা কোন কিছু থাকলে, তবেই তা থেকে আর একটা কিছুর সৃষ্টি হয়। এইভাবেই আমাদের মহান আচার্যরা এই সত্য আবিষ্কার করেছেন যে, সমগ্র বিশ্ব শুদ্ধ, অনন্ত, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। ব্রহ্মই এই বিশ্বের সবকিছুর অন্তরাত্মা। একটি জীবকোষের কথাই ধরুন, তার মধ্যেও রয়েছে এই অনন্ত চৈতন্য। কোষের সব কাজকর্ম এবং প্রক্রিয়া তার দ্বারাই পরিচালিত হয়। অতএব, এই চৈতন্য হলো *ততম্*, অর্থাৎ 'সর্বত্র পরিব্যাপ্ত'। এ হলো এক অচিন্ত্যনীয় সত্য এবং যা আমি আগেই বলেছি, আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ধীরে ধীরে এই সত্যের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে—বিজ্ঞানীরা বুঝতে চলেছেন যে, জড় বস্তু নয়, বিশ্বের পিছনে রয়েছে এক সনাতন চৈতন্যসত্তা। বেদান্তও তাই বলে। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, *ময়া ততম্ ইদং সর্বম্।* শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সেই অনন্ত চৈতন্যসত্তার সঙ্গে একীভূত করেছেন এবং জগতের মঙ্গলবিধানের জন্য ঈশ্বরাবতার রূপে মানব-শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন। বলছেন—'সবকিছুই আমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত', *ময়া ততম্ ইদং সর্বম্।* আমার স্বরূপটি কী? তার উত্তরে বলছেন, *জগদ্ অব্যক্ত মূর্তিনা,* 'এই জগতে আমি অব্যক্তমূর্তি ধারণ করে আছি।' বাস্তবিক, আপনি কোন একটি বস্তুকে কেটে ফেললেও, সেখানে অনন্ত চৈতন্যকে দেখতে পাবেন না, যদিও তা সেখানেই বিরাজ করছে, তবে অপ্রকাশিত অবস্থায়। তাই বলা হচ্ছে *অব্যক্তমূর্তি।* কোন ইন্দ্রিয় তাকে খুঁজে পায় না। শঙ্করাচার্য এই অর্থই করেছেন। বিজ্ঞানীও আজ এই সত্যের অনুসন্ধান করছে। কী সেই *অব্যক্তমূর্তি,* যা জড়বস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে? প্রচণ্ড চেষ্টার ফলে বৈজ্ঞানিকরা আজ দেখতে পাচ্ছেন, কত নতুন নতুন সত্য লুকিয়ে আছে সামান্য একটি জড়বস্তুর ভিতরেও। এ ব্যাপারে আণবিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কার হলো এই যে, চৈতন্যও এই পার্থিব জগতের এক অপরিহার্য অংশ—তার ভূমিকা দ্রষ্টার। এ তো সবে শুরু। অনুসন্ধান অব্যাহত রাখলে তাঁরা একদিন অবশ্যই সেই পরম সত্যে উপনীত হবেন, যা শ্রীকৃষ্ণ এখানে এই শ্লোকে বলেছেন। এই *অব্যক্তমূর্তি* হলো 'অনন্ত অপ্রকাশিত পরম চৈতন্য', যা প্রতিটি বস্তুর মধ্যে বর্তমান। কিন্তু তাকে দেখতে গেলে অন্তর্দৃষ্টি বা অন্তর্ভেদী দৃষ্টিশক্তি চাই। একমাত্র ঐ দৃষ্টির সাহায্যেই আমরা তাকে যেমন

প্রকৃতির মধ্যে, তেমনই মানবসত্তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে পারি। প্রকৃতির মধ্যে তাকে আবিষ্কার করার চেয়ে, মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তাকে খুঁজে পাওয়া অনেক বেশি সহজ। বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে আমরা কেবল তার কিছু আভাস এবং সংকেত পেতে পারি মাত্র। কিন্তু সেখানে তার হদিশ মিলবে না। ভৌতবিজ্ঞান, এমনকি জীববিজ্ঞানেরও ঐ এক দশা। একবার ভেবে দেখুন, কীভাবে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি গড়ে ওঠে? কীভাবে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমশ ফুটে উঠতে থাকে? ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সব কিছুই কেমন সুপরিচালিত, সুসংহত এবং পরস্পর সুসম্পর্কযুক্ত। এতকিছু বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা ঐক্য রয়েছে। এই ঐক্যের মূলে কিন্তু চৈতন্য, যা সবকিছুর মধ্যে বর্তমান। *অব্যক্তমূর্তি* বলতে এই সর্বব্যাপী চৈতন্যকেই বুঝিয়েছে। বাকি সব কিছু আমাদের কাছে স্পষ্ট। আমরা তাদের দেখতে পারি, নাড়াচাড়া করতে পারি, স্পর্শ করতে পারি। কিন্তু এই চৈতন্যকে আপনি চোখ দিয়ে দেখতে পাবেন না বা স্পর্শ করতে পারবেন না; তবে তার অস্তিত্ব আপনি *অনুভব* করতে পারেন, কারণ এই পার্থিব জগতের বহু ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই তাঁর পদচিহ্ন ধরা আছে। তাই বলছেন, *ময়া ততম্ ইদম্ সর্বম্ জগদ্ অব্যক্ত মূর্তিনা। জগৎ* কথার অর্থ 'নিত্য পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ড'। কৃষ্ণ বলছেন, 'আমি' এই জগতে অনুস্যূত হয়ে আছি। 'আমি' সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছি। *মৎস্থানি সর্বভূতানি,* 'সকল জীব ও বস্তু আমাতেই অবস্থান করছে'। *ন চাহং তেষু অবস্থিতঃ,* 'কিন্তু "আমি" তাদের মধ্যে নেই।' 'তারা আমাতে অবস্থান করে, আমি তাদের মধ্যে অবস্থান করি না', এর অর্থ এই যে, 'আমি' তাদের কারও মধ্যেই পৃথকভাবে অবস্থান করি না। 'আমি' সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। অতএব, *মৎস্থানি সর্বভূতানি,* 'সকল জীব আমাতেই অবস্থান করছে', আমাকে ছাড়া তাদের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কিন্তু তারা কেউই আমাকে সার্বিকভাবে তাদের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। এই হলো সেই অসীম সত্যের স্বরূপ। পরবর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ আরও কিছু বলবেন, যা আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী বলে মনে হওয়াও সম্ভব :

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

—'জীবগণও (বাস্তবিক) আমাতে অবস্থান করে না, আমার এই ঈশ্বরীয় যোগ দর্শন কর। সকল জীবের স্রষ্টা এবং পালনকর্তা হলেও আমার সত্তা তাদের মধ্যে অবস্থান করে না।'

ন চ মৎস্থানি ভূতানি, 'ভূতসকল আদৌ আমাতে অবস্থিত নয়'; *পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্,* 'আমার এই *ঈশ্বরীয় যোগ,* ঐশী শক্তি প্রত্যক্ষ কর।' এই যোগশক্তির প্রকৃতি কি? *ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থো মম আত্মা,* 'আমার স্বরূপ সকল জীবের পালন ও পোষণ করে, কিন্তু তবুও আমি তাদের কারও মধ্যে বাঁধা পড়ে নেই'। *ভূতভাবনঃ,* 'আমিই সেই একমাত্র সত্তা, যিনি এই বিশ্বের সকল জীবের পোষণ ও লালন পালন করেন।' এই সত্য যত সূক্ষ্ম হবে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি তত প্রকাশিত হবে; আবার, এই সত্য যত স্থূল হবে, ততই এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকাশের পথ অবরুদ্ধ হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই পার্থিব স্থূলশরীর একটি জায়গাতেই থাকতে পারে। একই সঙ্গে তা কখনই দুটি স্থানে থাকতে পারে না। বস্তু যতই স্থূল হয়, ততই তা স্থান ও কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যে বস্তু যত সূক্ষ্ম, তা স্থান ও কালের ওই গণ্ডীকে তত সহজে অতিক্রম করতে পারে। আর তাই, *ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।* শ্রীকৃষ্ণ পরে বলবেন ঃ এই *প্রকৃতি* হলো *মায়া।* আমি এই মায়াশক্তির সাহায্যে সবকিছুকে এমনভাবে সৃষ্টি করি যে, জাগতিক সবকিছুর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেও আমি নিত্যমুক্ত থাকি। এইসব সৃষ্টবস্তুর মাধ্যমেই সত্যসন্ধানী ব্যক্তি ধীরে ধীরে আমার সত্যস্বরূপকে আবিষ্কার করতে পারে। এই জগৎটা তোমার চোখের সামনেই পড়ে রয়েছে, বিশ্লেষণ করে দেখ না কেন, তাহলেই তুমি আমার সত্য প্রকৃতিকে আবিষ্কার করতে পারবে। একথা খুবই সত্যি যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিশেষভাবে মানুষের মধ্যেই এই সত্য সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত। বাহ্যপ্রকৃতির তুলনায় মানুষের অভিজ্ঞতার ওপরই তার আভাস স্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল। ঐ চিহ্নগুলি অনুসরণ করে করেই আপনি তাকে খুঁজে পেতে পারেন। উপনিষদে 'পদাঙ্ক অনুসরণ' বলে একটি অসাধারণ কথা আছে। গহন অরণ্যের মধ্যে একটি গরু হারিয়ে গেলে রাখাল তাকে খুঁজে বেড়ায়। এবং এই খোঁজার একটি বিশেষ পদ্ধতি হলো গরুটির পদচিহ্নের অনুসরণ করা। এইভাবে খুরের চিহ্ন অনুসরণ করে করে রাখাল একসময় দেখতে পায় যে গরুটি একটি জলাধারের কাছে গেছে। তখন সে গরুটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। অনুরূপভাবে, মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ওপর আত্মার চরণচিহ্ন ছড়ানো; এই চিহ্ন অনুসরণ করেই মানুষ একদিন সেই পরম সত্যকে আবিষ্কার করতে পারে। এই অর্থেই বলা হয়েছে, *মম আত্মা ভূতভাবনঃ,* 'আমার সত্তা এই বিশ্বের সবকিছুকে ধারণ করে রেখেছে'। পরবর্তী শ্লোকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে ঃ

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

—'মহাশক্তিসম্পন্ন সর্বত্র বিচরণশীল বায়ু যেমন সর্বদা আকাশে অবস্থান করে, তেমনি সকল প্রাণী আমাতেই অবস্থিত বলে তুমি জেনো।'

আবহমণ্ডলের সর্বত্রই বায়ুর অবস্থান, যেখানেই আপনি খোঁজ করবেন, বায়ুর সন্ধান পাবেন। ধর্মের ক্ষেত্রেও এইরকম, ঈশ্বরকে দেখার জন্য আপনাকে এখানে-সেখানে বা কোথাও যেতে হবে না। অক্সিজেন যেমন বাতাসের সর্বত্রই রয়েছে, তেমনি আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, ঈশ্বরও সেখানেই রয়েছেন। যেখানে, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, আপনি বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠতে পারেন। আপনি যদি বলেন, 'অক্সিজেন পাওয়ার জন্য আমি অমুক জায়গায় যেতে চাই', তাহলে সেটি যেমন হাস্যকর হবে, ঈশ্বরকে দেখার জন্যও এখানে ওখানে ছোটাছুটি করাও তেমনি নির্বুদ্ধিতার কাজ। অক্সিজেন 'এখানে'ও আছে। কেবল শ্বাস নিন, তাহলেই গোল মিটে গেল। ঠিক সেইভাবে এই আকাশও সর্বব্যাপী, সবকিছু ধারণ করে আছে, এমনকি বায়ুকেও যা *সর্বত্রগো মহান্*, 'সদা সর্বত্র বিচরণশীল এবং মহাব্যাপ্তিসম্পন্ন'। সম্ভবত পৃথিবীর ওপর কয়েকশত মাইল পর্যন্তই এই বায়ুর অস্তিত্ব। যদিও যতই ওপরে ওঠা যাবে, ততই বায়ুর ঘনত্ব কমে আসবে ও পাতলা হবে, তবুও সর্বত্রই বায়ু আছে। অবশ্য একটা সীমা অতিক্রম করে গেলে আর বায়ুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। মুক্ত মহাকাশে বায়ুর অস্তিত্ব নেই। তাই বায়ু নিতান্তই এক পার্থিব প্রপঞ্চ। এমনকি সৌর জগতের অন্যান্য গ্রহেও বিজ্ঞানীরা বায়ুর অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। এই পৃথিবীতেই বায়ুর যা কিছু অস্তিত্ব। সে যাই হোক, এখানে মূল কথাটি হলো, আমি, শ্রীকৃষ্ণ, ওই *আকাশের* মতো। *যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্*। ঠিক যেমন এই বায়ু *সর্বত্রগো*, অর্থাৎ 'সর্বত্রগামী' এবং *মহান্*, 'বিশাল'; *আকাশস্থিতঃ*, 'আকাশে অবস্থান করে'; *তথা*, 'তেমনি'; *সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানি ইতি উপধারয়*, 'সকল জীব আমাতেই অবস্থিত বলে জানবে।' যেমন বায়ু সর্বত্রগামী, প্রকৃতিতে বিশাল হয়েও তা আকাশে অবস্থিত, তেমনি সকল জীব আমাতেই অবস্থিত। এই সত্য অনুধাবন কর। *উপধারয়*, মানে 'যথাযথভাবে বোঝ।'

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

—'হে কুন্তীনন্দন, কল্প শেষ হলে সব জীব আমার প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়। পরবর্তী কল্পের প্রারম্ভে আমি আবার তাদের সৃষ্টি করি।'

হে অর্জুন, একটি *কল্প* শেষ হলে সকল জীব আমার প্রকৃতিতেই বিলীন হয়। একটি *কল্প* মানে ব্রহ্মার একটি দিন। কল্পান্তে সব জীব আমার কাছেই ফিরে যায়। আবার নতুন কল্প শুরু হলে তারা ফিরে আসে। প্রাচীন ভারতীয় তথা আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা এবং ভারতীয় বেদান্তেও ঠিক এই ধারণাই পোষণ করা হয়। সেমিটিক [আসিরীয়, হেব্রু, আরবীয় ইত্যাদি জাতির] চিন্তাধারায় স্থান ও কালের সীমাহীনতা স্থান পায়নি; এ ব্যাপারে তাদের ধারণা অত্যন্ত সীমিত। ভারতীয়রা কিন্তু অনন্তের ধারণা করেছে। বস্তুতপক্ষে, সময়ের এত চুলচেরা বিচার আর কোন দেশেই দেখা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় এক সেকেণ্ডের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে বলা হয় 'ত্রুটি' বা ন্যূনতা। প্রাচীন ভারতীয়রা কালের এইরকম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক একটি অংশের কথা বলেছেন। একথা ঠিক যে, এগুলি শুধু আণবিক হিসাবনিকাশের ক্ষেত্রেই কাজে লাগে। তবুও একথা স্বীকার করতেই হয় যে, প্রাচীন ভারতীয়রা 'ত্রুটি' অর্থাৎ এক সেকেণ্ডের এক দ্বাদশ-সহস্রাংশ সময়ের কথাও ভাবতে পেরেছিলেন। ত্রুটির মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়সীমার কথা যেমন তাঁরা চিন্তা করেছিলেন, তেমনি সময়ের অসীম ব্যাপ্তিও তাঁদের মানসলোকে ধরা পড়েছিল। কালের বিশালতার কথা বলতে গিয়ে আমরা যেমন লক্ষ লক্ষ বছরের কথা বলে থাকি, কল্পও সেইরকম একটি ধারণা। ব্রহ্মার এক দিন হলো একটি কল্প। কল্পের প্রারম্ভে এই সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হয় এবং দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যখন ব্রহ্মার রাত্রি আসে, তখন আবার এই ব্যক্ত বিশ্ব আগেকার *অব্যক্ত* অবস্থায় ফিরে যায়। ব্যক্ত ও অব্যক্ত—দুয়ের এই মধ্যবর্তী কালটিকে বলা হয় *কল্প*। নতুন কল্প শুরু হবার সময় এই বিশ্ব আবার ব্যক্ত হয়। *প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্। মামিকাম্* মানে 'আমার প্রকৃতি'। যে প্রকৃতিতে এই বিশ্ব লয় পায় তা হলো আমার নিজের *প্রকৃতি। কল্পক্ষয়ে* অর্থাৎ 'কল্পের শেষে'। *কল্পাদৌ পুনঃ তানি বিসৃজাম্যহম্,* 'কল্পের প্রারম্ভে আবার আমার থেকেই তাদের সৃষ্টি করি'। উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে, আমি তাদের অভিক্ষিপ্ত করি বা আবার মেলে ধরি—*বিসৃজামি*। কীরকম ভাবে? উপনিষদ বলেন, ঠিক যেমন করে একটি মাকড়শা তার নিজের ভিতর থেকেই তার জালটিকে টেনে বার করে, বাইরের কোন কিছু থেকে নয়। ভারতীয় দার্শনিকরা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি বোঝাতে গিয়ে মাকড়সার জাল তৈরির এই অসাধারণ দৃষ্টান্তটি দিয়ে থাকেন।

ব্রহ্ম থেকে এই জগত এসেছে, ব্রহ্মেই এই জগৎ অবস্থিত এবং এই ব্রহ্মেই আবার জগৎ ফিরে যায়। এই মহাবিশ্বর আদি, মধ্য এবং অন্ত যে এক ঐক্যসূত্রে বিধৃত, সে বিষয়ে বেদান্ত এবং আধুনিক বিজ্ঞান একমত।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

—'আমি নিজের প্রকৃতিকে বশীভূত করে, প্রকৃতির অধীনস্থ অসহায় এই সমস্ত ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করে থাকি।'

এইভাবে, নিজের প্রকৃতিকে বশীভূত করে, আমি বারবার এই বিশ্বকে ব্যক্ত করে থাকি, *প্রকৃতিং স্বাম্ অবষ্টভ্য বিসৃজামি*, 'আমি মেলে ধরি', *পুনঃ পুনঃ*, অর্থাৎ 'বারবার'। কত কত ব্রহ্মাণ্ড আগেও ছিল এবং পরবর্তিকালে আরও কত না হবে। আমরা এখন একটি বিশ্বে আছি। কিন্তু এই বিশ্বের আগেও অজস্র বিশ্বের অস্তিত্ব ছিল, আবার পরে আরও অজস্র বিশ্ব সৃষ্ট হবে। এসব আমরা এখন কল্পনাও করতে পারি না। তাই বলছি, বর্তমান এই বিশ্ব সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার একটি ক্ষুদ্র অধ্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়। *ভূতগ্রামম্ ইমং কৃৎস্নম্*, 'বিশ্বের এই সব *ভূতসমষ্টি*' আমিই ব্যক্ত করি এবং যথাসময়ে আবার টেনে নিই। *অবশম্*, 'এই বিষয়ে তাদের বলার কিছু নেই'। এ ব্যাপারে সূর্যের বলার কিছু নেই; নক্ষত্রগুলিরও বলার কিছু নেই; আবার আমাদেরও বলার কিছু নেই। আমরা যে বিশেষ পিতামাতার ঘরে জন্মেছি, সে বিষয়ে আমাদের বলার কিছু ছিল না। এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ *অবশম্*, অর্থাৎ 'পরনির্ভরশীল'। কেন আমরা স্বাধীন নই? কারণ *প্রকৃতেঃ বশাৎ*, আমরা 'প্রকৃতির হাতে'। প্রকৃতিই এসব ঘটায়। এই হলো বিশ্বের রকমসকম। *প্রকৃতেঃ বশাৎ*, 'প্রকৃতির প্রভাবে অসহায়'। একটু চিন্তা করলেই ব্যাপারটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, বুঝতে পারবো অবস্থাটা কী ভয়ঙ্কর! যখন আমি দেহধারণ করেছিলাম, তখন যেমন আমার কিছু বলার ছিল না, তেমনি যখন এই জীবদেহ ত্যাগ করে চলে যাব, তখনও আমার কিছু বলার থাকবে না। শুধু কিছু কালের জন্য এখন আমার বলার বা করার সামান্য স্বাধীনতা রয়েছে। এই সামান্য যে স্বাধীনতা, সেটুকু কেবল মানুষকেই দেওয়া হয়েছে, অন্য প্রাণীদের সেটুকুও নেই। একমাত্র মানুষই কিছুটা স্বাধীন; কিন্তু নির্দিষ্ট সীমার বাইরে মানুষ সম্পূর্ণরূপে *অবশম্* অর্থাৎ 'অসহায়', প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। এই হলো আমাদের বর্তমান অবস্থা।

এই অসহায়, নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থা অনুভব করে আমরা যখন তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা শুরু করি, তখনই আমাদের সত্যিকারের আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয়। তখন মন বিদ্রোহী হয়ে বলে ওঠে: 'আমি মুক্তি চাই, আমি মুক্ত হতে চাই, প্রকৃতির হাতের খেলার পুতুল হয়ে আমি থাকতে চাই না।' বলা হয় *কাঠপুতলী,* প্রকৃতির হাতে যেন কাঠের পুতুল। জীবজন্তু সব তাই; সূর্য তাই, নক্ষত্রগুলিও তাই। কেবল মানুষই এর ব্যতিক্রম হতে পারে। সেই কারণেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রয়োজন—আধ্যাত্মিক জ্ঞানই একমাত্র আমাদের মুক্তি দিতে পারে। 'আমি মুক্ত'—এ চেতনা কেবল অধ্যাত্মজ্ঞানই দিতে পারে। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন—আমি মুক্ত কোথায়? না, আপনি দৈহিক দিক থেকে মুক্ত নন। দেহ তো প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। বহিঃপ্রকৃতির নিয়মগুলি আমাদের এই দেহেও দেখা যায়। সেগুলি সবই পূর্ব-নির্ধারিত। এমনকি মানসিক দিক থেকেও আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নই। কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি, সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারি। কারণ সেটাই আমাদের সত্যিকারের স্বরূপ। এখনকার আমরা *অবশম্,* 'অসহায়', ঠিক যেমন গরু চরাতে চরাতে রাখাল গরুগুলিকে কখনও এইপাশে, কখনও ওইপাশে নিয়ে যায়, তাদের খাবার খেতে, জল খেতে বা চলতে ফিরতে বাধ্য করে, ঠিক তেমনি। *অবশম্,* 'সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতাহীন'। সামগ্রিকভাবে প্রকৃতি তার সৃষ্ট সবকিছুকেই *অবশ* করে রেখেছে, তার নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। *একমাত্র* মানুষই এই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। কেন *আমি* প্রকৃতির দাস হব? —এই প্রশ্ন একমাত্র মানুষই করতে পারে; অন্য কোন প্রাণী পারে না। কিন্তু মানুষ এ প্রশ্ন করতে *পারে,* প্রশ্ন *করেছে* এবং তার উত্তরও সে খুঁজে *পেয়েছে। সে বুঝেছে:* 'আমি মুক্ত হতে পারি, আমি মুক্ত হতে পারি', *আজাদ, আজাদ*—স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়শই একথা বলতেন, অর্থাৎ 'আমি মুক্ত, আমি মুক্ত'। এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। বুঝতে হবে, আমি প্রকৃতির হাতের খেলনা নই। প্রকৃতি বলছে, 'কাঁদো', অমনি আপনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন! প্রকৃতি বলছে: 'হাসো' এবং আপনিও তার হুকুম মেনে হাসলেন! কেন এরকম হবে? কেন এই সিদ্ধান্তগুলি মানুষ নিজে নিতে পারবে না? তার উত্তর এই, মানুষ অবশ্যই তা পারে, যদি সে তার অন্তর্নিহিত ঐশী প্রকৃতিকে প্রকাশের জন্য সংগ্রাম করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এই *অবশম্* শব্দটির এক গভীর অর্থ আছে। প্রতিদিনই তা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝছি, কিন্তু এই তিক্ত অভিজ্ঞতার অন্ত করা যায়। যখন আমরা এই *মায়ার* বাঁধন কাটাতে পারব, তখনই আমরা মুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ পরে বলবেন

যে, মানুষ এই মায়াকে অতিক্রম করে, নিজের সত্য স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে, *মায়াতীত* যে অনন্ত সত্য, তার সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করতে পারে। বাস্তবিক, সেই অনন্ত সত্যের সঙ্গেই আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক, এই *মায়াময়* জগতের সঙ্গে নয়।

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯ ॥

—'হে ধনঞ্জয়, এই সকল কর্ম আমাকে বদ্ধ করে না, কারণ আমি এই সকল কর্মের প্রতি উদাসীনবৎ এবং অনাসক্তভাবে অবস্থান করি।'

আমি এই সবই করছি : জগৎকে অভিব্যক্ত করছি, আবার তাকে নিজের ভিতর টেনে নিচ্ছি। কিন্তু এই সব কর্ম করে আমাকে কি দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়? আদৌ না। এই সব কর্ম আমাকে বাঁধতে পারে না। আমি নিত্যমুক্ত, কারণ আমি অনাসক্ত। *নিবধ্নন্তি*-র মানে হলো যা 'বদ্ধ করে'। আমার পক্ষে এগুলি বন্ধনের কারণ হয় না। কেন? *উদাসীনবদ্ আসীনম্,* 'এই সকল কর্মের প্রতি আমি উদাসীন'। কর্ম অব্যাহত থাকে, কিন্তু আমি তাতে বিশেষ লিপ্ত হই না, কারণ আমার মধ্যে অনাসক্তিবোধ রয়েছে। *অসক্তং তেষু কর্মসু,* 'এই সকল কর্মের প্রতি আমি অনাসক্ত'। এ হলো শ্রীকৃষ্ণের নিজের দৃষ্টান্ত, এক ঐশী দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমাদেরও এই একই অভিজ্ঞতা হতে পারে। কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত হলে এবং কর্মের জন্য কোনরকম মানসিক চাপ অনুভব না করলে আমরাও প্রচুর কাজ করতে পারি। তৃতীয় অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণ নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে এই কথা বলছেন : যদি আপনি অনাসক্তির ভাব নিয়ে কর্ম করতে পারেন, তাহলে আপনি মুক্ত হয়ে যাবেন, কর্ম আর তখন আপনাকে বাঁধতে পারবে না। সাধারণত কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। যত বেশি কাজ আপনি করবেন, ততই বন্ধনে জড়িয়ে পড়বেন। কিন্তু এ রকম হওয়ার কথা নয়। আমাদের সকলের মধ্যেই এমন একটি দিক বা মাত্রা রয়েছে, যেখানে সবকিছুই মুক্তি। যদি আপনার ভিতর আধ্যাত্মিক সচেতনতার উন্মেষ হয়, তবে কর্মও আর আপনার বন্ধনের কারণ হবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *উদাসীনবদ্ আসীনম্ অসক্তং তেষু কর্মসু,* 'এই যে-সব কর্ম আমি করছি, তাতে আমি আদৌ আসক্ত নই'।

মহাভারতে আপনারা শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী পাবেন। সেখানে দেখবেন তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন। অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ, শত শত ঘটনার সঙ্গে জড়িত হওয়া

সত্ত্বেও তিনি সর্বদাই মুক্ত, কোন আসক্তি তাঁর আদৌ ছিল না—এমনকি তাঁর আত্মীয়স্বজন, 'যাদবদের' প্রতিও তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। যখন তারা ক্ষমতার লোভে মত্ত এবং অত্যন্ত দুর্বৃত্তিপরায়ণ হয়ে উঠল, শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ এরা সমগ্র জগৎকে জ্বালিয়ে মারবে। কাজেই পারস্পরিক হত্যালীলায় মত্ত হয়ে সমগ্র যাদবকুল ধ্বংস হচ্ছে—এ তিনি নিজের চোখেই দেখে গেলেন। যাদব ইতিহাসের অন্তিম অধ্যায়ে এটি ঘটল। সেখানে তাঁর অনাসক্তি লক্ষণীয়। রাজা-রাজড়ারা তাঁর কথায় তাঁদের সিংহাসন থেকে নেমে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে রাজা হতে চাননি। তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। এ রকম অনাসক্তি আপনারা শ্রীকৃষ্ণের জীবনে দেখতে পাবেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন ছিলেন, সেকথাই এখানে বলেছেন। ঈশ্বরের প্রকৃতি যদি এ রকম হয় তবে আপনি-আমিও সামান্য একটু চেষ্টা করলে সেই প্রকৃতিকে বিকশিত করতে পারি।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ১০ ॥

—'আমার সার্বভৌম শক্তির সহায়ে প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে। হে কৌন্তেয়, এই কারণেই এই জগৎচক্র ক্রমাগত আবর্তিত হয়।'

আমি আমার *প্রকৃতির* কাজকর্মের নিয়ন্তা। *প্রকৃতি* আমারই অংশ, আমার শক্তি। বস্তুত আধুনিক বেদান্তের ভাষায় একে ব্রহ্ম ও শক্তি অথবা শিব ও শক্তি বলা হয়; দুয়ে মিলেই পরম সত্য। এদের একটি ক্রিয়াশীল, অপরটি নিষ্ক্রিয়। কিন্তু তারা এক এবং অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন—সাপ চলছে, সেটি হলো শক্তি এবং সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, সেটি হলো শিব। একই সত্যের দুটি ভিন্ন দিক। স্থির জলরাশি হলো *শিব,* তরঙ্গায়িত জলরাশি হলো *শক্তি* । দুটি একই বস্তু। *শিব* এবং *শক্তি* এক। *নিত্য* এবং *লীলা* এক। এই হলো মূল কথা। *নিত্য* মানে 'শাশ্বত সত্য'। লীলা মানে 'প্রকাশিত বিশ্ব'। উভয়ই এক এবং অভিন্ন। এই হলো বেদান্তের ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা, যিনি একাধারে নির্বিশেষ বা নিরাকার এবং বিশেষ বা সাকার, অর্থাৎ *নির্গুণ-সগুণ*-এর সম্মিলিত সত্তা। অতএব *শিব* ও *শক্তি,* ব্রহ্ম এবং *শক্তি* বা *মায়া* এক এবং অভিন্ন। একই সত্যকে আপনি দুইভাবে দেখছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্,* 'এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ প্রকৃতিই তার নিজের ভিতর থেকে সৃষ্টি করে বা ব্যক্ত করে; আমি

কেবল কর্তা হিসাবে সেখানে উপস্থিত থাকি, এই যা। আমার উপস্থিতিতে প্রকৃতিই এসব কাজ করে, আমি নিজে করি না। তাঁর ভূমিকা অনেকটা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির মতো। তাঁর নামেই শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছে। প্রত্যেকে সেই কাজে অংশ নিচ্ছেন, কিন্তু তিনি নিজে হাতে কলমে কিছুই করেন না। তাঁর উপস্থিতিটুকুই শাসনযন্ত্রের স্থিরতা রক্ষা করে চলেছে। এই হলো অধ্যক্ষের কাজ—*ময়া অধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ।* রাজনৈতিক পরিভাষায় আমরা স্পীকারকে বলি পার্লামেন্টের অর্থাৎ লোকসভার অধ্যক্ষ। কিন্তু স্পীকার নিজে বেশি কথা বলেন না। যা বলেন, খুবই সামান্য। প্রায় সব কথাই বলেন সভার সদস্যরা। কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকেন বলেই পার্লামেন্টের কাজকর্ম সব সুষ্ঠুভাবে চলে। ভারতবর্ষে অবশ্য সবসময় তা ঘটে না। তাই নয় কি? স্পীকার থাকলেও এখানে অনেকসময় অনর্থ ঘটে। এই অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন এবং কালে এই শুভ পরিবর্তন ঘটবেও। তাই, *ময়া অধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে। সূয়তে* কথার অর্থ *'প্রকাশ করে' বা 'সৃষ্টি করে'; সচরাচরম্‌,* 'পৃথিবীর সকল *চর* এবং *অচর,* অর্থাৎ জঙ্গম এবং স্থাবর বস্তুসমূহ'। *হেতুনা অনেন,* 'এই কারণে'; *কৌন্তেয়,* 'হে অর্জুন'; *জগৎ বিপরিবর্ততে,* 'এই জগতের সামগ্রিক বিবর্তন ঘটে থাকে'। এই হলো *বিপরিবর্তন* বা ক্রমবিকাশের প্রকৃতি। *বিপরিবর্তন* বা *বিশেষেণ পরিবর্তন।* প্রতিনিয়ত কতরকমের বিবর্তনই না ঘটে চলেছে—মহাজাগতিক বিবর্তন, দৈহিক বিবর্তন, মানবিক বিবর্তন। এ সবই চলছে। কিন্তু কীভাবে? *অনেন হেতুনা,* অর্থাৎ 'এই কারণে'। মনে রাখতে হবে 'এক' এবং 'বহু' বস্তুতপক্ষে দুটি ভিন্ন বস্তু নয়। বহু এক থেকে আলাদা নয়। এক থেকেই বহু এসেছে, আবার বহু সেই একেই ফিরে যাবে। এই এক এবং বহুর ঐক্যই হলো সেই পরম ব্রহ্মের ঐক্য। অতএব এক অর্থে ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, আবার সেই এক ব্রহ্মই বহু। *একম্‌* এবং *বহু,* এই দুটি শব্দ দিয়েই আপনারা সেই পরম সত্তাকে নির্দেশ করতে পারেন। ব্যক্ত জগতে তা বহু, আত্মস্বরূপে এক। উদাহরণস্বরূপ, সৌরকিরণের কথা বলা যায়। সেগুলি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, বহুবিধ, একে অন্যের থেকে পৃথক। কিন্তু সূর্য স্ব-স্বরূপে এক অখণ্ড সত্তা। এইভাবে, *হেতুনা অনেন কৌন্তেয় জগৎ বিপরিবর্ততে,* 'এরই কারণে জগৎচক্র পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হচ্ছে।' এই হলো *জগৎ বিপরিবর্ততে,* 'যার পিছনে রয়েছে অনন্ত পরমাত্মা, অনন্ত ঈশ্বরস্বরূপ যে-আমি, তার দ্বারা উদ্দীপিত প্রকৃতির ক্রিয়া'।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

—'সকল জীবের মহান প্রভু, আমার শ্রেষ্ঠ পরমাত্মতত্ত্বের কথা না জেনে, মূঢ় ব্যক্তিরা মনুষ্যদেহে অবস্থানকালে আমাকে অবজ্ঞা করে।'

ঈশ্বরাবতার প্রসঙ্গে যে বিষয়টিকে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথম ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, এই শ্লোকটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ রয়েছে। সেই অনন্ত ব্রহ্ম এক দিব্যরূপ, এক ঐশী ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করে আবির্ভূত হতে পারেন। তাঁকেই *অবতার* বলা হয়। তাঁর চেহারা বা বাহ্য রূপ দেখে তাঁর অন্তরের গভীরতা, তাঁর বিরাট ঐশীশক্তির পরিমাপ করা যায় না, কারণ তাঁর ভিতরের ঐশ্বর্যের খুব সামান্যই বাইরে প্রকাশিত হয়। কাজেই শরীরের মাপকাঠিতে তাঁকে বিচার করা ঠিক নয়। তাঁর অন্তরে যে অমূল্য সম্পদ রয়েছে, শরীর তার মাপকাঠি হতে পারে না। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। কখনো কখনো এমন হয় যে, একজন মানুষের সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো। দেখতে তিনি অতি সাধারণ। সাদাসিধে মানুষ। কিন্তু যেই আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করবেন, তখন দেখবেন যে মানুষটি মোটেই সাধারণ নন। বস্তুত তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। ব্যাঙ্গালোরে আমি একবার এক প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকের বাড়ি গেছিলাম। দেখলাম তাঁর চেহারাটা খুবই শীর্ণ; মাত্র পনের-কুড়ি টাকা বেতন পান। ঘরে একটি তেলের আলো টিমটিম করে জ্বলছে। ঘরদোর অত্যন্ত সাধারণ। কিন্তু দেখলাম, মানুষটি বিশাল মস্তিষ্ক এবং ধীশক্তির অধিকারী! সংস্কৃতের পণ্ডিত, কিন্তু কানাড়া, ইংরেজি এবং সংস্কৃত—এই তিন ভাষায় চমৎকার কথা বলেন এবং লিখতে পারেন। কিন্তু দেখতে অতি সাধারণ। তাই বলছি, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও শুধু বাইরেটা দেখলে আমরা বিভ্রান্ত হতে পারি। কিছু লোক দেখতে অতি সুন্দর, কিন্তু অন্তঃসারশূন্য; আবার কিছু লোক দেখতে সাধারণ, কিন্তু আসলে তাঁরা অসাধারণ। সাধারণ মানুষ সম্পর্কেই যদি এই কথা সত্য হয়, তবে একজন বুদ্ধ, একজন যিশু, একজন শ্রীকৃষ্ণ বা একজন শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কে একথা আরও কতই না সত্য! বাস্তবিক, তাঁদের বাইরের রূপ অতি সাধারণ। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন ঃ *অবজানন্তি মাং মূঢ়া,* 'মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে অবজ্ঞা করে, আমাকে তারা বুঝতে পারে না', *মানুষীং তনুম্ আশ্রিতম্,* 'দেহধারী বলে', তারা আমার সঙ্গে অন্য সাধারণ মানুষের মতো ব্যবহার করেন। কিন্তু কেন? *মম পরং ভাবম্ অজানন্তঃ,* 'আমার উচ্চতর প্রকৃতি সম্বন্ধে না জেনে।' আমার

সেই উচ্চতর প্রকৃতিটি কী? *ভূতমহেশ্বরম্,* 'এই জগতের পরম ঈশ্বর'। আমার এই অসাধারণ দিব্য পরিচয়টি সাধারণ জীব ধরতে পারে না। তাই, তারা আমার নিন্দা করে, আমাকে অপমান করে। *অবজানন্তি* কথার অর্থ 'অপমানকর'। এই কারণেই মহাপুরুষদের এত কষ্টভোগ করতে হয়। যিশুকে কষ্ট পেতে হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণকে কষ্ট পেতে হয়েছিল, শ্রীরামচন্দ্রকেও কষ্ট পেতে হয়েছিল। এইসব মহান ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে মানুষের কত না অভিযোগ! তাঁরা আন্তর সম্পদে অসাধারণ হলেও, বাহ্যত অতি সাধারণ ছিলেন। কাজে কাজেই লোকে তাঁদের ভুল বোঝে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভুল বুঝলেও, যাঁরা ঋষি, যাঁরা আধ্যাত্মিক মানসিকতা-সম্পন্ন, তাঁরা ভুল বোঝেননি। তাঁরা ভুল বোঝেন না। তাঁরা মহান ব্যক্তির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন ঃ *অবজানন্তি মাং মূঢ়া,* 'মূর্খ ব্যক্তিরা আমাকে অবজ্ঞা করে'; *মানুষীং তনুমাশ্রিতম্,* 'যখন আমি নরদেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হই'। কেন? *পরং ভাবম্ অজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্,* 'সমগ্র বিশ্বের নেপথ্যে আমিই যে সেই অবিনাশী সত্তা, এই সত্য তারা উপলব্ধি করতে পারে না।'

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের গোলাপকাননে পদচারণা করছিলেন। এমন সময়ে একজন সেখানে এলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখলেন। কিন্তু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনতে পারেন নি। বাগানের মালী ভেবে তাঁকে বললেন, 'আমাকে একটা গোলাপ তুলে দিতে পার?' শ্রীরামকৃষ্ণ সযত্নে একটি ফুল তুলে তাঁর হাতে দিলেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরে ফিরে এসে উপবিষ্ট হলেন; সেখানে ভক্তেরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর বাবুটিও ওই ঘরে ঢুকলেন, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের জন্যই তাঁর দক্ষিণেশ্বরে আসা। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, বাগানের ঐ 'মালীটিই' ওখানে বসে রয়েছেন! তিনি খুবই বিব্রত হয়ে ভাবতে লাগলেন, হায়, হায়, এ আমি কী করেছি! কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ মানুষের সেবা করতে পারা তো মস্ত ভাগ্যের কথা। আপনি একটা ফুল চেয়েছিলেন, আমি আপনাকে সেটা দিয়েছি। কী সুন্দর কথা লক্ষ্য করে দেখুন! সে যাই হোক, এইভাবেই আমরা মহাপুরুষদের চিনতে ভুল করি। তাঁরা দেখতে সাধারণ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অসাধারণ। আমি নিজেও এইরকম কিছু মানুষ দেখেছি, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে অসাধারণ, কিন্তু দেখতে অতি সাধারণ। তাই শুধু বাইরের রূপ দেখেই মানুষকে বিচার করা অনুচিত। তাদের

মধ্যেও অনেক মহান মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারেন। শঙ্করাচার্যের জীবনেও আমরা তাই দেখি। তিনি এই সুবিশাল ভারত ভূখণ্ডের সর্বত্র পায়ে হেঁটেছেন। সাধারণ লোক কী করেই বা তাঁর মহত্ত্ব বুঝবে? বিবেকানন্দও পরিব্রাজকরূপে ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু কজন মানুষ তাঁর মহত্ত্ব বুঝতে পেরেছিলেন? তারা বড় জোর বুঝেছিলেন—ইনি একজন সন্ন্যাসী। ব্যস্, ঐ পর্যন্তই। বাস্তবিক, আমরা যদি নিজেরা মহৎ না হই, তবে তাঁদের মহত্ত্বের গভীরতা বুঝব কীভাবে? কাজেই, শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন ঃ অবতারকে চেনা খুব শক্ত কর্ম। অবতারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, সাধারণভাবে আমরা যাঁকে মহৎ বলি, সেরকম মানুষের মহত্ত্ব বুঝতে পারাও যথেষ্ট কঠিন। কঠিন এই কারণে যে, তাঁদের অন্তরের গভীরতার পরিমাপ আমরা করতে পারি না। আমরা মানুষের বাইরেটাই শুধু জরিপ করতে পারি। তার উচ্চতা, দৈর্ঘ্য, আয়তন, রূপ এইগুলির হিসাবই কেবল আমরা করতে পারি। কিন্তু তাঁদের মনটি কোন্ স্তরের তা আমরা টের পাই না। কোন মানুষকে বিচার করবার সময়ে সেই জন্য মনটিকে খোলা রাখা ভালো। একজন দরিদ্র মানুষ হয়তো ভিক্ষার জন্য কারো গৃহে উপস্থিত হয়েছেন; তিনি দেখতে দরিদ্র, কিন্তু তিনি তো কর্ণাটকের পুরন্দর দাসের মতো একজন মহান কবি ও ভক্তও হতে পারেন! পুরন্দর দাস ছিলেন মস্ত ধনী। একদিন তিনি তাঁর সকল ধনসম্পদ বিলিয়ে দিয়ে দরিদ্র *দাস* অর্থাৎ চারণ কবির জীবন বেছে নিলেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি স্বরচিত ভজন গেয়ে শোনাতেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে ভিক্ষুক মনে করত। দেখতে নিতান্ত ভিক্ষুকের মতো হলেও আসলে তিনি ছিলেন রাজপুত্র। তিনি জানতেন তাঁর অন্তরে পরম সত্য, পরম ঐশ্বর্য গচ্ছিত আছে। এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণ সেই ঈশ্বরাবতারের কথা বলছেন, যাঁকে চেনা সাধারণ মানুষের পক্ষে আরো বেশি দুরূহ। যিশুখ্রিস্টকে সাধারণ মানুষ কী বলতো? বলতো—উনি তো একজন সাধারণ ছুতোরের ছেলে! *পরং ভাবম্ অজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।* মূঢ় বা অজ্ঞান ব্যক্তিদের মানসিকতা কীরকম হয়? তার উত্তরে বলা হচ্ছে ঃ

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

—'যাদের আশা ব্যর্থ, কর্ম ব্যর্থ, জ্ঞান ব্যর্থ এবং যারা বিবেকহীন, তারা মোহগ্রস্ত রাক্ষস এবং আসুরিক প্রকৃতির হয়ে থাকে।'

এইধরনের মানুষ *মোঘাশা,* অর্থাৎ 'বিফলমনোরথ হয়ে থাকে।' সব রকম

ব্যর্থ আশা তারা মনে মনে পোষণ করে। তেমনি, *মোঘকর্মাণঃ*, অর্থাৎ 'বিফলকর্মা'; *মোঘজ্ঞানাঃ*, 'বিফলজ্ঞান' এবং *বিচেতসঃ*, 'চেতনাহীন', কোন রকম বোধবুদ্ধির বালাই নেই। *রাক্ষসীম্ আসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ*, 'তারা যথার্থই রাক্ষস এবং অসুরদের মোহিনী প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়'। উচ্চতর মূল্যবোধের প্রতি এদের কোন শ্রদ্ধা বা আস্থা নেই। যদি শঙ্করাচার্যের মতো একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষও এদের কারো গৃহে উপস্থিত হন, তবে এরা মনে করবে ঃ 'ইনি একজন ভিক্ষুকমাত্র।'

বুদ্ধের জীবনের একটি সুন্দর ঘটনা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। ঘটনাটির মধ্যে যথেষ্ট মনোহারিত্ব এবং কবিত্ব রয়েছে। মুণ্ডিত মস্তক বুদ্ধ যখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করছিলেন, তখন হঠাৎ একদিন একটু বৃষ্টি নামে। তিনি এক কৃষকের কুঁড়ের ছাউনির নিচে আশ্রয় গ্রহণ করলে বুদ্ধ এবং সেই কৃষকের মধ্যে তখন কিছু কথাবার্তা হয় (*ধানীয় সুত্ত, সুত্ত নিপাত*, ৫৫.১৮-৩৪; পণ্ডিতদের মতানুসারে *সুত্তনিপাতে* পালি অনুশাসনের প্রাচীনতম কিছু অংশ সন্নিবেশিত হয়েছে।) ঃ

রাখাল ধানীয় বলেছিল, 'আমার ঘরে অন্ন প্রস্তুত এবং গরু দোয়ানোও শেষ হয়েছে। আর এখানে মহীর তীরে আমি আমার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে বেশ নিশ্চিন্তে বাস করছি। আমার ঘরখানি খড়ে ছাওয়া, আগুন জ্বালানোর শুকনো কাঠও ঘরে যথেষ্ট মজুত রয়েছে। হে ঈশ্বর, যদি তুমি ইচ্ছা করো, বৃষ্টি দাও'!

ভগবান বুদ্ধ উত্তর দিলেন ঃ 'আমি ক্রোধ থেকে মুক্ত। আমার সকল বন্ধন খসে গেছে। মহীর তীরে আমি মাত্র একটা রাত কাটাব। আমার কুটিরের ছাদ আকাশ, আগুন নিভে গেছে। বৃষ্টি নামুক, ঈশ্বর, যদি তোমার ইচ্ছা হয়'!

রাখাল ধানীয় বলে, 'এখানে ডাঁশের উৎপাত নেই, জলাভূমির ঘাসের মধ্যে আমার গরুগুলি চরতে যায়। এই যে বৃষ্টি এসেছে, তা তারা সহ্য করতে পারবে। তুমি যদি চাও, হে ঈশ্বর, বৃষ্টি হোক!'

বুদ্ধ সে কথা শুনে বললেন ঃ 'নদী পার হব বলে কাঠের টুকরোগুলিকে ভালো করে বেঁধে আমি ভেলা তৈরি করেছিলাম। বন্যার জলের ঢেউ শাসন করে সে ভেলায় চড়ে আমি ভবনদী অতিক্রম করেছি। এখন আমার এই ভেলার প্রয়োজন মিটেছে। বৃষ্টি নামুক ঈশ্বর, যদি তোমার ইচ্ছা হয়!'

রাখাল বললে, 'আমার স্ত্রী অসতী নয়, সে আমার অনুগত। দীর্ঘদিন সে

আমার সঙ্গে বাস করছে। সে অতি দয়ালু ও আমার প্রিয়। কারো মুখে তার নিন্দা শুনিনি। বৃষ্টি নামুক, হে ঈশ্বর, যদি তোমার ইচ্ছা হয়!'

প্রভু উত্তর দিলেন ঃ 'আমার চিত্ত বশীভূত, মুক্ত। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় তাকে আমি বশে এনেছি এবং তাকে আমার মনের মতো করে গড়ে তুলেছি। এখন আমি নিষ্পাপ। ঈশ্বর, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তো বৃষ্টি নামুক!'

রাখাল ধানীয় বলল, 'আমি পরিশ্রম করে জীবনধারণ করি। আমার সন্তানরা আমার সঙ্গেই থাকে এবং তারা শক্ত-সমর্থ। তাদের সম্বন্ধে আমি কোন নিন্দাও শুনি না। বৃষ্টি আসুক, ঈশ্বর, যদি তোমার ইচ্ছা হয়!'

সেই মহাত্মা উত্তর দিলেন, 'আমিও কারও দাস নই এবং আপন শক্তিতে আমি বিশ্ব পরিভ্রমণ করি। কর্মের প্রয়োজন আমার ফুরিয়েছে। হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছায় যদি বৃষ্টি আসে, আসুক!'

রাখাল ধানীয় বলল, 'আমার অনেক গরু এবং তাদের দুগ্ধপোষ্য বাছুর আছে এবং সেগুলি ভবিষ্যতে আমার জন্যই বংশবৃদ্ধি করবে। একটি ষাঁড়ও আছে, যে হলো পালের সর্দার। বৃষ্টি আসুক, প্রভু, যদি তোমার ইচ্ছা হয়!'

উত্তরে প্রভু বললেন, 'আমার কোন গাই নেই, দুগ্ধপোষ্য বাছুরও নেই যারা আমার জন্য তাদের বংশবৃদ্ধি করবে। আমার কোন ষাঁড়ও নেই, যে গরুর পালের ওপর সর্দারি করবে। বৃষ্টি আসুক, ঈশ্বর, যদি তুমি চাও!'

'আমার গরু বাঁধার খোঁটাগুলি শক্ত করে পোঁতা, তাদের নড়ানো যাবে না। মঞ্জুঘাসের তৈরি দড়াগুলিও আনকোরা নতুন ও ভালো করে পাকান। কোন বাছুরই সেগুলিকে ছিঁড়তে পারবে না। অতএব, বৃষ্টি নামুক, ঈশ্বর, যদি তোমার ইচ্ছা হয়!'

প্রভু উত্তর দিলেন, 'কিন্তু বৃষরূপী আমি সেই বন্ধন ছিঁড়ে ফেলেছি, যেমন করে দাঁতাল হাতি লতাপাতার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে। আমি আর জন্মাব না। বৃষ্টি নামুক, ঈশ্বর, যদি তোমার তাই অভিপ্রায় হয়!'

এই কথাবার্তার পর অবিলম্বে প্রবল বর্ষণ শুরু হলো এবং পাহাড় ও সমতল—সব কিছু প্লাবিত হলো। ধানীয় যখন ঈশ্বরের এই বারিবর্ষণের শব্দ শুনতে পেল, তখন সে মনে মনে বলল ঃ

'আমরা যে আপনার মতো মহাত্মার দর্শন পেয়েছি, তাতে আমাদের সামান্য লাভ হয়নি, আমরা আপনার শরণাগত। আপনার দৃষ্টিশক্তি আছে। হে মহর্ষি!

আপনি আমাদের আচার্য হন। আমার কল্যাণী স্ত্রী এবং আমি নিজে, অনুগত শিক্ষার্থী হয়ে, আপনার মতো আনন্দময় পুরুষের সঙ্গে পবিত্র জীবনযাপন করব এবং জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করে সকল দুঃখের অবসান ঘটাব!'

কারো মহত্ত্ব বুঝতে পারা চাট্টিখানি কথা নয়। তাই, তাড়াহুড়ো করে কাউকে বিচার করতে যাবেন না। আমরা অবশ্য প্রায়শ সেটাই করে থাকি; কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করতে শেখা উচিত আমাদের। আজ যে ব্যক্তি আমার দরজায় ভিক্ষা নিতে এসেছেন, তিনি যে একজন বুদ্ধ নন, তা কে বলতে পারে? তিনি একজন শঙ্করাচার্যও হতে পারেন। আমরা কিন্তু তা জানি না। এই ধরনের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চললে কাউকে ভুল বুঝে তার প্রতি অবিচার ও অসম্মান করার মতো ভুল আমরা করে বসব না। যখন *রাক্ষসী* এবং *আসুরী* গুণগুলি আমাদের পেয়ে বসে, তখনই আমরা এইসব ভুল করি। আমরা শুধু অর্থ দিয়েই মানুষকে বিচার করি, তার বুদ্ধি, তার আধ্যাত্মিকতা, এসব গুণ দিয়ে তার বিচার করি না। আপনার কত অর্থ আছে সেটাই আমার কাছে একমাত্র বিচার্য! আপনি গরিব! তবে দূর হয়ে যান। আপনাকে আমরা চাই না। এই হলো আমাদের বর্তমান মনোভাব!

মহাভারতের মতো মহাকাব্যেও এ ধরনের দৃষ্টান্ত আছে। সেখানে দেখি, রাজা দ্রুপদ দ্রোণের প্রতি এই আচরণই করেছিলেন। দ্রোণ দ্রুপদের সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু তিনি খুবই দরিদ্র। দ্রুপদ পাঞ্চাল দেশের রাজা হলে দ্রোণ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'চলুন, আমরা দ্রুপদের কাছে যাই, তিনি হয়তো আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারেন। ঘরে তেমন কিছু নেই; সন্তানদের একটু দুধও খাওয়াতে পারি না।' ইত্যাদি, ইত্যাদি। সে কাহিনী বড়ই করুণ। দ্রোণ দ্রুপদের কাছে গিয়ে তাঁকে মিত্র বলে সম্বোধন করলেন। এতে দ্রুপদ গর্বে স্ফীত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, 'কী, তোমার এতবড় দুঃসাহস! তুমি আমাকে তোমার মিত্র বলে সম্বোধন করছ! মিত্রতা কেবল দুজন সমপর্যায়ের মানুষের মধ্যেই সম্ভব হয়। তুমি হলে একজন ভিক্ষুক, আর আমি রাজা। কী করে আমাদের বন্ধুত্ব হতে পারে? চলে যাও। আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না।' তাঁর মুখ থেকে এই যে বিপজ্জনক কথাগুলি বেরুল, তা পরবর্তিকালে কুরুক্ষেত্রের মর্মান্তিক যুদ্ধে ইন্ধন জুগিয়েছিল। এ হলো এক মর্মান্তিক পরিণতির অন্যতম সূচনা। এইভাবেই পাপ বৃদ্ধি পেয়ে তা একদিন মহাযুদ্ধের রূপ নেয়। এই হলো মহাভারতের কাহিনী।

বর্তমান শ্লোকে তাই বলা হচ্ছে, যখনই আমরা গর্ব, অহংকার, ঔদ্ধত্য এবং স্বার্থপরতার বশীভূত হই, তখনই আমরা *আসুরী সম্পদের* গোলাম বনে যাই। ষোড়শ অধ্যায়ে এই *আসুরী সম্পদ* এবং *দৈবী সম্পদ* নিয়ে আলোচনা করা হবে। এখানে, এই নবম অধ্যায়ে, *আসুরী সম্পদ*-এর সামান্য উল্লেখমাত্র করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, যারা এই *আসুরী সম্পদের* অধিকারী, তাদের প্রকৃতি এইরকমই। তারা মোহাচ্ছন্ন, *প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ,* 'তারা মোহিনীশক্তি বা বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী গুণবিশিষ্ট যে মায়া বা প্রকৃতি, তার দ্বারা আচ্ছন্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, মায়ার দুটি দিক আছে—*অবিদ্যা মায়া* এবং *বিদ্যা মায়া। অবিদ্যা মায়া* মানুষকে মোহগ্রস্ত করে এবং ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। কিন্তু *বিদ্যামায়া* মানুষকে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে। মানুষ তার পছন্দ মতো—*বিদ্যামায়া* এবং *অবিদ্যামায়া*—এই দুটির একটিকে বেছে নিতে পারে। হৃদয় যখন *বিদ্যামায়ার* লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে, তখন *দৈবী সম্পদ* প্রকাশিত হয়; দয়া, প্রেম, সেবাভাব, সত্যবাদিতা, এই সব গুণ তখন তার মধ্যে ফুটে ওঠে। অন্যদিকে, হৃদয় যখন *অবিদ্যামায়া*-র কবলে পড়ে, তখন স্বার্থপরতা, নীচতা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশোষণ প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়। অতএব, *প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ,* 'ঐটিই *প্রকৃতি* বা *মায়া* অথবা মোহিনী, বিভ্রান্ত করাই যার স্বভাব।' কী আশ্চর্য ব্যাপার! সমুদ্রমন্থনের সময় যখন অমৃত উঠতে লাগলো, তখন *অসুরদের* প্রলুব্ধ করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিষ্ণু স্বয়ং মোহিনী-মূর্তি ধারণ করেছিলেন। এই হলো *মোহিনী* যা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। এই জীবনেও প্রকৃতি *মোহিনী* মূর্তিতে আপনার কাছে উপস্থিত হয়—উদ্দেশ্য, আপনাকে ভুল পথে চালিত করা। অতএব, এই মোহ থেকে সাবধান। এই মোহ থেকে বাঁচতে গেলে *বিদ্যাশক্তি বা বিদ্যামায়ার* শরণ নিন। তাহলে আর এই মোহ আপনাকে বশীভূত করতে পারবে না। যদি কোন কিছু আপনাকে বিভ্রান্ত করতেও চায়, তবু তার দ্বারা আপনি বিভ্রান্ত হবেন না। আপনি মুক্ত থেকে ওসবের উর্ধ্বে চলে যাবেন। এইভাবেই আমরা মুক্ত হতে পারি। বিদ্যা *মায়া* এবং অবিদ্যা *মায়া*—এই দুটির যে কোন একটিকে বেছে নেবার স্বাধীনতা আমাদের আছে। এখন কোন্‌টিকে আমরা বরণ করে নেব, সেটিই প্রশ্ন। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা সকলেই কিন্তু মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন। যখন আপনি কোন মন্দকাজ করেন, তখন আপনি মায়ার বশীভূত হয়েই তা করেন। আবার যখন ভালো কাজ করেন, তখনও আপনি তা সেই মায়ার বশেই করে থাকেন। যখন আপনি ধ্যান করেন, তখনও আপনি মায়ার মধ্যেই রয়েছেন। মায়া সব কিছুকে গ্রাস

করে রেখেছে।—মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি। সেই শক্তি *অবিদ্যা মায়া* ও *বিদ্যা মায়া,* দুইভাবেই অভিব্যক্ত।

বিদ্যা মায়া বা *দৈবী সম্পদ* কীভাবে আপনার এবং আমার মধ্যে কাজ করে তা পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে। এতে এমন সব সংকেত ও পথনির্দেশ রয়েছে যা অনুসরণ করে আমরা আমাদের জীবনকে যথার্থ উন্নতিশীল, শুদ্ধ এবং মঙ্গলময় করে গড়ে তুলে আর পাঁচজনের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে পারি এবং নিজেদের অন্তরেও গভীর প্রশান্তি অনুভব করতে পারি। পরবর্তী শ্লোকে জীবনের এই ইতিবাচক দিকটি, অর্থাৎ *বিদ্যামায়া* সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে, যে *মায়া* আপনাকে বঞ্চনা ও প্রতারণা করে না, যে শক্তি শুধু আপনাকে উন্নত করে। আপনি যে একটি সুখী পরিবার চান—একথা বাস্তব সত্য। আমিও ভাবি—আহা! আমাদের প্রতিটি পরিবার যদি সুখী হতো, তাহলে কত ভালোই না হতো! কিন্তু প্রশ্ন এই—পরিবারের লোকজন *বিদ্যামায়ার* দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে কীভাবে সেই পরিবার সুখী হতে পারে? *অবিদ্যা মায়ার* দ্বারা কবলিত হলে সে পরিবারে কখনও শান্তি থাকতে পারে না। কাজেই, আমাদের সকলকেই এই প্রশ্ন করতে হবে, প্রতিটি ছেলেমেয়ে যেন অবশ্যই নিজেকে এই প্রশ্ন করে ঃ তুমি কি তোমার হৃদয়কে *অবিদ্যামায়ার* ক্রীড়াক্ষেত্র করে তুলতে চাও, অথবা *বিদ্যামায়ার?* বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই হওয়া চাই *'বিদ্যামায়া'।* তাহলে তার জন্য চেষ্টা করুন, সংগ্রাম করুন। যখন এ রকম প্রকৃতিসম্পন্ন দুটি মানুষ বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করবেন, তখন তাদের পারিবারিক জীবন অবশ্যই সুখের হবে। গার্হস্থ্য জীবনের যথার্থ আনন্দ ঐ অবস্থাতেই লাভ করা সম্ভব, নচেৎ নয়। এই মহান শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্য এখানেই।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, একধরনের মানুষ আছে, যারা আমার উচ্চতর প্রকৃতি সম্বন্ধে না জেনে আমাকে অবজ্ঞা করে। আমার মনুষ্য অবয়ব তাদের দৃষ্টি এমন আচ্ছন্ন করে রাখে যে, তারা আমার প্রকৃত সত্তাটিকে উপলব্ধি করতে পারে না। তারা হলো অজ্ঞানে আচ্ছন্ন সাধারণ মানুষ, তারা বৃথা আশা, বৃথা কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আর একধরনের মানুষ আছে, যারা *সাত্ত্বিক* প্রকৃতির; এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি পরিষ্কার। পরবর্তী শ্লোকে বলা হচ্ছে ঃ

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩॥

—'কিন্তু হে পৃথানন্দন, দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করে মহাত্মারা আমাকে সর্বভূতের আদি কারণ এবং অবিনাশী জেনে, অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করেন।'

মহাত্মানস্তু, 'কিন্তু যাঁরা মহাত্মা, যাঁদের আত্মা দেহে সীমাবদ্ধ নয়, তাঁরা সর্বভূতে এই একই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন।' তাঁরা যথার্থ মহৎ এবং বড় মাপের মানুষ; তাই, তাঁদের *মহাত্মা* বলা হয়। তাঁরা আমাকে পরম ঐশী সত্যরূপেই জানেন। কীভাবে? *দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ,* 'তাঁরা দৈবী সম্পদের নিয়ন্ত্রণাধীন, শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবাপন্ন। যখন *দৈবীসম্পদ*-এর প্রাধান্য হয়, তখন সবকিছুই ইতিবাচক ও সৃষ্টিধর্মী হয়, মানুষ উচ্চ থেকে উচ্চতর নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে যায়। কিন্তু যখন *আসুরী সম্পদ* অর্থাৎ তমঃ এবং রজঃ-এর প্রাবল্য হয়, তখন মানুষ সম্পূর্ণভাবে বিষয়ী, সংকীর্ণ ও বিবাদপ্রিয় হয়ে থাকে। যে-কোন সমাজেই এ ধরনের মানুষের সংখ্যাই বেশি। তারা সর্বদাই তুচ্ছ কারণে ঝগড়া-বিবাদ বাধাতে চায় এবং তার সুযোগ খোঁজে। এইরকম মানুষ অতিমাত্রায় *রাক্ষসী* এবং *আসুরী* ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু *মহাত্মানঃ,* 'মহাত্মারা', *দৈবীসম্পদ* দ্বারা পরিচালিত; *দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ।* তাঁরা কী করেন? *ভজন্তি,* 'তাঁরা আমাকে ভজনা করেন'। তাঁরা আমার উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্বরূপটি বোঝেন। *অনন্যমনসো,* 'একাগ্র চিত্তে'; *জ্ঞাত্বা ভূতাদিম্ অব্যয়ম্,* 'আমাকে *ভূতাদিম্* অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের আদিরূপে এবং *অব্যয়ম্* অর্থাৎ অবিনাশিরূপে জেনে'। এই হলো আমার যথার্থ প্রকৃতি এবং এই *মহাত্মারা* জানেন যে, সেই দিব্যসত্তা কখনও কখনও মানবদেহ ধারণ করেন। তাই, তাঁরা আমার সত্যস্বরূপের পূজাই করেন।

পরের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বোঝাচ্ছেন, কীভাবে তাঁরা পূজা করেন। আমাদের মন যখন সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হয়, তখন ঈশ্বর-আরাধনার জন্য কোন বাঁধাধরা সময় থাকে না; তখন আমরা নিরন্তর পূজার ভাবেই থাকি। আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করার সময় অবশ্য আমরা মন্দিরে যাওয়া, প্রার্থনা করা এবং ধ্যানাদির জন্য কিছুটা সময় নির্দিষ্ট করে রাখি। কিন্তু মন যখন *সাত্ত্বিক* হয়ে ওঠে, অন্তর যখন শুদ্ধ হয়, তখন পূজায় কোন ছেদ থাকে না। অষ্টপ্রহরই ঈশ্বরের আরাধনা অব্যাহত থাকে। এমনকি দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সময়েও ঈশ্বরের এই পূজা সহজভাবে চলতে থাকে। ১৪ সংখ্যক শ্লোকে এই ভাবটিই পরিস্ফুট হয়েছে।

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

—'সর্বদা আমার গুণকীর্তন করে, দৃঢ়চিত্ত হয়ে সাধন-ভজন করে, ভক্তিভাবে আমাকে প্রণতি জানিয়ে, তাঁরা আমার উপাসনা করেন।'

নিত্যযুক্তা, 'যাঁরা সতত ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত', তাঁরা আধঘণ্টার যোগী নন, সদা সর্বদাই তাঁরা *যোগী। নিত্যযুক্ত,* অর্থাৎ সদাসর্বদাই 'আধ্যাত্মিক ভাবে বিভোর'। এই সব ব্যক্তি কীভাবে আমার উপাসনা করেন, *উপাসতে?* তার উত্তরে বলছেন, *সততং কীর্তয়ন্তো মাম্,* 'সর্বদা তাঁরা আমার মহিমা কীর্তন করেন', মনে মনে বা বচনের দ্বারা আমার ঐশী মহিমা কীর্তন করেন; *যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ,* 'দৃঢ়ব্রত হয়ে তাঁরা নিরন্তর চেষ্টা করেন', অর্থাৎ পূর্ণ উদ্যমে, সর্বদা ঈশ্বরে মন ফেলে রেখে। *দৃঢ়* অর্থে অটল, *ব্রত* মানে সংকল্প। *দৃঢ়ব্রতাঃ,* 'দৃঢ়সংকল্প হয়ে'। *নমস্যন্তশ্চ মাম্ ভক্ত্যা,* 'প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে আমাকে প্রণাম করে।' শারীরিকভাবে প্রণাম না করলেও তাঁদের মন সর্বদাই আমার প্রতি প্রণত হয়ে থাকে। সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাঁরা স্বভাবতই বিনয়ী হন। তাঁদের মধ্যে কোন গর্ব থাকে না। ক্ষুদ্র অহং থেকে তাঁরা মুক্ত। তাই, সর্বদা যে তাঁরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছেন তা না হতেও পারে, কিন্তু মনে মনে সর্বদাই তাঁরা ভক্তিনত হয়েই থাকেন। *ভক্ত্যা,* 'গভীর ভক্তির সঙ্গে'। *নিত্যযুক্তা উপাসতে,* 'যাঁরা আমার সঙ্গে নিত্য যুক্ত, তাঁরা এইভাবেই আমার উপাসনা করেন।' তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভজন, পূজন, এবং আত্ম-নিবেদন চলতেই থাকে। বাহ্যভাবে তাঁরা তা করতে পারেন, না-ও পারেন, কিন্তু অন্তরে তাঁরা সর্বদা ঐভাবেই ভাবিত—সর্বত্র একই আত্মাকে দর্শন করছেন। এই রকম মানুষের কীরকম অবস্থা হয়? 'এই অবস্থায় মানুষ সর্বদা সর্বত্র ঈশ্বরকে প্রণতি জানায় ও সকলের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে।' *শান্ত, দান্ত,* অর্থাৎ 'আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম' প্রভৃতি—যা মানুষ চেষ্টা করে থাকে—তার কাছে ঐ অবস্থায় তা স্বাভাবিক হয়ে যায়। সমস্ত ব্যাপারটাই তখন তাঁর কাছে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। মাণ্ডুক্য উপনিষদকারিকা (৪।৮৬)-র শেষের দিকে একটি সুন্দর শ্লোক আছে। সেখানে বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি *স্বভাবতই* শুদ্ধ, *স্বভাবতই* নম্র, *স্বভাবতই* অন্যদের প্রতি সহমর্মী কেন? কারণ, তিনি সকলের সঙ্গেই একত্ব অনুভব করেন। স্বতঃস্ফূর্ততা এবং স্বাভাবিকতার ধারণা এবং তার গুরুত্বের কথা ঐ শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে। এ জগতে কোথায় আপনারা এই সহজ

স্বতঃস্ফূর্ততা দেখতে পান? শিশুদের মধ্যে। শিশুরা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। এই হলো স্বতঃস্ফূর্ততার একটা নমুনা। এই কারণেই উপলব্ধিবান অধ্যাত্মজগতের ব্যক্তিদের শিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাঁদের মধ্যে কোন চাতুরী নেই। সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক তাঁরা। যখন তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ', তার অর্থ 'হ্যাঁ'-ই, যখন তাঁরা বলেন 'না', তার অর্থ 'না'-ই। এ হলো শিশুসুলভ স্বতঃস্ফূর্ততা। এ হলো মনের এক অতি উচ্চ অবস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'পরমহংসরা পাঁচ বছরের শিশুর মতো'। তাঁরা এত স্বাভাবিক, এতই স্বতঃস্ফূর্ত যে তাঁদের মধ্যে কোন আমিত্ব নেই। এই হলো পরম উপলব্ধির লক্ষণ।

তাই এখানে বলা হচ্ছে, *নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে,* 'তাঁরা সদাসর্বদা ভক্তিযুক্ত হয়ে আমাকে প্রণাম করেন, তাঁরা সর্বদাই নম্রতার অভ্যাস করেন।' যখন 'কাঁচা আমি' চিরদিনের জন্য মুছে যায়, এ হলো তখনকার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অবস্থা। তখন অসীম একত্ববোধের স্ফুরণ ঘটে।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

—'আবার অন্যেরা জ্ঞানরূপ যজ্ঞ (অর্থাৎ সর্বভূতে এক পরমাত্মাকে দর্শন) করে সব কিছুর আশ্রয় আমাকে—একরূপে, স্বতন্ত্ররূপে, আবার কখনও বহুরূপে—ভজনা করেন।'

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মাম্ উপাসতে, 'অন্যান্য কেউ কেউ জ্ঞানযজ্ঞের মাধ্যমে আমার উপাসনা করেন।' চতুর্থ অধ্যায়েও বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা কোন কোন ভক্ত আমার পূজা করেন। কীভাবে তাঁরা সেই পূজা করেন? *একত্বেন, পৃথকত্বেন,* 'সকলের সঙ্গে একত্ব অনুভব করে, অথবা ঈশ্বরকে জীবের থেকে আলাদা মনে করে, তাঁর দাস হয়ে থেকেছে'। *পৃথকত্ব* বলতে এইটিই বোঝায়। ভক্ত নিজেকে ঈশ্বরের থেকে পৃথক বলে মনে করে তাঁর উপাসনা করেন। এই হলো ভক্তিভাব। জ্ঞানের ভাব হলো 'আমিই ব্রহ্ম', 'আমি সেই পরম সত্য'। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে দুটিই খুব উঁচু ভাব। *বহুধা,* অর্থাৎ 'বহুরূপে'; *বিশ্বতোমুখম্,* সেই তত্ত্ব যা সর্বব্যাপী, 'যাঁর মুখ বিশ্বের সব দিকে ফেরান'। এই হচ্ছে পরম সত্যের স্বরূপ।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন, 'তুই কীরকম উপলব্ধি চাস? মনে কর, একটা বাটিতে মধু রয়েছে; তুই কি ডুব দিয়ে তাতে মিশে যেতে চাস,

নাকি বাটির কানায় বসে সেই রসের অল্প একটু খেতে চাস?' নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, 'অবশ্যই কানায় বসে মধু আস্বাদন করতে চাই।' শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, 'কেন?' নরেন্দ্র বললেন, 'যদি আমি ডুব দিই, তবে তো মরে যাব!' ঐ কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ সামান্য হেসে বললেন, 'কিন্তু এতো সাধারণ মধু নয়, এ হলো *সচ্চিদানন্দ* মধু বা অমৃত রস, যাতে ডুব দিলে তুই মরবি না, বরং অমৃতত্ব লাভ করবি। বিষয়ী লোকের মতো ভয় পাস না।' বাস্তবিক, ভক্ত রস আস্বাদন করতে চান, ঈশ্বরের প্রেম আস্বাদন করতে চান। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান না। এই হলো *ভক্তির* প্রকৃতি। কিন্তু *জ্ঞানী* বলবেন, *'শিবোঽহম্'*। ভক্ত তা বলবেন না। তিনি বলবেন, 'আমি শিবের দাস, শিবের সন্তান।' তিনি শিবকে আলাদা দেখতে চান, যাতে তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা যায়, তাঁর প্রেম সম্ভোগ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি বিশ্বতোমুখ', যে-কোন ভাবেই তুমি আমার ভজনা করতে পার। এর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। 'আমি সর্বত্র বিরাজমান'। তাই সব পূজা শেষপর্যন্ত আমার কাছেই পৌছায়। এ হলো হিন্দুদের ভাব। এর থেকেই সহিষ্ণুতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভাব হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করে রেখেছে।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাঽহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥

—'আমি *ক্রতু*, আমিই *যজ্ঞ*, আমি *স্বধা*, আমিই *ঔষধ*, আমি *মন্ত্র*, আমিই *আজ্য*, আমি *অগ্নি* এবং আমিই আহুতিরূপ যজ্ঞক্রিয়া।'

যজ্ঞ এবং পূজার বিবিধ উপকরণ আমারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। বস্তুত তারা কিন্তু সকলেই এক এবং অভিন্ন। *অহং ক্রতুঃ*, 'আমিই যজ্ঞ'; *ক্রতু* হলো বৈদিক যজ্ঞ। *অহং যজ্ঞ*, 'আমিই যজ্ঞ', এটিও আর এক ধরনের বৈদিক যজ্ঞ। *স্বধা অহম্*, 'আমিই সেই *স্বধা মন্ত্র*'। কোন কিছু উৎসর্গ করার সময় আপনি *স্বাহা* অথবা *স্বধা* উচ্চারণ করেন। যজ্ঞে আহুতি দিতে গেলে এই দুটি মন্ত্রই উচ্চারণ করা হয়। *অহম্ ঔষধম্*, 'আবার আমি *ঔষধও*'। তারপর, *মন্ত্রোঽহম্*, 'যে *মন্ত্র* তুমি উচ্চারণ কর, সেই *মন্ত্রও* আমিই।' *অহম্ এব আজ্যম্*, 'অগ্নিতে যে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়, সেই ঘৃতও আমি'। হোমের ঘিকে বলা হয় *আজ্যম্*। *অহম্ অগ্নিঃ*, 'যে আগুনে ঘি দেওয়া হয়, সেই আগুনও আমি।' *অহং হুতম্*, আবার 'আমিই আহুতি', অর্থাৎ যজ্ঞরূপ ক্রিয়াও আমি। চতুর্থ অধ্যায়ের ২৪ সংখ্যক শ্লোকে এই ভাবটিই ব্যক্ত হয়েছিল,

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥

কী অসাধারণ চিন্তা! কী নির্ভেজাল সত্য। 'আহুতি হলো ব্রহ্ম, যিনি আহুতি দেন, তিনিও ব্রহ্ম। অগ্নিও ব্রহ্ম। এই আহুতির যা ফল, সেই ফলও ব্রহ্ম'। সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম। এটিই যথার্থ সত্য। কিন্তু আমাদের ভেদবুদ্ধির জন্য এগুলিকে আমরা সব আলাদা দেখি। কিন্তু যা সত্য, তা হলো, এগুলি সবই স্বরূপত এক অনন্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যের বহুবিধ প্রকাশ।

সৌরকিরণের দৃষ্টান্তটি এ প্রসঙ্গে আমরা মনে করতে পারি। কয়েক বছর আগে আমেরিকার *National Geographic* ম্যাগাজিনে 'The Sun is our Mother' এই নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সূর্যকে মা বলে বর্ণনা করে সেখানে বলা হয়েছিল, খাদ্যের মধ্য দিয়ে আমরা সূর্যকে গ্রহণ করি, তাই খাদ্যও সূর্য; আমাদের পরনের কাপড়টিও সূর্য; আমাদের জ্বালানীর কয়লাও সূর্য; আবার আমাদের পাকস্থলীতে অবস্থিত পরিপাকশক্তি, তাও সূর্য। সূর্যই সব কিছু হয়েছে। সেই প্রবন্ধে বলা হয়েছে জীবন এবং আলো অঙ্গাঙ্গী জড়িত। সৌরজগতের সবকিছুই, এক সূর্যকিরণের ঘনীভূত নানান রূপ। যদি আপনি আরও এগোন তো দেখতে পাবেন, এই সব নানা বস্তুর ভিতর একমাত্র সেই অনন্ত আত্মা বা ব্রহ্মই বিরাজ করছেন। ১৬ সংখ্যক শ্লোকের এটিই মূল কথা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যা কিছু দেখছ, সব কিছুই আমি, সবকিছুই ব্রহ্ম। উপনিষদে বলা হয়েছে, *সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম,* 'এই ব্যক্ত বিশ্বের সবকিছুই ব্রহ্ম'। *বাসুদেব সর্বম্ ইতি,* 'এই বিশ্বের সবকিছুই বাসুদেব'। এই হলো অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি। সেই এক থেকেই সব কিছু এসেছে। অতএব, সবই স্বরূপত সেই এক। কার্যের মধ্যেই কারণ নিহিত। অতএব, আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন, কার্যের মধ্যে যা দেখছি, তা কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত এই বিশ্বে নতুন বলে কিছুই নেই। আধুনিক নভোবস্তুবিদ্যাও বলে যে, সেই আদিম উপাদান যা থেকে ধীরে ধীরে বিশ্ব বিকশিত হয়েছিল—সেটিকে ছাড়া এই বিশ্বে আর অন্য কিছু দেখতে পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। নিত্যতাতত্ত্বও সে কথা সমর্থন করে। নিত্যতা অর্থাৎ শক্তির নিত্যতা। একই শক্তি সামগ্রিকভাবে নিত্য বিরাজমান। এই শক্তি বাড়ানো বা কমানো যায় না। তবে নানাভাবে তাকে কাজে লাগানো যায়, এই যা। এই হলো চরম ঐক্য বা একত্বের ধারণা। বেদান্ত সেই কোন্ কাল থেকে বলে আসছে—'এই ব্রহ্মাণ্ড সেই শাশ্বত এক

থেকে এসেছে; সেই একেই আবার ফিরে যাবে।' আধুনিক বিজ্ঞানও মোটামুটি এই সার সত্যটিকে স্বীকার করছে। এই হলো অদ্বৈত দৃষ্টি, যা সব কিছুর মধ্যে সেই পরম একত্বকে দেখতে শেখায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে আমরা প্রকৃতির সঙ্গেও একাত্মতা অনুভব করি। যখন প্রকৃতিকে আমরা আমাদের থেকে পৃথক বলে মনে করি, তখন আমরা তাকে শোষণ করতে চেষ্টা করি, তাকে ধ্বংস করতে প্রয়াসী হই। কিন্তু যখন আমরা বুঝতে পারি যে, মূলত আমরা এক, তখন প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আচরণ বদলে যায়, প্রেম ও কল্যাণের ছায়াপাত ঘটে তাতে। আজকের সভ্যতায় এটির একান্ত অভাব। প্রাচীন সভ্যতায় কিন্তু মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা জানতো। বর্তমানে, আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে, এই বোধকে আবার জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চলছে। শ্রীকৃষ্ণ পরের শ্লোকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন,

পিতাঽহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

—'আমি এই জগতের পিতা—মাতা, ধাতা, পিতামহ, সেই (একমাত্র) জ্ঞেয় পরিশুদ্ধিকর বস্তু, (একাক্ষর) ওঁ, এবং ঋক্, সাম এবং যজুর্বেদও আমিই।'

আমিই সব। প্রথমত, *পিতা অহম্ অস্য জগতো*, 'আমি এই জগতের পিতা'। পিতারূপে ঈশ্বরের এই ধারণা আপনারা ইহুদী ধর্মে, খ্রিস্টান ধর্মে এবং ইসলাম ধর্মেও দেখতে পাবেন। *মাতা*, 'আমি এই জগতের মাতাও'। ঈশ্বরকে মাতারূপে কল্পনা কিন্তু শুধু ভারতীয় ধর্মে এবং আদিম ধর্মগুলিতেই দেখা যায়। *ধাতা* হলো 'যিনি আমাদের পরিপালন করেন'। তারপর, *পিতামহ*, 'পিতার পিতা'ও বটে। *বেদ্যং পবিত্রম্ ওঁকারঃ*, 'আমি সেই একমাত্র জ্ঞেয় সত্য, ওঙ্কার, যাকে জানলে মানুষ পবিত্র হয়'। জগতের যে-কোন জিনিস জানার চেষ্টা করুন, দেখবেন সেই জ্ঞান শেষ পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যাবে ঈশ্বরের দিকে। জগতের আপাতবিচিত্র সত্তাগুলির মূলে গিয়ে দেখুন; দেখবেন, সেই পরম ঈশ্বর বা ব্রহ্মই সেখানে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। অতএব, *বেদ্যম্* বা 'সর্বোত্তম জ্ঞেয় সত্য' হলেন তিনি, যিনি এই বিশ্বের কারণ এবং পালক। *পবিত্রম্*, 'পরম শুদ্ধ', পরম পবিত্র। *ওঁকারঃ*, 'সেই একাক্ষর ওঁ'। বর্তমান এই সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে এই *পবিত্রম্*, বা 'বিশুদ্ধতা' শব্দের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে, কারণ, যা কিছু *পবিত্রম্*, সে সবই আজ নির্বাসিত। আজ *পবিত্র* বলে কিছু নেই, এমন কিছু নেই যাকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি। সবকিছুই এখন জড়বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

থেকে ওজন করে দেখা হয়। আধুনিক সভ্যতার এটাই এক মস্ত দুর্বলতা। আপনি যখন আপনার মাকে শ্রদ্ধা করেন, তখন নিশ্চয় আপনি তাঁর ওপর একটা পবিত্রতার ভাব আরোপ করে থাকেন। আজকের সভ্যতায় এই শ্রদ্ধার একান্ত অভাব হয়েছে। বাবা-মা সম্পর্কে আমরা আজ যে ভাষা ব্যবহার করি, সেখানেও এই অপবিত্র ভাব বা অশ্রদ্ধার ভাব দেখা যাচ্ছে। মায়ের সম্পর্কে কোন ছেলে বা মেয়ে হয়তো বলে বসলো—'She is a good guy' অর্থাৎ 'মহিলাটি ভালো'। কোন আবেগ নেই, কোন কোমল অনুভূতি নেই। তাই বলছি, যা কিছু পবিত্র, সব যেন আজ দূরে সরে গেছে। এমনকি বিবাহিত জীবনেও পবিত্রতা বলে কিছু নেই। সবকিছুই নিতান্ত জাগতিক সম্পর্ক। জীবন থেকে সমস্ত পবিত্রতা ঘুচে যাওয়ায় জীবন হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায় গদ্যময়, লাবণ্যহীন এবং নিম্নস্তরের। এখানেই *পবিত্রতা* শব্দটির গুরুত্ব। মনে রাখতে হবে যে, এই বিশ্বের সব কিছুর মধ্যেই পবিত্রতার একটি কেন্দ্রবিন্দু আছে। তাকে বাদ দিলে চলবে না, তাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করবেন না। তাকে অবহেলা করলে সাংস্কৃতিক দৈন্য দেখা দেবে। তাই বলা হচ্ছে, *পবিত্রম্ ওঙ্কারঃ,* 'সেই পরম পবিত্র একাক্ষর ওঁ'। *ঋক্ সাম যজুরেব চ,* 'এবং আমিই *ঋগ্বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদ'।* আদিতে আমাদের এই তিনটি বেদই ছিল। পরে এল চতুর্থ বেদ, অর্থাৎ *অথর্ববেদ।* সেই থেকে চারটি বেদের চল। এরপর ভগবান বলছেন ঃ

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

—'আমি গন্তব্যস্থল, আমি পোষণকর্তা, আমি নিয়ন্তা, আমি দ্রষ্টা, আমি বাসস্থান, আমি আশ্রয়, আমি বন্ধু, আমি স্রষ্টা, আমি সংহর্তা, আমি আধার, আমি প্রলয়স্থান, আমিই অবিনাশী বীজ।'

এই শ্লোকে সেই পরম ব্রহ্মই বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছেন। *গতিঃ* অর্থাৎ লক্ষ্য; সমস্ত জগতের গতি বা লক্ষ্য সেই পরম ব্রহ্ম। *ভর্তা,* 'ভরণপোষণকারী'। *ভর্তৃ* মানে রক্ষা করা, লালন-পালন করা, পোষণ করা। অতএব, *ভর্তা* মানে লালন ও পালনকর্তা। *প্রভুঃ,* 'ঈশ্বর', চালক। *সাক্ষী,* অর্থাৎ 'দ্রষ্টা'। 'সূর্য কী? তিনি এই সৌরমণ্ডলের সাক্ষী। সৌরজগতে যা কিছু ঘটছে, সবই তিনি দেখতে পান। তাই তাঁকে বলা হয় *জগৎসাক্ষী,* অর্থাৎ 'জগতের দ্রষ্টা'। সেইরকম, ভগবানকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের *সাক্ষী* বলা হয়। সূর্য যেমন সমগ্র সৌরজগতের

সাক্ষী, তেমনি আমরাও আত্মারূপে এই জীবনে আমাদের সকল কর্মের সাক্ষী। আমরা এই আত্মাকে বলি *বুদ্ধিসাক্ষী*, অর্থাৎ 'আমাদের বুদ্ধির দ্রষ্টা'। আমাদের অন্তর্নিহিত আত্মা *বুদ্ধির* সমস্ত কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। তাই তাঁকে বলা হয় *সাক্ষী*। আমাদের বেদান্ত দর্শনে এই সাক্ষীর ধারণাটি এক কথায় অসাধারণ। সত্যি বলতে কি, যখনই আপনি নিরপেক্ষ বিচারের ক্ষমতা অর্জন করেন, তখনই আপনার ভূমিকাটি একজন সাক্ষীর। মনে করুন, কোন ঘটনা ঘটছে। আসক্তি যদি তখন আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে সে ঘটনার নির্ভুল বিচার আপনি করতে পারবেন না। একমাত্র মন আসক্তি থেকে মুক্ত হলে, তবেই আপনি ঘটনার যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারবেন। এই সামর্থ্য তখনই আসে, যখন আমরা আমাদের নিজেদের প্রকৃতিকে বুঝতে পারি, তার সাক্ষী হতে পারি। আসক্তি বা বিদ্বেষভাব দিয়ে না রাঙ্গিয়ে যেটা যেমন, তাকে সেভাবেই দেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আমাদের সকলের ভিতর যে আত্মা রয়েছেন, তিনি আমাদের সব কাজকর্মের *সাক্ষী* হতে পারেন; সে ক্ষমতা তাঁর আছে। মনে রাখতে হবে, সব নিরপেক্ষ বিচার, অনাবিল মূল্যায়ন কেবল সাক্ষীর পক্ষেই সম্ভব। অহংবোধ এ কাজ করতে পারে না। অহংবোধ সর্বদাই স্বার্থ দ্বারা চালিত হয়ে থাকে এবং তা দেহযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন এই আমাদের বৈদান্তিক মনোবিজ্ঞানে ও দর্শনে *সাক্ষী* অতি গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ এক উপলব্ধি। নিজের ভিতর এই *সাক্ষী*-ভাবটি গড়ে তুলুন, দ্রষ্টা হওয়ার চেষ্টা করুন। তা যদি করতে পারেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, সবকিছুকে আবেগবর্জিত দৃষ্টিতে দেখার ক্ষমতা আপনার আছে। এই সাক্ষী ভাবটি এমনই অসাধারণ যে, আপনি আড়ালে থেকে নির্লিপ্তভাবে আপনার নিজের মনকে, আপনার অনুরাগ-বিরাগকে, আপনার নির্বুদ্ধিতাকে—এক কথায় সবকিছুকেই লক্ষ্য করতে পারেন, যা অহং পারে না। অহং অন্যের ত্রুটিগুলিই দেখতে পায়, নিজেরটি নয়। অহং স্তিমিত হয়ে যখন সাক্ষী ভাবের বিকাশ ঘটে, তখনই কেবল আপনি আপনার নিজের ত্রুটিগুলি দেখতে পান। অতএব, আমাদের মধ্যে যদি সামান্য একটু সাক্ষী-সচেতনতাও গড়ে ওঠে, তাহলেই এক উচ্চতর জীবন, এক মহত্তর চেতনার দ্বার উন্মোচিত হবে। এই কারণেই সাক্ষীর ধারণাটি গড়ে উঠেছে। ভগবানকে *বুদ্ধিসাক্ষী* অর্থাৎ এই জগতের যাবতীয় *বুদ্ধির* সাক্ষিস্বরূপ মনে করা হয়। বাস্তবিক, এমন একজন আছেন, যিনি আপনার মন, আমার মন, জগতের সকল মনের সাক্ষী। তিনি ঈশ্বর। অতএব, ঈশ্বরের একটি দিক হলো এই *সাক্ষিভাব* এবং মানুষেরও একটি দিক হলো ঐ *সাক্ষিভাব*। *নিবাস* অর্থাৎ

'বাসস্থান'। আমাদের বাসস্থানও এই ঈশ্বর। *শরণম্* অর্থাৎ 'শেষ গতিস্থল', যেখানে আমরা আশ্রয় নিতে পারি। তারপর বলা হচ্ছে, *সুহৃৎ* অর্থাৎ 'যথার্থ বন্ধু'। বস্তুত তিনিই আমাদের একমাত্র বন্ধু। *সুহৃৎ* বলতে তাকেই বোঝায়, যে আমাদের 'বন্ধু'। সবসময়ে আপনি যখন ঈশ্বরকে *সুহৃৎ* মনে করেন, তখন তিনি একেবারেই আপনার কাছের মানুষ, অতি আপনজন হয়ে ওঠেন। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের দ্বিতীয় ছত্রে এর উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

সে যাই হোক, এরপর আলোচ্য শ্লোকে বলা হয়েছে *প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্*, 'আমি সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান।' আমার থেকেই এই বিশ্বের উদ্ভব, তাই বলা হচ্ছে *প্রভবঃ;* আবার অন্তিমে এই বিশ্ব আমাতেই বিলীন হয়, তাই আমাকে বলা হয় *প্রলয়ঃ স্থানম্। নিধানং বীজম্ অব্যয়ম্; নিধানম্* অর্থাৎ 'ভাণ্ডার'; *অব্যয়ম্ বীজম্*, এই জগতের 'অপরিবর্তনীয় বীজ'। সাধারণ বীজ কখনই অপরিবর্তনীয় হতে পারে না। সেগুলি সবই পরিবর্তনশীল। অঙ্কুর বেরুলেই বীজ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এখানে এমন এক বীজের কথা বলা হচ্ছে, যা 'অপরিবর্তনীয়', যা *অব্যয়।* সাধকেরা এই শ্লোকটির বহুরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য, স্বামী তুরীয়ানন্দ, এই শ্লোকটির খুবই অনুরাগী ছিলেন।

এই ঐশী সত্তাই সবকিছু চালাচ্ছেন। কীভাবে? তার উত্তরে বলছেন ঃ

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯ ॥

—'হে অর্জুন, (সূর্যরূপে) আমি তাপ বিকিরণ করি; জল আকর্ষণ ও বর্ষণ করি; আমি অমরত্ব, আবার মৃত্যুও; আমিই স্থূল এবং সূক্ষ্ম বস্তু।'

হে অর্জুন, আমিই এই সব হয়েছি। এইগুলি কী? *তপামি অহম্*, 'আমি তাপ বিকিরণ করি'। আমিই সৌরতাপের উৎস। আবার *বর্ষম্*, 'বৃষ্টিও'। নির্দিষ্ট ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে। *নিগৃহ্ণামি উৎসৃজামি চ*, 'আমি তাপ এবং বৃষ্টি দিই, আবার আমিই তাদের প্রত্যাহার করে নিই'। ঋতু অতিক্রান্ত হলে এই সবই আমাতে ফিরে যায়। যথা সময়ে তারা আবার ফিরে আসে। অতএব, আসা এবং যাওয়া দুই-ই আমার থেকে। *অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ,*

'আমি অমরত্ব, আবার আমিই মৃত্যু'। সেই পরম সত্তা অমরও বটে, মরণশীলও বটে। দুই-ই তিনি। মৃত্যুর পৃথক সত্তা নেই। অমরত্ব এবং মৃত্যু, একই সত্যের এপিঠ ওপিঠ। ঋগ্বেদ সংহিতাতেও (১০.৮.১২১) আছে, *যস্য ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ*. 'অমরত্ব এবং মৃত্যু যার ছায়া'। কাজেই, জীবন এবং মৃত্যু দুটি আলাদা বস্তু নয়। *হিন্দু সনাতন ঐতিহ্যে শয়তানের কোন স্থান নেই।* একটিমাত্র সত্যই রয়েছে। 'যত পাপ সব শয়তানের, আর যত পুণ্য তা সবই ঈশ্বরের'—এই ধরনের কথা আমরা বিশ্বাস করি না। বাস্তবিক, ভালো এবং মন্দ, এগুলো আপেক্ষিক শব্দমাত্র। একই জিনিস কখনও ভালো, আবার কখনও মন্দ বলে প্রতিভাত হতে পারে। কোন কিছুই অবিমিশ্র ভালো বা অবিমিশ্র মন্দ, তা নয়। আজ যা মন্দ মনে হচ্ছে, কালই তা ভালো মনে হতে পারে। সাপের বিষের কথাই ধরুন। এমনিতে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু সাপের তাতে কিছুই হয় না। ওটা তার প্রকৃতি। সে নিজের বিষে কখনওই মারা যায় না। আমরা আবার সেই বিষ দিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করি। তখন, তা আমাদের কল্যাণই করে। অতএব, এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে যেটাকে আপনি দোষ বলে মনে করছেন, সেটাই ভালো প্রতিপন্ন হতে পারে। আবার যেটাকে ভালো মনে করছেন, সেটাই হয়তো মন্দ হয়ে গেল। অতএব, এগুলি সবই আপেক্ষিক ব্যাপার। একই বস্তু এক ক্ষেত্রে ভালো, আবার অন্য ক্ষেত্রে খারাপ। আমাদের ঐতিহ্যে তাই ভালো এবং মন্দের দ্বৈত সত্তা কখনওই স্বীকৃত হয়নি। ব্যবহারিক জীবনে আমরা নিশ্চয় পার্থক্য বিচার করে বলি—এটা ভালো বা এটা মন্দ। এই বিচার ঠিকই আছে। একটা সাপ সামনে এলে যদি কেউ বলেন, 'জগতের সবকিছুই ভালো, অতএব এটা ধরুন'—আমরা সেকথায় মোটেই কর্ণপাত করি না। আমরা দূরেই দাঁড়িয়ে থাকি। কারণ সাপটা আমাদের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু পারমার্থিক সত্য হলো এই যে, যা মন্দ তা আবার ভালোও হতে পারে। আজ অথবা কাল, তাদের রূপ বদলে যেতে পারে। এই চেতনা আমাদের থাকা চাই। এই চেতনা ধরে রেখে সংসারের সব কাজ করে যেতে হবে। এইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'সকল জীবের মধ্যেই নারায়ণ আছেন, একটি বাঘের মধ্যেও'। এর অর্থ এই নয় যে, তুমি বাঘের কাছে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করবে, কারণ, সেই বাঘ তোমার পক্ষে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, এমনকি তোমাকে হত্যাও করতে পারে। তবুও সত্য এই যে, সেই এক ঈশ্বর বাঘের মধ্যেও আছেন। অতএব, দূর থেকেই বাঘ-নারায়ণকে নমস্কার করা ভালো। কিন্তু একটা বাঘের বাচ্চাকে আপনি কোলে নিতে পারেন, তার সঙ্গে খেলাও করতে

পারেন; সে আপনার কোন ক্ষতি করবে না। জল অবশ্যই নারায়ণ। কিন্তু কোন জল পা ধোবার, কোন জল চান করবার, কোন জল পান করবার। সব জল সবসময় ব্যবহার করা চলে না। অতএব, ব্যবহারিক জগতে পার্থক্য আছেই, তবে তার পিছনে ঐক্যও আছে। আমাদের ঋষিরা সেই সত্যই আবিষ্কার করেছিলেন ঃ প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য। *সৎ অসৎ চ অহম্ অর্জুন,* 'হে অর্জুন, আমি *সৎ* এবং *অসৎ* দুই-ই'। *সৎ* মানে 'দৃশ্যমান স্থূলবস্তু', *অসৎ* মানে 'অদৃশ্য সূক্ষ্ম বস্তু'। আমি এই দুই-ই। *সৎ* মানে আবার 'কার্য', *অসৎ* মানে 'কারণ'। এই দুটি অর্থেই শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়। যা আপনি প্রত্যক্ষ করেন, তা হলো কার্য। তা হলো *সৎ*/ আর এই কার্যের পিছনে যাকে আপনি প্রত্যক্ষ করতে পারেন না, তা হলো কারণ, তা হলো *অসৎ*। কাজে কাজেই, একটা ক্ষেত্রে তাকে আমরা *অসৎ* বলতে পারি। অন্য একটি ক্ষেত্রে বলি—সেই বস্তু যা আছে এবং সেই বস্তু যা নেই। *সৎ* মানে 'অস্তিত্বশীল', *অসৎ* মানে 'অস্তিত্বহীন'। আমি দুই-ই। কারণ সবকিছুই এক। জগতের আপাতবৈচিত্র্য ও বহুত্বের পিছনে যে পরম একত্ব রয়েছে, সেটিই মূল কথা।

এরপর গীতা বলছেন, স্বর্গ কামনা করে যাঁরা বিভিন্ন দেবতার পূজাঅর্চা করেন, তাঁরা নিতান্তই সাধারণ শ্রেণির ভক্ত ঃ

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

—'ত্রিবিধ বেদের জ্ঞাতারা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমার পূজা করেন এবং সোমরস পান করে পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন। দেবলোকে গিয়ে তাঁরা দেবভোগ্য যাবতীয় সুখ উপভোগ করে থাকেন।'

যাঁরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করেন, তাঁরা সেখানে গিয়ে সীমিতকাল সেই সুখ উপভোগ করেন। সীমিত কারণের ফল কখনওই অসীম হতে পারে না। কারণ যদি সীমিত হয়, তার ফলও সীমিত হতে বাধ্য। অতএব, আপনি স্বর্গে যেতে পারেন; সেখানে গিয়ে সবরকম সুখভোগও করতে পারেন, কিন্তু তারপর আপনাকে সংসারে ফিরে আসতেই হবে। পরবর্তী শ্লোকে বলা হচ্ছে,

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

—'সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করার পর, তাঁদের অর্জিত পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হলে, তাঁরা আবার মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। এইভাবে, তিনটি (বেদের) নির্দেশ অনুসরণকারী ভোগবাদীরা (নিরন্তর) যাওয়া আসা করে থাকেন।'

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম্, 'সেখানে, তাঁরা সুবিশাল *স্বর্গলোক* ভোগ করার পর'; *বিশালম্*, 'বিস্তৃত'; *ক্ষীণে পুণ্যে*, 'যখন তাঁদের সকল পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়', আপনার পুণ্যের পুঁজি শেষ হলে; *মর্ত্যলোকং বিশন্তি*, 'আপনাকে ফের এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হবে, এক নতুন শরীর ধারণ করে আবার সংগ্রাম শুরু করতে হবে। সত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান না থাকায় আধ্যাত্মিক অজ্ঞতার স্তরে এই হলো মানব জীবনের প্রকৃতি। *এবং ত্রয়ীধর্মম্ অনুপ্রপন্না*, 'এইভাবে যাঁরা তিন বেদের উপদিষ্ট ধর্ম অনুসরণ করেন', অর্থাৎ কর্মকাণ্ড বা বেদের আচার অনুষ্ঠান-মূলক অংশের অনুসরণ করেন। এঁরা শুধুমাত্র পুণ্য অর্জন করে স্বর্গে যাওয়ার আশাতেই এ-দেবতা সে-দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেন। শ্রীকৃষ্ণ আগেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়টির উল্লেখ করে বলেছেন যে, এঁরা কখনওই মনের সেই স্থিরতা অর্জন করতে পারেন না, যা একমাত্র উচ্চতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি থেকেই আসতে পারে। *ক্ষীণে পুণ্যে*, 'পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হলে'; *পুণ্য*-এর একটা সীমা আছে; আপনি কত পুণ্যকর্ম করতে পারেন? *পুণ্যের* পুঁজি বাড়ানোর জন্য কত আর যজ্ঞ আপনি করবেন? হ্যাঁ, স্বর্গলাভের চেষ্টা আপনি অবশ্যই করতে পারেন এবং সেখানে গিয়ে আনন্দ উপভোগও করতে পারেন। কিন্তু পুণ্যফলের ভোগ শেষ হয়ে গেলে আর আপনি সেখানে থাকতে পারবেন না। *মর্ত্যলোকং বিশন্তি*, 'আপনাকে এই *মর্ত্যলোকে*, অর্থাৎ মরজগতে ফিরে আসতে হবে'। *এবং ত্রয়ীধর্মম্ অনুপ্রপন্না*, 'যাঁরা এভাবে তিনটি বেদে উপদিষ্ট *ধর্ম* অনুসরণ করেন'; *ত্রয়ী, ত্রি*, মানে 'তিনটি' বেদ অর্থাৎ—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ—এই তিনটি। যাঁরা এই তিন বেদের ওপর নির্ভর করে তাদের নির্দেশ অনুযায়ী যাগযজ্ঞ করেন, তাঁদের কী হয়? *গতাগতম্*, 'তারা সর্বদাই যাওয়া-আসা করতে থাকেন।' কিন্তু কেন? *কামকামা*, কারণ তাঁরা 'ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগ কামনায় পরিপূর্ণ'। কামনার পর কামনা। আমি এটা ভোগ করব, আমি ওটা

ভোগ করব, এই হলো তাঁদের ভাব। তাই বলা হচ্ছে *কামকামা। গতাগতং লভন্তে,* 'তাঁরা নিরন্তর যাওয়া-আসা করতে থাকেন'। উপনিষদ বলেন, এটা জীবনের খুব সুখপ্রদ অবস্থা নয়। এই কারণে উপনিষদগুলিতে *জ্ঞানকাণ্ড*-এর বিকাশ ঘটেছে—যেখানে জ্ঞান—অর্থাৎ সত্যকে কীভাবে বোঝা যায়, তার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সত্য কী, স্বর্গ কোথায়?—এইসব প্রশ্ন নিয়ে সেখানে আলোচনা করা হয়েছে। ঘটনা এই, *আপনার* মধ্যেই সেই অনন্ত স্বর্গ রয়েছে। সেই অসীম সত্যকে অগ্রাহ্য করে আপনি এখানে-সেখানে ছুটে বেড়াচ্ছেন, সামান্য একটু পার্থিব সুখের আশায়; সেটা ঠিক নয়। কাজেই, উপনিষদ এই স্বর্গ টর্গকে বিশেষ মূল্য দেয়নি। *গীতাও* তাই করেছে। উপনিষদ এবং গীতার বক্তব্য—আপনার অনন্ত আত্মাকে উপলব্ধি করে এই পৃথিবীতেই স্বর্গ রচনা করুন। আমাদের পুরাণগুলিরও সেই এক সুর। পরবর্তিকালে, *জ্ঞান* ও *ভক্তি*-র শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ায় এই স্বর্গ নিয়ে মাতামাতি কমেছে। জ্ঞান ও ভক্তিশাস্ত্রগুলির বক্তব্য এই যে, এই স্বর্গ এই পৃথিবীতে এবং এই জীবনেই আপনি লাভ করতে পারেন। ঈশ্বরের আরাধনা করে, সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে, সকলের সেবা করে, এই পৃথিবীতেই আপনি স্বর্গলোক রচনা করতে পারেন। তাই, *বিষ্ণুপুরাণ* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ*-এ বলা হয়েছে, স্বর্গের দেবতারাও এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করতে চান। একবার স্বর্গের দেবসভায় তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, অর্জিত পুণ্য ক্ষয় হয়ে যখন তাঁদের স্বর্গের জীবন শেষ হবে, তখনও যদি কিছুমাত্র পুণ্য অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই সুবাদে তাঁরা যেন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তি এবং জ্ঞানমার্গী দর্শনের মাধ্যমেই এই ধারণা এসেছে। মহান জ্ঞানী এবং ভক্তরাই এই দেশের মাটিকে পূত এবং পবিত্র করে তুলেছেন। তাই আমরা ভারতবর্ষকে *পুণ্যভূমি* বলে থাকি। কত ঋষি, কত পুণ্যাত্মা এদেশে বাস করেছেন! এখানকার প্রতিটি ধূলিকণাও পবিত্র। ভারত যে পুণ্যভূমি, এই ধারণাটি পুরাণগুলির থেকেই এসেছে। তাই, কিছু মানুষ যেমন স্বর্গে যাওয়ার জন্য লালায়িত, তেমনি তার বিপরীত ভাবটিও দেখা যায়—দেবতারা ভারতবর্ষে মানুষ হয়ে জন্মাতে চান। যাঁরা স্বর্গে যেতে ব্যগ্র, তাঁরা জানেন না যে, এই পৃথিবী স্বর্গের থেকে বহুগুণে শ্রেয়। *গতাগতম্ কামকামা লভন্তে,* 'অন্তর ভোগের ইচ্ছায় পরিপূর্ণ বলে সংসারে গতাগতি তাঁদের চলতেই থাকে'। এইভাবে, বেদের শেষ ভাগ, অর্থাৎ উপনিষদগুলি স্বর্গগতির তুচ্ছতাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'এখানেই' *ইহৈব, ইহৈব,* এই দেহে, এই পৃথিবীতেই আপনি সেই পরম বস্তু উপলব্ধি করতে

পারেন। তার জন্য এখানে-ওখানে ছোটাছুটি কেন? স্বর্গ আপনার ভিতরেই আছে। যিশুও বলেছেন, 'ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তো তোমারই হৃদয়ে।' বাস্তবিক, সেই অনন্ত এবং অবিনাশী আত্মা হলো আপনার যথার্থ স্বরূপ। সেই স্বরূপকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করুন। নিজের আত্মাকে সকল জীবের মধ্যে দেখুন। স্বদেশকে স্বর্গ করে তুলুন। *ভক্তি* এবং *জ্ঞানের* সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে এবং তা আজও অব্যাহত। কিছু লোক আজও স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছাকে আঁকড়ে থাকলেও, এই প্রবণতা আজ অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, *'হোথা হোথা' অজ্ঞান, 'হেথা হেথা' জ্ঞান।* দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২/৪২) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদবাদরতাঃ পার্থ নানাদন্যীতিবাদিনঃ,* 'যারা বেদের (আচারমূলক) উক্তিগুলির দ্বারা আচ্ছন্ন এবং তার বাইরে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই বলে মনে করেন' এবং *ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাম্,* 'যাঁদের মন ইন্দ্রিয়-উপভোগ এবং ঐশ্বর্যে আসক্ত', সেই সব মানুষ, *ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে,* 'কখনওই দৃঢ় চিত্ত, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অধিকারী হতে পারেন না এবং সমাধিস্থ হয়ে কখনওই আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন না।' উপনিষদেও স্বর্গলিপ্সাকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। *মুণ্ডক উপনিষদ* বলছেন ঃ 'মূর্খরাই কেবল ঐরকম স্বর্গ স্বর্গ করে।' তাই, এখানে এই জীবনেই সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করুন। *গীতাও* বলেছেন, *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো,* 'এখানে, এই জীবনেই তাঁরা সব আপেক্ষিকতা এবং সীমাবদ্ধতাকে জয় করেছেন'। কীভাবে? প্রত্যেক জীবের মধ্যে এক আত্মাকে দর্শন করে।

অতএব, এই জ্ঞান ও ভক্তির গভীর শিক্ষা পরবর্তিকালে প্রসারিত হয়ে ভারতের সব ধর্মকেই প্রভাবিত করেছে এবং বর্তমানে এই ভাবধারা শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের মাধ্যমে উত্তাল হয়ে উঠেছে। তাঁদের বাণী—এই পৃথিবীকেই স্বর্গ করে তোলো। বলা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে *সত্যযুগ* প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন। বাংলার বিপ্লবী মুসলমান কবি, প্রয়াত কাজী নজরুল ইসলাম, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের উপর দুটি গান লিখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক গানে তিনি বলেছেন, *'সত্যযুগের পুণ্যস্মৃতি কলিতে আনিলে তুমি তাপস।'* আহা, কী সুন্দর ভাব! স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, *'ভারতে আনিলে তুমি নববেদ, মুছি দিলে জাতিধর্মের ভেদ।'* তাই দেখা যায়, মহান আচার্যরা আবির্ভূত হয়ে এই পৃথিবীকে পবিত্র করেন এবং তাঁরা আমাদের এমন এক বাণী দিয়ে যান, যা অনুসরণ করে, চারিত্রিক রূপান্তর ঘটিয়ে, আমরা

এই পৃথিবীতেই স্বর্গরচনা করতে পারি এবং তা করা যায় *ভক্তি এবং জ্ঞান* লাভ করে। আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সকলের সামনে এই লক্ষ্যের কথাই বলে গেছেন। সব কিছুই এখানে, এখানে, এখানে। সেই চরম সত্যও এখানেই আছে। তাকে লাভ করতে কেন আমরা বহু দূরে যাব? উপনিষদগুলি এইভাবেই মানুষের মহত্ত্বের কথা, তার অনন্যতার কথা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। মানুষ দেবতা এবং দেবদূতদের থেকেও বড়। মানুষের যে কী মহিমা, তা ইসলাম ধর্মেও একটি গল্পের মাধ্যমে বলা হয়েছে। গল্পটি এই ঃ মানুষ সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর দেবদূতদের নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন মানুষের কাছে নতশির হন। একজন দেবদূত সে আদেশ অগ্রাহ্য করলে ঈশ্বর তাঁকে অভিশাপ দেন এবং সে শয়তানে পরিণত হয়। সে যাই হোক, ঈশ্বর যে মানবদেহে অবতীর্ণ হন, তা থেকেও মানুষের কী উত্তুঙ্গ মহিমা, তা বোঝা যায়। কী দৈবী ব্যক্তিত্বসম্পন্নই না শ্রীরামকৃষ্ণ, যিশু, বুদ্ধ—এঁরা একেক জন কী আকাশ-ছোঁয়া দিব্য ব্যক্তিত্ব! কিন্তু তাঁরাও আমাদের মতোই দেহধারী মানুষ, যদিও তাঁদের অসাধারণত্ব আমাদের বিস্মিত করে। তাই এখন থেকে গীতায় জোর দেওয়া হবে, কীভাবে এই পৃথিবীতেই জীবনকে পবিত্র এবং ঈশ্বরমুখী করে তুলে সুখী মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়, তার ওপর। এই হলো গীতার উদ্দেশ্য। গীতা দেখাতে চান যে, ধর্ম বিশুদ্ধ অথচ বাস্তবধর্মী হবে। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক কেবল তখনই সুখের হতে পারে, যখন মানুষ সর্বত্র সেই ঐশী স্ফুলিঙ্গ দেখতে পায়। কেবল তখনই তার হৃদয় থেকে প্রেম স্ফুরিত হতে পারে। যদি সকলেই পরস্পরকে ভালবাসতে পারেন, যদি মহৎ সব চরিত্রের আবির্ভাব হয়, তাহলে এই পৃথিবীই একদিন স্বর্গ হয়ে উঠবে। এছাড়া আর স্বর্গ কী? এই তো স্বর্গ। অন্য যে স্বর্গের স্বপ্ন আমরা দেখি তা তো শুধুই প্রমোদ-কানন, আরো বেশি সুখভোগে পরিপূর্ণ, এই যা। সেখানে আত্মবিকাশের কোন সুযোগ নেই, উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। বস্তুত একথা বলা হয় যে, স্বর্গে কেউ নতুন কর্মফল সঞ্চয় করতে পারে না। শুধু যে-সব শুভকর্মের ফল আমরা জমিয়েছি, সেটুকুই সেখানে ভোগ করতে পারি। সেখানে নতুন পুণ্য অর্জন করা যায় না। এই কারণেই পৃথিবীকে *কর্মভূমি* বলা হয় এবং স্বর্গকে বলা হয় *ভোগভূমি।* এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *গতাগতং কামকামা লভন্তে,* 'যাঁদের মন ভোগবাসনায় পূর্ণ, তাঁরা বারবার আসা-যাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেন।' প্রাচীন হিন্দু মনীষীরা এই বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আধুনিক মার্কিন সমাজও এটি হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৎকালীন অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির মূল্যায়নের জন্য যে হুভার কমিটি (Hoover Committee) গঠিত হয়েছিল, সেই কমিটির রিপোর্টে সত্যের এই বাস্তব দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছিল ঃ

'এতদিন যা কেবল তত্ত্বগতভাবে জানা ছিল, এই সমীক্ষা তার সত্যতা চূড়ান্তরূপে প্রমাণ করেছে এবং দেখেছে যে, মানুষের বাসনার নিবৃত্তি হওয়া প্রায় অসম্ভব; এক বাসনা মিটলে তার জায়গায় আর এক বাসনা এসে জোটে। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের সামনে অবাধ ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, কারণ এমন কোন কামনা নেই, যা পরিতৃপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য আর একটি নতুন কামনার জন্ম দেয় না।'

মানুষ নিতান্তই জড় বস্তুর দাস হয়ে উঠেছে। এরই নাম *সংসার।* আজকের সমাজে এটিই বড্ড বেশি দেখা যাচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। নাহলে আমাদের মুক্তি কোথায়? ভোগের স্পৃহা নাকে দড়ি দিয়ে ঘোড়া বা ষাঁড়ের মতো আমাদের নাচাচ্ছে, বিভিন্ন দিকে ছুটিয়ে মারছে। এর কারণ কী? কারণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি অদম্য লোভ। আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এইভাবেই ধীরে ধীরে মানুষের আন্তর মহিমার মর্মোপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। তাঁরা যেন বুঝতে পারছেন, মানুষের অন্তরে একটা এমন কিছু বস্তু আছে, যা লাভ করলে মানুষ, আত্মার যথার্থ স্বরূপ যে *সৎ, চিৎ এবং আনন্দ,* অর্থাৎ অস্তিত্ব, চৈতন্য এবং আনন্দ, তাকে উপলব্ধি করে আপ্তকাম হতে পারে। আত্মাকে উপলব্ধি করলে বা উপলব্ধির পথে অগ্রসর হলে, এই জড় বস্তুজগৎ নিতান্ত তুচ্ছ ও শিশুসুলভ মনে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক ভজনে একটি পংক্তি আছে ঃ *সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোষ্পদ বারি যথায়।* এ যেন উপনিষদের বাণীগুলির মতোই এক মহাবাক্য। অতি গভীর তাৎপর্য এ কথার। *সম্পদ তব শ্রীপদ,* 'তোমার শ্রীচরণরূপ মহান সম্পদ পেলে', তখন আমরা কী অনুভব করি? *ভব,* অর্থাৎ 'এই বিশ্বসংসার'; *গোষ্পদ বারি যথায়,* 'একটা গোষ্পদের মতো অকিঞ্চিৎকর বলে বোধ হয়'। আপনি যখন ভগবানের শ্রীচরণে আশ্রয় পান, তখন জগতের সব আকর্ষণ আপনার কাছে গোষ্পদের মতো তুচ্ছ মনে হবে। গরু মেঠো পথ দিয়ে চলে গেলে খুরের চাপে একটি অগভীর গর্তের সৃষ্টি হয়। সেই ছোট্ট গর্তে কখনও কখনও সামান্য একটু জল জমে। একে

গোষ্পদবারি বলা হয়। বেদান্তও বলে, *ব্রহ্মাণ্ডং গোষ্পদায়তে,* 'সমগ্র *ব্রহ্মাণ্ড* বা বিশ্বসংসার একটি গোষ্পদের ন্যায় প্রতিভাত হয়।' এই হলো বৈদান্তিক শিক্ষা এবং মানুষের জীবনে এটি সত্য হতেও দেখা যায়। যাঁরা পরম সত্য উপলব্ধি করেন, তাঁদের কাছে আর এই বস্তুজগতের কোন আকর্ষণ থাকে না। সাধারণ ভোগের বস্তু তখন তাঁদের কাছে তুচ্ছ মনে হয়। কারণ তাঁরা মহত্তর ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছেন। সেই পারমার্থিক বস্তুর সঙ্গে কি কোন পার্থিব বস্তুর তুলনা চলে? এ প্রসঙ্গে এক খ্রিস্টান সন্তের একটি উক্তি মনে পড়ছে। সেই খ্রিস্টান সন্তের এক ধনী ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধু সন্ন্যাসীর অন্য এক বন্ধুকে বলেছিলেন যে, যখন তাঁর মৃত্যু হবে, তখন তিনি সমস্ত টাকাপয়সা সেই সন্ন্যাসী বন্ধুটিকে দান করবেন। এই কথা শুনে সেই দ্বিতীয় বন্ধুটি সন্ন্যাসীর কাছে গেলেন এবং সমস্ত কথা তাঁকে জানালেন। সব শোনার পর সেই সন্ন্যাসী উত্তর দিয়েছিলেন, 'ও কি জানে না যে, ওঁর আসন্ন মৃত্যুর অনেক আগেই আমার মৃত্যু ঘটে গেছে'! একই কথা—*ব্রহ্মাণ্ডং গোষ্পদায়তে!* কী আশ্চর্য এই দৃষ্টিভঙ্গি! এ কথা যখন আপনি বলতে পারবেন, তখন আপনি কত বড় মাপের মানুষ হয়ে গেছেন! এই ভোগসুখ, ক্ষমতা, নামযশ, তখন এগুলি সবই আপনার কাছে মূল্যহীন। কিন্তু জীবনের শুরুতেই আমরা ওকথা বলতে পারি না। আমরা এগুলি পাওয়ার চেষ্টা করি, তাতে কোন দোষ নেই। যেখানে আছেন, সেখান থেকেই শুরু করুন। কিন্তু মনে রাখবেন, জীবনের আরও এক উচ্চতর অবস্থা আছে। যখন সে বিষয়ে জ্ঞান হবে, তখন এই সমস্ত কিছুকে আপনি খড়কুটো জ্ঞান করবেন। এই হলো বৈদান্তিক শিক্ষা। বেদান্ত একথা বলে না, ক্ষমতা, ভোগসুখের পিছনে আপনি ছুটবেন না। না। চাইলে আপনি ছুটতে পারেন, কিন্তু চোখ খোলা রাখুন। একটা সময় আসবে যখন আপনি বুঝবেন যে, জাগতিক এসবের কোন মূল্য নেই। উচ্চতর কিছু তখন আপনাকে আকর্ষণ করবে। সেই আহ্বান যখন আসবে, দেখবেন, তাতে যেন সাড়া দিতে পারেন। সংসারে বাস করুন, কিন্তু সংসারে ডুবে যাবেন না। প্রত্যেক মানুষের কাছে এটাই বেদান্তের সতর্কবাণী।

উপনিষদগুলিতে সমস্ত আচারমূলক ধর্মের পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং সেখানে ঋষিরা দেখেছেন যে, এই আচারসর্বস্বতা এবং এই স্বর্গলাভের প্রচেষ্টা নিতান্তই ছেলেমানুষী। তাই তাঁরা জ্ঞানপথ বেছে নিয়েছিলেন। জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান; এই জ্ঞান যে, আত্মা প্রত্যেকের অন্তরে নিহিত দিব্য স্ফুলিঙ্গস্বরূপ, এবং এই আত্মজ্ঞানে প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার। এ হলো আধ্যাত্মিক

বিকাশের একটি ধারা। এর সঙ্গে অতি শীঘ্রই যুক্ত হলো অন্য একটি ধারা, যার নাম *ভক্তি*, ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধা ভক্তি। আচার্য রামানুজ ঈশ্বর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, ঈশ্বর হলেন সুন্দরতম দিব্য সত্তা, *অনন্ত-কল্যাণ-গুণ-সম্পন্ন পুরুষ*। সেই সগুণ ঈশ্বরকে ভালবাসা আর অনন্ত ব্রহ্মকে ভালবাসা—একই কথা। কেবল মনে রাখতে হবে, সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্ম সত্তার সগুণ ভাবটিকে কেন্দ্র করেই ভক্তির বিকাশ। তাই *জ্ঞান* ও *ভক্তি*, আধ্যাত্মিক বিকাশের এই দুটি ধারাই একদিকে যেমন স্বর্গের কল্পনাকে ম্লান করে দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়িকেও অপ্রয়োজনীয় প্রতিপন্ন করেছে। এই *ভক্তিধর্ম* আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণাকে অনেকটা উদার করেছে এবং সকলের জন্যই মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

এই হলো স্বর্গে যাওয়ার বাসনা ও সাধনা সম্পর্কে উপনিষদ এবং গীতার মূল্যায়ন। তাই পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ (২২ সংখ্যক) শ্লোকে বলা হয়েছে যে, *পরাভক্তি এই পৃথিবীতে এবং এই জীবনেই মানুষ লাভ করতে পারে।* প্রথম দিকে ভক্তের বেশ আমিত্ব-বোধ থাকে। তবুও সে ভক্ত। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে সে যতই এগিয়ে যায়, ততই তার অহংবোধ ক্ষীণতর হতে থাকে। শেষে এই অহং সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। তখন আর 'আমি' নয়, তখন কেবল 'তুমি'। New Testament-এ যেমন বলা হয়েছে 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' ভক্তের জীবনে এটি হলো একেবারে শেষের কথা। সব কিছুই ঈশ্বরের, আমি কিছুই নই। এভাবে অহং যখন সম্পূর্ণ মুছে যায়, তখনই ভক্তের হৃদয় জুড়ে ভগবান বিরাজ করেন। সেই পর্যায়ে ভক্তের আমূল রূপান্তর ঘটে যায়। আমরা নিজেদের স্বার্থে কাজ করি, অর্থ উপার্জন করি, ব্যাঙ্কে টাকা জমাই। এসব তো বটেই, আরও বহু কিছুই আমাদের করতে হয়, কারণ আমাদের মধ্যে কমবেশি অহংবোধ রয়েছে। কিন্তু ভক্তের জীবনে একটা সময় আসে, যখন তার এই দেহকেন্দ্রিক অহংবোধ বিলুপ্ত হয়ে যায়; তখন তার হৃদয় জুড়ে কেবল ঈশ্বর। সে অবস্থা এলে ঈশ্বরই আপনার জন্য সব কিছু করবেন। তখন আর নিজের জন্য আপনাকে কিছুই করতে হবে না। কিন্তু এ অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা। হিন্দু, খ্রিস্টান অথবা মুসলমান—সকল ধর্মেই কোন না কোন মরমীয়া সাধকের এইরকম উচ্চ অবস্থা দেখা গেছে। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। পরের শ্লোকে এই উচ্চাবস্থার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ

**অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২ ॥**

—'যাঁরা আত্মভাবে আমার ধ্যান করে, সব কর্মের দ্বারা আমার উপাসনা করে নিরন্তর যোগে প্রতিষ্ঠিত, আমি তাঁদের অপ্রাপ্তবস্তু বহন (প্রদান) করি এবং প্রাপ্তবস্তু রক্ষা করি।'

এ এক অসাধারণ প্রতিশ্রুতি! মহাভারতের *শান্তিপর্বেও* ভীষ্মের মুখে এ রকম একটি কথা পাবেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্,* 'যাঁরা কেবল আমার কথাই চিন্তা করেন, অন্য কোন কিছুর নয়'; অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি যাঁরা একাগ্র-চিত্ত তাঁরা হলেন *অনন্যাঃ;* অর্থাৎ 'সেখানে অন্য আর কেউ নেই।' এই রকম ভক্ত বলেন—'ঈশ্বরই আমার সর্বস্ব'। *যে জনাঃ পর্যুপাসতে,* 'যাঁরা এই মনোভাব নিয়ে আমার উপাসনা করেন', এইরকম একাগ্র চিত্তে; *তেষাম্,* 'তাঁদের'; তাঁরা করা? *নিত্যাভিযুক্তানাম্,* যাঁরা *নিত্য অভিযুক্তাঃ,* 'নিরন্তর যোগে সমাহিত'; অর্থাৎ যাঁরা অনুভব করেন যে, একমাত্র ঈশ্বরই তাঁদের ভিতর আছেন, তাদের পৃথক সত্তা অন্তর্হিত হয়েছে। *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্,* 'আমি তাঁদের যা আছে, তা রক্ষা করি এবং তাঁদের যা দরকার, তা দিয়ে থাকি।' তাঁদের প্রয়োজন, তাঁদের অভাব সব আমি দূর করি। কারণ তাঁদের সব দায় আমার। স্বয়ং ঈশ্বর এভাবে ভক্তের দাসে পরিণত হন। ভক্তের কোন দুশ্চিন্তা থাকে না।

এই হলো পরাভক্তির অবস্থা। আগেই বলেছি যে, প্রত্যেক ধর্মেই বিরল কিছু ভক্ত এই শরণাগতির উচ্চ অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই ভাবটিই হবে গীতার পরম সমাপ্তি সঙ্গীত—ঈশ্বরের পাদপদ্মে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এখন এখানে বিরল কিছু সাধকের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন ঠিক ঠিক পুষ্ট হলে এ অবস্থা আমরা সকলেই লাভ করতে পারি। গীতার শেষ অধ্যায়ের ৬৬ সংখ্যক শ্লোক, যাকে আমরা *চরম* শ্লোক বলি, সেটিই 'গীতার চরম বাণী'—যার নিষ্কর্ষ পূর্ণ শরণাগতি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, পাঁচ বছরের শিশু যখন নিমন্ত্রণ খেতে যায়, তখন তার কোন উদ্বেগ থাকে না। কেউ না কেউ তার ভার নেয়, তাকে বসার আসন দেয়, খাবার দেয়। এমনকি তাকে খাইয়েও দেওয়া হয়। তাকে নিজেকে কিছুই করতে হয় না। তেমনি আপনি যদি প্রকৃতই আধ্যাত্মিক শিশু হতে পারেন, সম্পূর্ণ অহংশূন্য হতে পারেন, তাহলে ঈশ্বর স্বয়ং আপনার মঙ্গলবিধান করবেন এবং আপনার

যা আছে তা রক্ষা করবেন। এই হলো সেই মহান শ্লোকের মর্মবাণী। বহু ভারতীয় সাধক এই শ্লোকটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বলা হয়েছে, *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্* 'এই সব সাধকদের *যোগক্ষেম* আমিই বহন করি।' *যোগক্ষেম*-এর মধ্যে দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ আছে। *যোগ*-এর অর্থ সেই বস্তু পাওয়া 'যা আপনার নেই, অথচ যা আপনার প্রয়োজনীয়' এবং *ক্ষেম* হলো, 'আপনার প্রাপ্তবস্তু রক্ষা করা'। অতএব, সংস্কৃতে এই *যোগক্ষেম*-এর অসাধারণ ব্যঞ্জনা। ভগবান বলছেন, 'এই সব ব্যক্তির যোগক্ষেম আমিই বইব'। এভাবে ঈশ্বর স্বয়ং ভক্তের দাস হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন স্থানেই ভগবান এই কথা বলেছেন। বলেছেন—আমি কারও দাস নই, আমি কেবল ভক্তের দাস। এই হলো ভগবান বিষ্ণু এবং শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া প্রতিশ্রুতি।

এই প্রতিশ্রুতি যে বর্ণে বর্ণে সত্য তা আধুনিককালে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে ফলতে দেখি। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শিষ্যদের লেখা তাঁর জীবনী পড়লে এক চমকপ্রদ ঘটনার কথা জানা যায়। ঘটনাটি এরকম : তিনি তখন কপর্দকহীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। ট্রেনে চলেছেন। কেউ হয়তো তাঁকে প্রথম শ্রেণির টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দিয়েছিলেন। রাজস্থানের মরু এলাকার মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটছে। তাঁর সঙ্গে খাবারদাবার এবং জল কিছুই ছিল না। যেমন তাঁর খিদে পেয়েছে, তেমনি জলতেষ্টা। ট্রেন থামলে তিনি নেমে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে ঐ একই কামরায় একজন ধনীব্যক্তিও ভ্রমণ করছিলেন। তিনি বিবেকানন্দের দুরবস্থা দেখে বিদ্রুপ করে বললেন, 'তুমি উপার্জনের চেষ্টা করোনি, তাই কষ্ট পাচ্ছ।' একথা বলে স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধনী ব্যক্তিটিও ট্রেন থেকে নামলেন এবং ঢাকা প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চিতে বসলেন। সন্ন্যাসী স্বামীজীর বেশভূষা অতি সাধারণ। তাই তিনি সেখানে বসতে পারলেন না। এক পেট খিদে নিয়ে বাইরের একটি গাছের তলায় তিনি বসে রইলেন। ঠিক তখনই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। দূর থেকে একজন লোক প্ল্যাটফর্মে এসে স্বামীজীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'বাবাজী, বাবাজী, আমি আপনার জন্য খাবার এনেছি।' তিনি ক্রমশ আরও কাছে এলেন। স্বামীজী ভাবলেন, লোকটির নিশ্চয় ভুল হয়েছে। তাই তিনি বললেন, 'আমি তো তোমাকে চিনি না, তোমার বোধহয় ভুল হচ্ছে। তুমি বোধহয় অন্য কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছ' তখন লোকটি উত্তর দিলো, 'না-না-না, আমি আপনার কাছেই এসেছি। আমি এখানকার এক মিঠাইওয়ালা। আমি শ্রীরামের ভক্ত। আমি আমার পুজো এবং দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। এমন

সময় স্বপ্নে শ্রীরাম আমাকে দর্শন দিয়ে বললেন, "আমার ভক্ত কষ্ট পাচ্ছে। তুমি গিয়ে তাঁর সেবা কর।" প্রথমটা আমি গ্রাহ্য না করে ঘুমোতে লাগলাম। স্বপ্নের নির্দেশে কর্ণপাত করলাম না। কিন্তু প্রভু আমাকে আবার ঠেলা দিয়ে বললেন, "যাও, যাও; এক্ষুনি যাও।" তখন আমি ধড়মড় করে উঠে পড়ে এই সব লুচি, মিষ্টি তৈরি করে, জল নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এলাম এবং দূর থেকে দেখেই আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। স্বপ্নে রামচন্দ্র আপনাকেই দেখিয়েছিলেন। কাজেই, দয়া করে আপনি এগুলো গ্রহণ করুন।' এই অভিজ্ঞতা স্বামী বিবেকানন্দকে অভিভূত করেছিল। দুচোখ বেয়ে তাঁর অশ্রু গড়িয়ে পড়লো এবং তিনি সেইসব খাবার খেয়ে মিঠাইওয়ালাকে আশীর্বাদ করলেন। পরবর্তী কালে স্বামীজী নিজেও এই ঘটনাটির কথা বলেছিলেন।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩ ॥

—'এমনকি সেইসব ভক্ত, যাঁরা শ্রদ্ধাসহকারে অন্যান্য দেবতার পূজা করেন, তাঁরাও বস্তুত আমারই পূজা করেন ঃ তবে হে কুন্তীনন্দন, তাঁরা তা করেন ভুল পথে।'

যেঽপি অন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ, 'যদি কোন ভক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্য দেবদেবীর পূজা করেন'—আমাদের শাস্ত্রে কত দেবদেবীর কথাই তো পাওয়া যায়; *তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তি অবিধিপূর্বকম্,* 'তাঁরাও বস্তুতপক্ষে আমারই পূজা করেন, তবে তা যথার্থভাবে নয়, সঠিক পথে নয়'। *অবিধিপূর্বকম্, 'বিধি* অনুসারে নয়'। *অন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ,* তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধা আছে ঠিকই, কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, ঈশ্বর এক ও অনন্ত, সেই সত্য তাঁদের জানা নেই। তাই 'তাঁরা এখানে সেখানে স্বতন্ত্র দেবদেবীর পূজা করেন'। কিন্তু তাঁদের সেই সব পূজা পরিণামে আমার কাছেই এসে পৌঁছয়। তবে সে সত্য তাঁরা জানেন না।

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

—'আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু (অর্থাৎ ফলদাতা)। কিন্তু যেহেতু তাঁরা আমাকে স্বরূপত জানেন না, তাঁরা (এই মর্ত্যলোকে) প্রত্যাবর্তন করেন।'

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ, 'আমিই সকল পূজা, সকল আচার-অনুষ্ঠান, সকল যজ্ঞ এবং উপাসনার ভোক্তা ও প্রভু'। আমিই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। এক অনন্ত ঈশ্বরই আছেন, যাঁর কাছে সব উপাসনা পৌঁছয়। অনেকে হয়ত এই সত্য জানেন না। তাই তাঁরা পথভ্রষ্ট হয়ে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করেন। *ন তু মাম্ অভিজানন্তি,* এই সব দেবদেবীর পিছনে এক পরমেশ্বররূপে আমিই যে বিরাজমান, 'এই সত্য এঁরা জানেন না'; *তত্ত্বেন অতঃ চ্যবন্তি তে* এবং 'সেই কারণেই তাঁরা তত্ত্ব থেকে চ্যুত হন।' সেই তত্ত্ব কী? সেই তত্ত্ব হলো এই সব বিভিন্ন দেবদেবীর পিছনে শুধু এক অনন্ত ঈশ্বরই বিদ্যমান। চারহাজার বছরেরও আগে *ঋগ্বেদ* এই সত্য ঘোষণা করে বলেছিল—*একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি,* 'সত্য এক, ঋষিরা তাকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকেন।' এই সত্য ভুলে গিয়ে তারা শত শত দেবদেবী আবিষ্কার করেছেন এবং কখনও এই দেবতার, কখনও ওই দেবতার পিছনে ছোটাছুটি করছেন। এই কারণেই আগের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : *অবিধিপূর্বকম্, 'বিধি* বা বৈদিক শিক্ষাকে অনুসরণ না করে তাঁরা ঐ ধরনের পূজা অর্চনা করে থাকেন। আমি যদি কোন এক বিশেষ দেবতার পূজাও করি, আমাকে বুঝতে হবে যে, আমার ইষ্ট দেবতা বা ইষ্ট দেবী সেই পরম অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই একটি মূর্তি বা রূপ।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

—'বিভিন্ন দেবতার উপাসকরা বিভিন্ন দেবতাদের কাছে যান, পিতৃভক্তরা পিতৃগণকে লাভ করেন, যাঁরা ভূতাদির উপাসনা করেন, তাঁরা ভূতলোক প্রাপ্ত হন; এবং আমার উপাসকরাও আমাকেই লাভ করেন।'

যান্তি দেবব্রতাঃ দেবান্, 'যাঁরা দেবতার উপাসনা করেন, তাঁরা দেবলোক প্রাপ্ত হন।' অনুরূপভাবে, *পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ,* 'যাঁরা পিতৃগণের অর্থাৎ পূর্বপুরুষের উপাসনা করেন, তাঁরা তাঁদের কাছেই যান'। একইভাবে, *ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ,* 'যাঁরা বিভিন্নরকম ভূত-প্রেতাদির অর্চনা করেন, তাঁরা সেই সকল ভূতপ্রেতাদির গতিপ্রাপ্ত হন'। শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে এইরকম আরও অনেকের কথা পাবেন। সেখানে দেখা যাবে, বিভিন্ন ধরনের উপাসকরা আপন আপন অভীপ্সিত লোকে গিয়ে থাকেন। *যান্তি মৎ যাজিনঃ অপি মাম্,* 'কিন্তু যাঁরা আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।' পরমাত্মা নিজে বলছেন, 'যাঁরা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমার কাছেই আসেন'। ঈশ্বরের

যে রূপের প্রতিই আমাদের শ্রদ্ধা থাকুক না কেন, আমরা তাঁকেই পাব। কিন্তু তার ফল হবে অতি সামান্য। এটা বোঝা কঠিন নয় যে, আপনি যদি সর্বোত্তমের চিন্তা করেন এবং তাঁর উপাসনা করেন, তবে স্বাভাবিকভাবেই আপনি শ্রেষ্ঠ ফল পাবেন। এই যে এক, অনন্ত ও অবিনাশী পরমেশ্বর, তাঁর উপাসনা অতি সহজ সরল। বরং বলা চলে যে, বিভিন্ন দেবতা এবং অন্যান্য শক্তির আরাধনা অপেক্ষাকৃত জটিল, ব্যয়বহুল এবং তা করাও কঠিন। কিন্তু দেখবেন, যেখানে বিশুদ্ধ ভক্তি আছে, সেখানে পূজার জন্য অধিক ব্যয় করার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দেবদেবীদের তুষ্ট করতে আপনার বিস্তর টাকা পয়সার প্রয়োজন, দরকার বহু পুরোহিতের। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যে দিব্য সত্তা সর্বজীবের হৃদয়ে বিরাজমান, তাঁর উপাসনাই সবচেয়ে সহজ। তার চেয়ে সহজ আর কিছু হতে পারে না। এই হলো পরবর্তী শ্লোকের বিষয়।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

—'যিনিই ভক্তির সঙ্গে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল—যা-কিছু অর্পণ করেন—সেইসব শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিযুক্ত দান আমি গ্রহণ করি।'

খণ্ড ঐশী শক্তি আর অখণ্ড অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য এই ঃ শেষের জন প্রেমে পরিপূর্ণ, কিন্তু প্রথমোক্ত দেবদেবীরা কখনও তুষ্ট, কখনও রুষ্ট। কোন বিশেষ দেবতার বিরাগভাজন হলে আপনাকে ভুগতে হতে পারে। আপনার মনও সর্বদা খুঁতখুঁত করবে এই ভেবে যে, কী জানি বাবা—আমার পূজা-অর্চনা সব ঠিক ঠিক হয়েছে তো? কিন্তু এই এক প্রেমমূর্তি পরমেশ্বরের ক্ষেত্রে, বিপরীত ফললাভের কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তিনি প্রেমস্বরূপ। এই সত্যই শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে বোঝাতে চেয়েছেন। বলছেন—*পত্রম্,* পূজার সময়ে একটি তুলসী 'পত্র' দিলেই চলবে; অথবা *পুষ্পম্,* 'একটি ফুল'; অথবা *ফলম্,* ছোট একটি 'ফল'; অথবা *তোয়ম্,* একটু 'জল'; *ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি,* 'যাঁরা ভক্তি করে এর যে-কোন একটিও আমাকে নিবেদন করেন'; আমি কেবল সেই ভক্তিটুকুই দেখি, উপচারের পরিমাণ দেখি না। *ভক্ত্যুপহৃতম্,* 'ভক্তির সঙ্গে নিবেদিত' এই উপহার; *তদহম্ অশ্নামি,* 'আমি তা গ্রহণ করি, খাই', কারণ যে ভক্ত এগুলি দিয়েছেন, তিনি *প্রযতাত্মনঃ,* অর্থাৎ 'প্রেমময়, বিশুদ্ধচিত্ত ও নিষ্কাম'। এই ভক্তিই আমি দেখতে চাই, উপচারের পরিমাণ নয়। সত্যি কথা। বিশুদ্ধ প্রেমের সঙ্গে যা কিছু দেওয়া যায়, তার মূল্য অসীম।

অতএব, ভক্তির পথে আচার-অনুষ্ঠান কমে যায়, ব্যয়বাহুল্যের প্রয়োজন হয় না এবং বাহ্যিক লোকদেখানো ঘটাও কমে যায়। এই ভক্তির মহিমা যা আপনাকে ভগবানের খুব কাছে নিয়ে যায়। আলোচ্য শ্লোকটিতে এইধরনের ভক্তির ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছে। এই ভক্তি কার হয়? *প্রযতাত্মনঃ*, 'শুদ্ধচিত্ত ভক্তের'। একজন যথার্থ ভক্তের ঈশ্বরকে বেশি কিছু দিতে হয় না। যখন আপনি কারও খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে যান, তখন তাকে লৌকিক উপহার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ তখন আপনারা একাত্ম হয়ে গেছেন। ঠিক সেইরকম, একজন ভক্ত, যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা লাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে খুব বেশি ব্যয়বহুল আনুষ্ঠানিক পূজার্চনা করার দরকার হয় না। ঐ প্রয়োজন তাঁর ফুরিয়েছে। তাঁর পূজা সহজ সরল। তাঁর পূজার উপকরণ অতি সামান্য, অর্থব্যয়ও অতি সামান্য। কিন্তু তিনি যা কিছু করেন, তার পিছনে থাকে ভগবানের প্রতি গভীর বিশুদ্ধ ভালবাসা। ঈশ্বর এই শুদ্ধ প্রেমটুকুই চান; আপনি তাঁকে কত উপচারে ভোগ দিলেন, ওসব তিনি দেখেন না। সকল ভক্তকে উদ্দেশ্য করে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাটিই বলতে চাইছেন। তাই, তিনি আবার বলছেন,

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যৎতপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

—'হে কুন্তীনন্দন, তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যজ্ঞে যা কিছু আহুতি দাও, যা কিছু দান কর এবং যে সব তপস্যা কর, সে সবই আমাকে সমর্পণ করবে।'

কী ভাবদ্যোতক আবেদন! গীতার দু'তিন জায়গায় এইধরনের আবেদন শ্রীকৃষ্ণ করেছেন। এখানে বলছেন, *যৎ করোষি*, 'যা কিছু তুমি কর', অর্থাৎ যে কোন কর্মই আপনি করুন না কেন; *যৎ অশ্নাসি*, 'যা কিছু খাও'; *যৎ জুহোষি*, 'যা কিছু তুমি হোমে আহুতি দাও'; *দদাসি যৎ*, 'যা কিছু তুমি দান কর'; *যৎ তপস্যসি*, 'যে তপস্যাই তুমি কর'; তৎ *কুরুষ্ব*, 'সে সব কিছুই তুমি কর'; *কৌন্তেয়*, 'হে কুন্তীনন্দন'; *মদ্ অর্পণম্*, 'আমাকে নিবেদন করছ মনে করে'। এই ভাবে ভক্তের সমগ্র জীবনটিই ঈশ্বরের পূজা হয়ে ওঠে। আপনার কাজকর্ম, সকলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক, আপনার পূজার্চনাদি, সব কিছুই তখন সেই পরম ঈশ্বরের পূজার নৈবেদ্য হয়ে যায়। এই হলো ভক্তদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরম পবিত্র নির্দেশ। একাদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে এই নির্দেশ তিনি আরও দৃঢ় ভাষায় ব্যক্ত করবেন। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে এটিকেই গীতার সার বাণী বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে, এই শ্লোকেও সেই তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে। এইসব

আড়ম্বরপূর্ণ ধর্ম এবং পূজানুষ্ঠানের প্রয়োজন কী? যথার্থ ধর্ম এবং পূজা এতই সহজ যে, তাতে সমগ্র জীবন ঈশ্বরের পাদপদ্মে এক পবিত্র নৈবেদ্য হয়ে উঠতে পারে। আমরা সর্বদা তাঁর ভিতরই থাকতে পারি। আবার, তিনিও আমাদের মধ্যেই থাকবেন। ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এই সহজপথটি আমরা অবলম্বন করতে পারি। তা যদি করি, তাহলে আমাদের মধ্যে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা স্ফুরিত হবে। আমাদের অধ্যাত্মজীবন বিকশিত হবে। ভক্তির এই যথার্থ প্রকৃতি বুঝতে পারলে, সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই সমাজে বহু ভক্তের আবির্ভাব হবে এবং তার ফলে বর্তমান যুগের কোলাহলমুখর, জাঁকজমকপূর্ণ, ব্যয়বহুল পূজার উদ্যোগ কমে যাবে। বিবেকানন্দের কথায়, তখন সমগ্র জীবনটাই ধর্ম হয়ে উঠবে। ভগিনী নিবেদিতা *Complete Works of Swami Vivekananda*-র ভূমিকায় স্বামীজীর এই উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ 'Life itself is religion' অর্থাৎ 'জীবনটাই হলো ধর্ম'।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

—'এইভাবে সন্ন্যাসযোগযুক্ত হৃদয়ে কর্মের শুভ ও অশুভ ফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, সমস্ত কিছু থেকে মুক্তিলাভ করে তুমি আমারই কাছে আসবে।'

যখন এইরকম অধ্যাত্মসাধনা করে তুমি মুক্ত হবে, তখন 'তুমি আমাকেই লাভ করবে।' কীভাবে? *সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা,* অর্থাৎ 'যে ভক্ত *সন্ন্যাসযোগ* বা সর্বস্ব সমর্পণের অভ্যাস করেন', সেই অভ্যাসের দ্বারা। তার ফলে, তাঁর খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, লোকব্যবহার—এককথায় তাঁর গোটা জীবনটাই ঈশ্বরাভিমুখী হয়ে ওঠে। সব কিছুই দিব্যায়িত হয়ে যায়। ভক্তিপথে এই হলো যথার্থ *সন্ন্যাসযোগ। শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ,* 'এর দ্বারা তুমি শুভাশুভ ফলপ্রদায়ী কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে'। কী ধরনের বন্ধন? শুভ ও অশুভ—কখনও 'শুভ', কখনও আবার 'অশুভ'। সংসারে থেকেও, সমাজে বাস করেও, আপনি হতে পারেন একজন *সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা,* কারণ আপনি আপনার সব কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে দেন। *বিমুক্তো মাম্ উপৈষ্যসি,* 'এই রকম ভক্ত মুক্ত হয়ে আমাকে লাভ করেন'। পরবর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ২৯॥

—'সকল জীবের মধ্যে আমি সমভাবে বিরাজ করি; আমার কাছে কেউ অপ্রিয়, অথবা প্রিয় নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তির সঙ্গে আমার ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে এবং আমিও তাঁদের মধ্যে অবস্থান করি।'

'সকল জীবের মধ্যে আমি সমান', *সমোঽহং,* ঈশ্বরের কাছে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। এটি লক্ষ্য করার জিনিস। আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন: ঈশ্বরের কাছে কেউ কি বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকে? তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন কেউ আছে কী? না—তাঁর দৃষ্টিতে এ রকম কোন অসমদর্শিতা নেই। *ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ,* 'কেউ আমার শত্রু নয়, আমার মিত্রও কেউ নেই'। সকলের প্রতিই আমার সমান মনোভাব। সূর্য যেমন পাপী বা সাধু, ভালো বা মন্দ সকলকেই সমান আলো দেয়, ঈশ্বরও ঠিক তাই। তাহলে পার্থক্য কোথায়? *যে ভজন্তে তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্,* পার্থক্য এইখানে যে, 'যাঁরা ভক্তির সাথে আমার ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে এবং আমিও তাঁদের মধ্যে অবস্থান করি।' স্বেচ্ছায় আমার কাছে এসেছেন বলে অন্য যে-কারও তুলনায় তাঁরা আমার সান্নিধ্যের সুফল বেশি করে পেয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে, শীতকালে শরীর তাতানোর জন্য আমরা আগুন জ্বালাই। এখন আপনি যদি আগুনের কাছ ঘেঁষে বসেন, তাহলে আপনি আগুনের তাপ পাবেন; কিন্তু যদি আপনি অনেকটা দূরে বসে থাকেন, তাহলে আপনার কপালে তাপ জুটবে না। আপনি আগুন থেকে দূরে বসে রয়েছেন, তাই তাপ পাচ্ছেন না। তাতে আগুনের কী দোষ? আপনি আগুনের শত্রু নন; আবার যিনি কাছে বসে আছেন, তিনি যে আগুনের বিশেষ প্রিয়পাত্র তাও নয়। সব অবস্থাতেই আগুন নিরপেক্ষ, পক্ষপাতহীন। তবে আপনি আগুনের কাছে গিয়ে বসবেন কিনা—তা নির্ভর করছে আপনার উপর। যদি বসেন, তাহলে আপনিও অগ্নির সুখকর সান্নিধ্য লাভ করতে পারবেন। সেইরকম, এইসব ভক্ত যে আমার পরম আশীর্বাদ লাভ করেছেন, তার কারণ, 'তাঁরা আমাতেই অবস্থান করেন', *ময়ি তে* এবং 'আমিও তাঁদের মধ্যে বাস করি', *তেষু চাপ্যহম্।* অতএব ঈশ্বরাভিমুখী হওয়া এবং যে মহান সত্তা আপনার, আমার, সকলের মধ্যে বিরাজমান, তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে ধন্য হওয়া—তা আমাদের ওপরই নির্ভর করছে। কিন্তু সত্য এই—*সমোঽহং সর্ব ভূতেষু,* 'সকল

জীবের মধ্যেই আমি সমানভাবে বিরাজমান।' সূর্যের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। সকলেই, এমনকি নিকৃষ্টতম মানুষও ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ লাভ করবেন। এই ভক্তিভাব সকলের জন্যই, সেখানে পাপী, সাধু, সাধারণ ভক্ত এবং অতি শুদ্ধ ভক্তের বাছবিচার নেই। নেই বলেই পরবর্তী শ্লোকে আমরা এই আশ্চর্য মন্তব্যটি পাচ্ছি ঃ

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

—'অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি একাগ্রচিত্তে আমার ভজনা করেন, তাঁকে সজ্জন বলে জেনো, কারণ তাঁর সঙ্কল্প অতি শুভ।'

এমনকি যদি, 'কোন ব্যক্তি অতি দুরাচারী হয়', *সুদুরাচারঃ; দুরাচারঃ* অর্থাৎ 'দুর্বৃত্তিপরায়ণতা'; *সুদুরাচারঃ* অর্থাৎ 'অতি দুষ্কর্মকারী'; যদি সেও *ভজতে মাম্ অনন্যভাক্*, 'একনিষ্ঠ ভক্তির সঙ্গে আমার ভজনা করেন'; *সাধুরেব স মন্তব্যঃ*, 'তাহলে তাঁকেও সাধু মনে করতে হবে', ভালো বলতে হবে; *সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ*, 'কারণ, তিনি শুভ সংকল্প করেছেন'। সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে যাওয়ার সাধুসংকল্প গ্রহণ করেছেন। অতীতে দুর্বৃত্তিপরায়ণ হলেও তিনি নিজেকে পালটাবার চেষ্টা করছেন। *অপি চেৎ সুদুরাচারঃ*, 'সেই ব্যক্তি অতি দুরাচারী হলেও, ঈশ্বর সকলকেই পবিত্র করে নেন। ঈশ্বরের ভালবাসায় পাপী, তাপী, দুষ্ট সকলেই উদ্ধার হয়ে যাবে। উদ্ধার যে হয় এমন বহু নজির আমাদের অধ্যাত্ম সাহিত্যে আছে। সেখানে আমরা দেখতে পাই—ঘোর পাপীরাও ঈশ্বরের দিব্যস্পর্শে মহান সন্ত হয়ে গেছেন। এই হলো ভক্তির মাধুর্য ও মহিমা। প্রায়শই দেখা যায় পথভ্রষ্ট মানুষ ধার্মিক ও মহানুভব হয়ে উঠেছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, সমাজ তাঁদের স্বীকৃতি দেয় না। সমাজ তাঁদের মধ্যে সেই পুরনো পাপীকেই খুঁজতে থাকে, কারণ সমাজের দৃষ্টিতে কেবল পাপই চোখে পড়ে; মানুষের অন্তর্জগতের পরিবর্তনটি ধরা পড়ে না। ভিক্টর হুগো (Victor Hugo)-র বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থ 'লা মিজারেবল' (*Les Miserables*) ঐ বিষয় নিয়েই লেখা। সেখানে দেখি, 'জাঁ ভল জাঁ' নামে এক চোর এক বিশপের বাড়ি থেকে অনেক সোনা-রূপার জিনিস চুরি করে। পুলিশের তাড়া খেয়ে যখন সে চুরি করা জিনিস সব ফিরিয়ে দিল, তখন কিন্তু বিশপ তার ওপর এতটুকু ক্রুদ্ধ হলেন না। বরং চোরটিকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'এগুলি তো তোমার, তুমি এগুলো ফিরিয়ে নাও'। কিন্তু বিশপ তাকে ক্ষমা করলেও পুলিশের চোখে সে একজন দাগী

অপরাধী বলেই চিহ্নিত হয়ে রইলো। বিশপের ভালবাসার ছোঁয়ায় তার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেলেও, পুলিশের সন্দেহ যায় না এবং জাঁ ভল জাঁর রূপান্তরকে সমাজও স্বীকার করে না। কাজেই জাঁ ভল জাঁর পিছনে পুলিশ ছায়ার মতো লেগে রইলো। ভারী মর্মস্পর্শী কাহিনী। গীতা এখানে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন, *সাধুরেব স মন্তব্যঃ*, 'তাঁকে সাধু মনে করতে হবে'; কারণ, *সম্যক্‌ ব্যবসিতো হি সঃ*, 'তাঁর মনে ভালো হবার সুসংকল্প উদিত হয়েছে।' তাঁর মন ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অতীত মুছে গিয়ে নতুন জীবনের সূচনা হয়েছে তাঁর। এই হলো ভক্তি বা ঈশ্বরপ্রেমের অকল্পনীয় শক্তি।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

—'হে কুন্তীনন্দন, শীঘ্রই সেই ব্যক্তি ধর্মপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং চিরশান্তি লাভ করেন; একথা তুমি নিশ্চিত জেনো এবং মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পার যে, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হবে না।'

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কী উদার অঙ্গীকারই না করছেন! বলছেন—*ক্ষিপ্রং*, 'অতি শীঘ্রই', *ভবতি ধর্মাত্মা*, সেই ব্যক্তি 'ধর্মাত্মা অর্থাৎ নৈতিক এবং সদাচারসম্পন্ন হয়ে উঠবেন'; *শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি*, অতি শীঘ্রই তিনি 'পরম শান্তি লাভ করবেন।' তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের দিকে ফিরে বলছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি*: 'হে অর্জুন, তুমি সকলকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বল', *ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*, 'আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হবে না।' এই কথা অভ্রান্ত বলে তুমি ধরে নিতে পার। এ পরম সত্য। সকলকে তুমি একথা জানিয়ে দাও। একথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে আমাদের সকলকেই বলছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি*। আমরা দেখেছি, একজন অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও, নানারকম কুকর্ম করা সত্ত্বেও, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি তার মধ্যে কী বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং, এই যে পরিবর্তন, তা সাময়িক বা আংশিক নয়—তা স্থায়ী পরিবর্তন। তবে সাধারণ মানুষের চোখে এই রূপান্তর চট্‌ করে ধরা পড়ে না, তাদের বুঝতে কিছুটা সময় লাগে। কট্টর রক্ষণশীল সমাজ মানুষের দুর্বলতাগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে জানে না। কিন্তু যে সমাজের মানুষ ভক্তির দ্বারা অনুভাবিত, তারা কখনওই তা করে না। তাদের মধ্যে একটা সমবেদনার ভাব থাকে। আজ যার নিন্দা করছি, আগামিকালই যে সে বদলে যাবে না, তা জোর করে কে বলতে পারে? New Testament-এ গল্প আছে—এক পাপীকে অন্য পাপীরা ধিক্কার দিচ্ছে। এরকমই

হয়। কিন্তু যিনি সত্যিকারের মহাত্মা, তিনি কখনওই পাপীকে ধিক্কার দেন না। যিশুর কাহিনিতে আছে, একজন ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোককে তিনি প্রশ্ন করছেন, 'তোমার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ এনেছিল, তারা গেল কোথায়?' সে উত্তর দিল, 'তারা সবাই চলে গেছে প্রভু'। যিশু প্রশ্ন করলেন, 'তারা তোমার কোন দোষ খুঁজে পায়নি?' মহিলাটি বলল, 'না, প্রভু, তারা পায়নি, কারণ আপনি তাদের বলেছিলেন, "যে জীবনে কখনও কোন পাপ করেনি, প্রথম পাথরটা তাকেই ছুঁড়তে দাও।" একথা শুনে তারা একে একে সবাই সরে পড়ল।' তখন যিশু বললেন, 'তাহলে শেষপর্যন্ত ওরা তোমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল? আমিও বলছি, "আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তুমি মুক্ত। তুমি এখন যেতে পার। যাও, কিন্তু আর কখনও পাপ কর না"।' এই শেষের কথাটাই আসল কথা। অতএব, দেখতে পাচ্ছি, একজন মহাত্মা মানুষের স্খলন ও দুর্বলতাকে কী গভীর সহানুভূতির চোখে দেখেন! সাধারণত, সব গোঁড়া সমাজেই নির্দয় বিচারের আধিক্য এবং স্পর্শকাতরতা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু যে সমাজে যথার্থ *ভক্তিভাব* আছে, সেখানে কখনওই এইরকম শুষ্ক বিচারের কঠোরতা থাকতে পারে না। কারণ, আজ যে পাপী, কাল সে তো সাধু হয়েও উঠতে পারে। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলতেন, প্রতিটি সাধুর পিছনেই একজন পাপী দাঁড়িয়েছিলেন, আর প্রত্যেক পাপীর সামনেই একজন সাধু দাঁড়িয়ে আছেন। অতএব, একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, জগতের সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল; কোন কিছুই স্থিতিশীল নয়। আগে যেমন ছিল, চিরকাল তেমন থাকে না।

পাকিস্তানের করাচিতে একজন সংবাদপত্র সম্পাদকের টেবিলে আমি একবার এই কথাগুলি লেখা দেখেছিলাম : 'আমাদের মধ্যে যারা হীনতম, তাদের মধ্যে এত ভালো জিনিস আছে এবং আমাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম, তাদের মধ্যেও এত মন্দ জিনিস রয়েছে যে, কারও নিন্দা করা আমাদের শোভা পায় না।' কথাগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছিল। যে সমাজ মানুষের দুর্বলতাকে নির্দয়ভাবে বিচার করে না, সেই সমাজ সুস্থ সমাজ। হ্যাঁ, সমাজে দুর্বলতা আছে, সে কথা ঠিক। দুর্বলতা আসবেই। কিন্তু সহানুভূতির সঙ্গে তাকে বিচার করুন। আজ জগতের সেটাই প্রয়োজন। জগৎ সহানুভূতি চায়, রুক্ষ বিচার নয়। এবং সেটা তখনই সম্ভব হয় যখন সমাজের মানুষের ভেতর *ভক্তি* থাকে। তখন আর তাঁরা মানুষের দুর্বলতাকে নির্দয়ভাবে বিচার করেন না। তাঁরা মানুষকে বলেন— ভয় কী! আমরা আপনার পাশে আছি। আমরা আপনাকে ভালো হতে সাহায্য

করবো। ভেবে দেখুন, কী চমৎকার এই ভাবনা! কিছু দুর্বলতা আছে বলেই একজন মানুষকে রসাতলে যেতে দেওয়া চলে না। যে সমাজ বলে, 'আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমরা আছি', সেই সমাজই সুস্থ সমাজ। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে আমাদের সমাজ এই উদারতা থেকে বঞ্চিত। অত্যন্ত নির্মম হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজ। এর পরিবর্তন প্রয়োজন। যখন বিশুদ্ধ ধর্মভাব জাগবে, তখন এই পরিবর্তনও আসবে, অভ্যুদয় হবে মানবিকতাবোধের। তখন সবরকম বিপর্যয়ে মানুষ সাড়া দেবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমার ভক্ত বিনষ্ট হবে না।'

গিরিশচন্দ্র ঘোষ খুব মদ খেতেন। কিন্তু তিনি একজন বড় নাট্যকারও ছিলেন। তিনি স্বীকার করতেন, পৃথিবীতে যতরকমের পাপ আছে, সব তিনি করেছেন। তবু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। এত সব দোষ সত্ত্বেও তিনি গিরিশের প্রতিভা ও গুণগুলিই দেখেছিলেন এবং তাঁকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করতেন। তাঁর ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের যতটা বিশ্বাস ছিল, গিরিশ নিজেকেও ততটা বিশ্বাস করতেন না! শেষপর্যন্ত গিরিশচন্দ্র একজন মহাত্মা হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনি নিজ মুখে বলেছিলেন, 'এ হলো শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক কাণ্ড। তিনি আমাকে কখনও বলেননি, এটা ছাড়, ওটা ছাড়। তিনি শুধু আমার সৎপ্রবণতাটি উসকে দিয়েছিলেন, আর তাতেই আমি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিলাম।' এই হলো গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাহিনি। এমনকি যে সব মেয়েরা গিরিশ ঘোষের নাট্যালয়ে অভিনয় করতেন, যাঁদের সেকালে নিম্নশ্রেণির মহিলা বলেই গণ্য করা হতো, তাঁদেরও শ্রীরামকৃষ্ণ আশীর্বাদ করেছিলেন। তার ফলে ধীরে ধীরে তাঁদের জীবনেও পরিবর্তন এসেছিল। একজন অভিনেত্রী একটি গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের এই কৃপার কথা লিখেছেন এবং এই কৃপায় তাঁর জীবন কীভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেকথাও বর্ণনা করেছেন। এ আমাদের সময়েরই একটি ঘটনা। প্রাচীন কাল থেকে এ রকম বহু কাহিনি আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, যা পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়। সে যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণের *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*, এই সত্যটি আমাদের পক্ষে জেনে রাখা মঙ্গল। পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২॥

—'হে পৃথানন্দন, যারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা যদি হীনযোনিজাত হয়, অথবা স্ত্রীজাতি, বৈশ্য বা শূদ্র জাতিও হয়—তারাও পরমগতি লাভ করে।

এই শ্লোকটি বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে অনুবাদ করেছেন। *মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য,* 'যারা যথার্থই আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে', তারা যেই হোক, *পাপযোনয়ঃ,* 'যারা পাপ যোনিজাত', বা এই ধরনের মানুষও হতে পারে; *স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ,* 'স্ত্রীজাতি, বৈশ্য, অথবা শূদ্র', এদের যে কেউ হতে পারে; *তে অপি যান্তি পরাং গতিম্,* আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, 'তারাও পরম গতি লাভ করে'। এখানে বিশেষ জোর দিয়ে ভগবান বলছেন, সমাজ যাদের অবহেলা করে, সমাজের দৃষ্টিতে যারা হেয়, আমার প্রতি ভক্তি তাদের প্রত্যেককেই টেনে তুলবে। এখানে এটিই মূল বক্তব্য। কিন্তু আমাদের প্রাচীন ব্যাখ্যাকাররা এই *পাপযোনয়ঃ* কথাটির অর্থ করেছেন, 'যাদের পাপ থেকে জন্ম'। মধ্যযুগের গোঁড়াদের মত ছিল স্ত্রীলোক এবং শূদ্রদের জন্ম পাপ থেকে। নারীমাত্রেই, এমনকি ব্রাহ্মণবংশে জন্মালেও তাঁরা পাপজন্মা। কিন্তু মহাভারতের কোথাও আপনারা এ ধরনের মন্তব্য খুঁজে পাবেন না। শ্রীকৃষ্ণ এবং উপনিষদেরও শিক্ষা কিন্তু ভিন্ন। তাঁরা বলছেন, সকলেই মুক্তি লাভ করতে পারে, কেউ পাপজাত সন্তান নয়। উপনিষদে বলা হয়েছে, সকল মানুষ, তা তিনি ভারতীয় হোন বা বিদেশীই হোন—সকলেই *অমৃতস্য পুত্রাঃ,* 'অমৃতের সন্তান'। ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক এই ঘোষণাই করেছিলেন। হ্যাঁ, কেউ গর্হিত অপরাধ করলে আপনি তাকে পাপযোনি বলতে পারেন। কিন্তু, সেও উদ্ধার পাবে। আর অন্য তিনটি শ্রেণির তো কথাই নেই। গীতা সে কথাই জোরের সঙ্গে বলছেন। *স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ,* 'মহিলারা, বৈশ্য এবং শূদ্ররাও'; *তে অপি যান্তি পরাং গতিম্,* 'তাঁরাও আধ্যাত্মিকতার চরম স্তরে উঠতে পারেন।' শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমার প্রতি ভক্তির এই হলো মহিমা। এই *পাপযোনির* ধারণা দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রগুলিকে গ্রাস করে রেখেছিল। এমনকি মহিলাদেরও *পাপযোনি* বলে নিগ্রহ করা হতো। মধ্যযুগে এসব ছিল। সবই ভিত্তিহীন অবৈদান্তিক কুসংস্কার। সুখের বিষয়, আজ ওসব কথায় কেউ আমল দেয় না। আজ আমরা উপনিষদের সত্যকে গ্রহণ করেছি। বাস্তবিক, এক আত্মা যখন সকল জীবের অন্তরে বিদ্যমান, তখন কী করে একজন মানুষ *পাপযোনি* হতে পারেন? অতএব, দেখা যাচ্ছে, কয়েক শতাব্দীর সামাজিক অচলাবস্থা, হৃদয়হীনতা এবং বুদ্ধিবিভ্রম সমাজের বহু শ্রেণির মানুষকে নিন্দিত ও ধিকৃত করে রেখেছিল। সেইদিনের সেই পাপের অধ্যায় আজ গত। আমাদের সমাজে বা এই পৃথিবীর কোন সমাজেই তার আর কোন স্থান নেই। আমেরিকানরা একসময় নিগ্রোদের *পাপযোনি* বলে মনে করত। আজ আর কেউ তা মনে করে

না। কোন কোন ব্যক্তি হয়তো এখনো এ রকম করতে পারেন, কিন্তু আজকের সামগ্রিক প্রবণতা হলো মানুষকে তার যথার্থ আলোকে দেখা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একই মনুষ্যত্ব সুপ্ত রয়েছে। তাই, প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের মধ্য থেকেই উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটা সম্ভব। এই সত্যটি বর্তমান বিশ্বের সকলেই বুঝতে পারেন এবং আমাদের যুগে এই কথাটিই অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁরা জানিয়ে গেছেন, প্রতিটি জীবই স্বরূপত ঈশ্বর এবং সেই সুপ্ত দিব্যতা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বিকশিত হতে পারে। এখানেই মনুষ্য জীবন ও ধর্মের প্রকৃত গুরুত্ব। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য,* 'হে অর্জুন, যাঁরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেন,' তাঁরা *পাপযোনি* হন, স্ত্রীজাতি হন, বৈশ্য অথবা শূদ্র যাই হন, তাঁরা সকলেই পরম গতি লাভ করবেন। এখানে *পাপযোনিকে* গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এই সত্যকে যে, পুরোহিতরা যা-ই বলুন না কেন, *ভক্তি* পথে এলে সব শ্রেণির মানুষই উচ্চতম স্তরে উঠে যাবেন। গীতার এই অংশে এই ভাবটি বড় সুন্দর। বাস্তবিক, ভক্তিতে জাতপাত, সম্প্রদায় বা নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। *নারদ ভক্তিসূত্রের* একটি সূত্রে বলা হয়েছে, ভক্তি স্ত্রী-পুরুষ বা উচ্চ-নিচের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করে না। কেন? পরবর্তী সূত্রে (সূত্র, ৭৩) তার উত্তরে বলা হয়েছে : *যতঃ তদীয়াঃ* 'কারণ তাঁরা সকলেই সেই পরমেশ্বরের সন্তান'। এই হলো সত্য এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি—প্রত্যেকের সম্পর্কই সেই পরমেশ্বরের সঙ্গে। তা যদি হয়, তাহলে কীভাবে আপনি একদল মানুষকে হীন প্রতিপন্ন করতে পারেন? কখনওই পারেন না। কারণ, *যতঃ তদীয়াঃ*—'তাঁরা সকলেই সেই পরমেশ্বরের সন্তান।' প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বর বা অমৃতের সন্তান, যা আমি আগেই বলেছি। উপনিষদের ভাষায়, মানুষ হলো *অমৃতস্য পুত্রাঃ।* বিশ্বের মানুষকে ডেকে উপনিষদ এক অসীম আনন্দের খবর দিচ্ছেন। বলছেন—*শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ*—তোমরা সব অমৃতের সন্তান। অতএব, এই ভক্তি এবং বেদান্তের জ্ঞান মানুষকে মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাকে অবনতির পথে ঠেলে দেয় না। তাই গীতা বলছেন, সকলেই সেই *'পরমগতি'* লাভ করবে। তাই যদি হয়, তবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আর কী কথা!। তাদের তো সামর্থ্য আছেই। তাঁরা যদি ভগবান লাভ করতে চান এবং ভক্তির অনুশীলন করেন, তাহলে কত শীঘ্রই না তাঁরা তা লাভ করতে পারেন! তাঁরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ, যে সম্পদ অন্যদের কঠোর চেষ্টা করে অর্জন করতে হয়। যদি সাধারণ মানুষ সেই পরমপদ লাভ করতে পারেন, তবে উন্নতশ্রেণির মানুষ আরও সহজে

কেন সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করতে পারবেন না? পরের শ্লোকে এই বিষয়েই বলা হয়েছে।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

—'পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং ধর্মপ্রাণ রাজর্ষিদের কথা আর বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন কী? এই ক্ষণস্থায়ী, সুখহীন জগতে জন্মলাভ করে তুমি আমারই ভজনা কর।'

পূতচরিত্র ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণরা বা রাজর্ষিরা, অর্থাৎ 'ঋষিপ্রতিম রাজা বা ক্ষত্রিয়রা'; *লোকমিমং প্রাপ্য*, 'এই পৃথিবীতে এসে'; যে পৃথিবী *অনিত্যম্*, অর্থাৎ 'ক্ষণস্থায়ী' এবং *অসুখম্* অর্থাৎ 'সুখহীন', যদি তাঁরা আমাকে ভজনা করেন, তবে আর সন্দেহ কী যে, তাঁরাও এই পরম গতি লাভ করবেন? এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে এই *রাজর্ষি* শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ এর আগে সমাজের অবহেলিত শ্রেণির কথা বলেছেন এবং এখন সমাজের মান্যগণ্য শ্রেণির কথা বললেন। এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে তিনি বলেছেন,

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

—'তোমার চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে প্রণাম কর; এইভাবে তোমার হৃদয় আমাতেই স্থির হলে, আমাকেই পরম গতিরূপে গ্রহণ করলে, তুমি আমাকেই লাভ করবে।'

মন্মনা ভব, 'তোমার চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট কর'; *মদ্ভক্তো*, 'আমার ভক্ত হও'; *মদ্যাজী*, 'যা কিছু পূজা-অর্চনা এবং যজ্ঞ, তা আমার উদ্দেশ্যেই কর'; *মাং নমস্কুরু*, 'আমাকে প্রণাম কর', কারণ আমাদের সকল প্রণাম এবং স্তুতি পরমপুরুষের প্রতিই নিবেদিত হওয়া উচিত। *মাম্ এব এষ্যসি যুক্ত্বা এবম্*, 'এই রকম *যোগযুক্ত* হয়ে তুমি আমাকেই লাভ করবে'; *মৎপরায়ণঃ*, 'যাঁরা সম্পূর্ণভাবে আমার অনুরক্ত'। এই অধ্যায়ে এটিই ভগবানের একান্ত আবেদন। এই আবেদন তিনি আরও দু'এক জায়গায় করেছেন। পরে দেখব। *মৎপরায়ণঃ; পরায়ণঃ* অর্থ 'পরম লক্ষ্য'; যখন এই শব্দের আগে *মৎ* যুক্ত হবে, তখন তার

অর্থ 'আমিই (ভক্তের) পরম লক্ষ্য'। এই ভাব থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ গাইতেন, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'।

নদীতে সামান্য জল থাকলে, বহু কষ্ট করে সে জল তুলে আনতে হয়; কিন্তু দুকূল ছাপিয়ে গেলে তখন আর কষ্ট করতে হয় না, যেখান থেকে খুশি জল নেওয়া চলে। এখানে ভক্তির বন্যা। কালে মানুষের মধ্যে অবশ্যই এই ভক্তির প্লাবন আসবে। মানব জীবনের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি তখন সকলে উপলব্ধি করবে এবং বুঝবে যে, মানুষের স্বরূপ ঈশ্বর প্রেমের মাধ্যমে, মানব প্রেম, সহমর্মিতা এবং সেবাভাবের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। এগুলিই বিশুদ্ধ ভক্তির ফল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী দু-তিনশো বছরের মধ্যে সাধারণ মানুষ জ্ঞান-ভক্তি সমন্বিত এই বেদান্ত দর্শনকে বুঝতে পারবে এবং তার ফলে প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই মানুষের প্রতি প্রেম ও সেবার ভাব প্রকাশ পাবে। অষ্টম-নবম শতাব্দীর সুফী মহিলা সাধ্বী রাবেয়ার কথাই ধরা যাক। তিনি কী করেছিলেন? একজন যখন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'রাবেয়া, তুমি কি ঈশ্বরকে ভালবাস?' রাবেয়া বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরকে গভীরভাবে ভালবাসি, প্রচণ্ড ভালবাসি।' তারপর প্রশ্ন করা হলো, 'রাবেয়া, তুমি কি শয়তানকে ঘৃণা কর?' তিনি বললেন, 'ঈশ্বরকে ভালবেসে শয়তানকে ঘৃণা করার সময় আমি পাই না।' রাবেয়া একজন ক্রীতদাসী হয়েও পরম আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। ফলে পরবর্তিকালের সব সুফী সাধকই তাঁর জীবন দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। প্রত্যেক ধর্মেই এইরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ধর্মভাবাপন্ন মানুষ যে আরও আবির্ভূত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস, ভক্তি ও জ্ঞান সমন্বিত এই বৈদান্তিক সত্য মানুষ একবার বুঝতে পারলে তাদের জীবন ও কর্মধারা আমূল বদলে যাবে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থেকে তাদের হৃদয়ে মানুষের প্রতি প্রেম ও সেবার ভাব আসবে এবং তার ফলে তারা পরমানন্দ অনুভব করবে। যেদিন আমরা বুঝব প্রকৃত ধর্ম বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়, তখনই এই ধরনের *ভক্তি* সমাজে সঞ্চারিত হবে। এই শুদ্ধ ভক্তির ধারণা আমরা বহু সূত্রেই পেতে পারি। যেমন, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*। যথার্থ ধর্ম বলতে কী বোঝায় তা কথামৃতে অতি সহজ সরলভাবে বলা হয়েছে। এই ভক্তিভাব জাগলে মানুষের জীবন ও কাজকর্মে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে যাবে এবং আমি বিশ্বাস করি যে, এই পরিবর্তন

ভারতবর্ষে তো বটেই, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও দেখা দেবে। আমি নিজে দেখেছি বিদেশের মানুষ এই বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার অমৃত আস্বাদনের জন্য কীরকম ক্ষুধার্ত, কীরকম ব্যাকুল! অন্ধবিশ্বাস এবং মতবাদের গোঁড়ামিতে তারা আর ভুলছে না। কাজেই এই বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পেলে তারাও এই দিকে ফিরবে এবং তখনই মহান্‌গ্রন্থ *পদ্মপুরাণ*-এর অঙ্গীকার ফলবতী হবে। ভাগবতের মহিমা বর্ণনা করে সেখানে বলা হয়েছে ঃ

জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তা যা ভক্তিঃ প্রেমরসাবহা।
প্রতি গেহং প্রতি জনং ততঃ ক্রীড়াং করিষ্যতি ॥

এ এক আপ্তবাক্য। এর অর্থ, 'জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা সমৃদ্ধ এই মহান *ভক্তি*', *জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তা যা ভক্তিঃ;* এই *ভক্তি* কীরকম? *প্রেমরসাবহা,* 'প্রেমরসের প্রবাহ অর্থাৎ অমল প্রেম'। কালে, *ক্রীড়াং করিষ্যতি,* এই ভক্তিস্রোত, 'খেলা করবে'; *প্রতি গেহম্,* 'প্রত্যেক গৃহে'; *প্রতি জনম্,* এবং 'প্রতিটি হৃদয়ে'। বর্তমান যুগে মানবজাতির পক্ষে এই ধর্মভাব বোঝা এবং তদনুযায়ী জীবনযাপন করা খুবই সম্ভব, কারণ এই ধর্ম যেমন সহজ তেমনি বাস্তবসম্মত; এই ধর্ম সর্বস্তরের সব মানুষই অনুসরণ করতে পারে। এই কারণেই এই অধ্যায়ের শুরুতে দ্বিতীয় শ্লোকের বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। ঐ শ্লোকে বলা হয়েছিল ঃ

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥

রাজবিদ্যা, 'এ হলো রাজবিদ্যা', সকল বিদ্যার রাজা; *রাজগুহ্যম্,* 'রহস্যের চূড়ামণি', *পবিত্রম্ ইদম্ উত্তমম্।* 'এই বিদ্যা পরম শোধনকারী'। এই ধরনের ভক্তির মাধ্যমে কী অসাধারণ চারিত্রিক পরিবর্তনই না আসতে পারে! বস্তুত পবিত্রতা, প্রেম, সেবাভাব, শরণাগতি—সবই এই ভক্তির মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আসবে। *প্রত্যক্ষাবগমম্,* 'দৈনন্দিন জীবনেই তা অনুভব করা যাবে, তার জন্য সুদূর অরণ্যে বা স্বর্গে যাওয়ার দরকার হয় না। রান্নাঘরে, কলকারখানায় বা অফিসে কাজ করতে করতেই আপনারা এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারেন। *ধর্ম্যম্,* 'যা সামাজিক কাঠামোকে দৃঢ় করে'; একজন মানুষের সঙ্গে আর পাঁচজন মানুষের ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। *সুসুখম্ কর্তুম্,* 'যা আচরণ করা সহজ এবং সুখকর'। কিন্তু, *ফলম্ অব্যয়ম্,* 'তার ফল অক্ষয়'। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে এই কথাই আপনারা শুনেছেন এবং এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হচ্ছে অন্তিম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের এক বিশেষ আবেদন দিয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে যেসব মানবিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সেগুলি সমাধানের জন্য অজ্ঞাবাদী বার্ট্রান্ড রাসেল চেয়েছিলেন, মানুষের হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হোক। সমস্যা সমাধানের আর কোন পথ খুঁজে না পাওয়ায় চিরকালের কট্টর খ্রিস্টধর্মবিরোধী রাসেল একটু লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন, খ্রিস্টীয় ভালবাসাই হলো এই সব জটিল সমস্যার একমাত্র সমাধান (*The Impact of Science on Society,* Chapter.6 : 'Science and Values', p.105)। রাসেল তাঁর গ্রন্থে বলছেন ঃ

'ব্যাপারটা এতই সরল এবং সেকেলে যে তা উল্লেখ করতে আমার লজ্জাই হচ্ছে; ভয় হচ্ছে আমার কথা শুনে অবিশ্বাসীরা না মুচকি হাসি হাসেন। যে জিনিসটার কথা আমি বলতে চাইছি—আমাকে দয়া করে আপনারা ক্ষমা করবেন—সেটি হলো প্রেম, খ্রিস্টীয় ভালবাসা বা করুণা। যদি এই প্রেম আপনার ভিতরে থাকে তো বুঝব, আপনার বেঁচে থাকার একটা উদ্দেশ্য আছে, কর্মকে সঠিক পথে চালিত করার একটা অবলম্বন আছে, একটা যুক্তি আছে, বৌদ্ধিক সত্তার অকুতোভয় হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি এই প্রেমের প্রেরণা আপনি অনুভব করেন, তাহলে বলবো ধর্মপথে চলার জন্য মানুষের যা প্রয়োজন, তার সবকিছুই আপনার আছে। ....'

ধর্মের যে বিজ্ঞান, তাতে কোন জটিলতা নেই। শুদ্ধ ধর্মের আচরণও সহজ-সরল ব্যাপার। কিন্তু আমরাই তাকে জটিল করে তুলি। এই মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, মহত্তম সত্যগুলি সর্বদাই সরল। তাতে কোন মারপ্যাঁচ নেই। কিন্তু সেটা মানুষের বোঝা দরকার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই আধুনিক যুগে পৃথিবীব্যাপী এক প্রচণ্ড বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে, কারণ আমি সর্বত্রই লক্ষ্য করছি এক বিরাট আধ্যাত্মিক ক্ষুধায় মানুষ ছটফট করছে। বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য মানুষ আজ ব্যগ্র। তারা জানতে চায়—উচ্চতর জীবন কী? এটাই শুভ সংকেত। সেকেলে গোঁড়ামি দূরে সরিয়ে ধর্মের সার সত্যগুলি বুঝতে মানুষের হয়তো কিছুটা সময় লাগবে, তা লাগুক। কিন্তু এই সত্য ধীরে ধীরে তাদের জীবনে প্রকাশ পাবেই। এই অধ্যায়ে একটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত হয়েছে। সেটি কী? *প্রত্যক্ষ অবগমম্,* ভগবান 'সেখানে' নয়, 'এখানে'; এখানেই, যেখানে আমি এখন আছি। এখানেই আমি আধ্যাত্মিক হয়ে উঠতে পারি। এটিই এই অধ্যায়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাব। আমার 'হেথা সেথা' যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কেন? তার কারণ আপনার অনন্ত আত্মাই ঈশ্বর।

তিনি প্রেমস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। এই হলো ভগবদ্‌গীতার দৃষ্টিতে অধ্যাত্মবিজ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ জগদ্‌গুরু, তাঁর বাণী সকলের জন্য। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 'ভগবদ্‌গীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা'—নামক এই গ্রন্থের তাৎপর্য এটাই।

ইতি রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

'রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ নামক নবম অধ্যায়ের এখানেই সমাপ্তি।'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দশম অধ্যায়

বিভূতিযোগ

ঈশ্বরীয় বিভূতির আভাস

দশম অধ্যায়ের বর্ণনায় *বিভূতি* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে *বিভূতিযোগ। বিভূতি* শব্দের অর্থ 'প্রকাশের শক্তি' বা ব্যক্ত ঈশ্বর। ঈশ্বর অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত। কিন্তু সেই তিনিই আবার প্রকাশিত বা ব্যক্ত। এ দুটি হলো পরব্রহ্মের দুটি দিক বা ভাব—নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিক—নিরাকার এবং সাকার। বস্তুত সত্তা হিসাবে তারা এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে—এই যা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'সাপ যখন কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, তখন সেটা নিরাকার অবস্থা। আবার সেই একই সাপ যখন চলতে শুরু করে, তখন সেটি ব্রহ্মের সাকার অবস্থা'। সাপ দুটি নয়, একটাই এবং এই কারণেই আমরা এই সংসারে বাস এবং কাজকর্ম করা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করতে পারি। নবম অধ্যায়ে এই দর্শনের কথাই বলা হয়েছে। সত্যি বলতে কি, সমগ্র গীতার মূল সুর এইটিই। ইন্দ্রিয়াতীত, তুরীয় ও অব্যক্ত সত্যলাভের পথেরও উল্লেখ গীতায় রয়েছে; কিন্তু জোর দেওয়া হয়েছে এই ব্যক্ত জগৎ-সংসারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সাধনার ওপর।

ঈশ্বর আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা। এই জগতের মধ্যেই তিনি নিজেকে ব্যক্ত করেছেন। তাই আমরা সর্বদা তাঁর কাছে কাছেই আছি। দরকার কেবল স্বচ্ছ দৃষ্টির। তাহলেই আমরা তাঁকে জগতের সকল বস্তুতে প্রত্যক্ষ করতে পারব। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলিতে এই ভাব বারবার প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি যাঁরা বিশুদ্ধ প্রকৃতির কবি, যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, তাঁদের কবিতাতেও এই ভাবের আভাস মেলে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর 'Tintern Abbey' কবিতায় এই ভাবটি ব্যক্ত করেছেন। তিনি যা বলেছেন তার বাংলা করে এই দাঁড়ায়—

... ... প্রকৃতিকে দেখতে শিখেছি আমি
কলগাহীন যৌবনের চিন্তাহীন প্রহরে নয়;
বরং বারবার মানুষের স্তব্ধ বিষণ্ণ সঙ্গীত শুনে

যা রুক্ষ পীড়াদায়ক নয়, অথচ যা
শুদ্ধ করে, শান্ত করে অবলীলায়।
এবং এমন এক সত্তার উপস্থিতি অনুভব করেছি
ঋদ্ধ চিন্তার আনন্দ-তরঙ্গে যা আমাকে আপ্লুত করে,
মহান এমন কিছুর স্পন্দন যার মূল নিস্তল গভীরে,
নীড় যার অস্তগামী সূর্যকিরণে,
সাগর বলয়ে, প্রাণদায়ী বাতাসে,
সুনীল গগনে এবং মানুষের মনে;
সে এমন এক গতি ও সত্তা যা প্রাণিত করে
সব মননশীল বস্তুকে, চিন্তার সকল বিষয়,
সবকিছুতেই তার সঞ্চরণ। তাই এখনও আমি
ঘাসে ছাওয়া মাঠ, অরণ্য
এবং পর্বত ভালবাসি, মুগ্ধ সবকিছুতেই
যা এই শ্যামল ধরিত্রী থেকে চোখে পড়ে;
চোখে দেখা, কানে শোনার বিপুল জগৎ
যার অর্ধেক বাস্তব আর অর্ধেক কল্পনা;
তবুও তৃপ্ত আমি প্রকৃতিকে দেখে, ইন্দ্রিয়ের ভাষায়—
কারণ সে আমার বিশুদ্ধ চিন্তার আশ্রয়, আমার ধাত্রী,
আমার গুরু, অন্তর্যামী এবং
আমার নৈতিক জীবনের প্রাণভ্রমর।

দেখুন, শুধু প্রকৃতিকে দেখেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর মনে কী চমৎকার বিশুদ্ধ ভাব সঞ্চারিত হয়েছে, তাঁর দৃষ্টি খুলে গেছে। সেই ভাবটি এই কবিতায় ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়, তিনি এমন এক অবস্থার কথাও বলেছেন, যেখানে 'আমাদের দেহবোধ ঘুমিয়ে পড়ে, আমরা তখন হয়ে উঠি জাজ্বল্যমান আত্মা।' স্বামী বিবেকানন্দ তখন কলকাতার একটি কলেজে পড়েন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হেস্টি সাহেব ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর কবিতা পড়াচ্ছিলেন। সেখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বর্ণিত *সমাধি-র* অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, 'এ হলো মনের এক অতি উচ্চ অবস্থা। বিরল কেউ কেউ এ অবস্থা লাভ করতে পারেন। আমি কেবল একজনকেই জানি, যিনি এই অবস্থা লাভ করেছেন; তিনি হলেন দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ' (*Life of Swami Vivekananda* by His Eastern & Western Disciples, V.I, pp. 47-48)।

প্রত্যেক ধর্মেই এই হলো ভক্তির মূল ভিত্তি। খ্রিস্টীয় ভক্তি, হিন্দু ভক্তি, সুফী ভক্তি এবং বৌদ্ধ ভক্তি—সব ভক্তিই দাঁড়িয়ে আছে এই সুগভীর দিব্য অনুভূতির ওপর। সেই দিব্য অনুভূতি লাভের সম্ভাবনা আছে বলেই মানুষের জীবন এত মূল্যবান, সেখানেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা।

এখন আমরা দশম অধ্যায়ে এসেছি। এখানে আমরা ব্যক্ত বিশ্বের বর্ণনা পাচ্ছি, যেখানে বলা হয়েছে সেই এক ব্রহ্ম বহু হয়েছেন। কিন্তু কীভাবে তিনি বহু হয়েছেন? তাঁর *যোগশক্তির* সাহায্যে। তিনি এমন এক অসাধারণ শক্তির অধিকারী যে, যদিও তিনি স্বরূপত এক ও অখণ্ড তবুও তিনি বহু হতে পারেন। পরে এইভাবেই বলা হবে। তাই এই অধ্যায়ের নাম *বিভূতিযোগ* অর্থাৎ ভগবানের দিব্য বিভূতির যোগ। বিভূতি, অর্থাৎ নিজেকে ব্যক্ত করার বিবিধ শক্তি। এই অধ্যায় শুরু হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথা দিয়ে। কখনো অর্জুন প্রশ্ন করেছেন এবং সেই প্রশ্ন দিয়ে কোন অধ্যায় শুরু হয়েছে। আবার কখনো শ্রীকৃষ্ণ নিজেই উপদেশ দিয়ে চলেছেন। এখানে অধ্যায় শুরু শ্রীকৃষ্ণের কথা দিয়ে।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান বললেন—'হে মহাবাহু অর্জুন, আবার তুমি আমার এই পরম বাক্য শোন, যা আমি তোমার কল্যাণার্থে তোমাকে বলব, যে তুমি (আমার কথা শুনে) প্রীত হও।'

হে অর্জুন, আবার তুমি আমার কথা শোন। *ভূয়* মানে 'পুনরায়'; *শৃণু মে পরমং বচঃ,* 'আমার এই পরম তত্ত্বকথা শোন'। যে কথার গভীর ব্যঞ্জনা, তাকে বলা হয় *পরমং বচঃ*। কথা শূন্যগর্ভ, অসার হতে পারে, যাকে শেক্সপীয়ার, 'শুধুই তাৎপর্যহীন শব্দ ও কোলাহল' বলেছেন। আবার কথা গভীর ব্যঞ্জনাবহ হতে পারে; সে কথা ঠিক যেন সুন্দর মৌচাক, যার অন্তর মধুতে পরিপূর্ণ। তেমনি আমরা এমন কিছু কিছু কথা পাই যা গভীর অর্থবহ। *যৎ তেঽহং প্রীয়মাণায়,* 'এই গভীর তত্ত্বকথা আমি তোমাকে বলছি, কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়'; *বক্ষ্যামি হিত কাম্যয়া,* 'যাতে তোমার নিশ্চিত কল্যাণ হয়, সে জন্যই আমি তোমাকে এই তত্ত্বকথা বলছি'।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২ ॥

'দেবতারা এবং মহর্ষিরা, কেউ আমার উৎপত্তির কথা জানেন না। কারণ সর্বতোভাবেই, আমি সকল দেবতা এবং মহর্ষিদের উৎস।'

দেবতারা বা মহর্ষিরা, কেউই আমার উৎপত্তির কথা জানেন না। কারণ, আমি তাঁদের সকলের আদি। এই অপূর্ব তত্ত্বটি প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল ঋগ্বেদের 'নাসদীয় সূক্তে'। দেবতারা সব সৃষ্টির পরবর্তিকালে আবির্ভূত হয়েছেন—তাঁরা কীভাবে সেই আদিকারণকে জানবেন? তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তাঁরা আমাকে জানেন না; এমনকি আদ্যিকালের দেবতা এবং ঋষিরাও আমার উৎপত্তি জানেন না।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

—'যে ভক্ত আমাকে জন্মহীন, আদিহীন এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানেন—সকল মানুষের মধ্যে তিনিই মোহশূন্য এবং সকল পাপ থেকে মুক্ত হন।'

যো মাং বেত্তি, 'যাঁরা আমাকে জানেন'। কীভাবে জানেন? জানেন এইভাবে যে, *অজম্ অনাদিম্ চ,* 'আমি *অজম্* এবং *অনাদিম্*'; *অজম্* শব্দের অর্থ 'জন্মহীন'। এই পরম ব্রহ্মের কখনও জন্ম হয় নি; বাকি সব জিনিসের উৎপত্তি আছে, পরিবর্তন এবং মৃত্যু আছে। কিন্তু ব্রহ্ম অবিনাশী, পরিবর্তনহীন এবং জন্মরহিত। *অনাদিম্* মানে 'আদিহীন'। *বেত্তি লোকমহেশ্বরম্,* 'যিনি আমাকে বিশ্বের সর্বময় অধীশ্বররূপে জানেন'। তিনিই বিশ্বের একমাত্র পরিচালক ও শাসক; তাঁর শক্তিতেই জগৎ চলছে। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*-এ যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী এবং গার্গীকে, বিশেষ করে গার্গীকে বলছেন, 'সেই অবিনশ্বর সত্তার শক্তিতেই সূর্য এবং চন্দ্র তাদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে, নদীগুলি সাগর অভিমুখে ছুটে চলেছে ...।' এখানেও শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা বলছেন, *লোকমহেশ্বরম্,* 'এই বিশ্বের পরম প্রভু'। *অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু,* 'মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি অবশ্যই *অসংমূঢ়ঃ*'; *মূঢ়* মানে 'বোকা', মোহগ্রস্ত ব্যক্তি; *অসংমূঢ়ঃ* মানে 'মোহশূন্য ব্যক্তি'। সংস্কৃতে *মূঢ়* শব্দটি একমাত্র ধিক্কারবাচক শব্দ। আমরাও বলে থাকি; 'সে একটা বোকা'। কিন্তু এর বিপরীত হলো *অসংমূঢ়ঃ,* 'মোহ থেকে, নির্বুদ্ধিতা থেকে

সম্পূর্ণ মুক্ত'; *সর্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে,* 'এইরকম মানুষ সব পাপ থেকে মুক্ত হন' এবং সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়ে যান। কেন? কারণ, তিনি সেই গূঢ় সত্যকে, সব সত্যের ঊর্ধ্বে যে সত্য, সেই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥

—'বুদ্ধি, জ্ঞান, মোহশূন্যতা, ক্ষমা, সত্য, বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম, চিত্তের প্রশান্তি, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয় এবং অভয়',

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

—'অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপস্যা, পরহিতচিকীর্ষা, যশ (আবার) অপযশও—জীবের (এইসব) বিভিন্ন গুণ আমার থেকেই উৎপন্ন হয়।'

দুটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষিপ্তভাবে বলছেন যে, ভালো, মন্দ, সবকিছুর উৎপত্তি হলো সেই এক ব্রহ্ম থেকে। বেদান্ত বলে না যে, ভালো যা কিছু তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, আর যা কিছু মন্দ তা এসেছে শয়তানের কাছ থেকে। সবকিছুর উৎস সেই এক এবং অসীম ব্রহ্ম। এখন দেখা যাক, সেই এক উৎস থেকে কী কী এসেছে। বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমূঢ়তা, ক্ষমা, সত্য, বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম (*দমঃ*), হৃদয়ের প্রশান্তি (*শমঃ*); সুখ, দুঃখ, জন্ম (ভবঃ), মৃত্যু (অভাবঃ), ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপস্যা, দান, যশ এবং অপযশ। *ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ,* 'জীবের এই সমস্ত বিভিন্ন গুণগুলি শুধুমাত্র আমার থেকেই উৎপন্ন হয়।' এটি বেদান্তের অতি বলিষ্ঠ ঘোষণা। শুধুমাত্র ভালো গুণগুলি নয়, যেগুলিকে মন্দ বলা হয়, সেগুলিও ওই একই উৎস থেকে নিঃসৃত। একথায় অনেকে ক্ষেপে যান; তাঁরা বলেন—মন্দ কীভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টি হতে পারে? তাঁরা এমনভাবে প্রশ্নটি করেন যেন, মন্দ এবং ভালো দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। না, তা নয়। তারা আপেক্ষিক। কারণ একজনের কাছে যা ভালো, অন্যের কাছে তা খারাপ মনে হতে পারে। শুধু তাই বা কেন? এখন আপনার কাছে যা ভালো বলে প্রতিভাত হচ্ছে, পরক্ষণেই আপনার কাছে তা মন্দ *ঠেকতে* পারে। কাজেই, বেদান্তে ভালো এবং মন্দকে দুটি পুরোপুরি ভিন্ন বস্তুরূপে দেখা হয়নি। এগুলি আপেক্ষিক সত্য, আত্যন্তিক সত্য নয়। নয় যে, তা আমরা প্রতিদিনই দেখতে পাচ্ছি। কার্বন-ডাই-অক্সাইড

গ্যাসের কথাই ধরুন। ঐ গ্যাস আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীর থেকে বার করে দিই; কারণ ঐ গ্যাস আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু গাছপালার পক্ষে ঐ গ্যাসই পরম আদরের বস্তু। সেইরকম, বিষ সাপের ক্ষতি করে না, কিন্তু সাপ যাকে কাটে তারই মরণ-যন্ত্রণা। সাপের মধ্যে বিষ তার শরীরের একটা অংশ, সেটাই তার প্রকৃতি। আবার দেখুন, এই বিষ অতি সামান্য মাত্রায় গ্রহণ করলে অবাঞ্ছিত রক্তক্ষরণ বন্ধ হতে পারে। বহু যুগ আগেই আমরা এই সত্য আবিষ্কার করেছি যে, মন্দ এবং ভালো—এগুলি সবই আপেক্ষিক। আত্যন্তিক সত্য একটিই—ঈশ্বর নিজে। ঈশ্বর যখন জগৎরূপে প্রকট হন, তখনই এই ভালো এবং মন্দ সৃষ্ট হয়। এক ঈশ্বর বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেন। কখনও ভালো, কখনও মন্দ ইত্যাদি। যে আগুন মানুষকে দহন করে, সেই আগুনই আবার শীতকালে আপনাকে আরাম দেয়। আগুন সর্বতোভাবে ভালো নয়, আবার মন্দও নয়। জগতে সবকিছুরই একটা নিজস্ব মর্যাদা ও মূল্য আছে। এই দুটি শ্লোকে তাই বলা হচ্ছে, সবকিছুরই উৎপত্তি আমার থেকে, পরমেশ্বরের থেকে।

কয়েক সপ্তাহ আগে আমি আমেরিকার 'ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক' পত্রিকার একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেছিলাম। প্রবন্ধটির নাম ছিল, 'Sun is Our Mother—'সূর্য আমাদের মা'। সেখানে লেখক বলেছেন যে, এই সৌরজগতের সবকিছুই—ভালো, মন্দ, সব কিছুই—সৌরকিরণের ঘনীভূত রূপ। কিন্তু তাতে সূর্যের গৌরবের কিছু হানি হয় না। ব্যক্তরূপে সূর্যের যা কিছু মন্দ, তা তার আদি উৎসকে কখনওই কলুষিত করতে পারে না। তাই, যে-কাপড় আপনি পরেন, যে-খাদ্য আপনি খান, আপনার চারপাশে যে-আবর্জনা আপনি দেখেন, আপনার যে হজম শক্তি, সবই এক সৌরশক্তির ব্যক্তরূপ ছাড়া আর কিছু নয়। ভারী চমৎকার ভাব! এই সত্যই অদ্বৈত দর্শনের ভিত্তি—বহুর অন্তরালে বিরাজিত এক অদ্বিতীয় সত্তা। দুই বলে কিছু নেই। কোনও জড় বিজ্ঞানই বিশ্বের পিছনে দুই-এর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। দুটি অনন্তশক্তির অস্তিত্ব বেদান্তও স্বীকার করে না। বেদান্ত বলে, একটি সত্তাই রয়েছে। যদি আপনারা এখানে বহুর অস্তিত্ব দেখতে পান, তবে বুঝবেন সেই অনন্ত এক থেকেই বহুর সৃষ্টি হয়েছে। এই হলো সত্যকে স্বীকার করার সাহস। এই শ্লোক দুটি আমাদের সেই নির্ভীক বাণী দিচ্ছে। *মত্ত এব,* তারা আমার থেকেই সৃষ্ট হয়েছে; *পৃথগ্বিধাঃ,* 'বিভিন্নরূপে'।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা ।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

—'সপ্ত মহর্ষি, [তাঁদের] পূর্ববর্তী চার ঋষি এবং চতুর্দশ মনু, যাঁদের চিত্ত আমাতেই নিবিষ্ট ছিল, তাঁরা আমারই মানসপুত্র এবং তাঁদের থেকে জগতের এই সকল প্রজাসমূহ [সৃষ্ট হয়েছে]।'

এই শ্লোকে পরোক্ষভাবে আমাদের প্রাচীন পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের ছায়াপাত ঘটেছে। পুরাণমতে, ব্রহ্মাই সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন; তারপর ব্রহ্মা থেকে জন্মালেন চার কুমার; তারপর মনুগণ এবং তারও পরে বিভিন্ন রুদ্রগণ। এই সবকিছুর উৎপত্তি সেখান থেকে। এই শ্লোকগুলিতে ঐ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। কাজেই, এই পটভূমি সম্পর্কে কিছুটা জানা ভালো। কিন্তু মূল কথা একটিই— এই বিশ্ব এসেছে সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা দিব্য সত্তা থেকে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *মহর্ষয়ঃ সপ্ত,* 'সাতজন মহর্ষি'; ভারতবর্ষের প্রায় সকলেই এই সপ্তর্ষির কথা জানেন। পাশ্চাত্যের মানুষ বলেন 'Great Bear'। আমরা বলি সপ্তর্ষিমণ্ডল। *পূর্বে চত্বারো,* 'পূর্ববর্তী চারজন'। এই 'পূর্ববর্তী চারজন'-এর বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলি আদৌ সন্তোষজনক নয়। *মনবস্তথা,* এবং 'সাতজন মনুও'। ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের অন্তর্গত চতুর্দশ মনুর মধ্যে সাতজন মনুর আবির্ভাব ঘটে গেছে এবং ভবিষ্যতে আরও সাতজন মনুর আবির্ভাব ঘটবে।

বাল গঙ্গাধর তিলক এ বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধানের পর বলেছেন যে, 'পূর্ববর্তী চারজন' বা *চত্বারো পূর্বে*-র তাৎপর্য হলো চারটি ব্যূহ—*বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন* এবং *অনিরুদ্ধ*—ঈশ্বরের চারটি ব্যক্ত রূপ। এদের বলা হয় চার *ব্যূহ।* মহাভারতের *নারায়ণীয়* পর্বে, যা গীতার অনুপ্রেরণার স্থল, সেখানে এই চার ব্যূহের উল্লেখ রয়েছে। অতএব, এরা ছাড়া পূর্ববর্তী চারজনের আর অন্য কোন ব্যাখ্যা হতে পারে না। অতএব, *চত্বারো পূর্বে-র* অর্থ 'আগের সেই চারজন', অর্থাৎ এই চারজনের ব্যূহ। *মনবস্তথা,* 'এবং মনুগণ'। চতুর্দশ *মন্বন্তর*-এ ব্রহ্মাণ্ডের একটি যুগ হয়। প্রথম মনু হলেন স্বায়ম্ভুব মনু। এরপর, আরও পাঁচজন মনুর পর আবির্ভূত হন বৈবস্বত মনু। বৈবস্বত হলেন সপ্তম মনু। বর্তমানে আমরা বৈবস্বত মনুর কালে বাস করছি। এক একজন মনুর বয়স কয়েক লক্ষ বছর। অতএব, *মনবস্তথা,* এঁরা হলেন সাতজন মনু (স্বায়ম্ভুব মনু থেকে বৈবস্বত মনু পর্যন্ত) অর্থাৎ পূর্ববর্তী সাতজন মনু। আমাদের দর্শনে এবং ধর্মশাস্ত্রে স্থান এবং কালের এ এক বিশাল ধারণা। *মদ্ভাবা,* 'তাঁদের মন আমার ওপর নিবদ্ধ ছিল'; *মানসা জাতা,* এবং তাঁরা 'আমার মানসপুত্র', অর্থাৎ

তাঁরা আমার সঙ্কল্পজাত, আমার মনের সৃষ্টি। ব্রহ্মা স্বয়ং ভগবান নারায়ণের মনের এক প্রক্ষেপণ। এই মনুগণ, চার *ব্যূহ* এবং সপ্ত ঋষিও তাই। এঁরা সকলেই ঈশ্বরীয় ভাব থেকে অভিক্ষিপ্ত। এইভাবেই সেই আদি সৃষ্টির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তা। সেই সূক্ষ্মসত্তাই ক্রমশ স্থূল থেকে স্থূলতর হয়ে এক সময় এই জগৎরূপে ব্যক্ত হয়েছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা প্রায় একই পথ অবলম্বন করেছে। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার বক্তব্য এই যে, সৃষ্টির আদিতে সব কিছুই অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে; বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তখন কোন পার্থক্য থাকে না। তারপর, সেই সূক্ষ্মবস্তু প্রতি মুহূর্তে স্থূল হতে থাকে। যতই স্থূল হয়, ততই তার মধ্যে ভেদ বা বৈচিত্র্যের প্রকাশ হতে থাকে। অবশেষে একদিন এই বিশ্বরূপে তা ব্যক্ত হয়ে থাকে। আজ এই যে বিপুল বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাই, আদিতে তা ছিল না; ছিল অখণ্ড ঐক্য। আধুনিক নভোবস্তু বিজ্ঞানীরা এই অবস্থাটিকে 'Point of singularity' অর্থাৎ অনন্য বা মৌলিক অবস্থা বলে থাকেন। সেখান থেকেই শুরু হয় প্রসারণ এবং একের পর এক তা ব্যক্ত হতে থাকে। গোড়ায় এই এত সব বৈচিত্র্য ছিল না; অণু, পরমাণু এমনকি ইলেকট্রন, প্রোটন—কোনকিছুই ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল এক ঘনীভূত শক্তি। তার থেকেই পরবর্তিকালে এটা সেটা হয়েছে। এইভাবে সেই 'এক' থেকেই এই সমগ্র বিশ্ব এসেছে এবং এই প্রকাশের কাল শেষ হলে তা আবার সেই এক ও অখণ্ড অবস্থায় ফিরে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, 'আমি এই সকল দেবতা ও মহর্ষিগণেরও আদি। যাঁরা আমাকে এই বিশ্বের উৎপত্তিস্থল বলে জানেন, তাঁরা সব মোহ থেকে মুক্ত হন।' তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, অভিব্যক্তি বা প্রকাশপর্ব শুরু হয়েছে মহর্ষিদের থেকে—*মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবঃ তথা, মদ্ভাবা মানসা জাতা।* এঁদের 'মানস সৃষ্টি' বলা হয়। আসল কথা এই, মূলে এই বিশ্ব ছিল ঐশী-চিত্তের একটি স্পন্দন, বিশুদ্ধ চৈতন্যের স্পন্দন। তাতে কোন বৈচিত্র্য ছিল না। পরে ধীরে ধীরে তা ঘনীভূত হয়ে স্থূলরূপ পরিগ্রহ করে। এমনকি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও তাই ঘটে। আপনি কাজ করেন বটে, কিন্তু আপনার কাজের পিছনে থাকে আপনার মানসিক স্পন্দন। প্রথমে আমরা চিন্তা করি, তারপর সিদ্ধান্ত নিই, কামনা করি এবং তারপর সেই ইচ্ছাটিকে কাজে পরিণত করি। আজ যে বাড়িটি আপনি তৈরি অবস্থায় দেখছেন, তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বস্তু—সকলের ধরাছোঁয়ার মধ্যে। কিন্তু এটা আগে কোথায় ছিল? ছিল আপনার মনে, আপনার কল্পনায়। আপনি ঠিক করেছিলেন,

'এইরকম একটা বাড়ি একদিন তৈরি করবই'। তাই যথাসময়ে আপনি বাড়ির নকশা তৈরি করলেন এবং একদিন বাড়িটি নির্মাণ করলেন। এই সব সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায় যে, 'আগে আসে সূক্ষ্ম, পরে স্থূল'। যখন আবার জগৎকে গুটিয়ে নেবার সময় আসবে, তখন ক্রমটি উলটে যাবে। স্থূল ক্রমশ গিয়ে মিশবে সূক্ষ্মে—অর্থাৎ বিবর্তন থেকে সংকোচন। আজকের পদার্থবিদ্যায় আমরা বলি, এক আদি বিস্ফোরণ থেকেই এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে; আবার এক মহাসংকোচনের ফলে জগতের বহুত্ব একত্বে মিলিয়ে যাবে।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

—'যিনি আমার এই বহুত্বের অভিব্যক্তি এবং (এই) যোগশক্তিকে যথার্থভাবে বুঝবেন, তিনি অবিচলিতভাবে যোগে প্রতিষ্ঠিত হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

যিনি এই সত্য জানেন, তিনি *অবিকম্পযোগ-এ* প্রতিষ্ঠিত হন। *অবিকম্প-যোগ,* অর্থাৎ 'এ সেই যোগ, যা থেকে কখনই চ্যুত হতে হয় না।'। *কম্প* মানে 'নড়াচড়া'। *অবিকম্প* মানে 'অবিচলিত', সম্পূর্ণরূপে স্থির। এটাই তো আমাদের চাই—স্থির মন, স্থির বুদ্ধি, স্থির জীবন। অস্থির জীবন আমাদের কাম্য নয়। আমরা বলবান এবং শক্তিমান হতে চাই। তাই বলা হচ্ছে, এ রকম যাঁরা, তাঁরা অবিকম্প বা অবিচলিত যোগে প্রতিষ্ঠিত হন। কীভাবে? *এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ,* 'যাঁরা আমার *বিভূতি* এবং *যোগকে,* অর্থাৎ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডরূপে আমার অভিব্যক্তিকে এবং তা সম্ভব করে তোলার শক্তিকে যাঁরা যথার্থভাবে জানেন। *বিভূতি* মানে 'প্রকাশশক্তি'; *যোগ* মানে 'সেই শক্তি যা সেই বিচিত্র প্রকাশকে সম্ভাবিত করে।' *যো বেত্তি,* 'যাঁরা [এই সত্যকে] জানেন; *তত্ত্বতঃ,* 'যথার্থরূপে'; *সঃ,* 'তিনি'; *অবিকম্পেন যোগেন,* 'এই অবিচলিত যোগের দ্বারা'; *যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ,* 'কোন সংশয় নেই যে তিনি', সেই *অবিকম্প যোগ,* 'লাভ করেন'। অবিকম্প যোগ অর্থাৎ 'স্থির মন'। কারো মন স্থির কিনা তা তাঁর চোখ দেখলেই বোঝা যায়। চোখের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্বের বাহ্য একটি দিক উন্মোচিত হয়। যখন দেখবেন, কারো চোখ স্থির ও অচঞ্চল, তখন নিশ্চিত জানবেন, তার মনটিও স্থির। যদি চোখ চঞ্চল বা অস্থির হয়, তাহলে জানবেন, মনও অস্থির। মানুষের চোখ দেখেই তার মনটি বোঝা যায়। Shakespeare বলেছেন, মানুষের মুখমণ্ডলে তার আত্মার ছায়া পড়ে।

ঠিক কথা। আমরাও তাই বলি। তবে চোখের মাধ্যমেই মনের ভাবটি, মনের অবস্থাটি সব থেকে বেশি ব্যক্ত হয়। মন প্রশান্ত এবং স্থির হলে চোখ দুটিও প্রশান্ত ও স্থির হবে। অতএব, ঈশ্বরের বিভূতি ও যোগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান হলে আমরা *অবিকম্প যোগ*-এ প্রতিষ্ঠিত হই, একটা পরম অবিচলতার ভাব আমাদের মধ্যে আসে। *নাত্র সংশয়ঃ*, 'এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই'। অতএব, এই রকম দৃঢ় মানসিক স্থিতি অর্জন করে দৃষ্টিকে শান্ত এবং স্থির করে তোলার জন্য সংগ্রাম করা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর। এ এক অদ্ভুত প্রাপ্তি। কিন্তু বিনা চেষ্টায় তা হবার নয়; এর জন্য সংগ্রাম করা একান্ত প্রয়োজন। এইভাবেই, জীবনে পরিপূর্ণতা আনা যায়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক ঃ *যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*, 'যাঁরা তত্ত্বতঃ আমাকে জানেন', *সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে, নাত্র সংশয়ঃ*, 'তিনি অবিচলিত যোগে প্রতিষ্ঠিত হন, এতে কোন সন্দেহ নেই।'

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

—'আমি সব কিছুর মূল কারণ; আমার থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি হয়—এইরূপ জেনে, জ্ঞানীরা প্রীতির সঙ্গে সচেতনভাবে আমাকেই ভজনা করেন।'

অহং সর্বস্য প্রভবঃ, 'আমি এই জগতের সব কিছুর উৎপত্তিস্থান'। একটা গাছে তো আপনারা কত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন—পাতা, মুকুল, ডালপালা, ফুল, ফল ইত্যাদি—কিন্তু সবকিছুর মূল কারণ একটি বীজ। তেমনি, ভগবান বলছেন, সবকিছুর উৎপত্তিস্থল আমি, অনন্ত ঈশ্বর। *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*, 'আমার থেকেই সবকিছু উৎপন্ন হয়।' *প্রবর্ততে* মানে 'অভিব্যক্ত বা উদ্ভূত হয়'; *ইতি মত্বা*, 'এইরূপ জেনে'; এই জ্ঞান সহায়ে *ভজন্তে মাং বুধা*, 'জ্ঞানীরা আমার ভজনা করেন।' কী ধরনের জ্ঞানী ব্যক্তি? *ভাবসমন্বিতাঃ*, যাঁরা 'সপ্রেম চৈতন্যযুক্ত'। *ভাব* মানে 'আবেগ, প্রেম, ভক্তি'; এই হলো ভক্তির প্রকৃতি। অবশ্য ভক্তিকে বাদ দিয়েও চৈতন্যলাভ হতে পারে, উপাসনা চলতে পারে। কিন্তু ভক্তিপথে সপ্রেম চৈতন্য অপরিহার্য। এই ভক্তি আপনার অনুভূতিকে সমৃদ্ধ করে, শুষ্ক দর্শন যা পারে না। খটখটে দর্শন এবং ভক্তির মধ্যে এই হলো পার্থক্য। রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস (Marcus Aurelius)-এর দর্শন-এর কথাই ধরুন। অতি নীরস। আমাদের দেশেও এইরকম অনেক শুষ্ক দর্শনের চল আছে, তাদের তুলনায় ভক্তিপথ রসসিক্ত এবং ষোলো আনা মানবিক। তাতে মানবীয় আবেগের স্থান

আছে, ভালবাসা আদান-প্রদানের সুযোগ আছে। এককথায়, মানবিক ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধতর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তোলার অনেক বেশি সুযোগ এ পথে আছে। যে সুরের অনুরণন ভক্তের জীবনে ঝংকৃত হয়, তাঁর মাধুর্য অন্য পথের মধুরতাকে ছাপিয়ে যায়। অবশ্য একটি নির্দিষ্ট পর্যায় বা সীমা পর্যন্ত; সর্বোচ্চ স্তরে অবশ্য এই রুক্ষতা আর থাকে না। তখন সব পথেই আনন্দ। জ্ঞানপথ ও ভক্তিপথের মধ্যে তুলনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি দৃষ্টান্ত দিতেন। আপনারা আপনাদের রুচিমতো তার অর্থ করে নেবেন। তিনি বলেছেন, 'দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে রোশনচৌকি বাজে। সেখানে একজন সানাই-এ কেবল 'পোঁ ধরে' থাকে। অন্য আর একজনের যন্ত্রে সাতটা ফুটো; সে তাতে নানারকম সুর তোলে। প্রথম জন একটা সুরই বাজায়, দ্বিতীয় জন সাতটা সুরের রঙপরং তোলে। কোন্‌টা শুনতে বেশি মধুর? ওই সাত সুরের বাজনাটাই। শুধু পোঁ বেশিক্ষণ ভালো লাগে না।' এখানে তাই জ্ঞানের পরিপূরক হিসাবে ভক্তির কথা বলা হচ্ছে, যে ভক্তি কর্মের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে। ভক্তিতে জীবনের পরিপূর্ণতা আছে, আনন্দ আছে, বৈচিত্র্য আছে। এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিকে সাত-ফুটো-ওলা-বাজনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভক্তিতে সপ্তসুর বাজে। জ্ঞান হলো এক সুরের যন্ত্র। তাতে কেবল পোঁ বাজে। আমাদের চিরাচরিত বৈদান্তিক ঐতিহ্যে জ্ঞানী বলতে তাই রসকসহীন সাধকের ছবিটিই ভেসে ওঠে। তিনি এতদূর বেরসিক যে কোনকিছুতেই আনন্দ অনুভব করেন না। এইরকম মানুষ একটি শিশুর মুখ দেখে বলবেন—এসব *মায়া।* শিশুর মধ্যে কোনকিছুই তিনি খুঁজে পাবেন না। তিনি বলবেন, 'শিশুর হাসি, সূর্যের বা পৃথিবীর সৌন্দর্য আমি উপভোগ করতে পারি না। কেন? কারণ, এগুলি সবই মিথ্যা। এই সব কিছুর অতীত যে তত্ত্ব, সেই ব্রহ্মই একমাত্র সত্য।' এই হলো সানাই-এর একঘেয়ে পোঁ। কিন্তু ভক্তি হলো সাত-স্বরের, সুন্দর, সমৃদ্ধ, সুচারু সঙ্গীত। কেবল ভারতবর্ষের নয়, বিশ্বের সব ধর্মের শ্রেষ্ঠ *ভক্তি* হলো এই গোত্রের। গীতায় যে ধর্মের কথা বলা হচ্ছে, তাও তাই—গভীরভাবে মানবিক। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও এইরকম ছিলেন। তাঁর হৃদয়বত্তা, মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের দুঃখকষ্টে সাড়া দেওয়ার যে আগ্রহ, তার কি তুলনা আছে?

বর্তমান যুগে, আনন্দের ঘনীভূত মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ এই আনন্দের ধর্মই আমাদের উপহার দিয়েছেন। বাস্তবিক, কঠোর প্রকৃতির মানুষের কাছে আপনি যেতে পারবেন না কারণ আপনি তাকে ভয় পাবেন। সংসারেও আমরা সাধারণত দুরকম মানুষ দেখতে পাই। বাড়িতে হয়ত একজন কাকা আছেন:

তিনি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির, সকলেই তাঁকে ভয় করে; কেউই তাঁর কাছে ঘেঁষতে চায় না। আবার একই বাড়িতে অন্যরকম লোক আছেন, যাঁর কাছে শিশুরা ধেয়ে যায়, কারণ তিনি খুব মজার মানুষ, হাসিখুশি এবং সদানন্দ পুরুষ। এই দু-রকম মানুষই সংসারে দেখা যায়। ভক্তিও তাই। লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে তার, সে মানুষকে ভালবাসতে শেখায় এবং অন্যের ভালবাসা গ্রহণ করতেও শেখায়। এই অধ্যায়ে ভক্তির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত রয়েছে এক গভীর মানবিকতা বোধ যা সমগ্র গীতার ভিত্তি। এই ভক্তি পথে আমরা যেমন অন্যদের ভালবাসা আকর্ষণ করতে পারি, তেমনি অন্যরাও আমাদের ভালবাসা পেতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে এই ধরনের ভক্তির কথাই বলেছেন, কিন্তু তার ভিত্তি সেই পরম *জ্ঞান,* বা ঐশী তত্ত্ব, যা এই বিশ্বের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল। তাই দেখতে পাই, গীতার যে অখণ্ড যোগ, তাতে *জ্ঞান, ভক্তি* এবং *কর্ম*—সবই রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ আগেই বলেছেন, *জ্ঞানম্ বিজ্ঞান সহিতম্, বিজ্ঞানের* সঙ্গে *'জ্ঞান।' বিজ্ঞান* মানে অভিজ্ঞতা, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। *বিজ্ঞান* মানে সেই *জ্ঞান,* যা প্রতিদিন মানবিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। নবম অধ্যায়ে তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলেছিলেন। এই দিক থেকে এই 'বিভূতিযোগ' অধ্যায়ের গুরুত্ব রয়েছে। বেদান্তে যাকে *মায়া* বলা হয়েছে, এখানে তাকেই বলা হয়েছে 'ঈশ্বরের বিভূতি', অর্থাৎ আমাদের চারপাশে প্রকৃতিরূপে ঈশ্বরের বহুবিধ প্রকাশ।

ঋগ্বেদের প্রথমদিকেই এই ধারণাটি ব্যক্ত হয়েছিল। সেখানে একটি সুন্দর *মন্ত্রে* বলা হয়েছে, *যস্যৈতে হিমবন্তো মহিত্বা,* 'এই হিমালয় যাঁর মহিমা কীর্তন করে'। কী কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি! লক্ষ্য করুন। আমরা যাকে হিমালয়ের মহিমা বলছি, সে মহিমা বস্তুত কার? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে যে পরম সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, এ তাঁরই মহিমা। হিমালয় যেন সেই মহিমাকেই ব্যক্ত করেছে।

এই অধ্যায়ের ৪১ সংখ্যক শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ বলবেন যে, 'যেখানেই দেখবে কোন অসাধারণ শক্তির অভিব্যক্তি ঘটেছে এবং মানুষের কল্যাণ হচ্ছে, জানবে সেখানে আমার শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। এইভাবে পৃথিবীর যে কোন স্থানে, যে কোন অভিব্যক্তির মধ্যেই ঈশ্বরকে দর্শন করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা শ্রীভগবান আমাদের দিচ্ছেন। বিভূতিযোগের এই সিদ্ধান্ত সকলের কাছেই প্রভূত আনন্দদায়ক হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গান্ধীজীর কথাই মনে করুন। মানুষকে টেনে তুলতে, তাকে দাসত্বের শৃঙ্খল

থেকে মুক্ত করতে, সমাজে প্রেম এবং অহিংসার প্রসার ঘটাতে তিনি কী অসাধারণ শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর মুখের একটি কথাই যথেষ্ট ছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ তার দ্বারা প্রভাবিত হতো। এই যে শক্তি, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তা 'আমার'। 'আমার' শক্তিই সেখানে প্রকাশিত। একই জিনিস আমরা দেখতে পাই আব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln)-এর জীবনে। পৃথিবীর যে-কোন অংশে, যে-কোন মানুষের মধ্যেই শক্তির এই প্রকাশ ঘটতে পারে। এঁদের জীবন দেখে বোঝা যায় সর্বব্যাপী ঐশী শক্তি মাঝে মাঝে এখানে ওখানে বিরল কিছু মানুষের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়। তাঁদের মধ্যে ঐশী শক্তির প্রকাশ ঘটেছে, তাই তাঁরা প্রণম্য।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ,* 'আমিই এই বিশ্বের উৎপত্তিস্থল'; *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে,* 'সব কিছুই আমার থেকে উদ্ভূত হয়'; *ইতি মত্বা ভজন্তে মাম্,* 'এটি জেনে তাঁরা আমাকে ভজনা করেন'; *বুধাঃ,* 'জ্ঞানীরা'; *ভাব সমন্বিতাঃ,* 'প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে'। জ্ঞানীদের হৃদয় ঈশ্বর-প্রেমে পরিপূর্ণ। তাঁরা শুষ্ক নন, এ কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তাঁরা এমন সপ্রাণ ও সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন যে, তাঁদের সান্নিধ্যে গেলেই আপনার হৃদয় তৃপ্তিতে ভরে উঠবে। মানবিক গুণে সমৃদ্ধ এই রকম মধুর ব্যক্তিত্ব স্বভাবতই অন্যদের আকৃষ্ট করে। যে পথ মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে মর্যাদা দেয় না, তা মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর। আবেগবর্জিত মনুষ্যজীবন অর্থহীন।

ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ স্নায়ুতত্ত্ববিদ স্যার চার্লস শেরিংটন (Sir Charles Sherrington) বলেছেন, 'আবেগের প্রেরণা না থাকলে একটা পাখি কি তার বাসা তৈরি করতে পারে?' ভেবে দেখুন, একটা পাখি বাসা তৈরি করছে। কিন্তু কোন্ শক্তির প্রেরণায় সে মুখে করে ঘাস বা পাতার টুকরো বয়ে এনে, এক কোণে জড়ো করছে? কোন্ আবেগের তাড়নায় তারপর সে কুড়িয়ে আনা খড়কুটো দিয়ে স্বপ্নের নীড় তৈরি করার কাজে লেগে যায়? কে তাকে একাজে উদ্বুদ্ধ করে? উদ্বুদ্ধ করে তার আবেগ। তার আবেগ তাকে বলে দেয়, অনাগত শাবকগুলির একটি আশ্রয় দরকার। তার কাজের পিছনে আছে এই আবেগ। আপনি বাসাটা ভেঙে দিন, সে আবার নতুন করে বাসা বুনবে। এই হলো আবেগের শক্তি। বস্তুতপক্ষে, সৎ প্রেরণার বশে আপনি যখন কাজ করেন, তখনই সে কাজ সবচেয়ে ভালো হয়। কেবল শুকনো বৌদ্ধিক জ্ঞান দিয়ে কোন মহৎ কাজ সুচারুভাবে করা যায় না। দক্ষতা এবং কর্মশক্তি আসে আবেগ থেকেই,

বৌদ্ধিক জ্ঞান থেকে নয়। বুদ্ধি কেবল সেই আবেগশক্তিকে চালিত করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রেরণা আসে আবেগ থেকে। আপনার যা কিছু শ্রেষ্ঠ কাজ, তা আবেগই সম্ভব করে তোলে। এই আবেগকে সরিয়ে দিন, দেখবেন আপনি জড়পাথর হয়ে গেছেন—কোন অনুভূতি এবং সহানুভূতির লেশ থাকবে না আপনার মধ্যে। সাধারণ ভাষায় আমরা যাকে হৃদয়ের বিকাশ বলি, সেটি চাই। মস্তিষ্কের বিকাশ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন হৃদয়ের বিকাশ। আপনি মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটালেন, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আপনার হৃদয় বিকশিত না হয় তাহলে আপনি হয়তো বড়জোর একজন নির্দয়, রসকসহীন শুকনো মানুষ হয়ে উঠবেন। গত কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে এই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারটিই ঘটেছে। আমরা মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটিয়েছি; কিন্তু হৃদয় যেমন, তেমনি থেকে গেছে, তার কোন উন্নতি হয়নি। আমাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে অন্যদের জন্য কোন ভাবনাচিন্তা ছিল না। এখনও আমাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন, অন্যদের জন্য যাঁদের কোন দুশ্চিন্তা নেই। তাঁরা হৃদয়হীন। সর্বক্ষণ শুধু 'আমি', 'আমি', 'আমি' করছেন। এই ধরনের মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, আরও উৎসন্নে যাচ্ছে। 'শিক্ষা' না পেলে হয়তো সে কম উৎপাত করতো। কিন্তু শিক্ষা পেয়ে সে সমাজের পক্ষে অতি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'হৃদয়টাকে বাড়াও'। বাস্তবিক, হৃদয়ের বিস্তার ঘটলে তবেই আপনার আবেগ ঠিক মতো কাজ করবে; অন্যদের প্রতি প্রেম, সহানুভূতি ও সেবার ভাব জাগবে। সেই সঙ্গে যদি আপনার বুদ্ধিটিও ঠিক ঠিক বিকশিত হয়, তাহলে আপনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন। গীতায় যে ভক্তির কথা বলা হয়েছে, সেখানে লক্ষ্য করে দেখবেন, বুদ্ধি এবং আবেগের সমন্বয় ঘটেছে। বুদ্ধির প্রকৃতিই এই—সেখানে আবেগ, মেধা এবং ইচ্ছাশক্তি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে থেকে এক সুনিপুণ চরিত্র সৃষ্টি করে। কয়েকটি শ্লোকের পরে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বলবেন. *দদামি বুদ্ধি যোগং তম্,* 'আমি যাদের কৃপা করি, তাদের ঐ বুদ্ধি যুগিয়ে দিই'; *যেন মাম্ উপজান্তি তে,* 'যার দ্বারা তারা আমার কাছে আসার পথ খুঁজে পায়'। তাদের আর অন্যভাবে সাহায্য করতে হয় না। কেন? কারণ আমি তাদের বুদ্ধিরূপ সর্বোত্তম বস্তুটি দিয়েছি, যার দ্বারা তারা জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে পারবে। কয়েকটি শ্লোক পরে দেখা যাবে তিনি এই কথাই বলবেন।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

—'যাঁদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে আমাতেই নিবিষ্ট ও সমাহিত, তাঁরা পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করে এবং সর্বদা আমার প্রসঙ্গ করে তৃপ্তি এবং পরমানন্দ লাভ করেন।'

বুদ্ধি যাঁদের শুদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ যাঁদের আবেগ, মেধা এবং ইচ্ছা একীভূত হয়েছে, তাঁরা এক বিশেষ থাকের মানুষ। *মচ্চিত্তা,* 'তাঁদের *চিত্ত* বা মন আমাতে নিবিষ্ট'; *মদ্গতপ্রাণা,* 'তাঁদের দেহ ও মনের সমস্ত শক্তিও আমার দিকেই ধাবিত'; *বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্,* 'পরস্পরকে বুঝিয়ে থাকেন'। এইরকম দু'জন ভক্ত মিলিত হলে একজন অন্যজনকে উদ্দীপিত করবেন, এটাই তাঁদের প্রাপ্তি; একে অন্যকে নিচে টেনে নামানোর চেষ্টা করবেন না। *কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যম্,* 'তাঁরা সর্বদাই আমার কথা আলোচনা করেন'। কোন্ আমি? যে আমি বহুর ভিত্তি, সেই আমি। ব্যবহারিক জীবনে তাঁরা বহু নিয়েই আছেন, সে কথা সত্যি। কিন্তু বহুর পিছনে যে পরম 'এক', তাঁরা তাঁর কথাই আলোচনা করেন এবং এভাবে এক রঙে বহুকে রাঙিয়ে, বৈচিত্র্যকে মূল্যবান করে তোলেন। *তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ,* 'তাঁরা তৃপ্তও হন, আবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও পান'। নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তি, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে তাঁদের জীবন ভরে ওঠে। *তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ;* —আহা, কী ভাব! এ রকম হলে মানুষের জীবন একটানা আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়। কীভাবে? যে উপায়ের কথা বলা হলো তা অনুশীলনের মাধ্যমে।

'কথামৃতে' দেখবেন, শ্রীম স্বয়ং লিখেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরখানি যেন আনন্দের হাট। সর্বদাই আনন্দে পরিপূর্ণ এবং সেখান থেকে নিত্য আনন্দের তরঙ্গ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলায় বলে 'মজার কুটি', অর্থাৎ আনন্দের নিকেতন। 'পাণ্ডব-গীতা'-য় একটি শ্লোক আছে যা আমার খুব পছন্দ এবং আমার মতে এতে যেন শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিখানি ফুটে উঠেছে। সেই শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

নিত্যোৎসবং ভবত্যেষাং নিত্যং শ্রী নিত্যমঙ্গলম্।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনো হরিঃ ॥

এটি অতি গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ শ্লোক। হরি হলেন পরম ব্রহ্ম, যিনি সকল জীবের হৃদয়ে নিত্য বিরাজমান, কিন্তু অনভিব্যক্ত। হরিকে শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। কিন্তু এই সব নামই সেই এক পরমেশ্বর বা দিব্যসত্তার, যা থেকে এই সমগ্র জগৎ এসেছে। স্বভাবতই, এই ব্রহ্মাণ্ডের

সবকিছুতেই তিনি প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। এখন এই হরিকে যদি আপনি আপনার ভিতর থেকে প্রকাশ করতে পারেন, তাহলে কী হবে? হরি হচ্ছেন, *মঙ্গলম্‌,* 'সকল শুভ এবং মঙ্গল'-এর আধার। এই হরি আপনার হৃদয়ে অভিব্যক্ত হলে, আপনার জীবনটা কীরকম হবে? *নিত্যোৎসবং ভবত্যেষাম্‌,* 'তাঁদের জীবন নিত্য উৎসবে পরিণত হয়।' *নিত্যং শ্রী,* '*শ্রী* অর্থাৎ সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধি তাঁদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রকাশিত হয়'; *নিত্যমঙ্গলম্‌,* 'যা কিছু কল্যাণপ্রদ, তাও সর্বদাই তাদের জীবনে প্রকটিত হয়'। কখন? *যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্‌ মঙ্গলায়তনো হরিঃ,* 'যাঁদের হৃদয়ে *মঙ্গলায়তনঃ,* অর্থাৎ মঙ্গলের আধার সেই হরি প্রকাশিত হয়েছেন।' তখন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দময় হয়ে উঠে। কোন কোন মরমিয়া সাধকের জীবনে এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের এমন প্রকাশ ঘটেছে যে, মনে হয়েছে আনন্দ যেন তাঁদের ভিতর থেকে উথলে উঠছে। সুফী, খ্রিস্টান বা আমাদের মহান মরমিয়া সাধকদের জীবনী যদি পাঠ করেন, তবে দেখতে পাবেন, তাঁদের মধ্যে এই ঐশী ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। এই কারণেই তাঁরা যেমন নিত্য আনন্দে পূর্ণ থাকতেন, তেমনি চারপাশেও সে আনন্দ ছড়িয়ে দিতেন। বেদান্ত পরম সত্তাকে *সৎ, চিৎ* এবং *আনন্দ* বলে বর্ণনা করেছেন। এই পরম অনুভূতি অতি অল্প মানুষের ভাগ্যেই জোটে, যদিও এই অভিজ্ঞতা লাভের সাধনা অনেকেই করতে পারেন এবং ক্রমশ এই সর্বোচ্চ মহান অনুভূতির আভাস পেতে পারেন। কিন্তু হৃদয়ে ভগবানের প্রকাশ ঘটিয়ে মানবজীবনকে আনন্দময় ও খুবই সুন্দর করে তোলা সম্ভব। এখন আমাদের মধ্যে হরি অপ্রকাশিত, প্রকাশ পাচ্ছে কেবল আমাদের ক্ষুদ্র অহংকার। সেবাভাবের মাধ্যমে এই অহংকারকে আমাদের ঝেড়ে ফেলতে হবে। অহংকারের হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে সেবাই শ্রেষ্ঠ উপায়। সেবাভাবের দ্বারা জীবন পরিচালিত হলে অহংভাব মাথা নোয়ায়। এবং মানুষের অহংকার যত কমতে থাকে, ততই তার হৃদয়ে ঈশ্বর নিজেকে ব্যক্ত করেন।

কেউ একজন বলেছিলেন যে, বাইবেলে আছে, 'হে ঈশ্বর, তোমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক'। আমরাও সেই অনুযায়ী প্রতিদিন প্রার্থনা করি, 'হে ঈশ্বর, তোমারই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক।' শত শত বার আমরা এই প্রার্থনা করে চলেছি, তবু সেই রাজত্ব আজও দুরন্ত। এর কারণ কী? তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, এর কারণ অনুসিদ্ধান্তটি বা পূর্বশর্তটি পালন করা হয়নি। সেই পূর্বশর্তটি কী? '*আমার* রাজত্বের ইতি হোক!' সেটা হলে তখনই ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তার আগে নয়। তাই বলা হচ্ছে, এই তুচ্ছ 'আমি' কে অবশ্যই

দূর করতে হবে। কেবল তখনই এই হৃদয়ে ঈশ্বর প্রকাশিত হবেন। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন ধর্মজীবনে সর্বদা 'আমার' রাজত্বই চলছে, 'তাঁর' রাজত্বের জায়গা নেই। এমনকি যখন আমরা মন্দিরে যাই, তখন সেখানেও আমরা ঈশ্বরকে তাঁর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলি না। হয়ত একটা লম্বা ভাষণই দিয়ে বসি। কিন্তু ঈশ্বর কী বলছেন, তা একবারও শুনি না। শুধুই কোলাহল, আর কোলাহল। একবারও ভেবে দেখি না যে তাঁর রাজত্ব কীভাবে আসতে পারে যতক্ষণ না সব শর্ত পূরণ করছি। তাই যখন কোন মন্দিরে যাবেন, চুপ হয়ে যান; নীরব, অন্তর্মুখী হয়ে শুনতে চেষ্টা করুন ঈশ্বর আপনাকে কী বলছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে শুনতে শেখা চাই। এটি মস্ত গুণ। শঙ্করাচার্য তাঁর 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে বলেছেন, 'যোগের প্রথম দ্বার হলো বাক্‌সংযম', *যোগস্য প্রথমং দ্বারং বাঙ্‌নিরোধঃ।* গত কয়েক বছর আমাদের এই অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। আজ এর পরিবর্তন দরকার। আমাদের চিন্তাশক্তি ও অনুভবশক্তিকে বাড়াতে হবে এবং কথা কম বলে বেশি কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। অতএব, এখানে যে চমৎকার ভাবটি পাওয়া গেল, তা এই যে, হৃদয়ে ঐশী সত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে আমরা পূর্ণ আনন্দ অনুভব করতে পারি।

বেদান্তধর্ম যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের ভিতর যে অনন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তাকে বিকশিত করার পথ দেখানোই এই ধর্মের উদ্দেশ্য। খিদে পেলে খেতে হয়, তাতেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। জ্ঞানের ক্ষুধা থাকলে শিক্ষাচর্চা ও মননের দ্বারাই সে ক্ষুধা মেটে। এই ক্ষুধা অল্পবিস্তর আমরা সকলেই অনুভব করি। ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষাও ঐরকম। এই আকাঙ্ক্ষা জাগলে ভূরি ভূরি বই পড়েও আপনি তৃপ্তি পাবেন না। একমাত্র ঈশ্বরকে অনুভব করলেই এই আশ্চর্য ক্ষুধা মিটতে পারে। এই কারণেই আমাদের শাস্ত্রগুলি মানুষের ভিতর কী কী সম্ভাবনা আছে, তা খুলে বলেছে এবং প্রত্যেককেই সেই সম্ভাবনা বিকাশের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে আহ্বান করেছে। একটু সাফল্যের মুখ দেখে, সেখানেই আটকে যাবেন না। পরবর্তী ধাপের দিকে এগিয়ে যান। এমনকি বৌদ্ধিক স্তরেও থেমে থাকবেন না। এগিয়ে যাবার আরও একটা স্তর আছে—আধ্যাত্মিক স্তর। সেখানে পৌঁছতে পারলে তবেই আপনি প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পাবেন, সত্যকার পরিপূর্ণতা লাভ করবেন। পরবর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ একটি অসাধারণ কথা বলছেন :

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥

—'যাঁরা নিত্যযুক্ত এবং প্রীতির সঙ্গে আমাকে ভজনা করেন, তাঁদের আমি সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমাকে লাভ করেন।'

যাঁরা এই পরমানন্দ উপলব্ধির জন্য সংগ্রাম করছেন, তাঁদের প্রতি আমার মনোভাব কীরকম? আমি তাঁদের আশীর্বাদ করি, উৎসাহ দিই। কীভাবে? *তেষাং সতত যুক্তানাম্,* 'যাঁরা নিত্যযোগী, তাঁদের'। *যোগী* মানেই *যুক্ত*। অর্থাৎ, যিনি যোগী, তিনি যুক্তও বটে। এগুলি সবই সমার্থক, যার তাৎপর্য হলো 'ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ'। লোকমান্য তিলক তাঁর *গীতারহস্য* গ্রন্থে বলেছেন যে, গীতায় *যোগ* শব্দটি নানাভাবে আশিবারেরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে যে *যুক্ত*-এর কথা বলা হয়েছে, তা এক বিশেষ ধরনের যুক্ত বা যোগী—*সততযুক্ত,* অর্থাৎ তাঁর 'চিত্ত নিরন্তর যোগাবস্থায় রয়েছে।' *সতত* মানে সর্বদা, নিরন্তর। *ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্,* 'যাঁরা গভীর প্রেমের সঙ্গে আমার ভজনা করেন, পূজা করেন'; আমি তাঁদের কী ফল দিই? *দদামি বুদ্ধিযোগং তম্,* 'আমি তাঁদের *বুদ্ধিযোগ* প্রদান করি'। এটি এক অসাধারণ *যোগ,* 'যুক্তিসিদ্ধ যোগ'। তিলক-এর ভাষায়, 'প্রশান্ত যুক্তির' যোগ। এ অবস্থায় মন সর্বদাই শান্ত, স্থির, যুক্তির আলোকে উজ্জ্বল। এইরকম বুদ্ধিই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। *যেন মাম্ উপজান্তি তে,* 'যে বুদ্ধির দ্বারা তাঁরা আমাকে লাভ করেন।' আমি তাঁদের সঠিক মনোভাব, সঠিক যুক্তি যুগিয়ে দিই, যার ফলে তাঁরা আমার কাছে আসার পথ খুঁজে পান। এ কথার ব্যঞ্জনা অতি গভীর! বাস্তবিক, ভগবান কীভাবে মানুষকে সাহায্য করেন? নানাভাবেই তিনি সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃপা মানুষকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করা। বুদ্ধও তাঁর অষ্টাঙ্গিক মার্গে এই 'সম্যক্ দৃষ্টির' কথা বলছেন। এই সম্যক্ দৃষ্টিভঙ্গি জীবনের সবচেয়ে মহার্ঘ বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, 'আমি তাঁদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করি'। জীবনে এই *বুদ্ধিযোগ*-এর চেয়ে বড় আর কিছু নেই। কীটপতঙ্গের মতো শুধু শরীর নিয়েও আমরা বেঁচে থাকতে পারি; জীবজন্তুর মতো ইন্দ্রিয়ের স্তরেও বেঁচে থাকতে পারি; বুদ্ধিজীবীদের মতো মানসিক বা বৌদ্ধিক স্তরেও বেঁচে থাকতে পারি, আবার উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উঠে সকলের অন্তরে নিহিত যে গভীরতম সত্য, তাকে আশ্রয় করে পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারি। এইগুলি সবই এক একটা স্তর, যেখান থেকে চৈতন্য সক্রিয় হয়। যখন ইন্দ্রিয়ের স্তরে চৈতন্যের

ক্রিয়া হতে থাকে, তখন আমরা সুখী হই, দুঃখী হই; আমরা ভালো হতে পারি, মন্দ হতে পারি, আবার দুষ্টও হতে পারি। সবকিছুই আমরা হতে পারি। আগে থেকে কিছুই বলা যায় না, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি বেপরোয়া—তারা যে কোন্ দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যাবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। বৌদ্ধিক স্তরেও ঐ একই দুরবস্থা। আপনি ভালো, মন্দ, আবার অতি দুষ্টও হতে পারেন। কিন্তু একবার সেই গভীর আধ্যাত্মিক স্তরের স্পর্শ পেলে আপনি একেবারেই অন্য মানুষ হয়ে যান। তখন আপনার মধ্যে নেতিবাচক কিছু থাকে না। সবটাই তখন ইতিবাচক। আপনার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হওয়ার ফলে, তখন স্বভাবতই আপনার ভিতর প্রেম, করুণা, সেবা ও আত্মোৎসর্গের ভাব জেগে ওঠে। তার জন্য তখন আর আপনাকে চেষ্টা করতে হয় না। গোলাপকে কি তার সৌরভ ছড়ানোর জন্য চেষ্টা করতে হয়? হয় না। স্বাভাবিকভাবেই সেই সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। সেই ভাবেই একজন অধ্যাত্মজগতের মানুষ, স্বভাবপ্রেরণা বশেই সৎ, ধার্মিক, নৈতিক এবং চরিত্রবান হয়ে ওঠেন। এই স্তরটি বাহ্য স্থূল প্রকৃতির অনেক ঊর্ধ্বে। এটি মানুষের পরাপ্রকৃতির অভিব্যক্তি। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, 'আমি তাঁদের *বুদ্ধিযোগ* প্রদান করি', *যেন মাম্ উপজান্তি তে,* 'যে যোগবুদ্ধির সাহায্যে তাঁরা আমাকে লাভ করেন', আমার কাছে আসেন। অনাবিল, স্বচ্ছ চিন্তা ও আত্মার স্পর্শপূত বিশুদ্ধ যুক্তি—এ হলো ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ যা আমরা পেতে পারি। বুদ্ধিযোগের এই হলো অর্থ। এই কারণেই মহাভারতে বলা হয়েছে, দেবতারা যখন কোন মানুষকে ধ্বংস করতে চান, তখন তাঁরা তার বুদ্ধিকে মন্দ পথে চালিত করেন। তখন সেই ব্যক্তি নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ইতিবাচক দিকটির কথা বলছেন: 'আমি বুদ্ধিযোগ দ্বারা মানুষকে কৃপা করি'। *এটিই গীতার মূল শিক্ষা।* এই বুদ্ধিযোগ থেকেই চারিত্রিক উৎকর্ষ আসে। দ্বিতীয় অধ্যায়েও তিনি এই কথা বলেছেন: *বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ,* 'এই [পরমার্থ] বুদ্ধির আশ্রয় নাও'। তাহলেই ব্যক্তির জীবন চারিত্রিক উৎকর্ষে মহান ও মধুময় হয়ে উঠবে। অতএব, ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের এই আশীর্বাদই চাইতে হবে। বলতে হবে—আমাকে শুদ্ধ বুদ্ধি দাও। ঐটুকুই আমি চাই। ঐটি পেলেই ক্রমে ক্রমে আমি সব পেয়ে যাব। এই কারণেই ঋগ্বেদের গায়ত্রী মন্ত্র মহত্তম বিশ্বজনীন প্রার্থনার স্বীকৃতি পেয়েছে। সেখানে ধ্বনিত হয়েছে বুদ্ধির জন্য নিবিড় আকুতি। গায়ত্রী মন্ত্র এত মহান কেন? তা এই কারণে যে, সর্বোত্তম বুদ্ধির প্রার্থনা এই মন্ত্রে ধ্বনিত হয়েছে। *ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ,* 'সেই *ধী* অর্থাৎ বুদ্ধিতে আমাদের

ভূষিত কর।' এখানে সেই *যোগবুদ্ধির* কথা বলা হয়েছে। সম্পূর্ণ গায়ত্রী মন্ত্রটি হলো ঃ তৎ *সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*। সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তিন লাইনের এই প্রার্থনা আজ থেকে পাঁচহাজার বছর আগে ঋগ্বেদে উচ্চারিত হয়েছিল। এই সর্বজনীনতাই এই প্রার্থনার সৌন্দর্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণের কথায় যেন সেই প্রার্থনারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি।

একাদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ আরও এক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন ঃ

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

—'তাঁদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে, তাঁদের হৃদয়ে থেকে আমি তাঁদের অজ্ঞানতা-জনিত অন্ধকারকে উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদ দীপ দ্বারা বিনষ্ট করি।'

আর একটি চমৎকার শ্লোক। *তেষাম্ এব,* 'এই সব মানুষের প্রতি'; *অনুকম্পার্থম্,* 'কৃপাবশত'; আমি কী করি ? *অহম্ অজ্ঞানজম্ তমঃ নাশয়ামি,* 'আমি তাঁদের অজ্ঞানতাজনিত অন্ধকার এবং ভ্রান্তি নাশ করি'; *অহম্ নাশয়ামি,* 'আমি বিনষ্ট করি'। কীভাবে আমি তা করি? *আত্ম ভাবস্থো,* 'নিজেকে তাঁদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে' অথবা 'আমি তাঁদের হৃদয়ে প্রকাশিত হতে শুরু করি, এবং আমূল রূপান্তরিত হতে তাঁদের সাহায্য করি'। ফলে, মনের অন্ধকার এবং ভ্রান্তি সব কিছু ধুয়ে মুছে যায়। জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রভায় তাঁদের কাছে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। 'ভক্তের অজান্তেই নীরবে, শান্তভাবে আমি তাঁকে এইভাবে আশীর্বাদ করি'। কীভাবে? *আত্মভাবস্থঃ,* 'তাঁদের হৃদয়ে প্রবেশ করে'। সেখানে ঢুকে আমি কী করি? তার উত্তরে ভগবান বলছেন, *জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা,* '*জ্ঞানদীপের* দ্বারা সবকিছু আলোকিত করে তুলি'। ঈশ্বর এইভাবেই তাঁর ভক্তের বা সাধকের সেবা করেন। এরপর আর সেই ভক্তের বেতালে পা পড়ে না, সে সর্বদাই সকল জীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রেমের সম্বন্ধ বজায় রেখে ঈশ্বরের অভিমুখে চলতে থাকে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির মাধ্যমে মানুষ এভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। নবম অধ্যায়ে এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলা হয়েছে। এখন এই দশম অধ্যায়েও তার পুনরাবৃত্তি চলছে।

এই শ্লোকে, যে *জ্ঞানদীপ*-এর কথা বলা হয়েছে, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কথাটি প্রতীকী কিন্তু অধ্যাত্মভাবে পরিপূর্ণ। আমাদের কিছু কিছু আচার-

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েও এই গভীর অধ্যাত্মভাবটি ফুটে ওঠে। যেমন মনে করুন, ঘরে ঢুকেই প্রথমে আপনি আলো জ্বেলে দেন। হিন্দুদের বাড়ির সামনে আলো জ্বালিয়ে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ভিতর যে একটা আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা আছে, তাকে আমরা খুবই মূল্য দিয়ে থাকি। এরই পরিপূরক ক্রিয়াটির কথা এখানে বলা হয়েছে ঃ নিজের ভিতরে আলো জ্বালো। আমরা এখন কেবল বাইরে আলো জ্বালাচ্ছি। কিন্তু বাইরের এই আলো এক মহত্তর আলোকের প্রতীক। সেই আলো আমাদের হৃদয়ে জ্বালতে হবে। অন্ধকার কেউই ভালবাসে না। আমরা সকলেই আলোর পূজারি। আমাদের হৃদয় আলোর জন্য কাঁদে, অন্ধকারের জন্য নয়। তাই, বৃহদারণ্যক উপনিষদে মানব হৃদয়ের এক সর্বজনীন প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—*অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,* 'আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে চল; আমাকে অসত্য থেকে সত্যের দিকে নিয়ে চল'; *মৃত্যোর্মা অমৃতম্ গময়,* 'আমাকে মৃত্যুর থেকে অমরত্বের দিকে নিয়ে চল'। কেবল বৃহদারণ্যক উপনিষদে নয়, পৃথিবীর অনেক অধ্যাত্ম শাস্ত্রেই মানবহৃদয়ের অন্তস্তল থেকে এই প্রার্থনা উৎসারিত হয়েছে। হয়েছে তার কারণ মানুষ চিরদিনই জীবন, আলো এবং জ্ঞানের অভিসারী। তাই হৃদয়ে জ্ঞানের প্রদীপটি জ্বালান। এটি আমাদের কর্তব্য, এর জন্যই আমরা সাধনা করি এবং সাধনার অন্তিম পর্যায়ে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমরা সংগ্রাম করলে তবেই তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এ বিষয়ে যদি আমরা চেষ্টা না করি, তার অর্থ হলো, কৃপার মূল্য আমরা জানি না। ধরা যাক, ঈশ্বর আমাদের হৃদয়দীপটি জ্বালিয়ে দিলেন; কিন্তু আমরা বললাম, 'এ আমি চাই না'। তাহলে এর অর্থ কী দাঁড়াবে? এর অর্থ হবে এই যে, এই কৃপার আমরা উপযুক্ত নই, আমরা তাকে কাজে লাগাবার জন্য প্রস্তুত নই। কিন্তু যখনই আমাদের বোধ সূক্ষ্ম হয়, সংগ্রাম করি, তখন ঈশ্বরের সাহায্য এসে থাকে। অতএব, কৃপার উপযুক্ত হলেই কৃপা আসে। নিজেদের প্রস্তুত করলে কৃপা আসবেই। এইভাবেই অধ্যাত্ম জগতে মানুষ এগিয়ে যায় এবং সব ধর্মই অগ্রগতির এই ক্রমকে স্বীকার করেছে। আপনার প্রচেষ্টা এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ—এই দুটির মিলন হলেই আধ্যাত্মিক বিকাশ সুনিশ্চিত।

এতক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণই কথা বলছিলেন। এবার অর্জুনের পালা। শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে তিনি বলছেন,

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥

অর্জুন বললেন—'আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম এবং পরম পবিত্রকারী। আপনি শাশ্বত পুরুষ, স্বয়ংজ্যোতি, আদিদেব, জন্মহীন এবং সর্বব্যাপী।'

পরম ব্রহ্ম, 'আপনি সেই পরম ব্রহ্ম'; *পরম ধাম,* 'আপনি পরম আশ্রয়'; *পরমং পবিত্রং ভবান্,* এই পৃথিবীতে 'আপনিই হলেন পরম পবিত্রকারী বস্তু'; *পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্,* আপনিই 'সেই শাশ্বত দিব্য পুরুষ'; *আদিদেবম্,* 'সেই আদিদেব'; *অজম্,* 'জন্মহীন'; *এবং বিভুম্,* 'সর্বত্রপরিব্যাপ্ত'। এই কথার পর অর্জুন আরও বলছেন ঃ

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা ।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

—'দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাসদেব, সকল ঋষিই এইরকম বলেছেন; আপনি নিজেও আমাকে এই কথা বলছেন।'

অর্জুন এখানে ঋষিদের কথা উল্লেখ করে বলছেন, 'সব ঋষিই আপনার সম্পর্কে এইরকমই বলে থাকেন,' *আহুঃ ত্বাম্ ঋষয়ঃ সর্বে;* এমনকি *দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা,* 'মহান দেবর্ষি নারদও'। তিনিও আপনার সম্পর্কে এইকথা বলেন ঃ *পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্ আদিদেবম্।* অসিত, দেবল এবং ব্যাসদেবের মতো অন্যান্য ঋষিরাও আপনার সম্পর্কে এই কথা বলেন। মহান ব্যক্তিরা যাঁকে সম্মান করেন, বুঝতে হবে তিনি অবশ্যই পরম সম্মানীয় ব্যক্তি। সাধারণ মানুষ যে কাউকেই স্তুতি করতে পারেন, কিন্তু এখানে অসাধারণ ব্যক্তিরাও ঈশ্বরের গুণগান করছেন। এখানেই ঈশ্বরের মহত্ত্ব। *স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে,* 'এবং আপনিও আমাকে একই কথা বলছেন'। অর্থাৎ, ঋষিরা আপনার সম্পর্কে যা বলেছেন, আপনি সে-কথা নিজেই স্বীকার করছেন। অর্জুনের দৃঢ় প্রত্যয় যে, এই সব কথাই সত্য।

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

—'হে কেশব, আপনি আমাকে যা বলছেন, সে সবই আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবন্, দেবতা বা দানব কেউই আপনার যথার্থ স্বরূপ জানে না।'

ঋতম্‌ মানে 'সত্য'। *সর্বম্‌ এতৎ ঋতম্‌ মন্যে,* 'এই সকল কথাকে আমি সত্য বলে মনে করি'; *যৎ মাং বদসি কেশব,* 'হে কেশব, যা-কিছু আপনি আমাকে বলছেন,' আমি তা সত্য বলে মানি। আমি এগুলি যথার্থ বলে মনে করি। *ন হি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিদুঃ,* 'হে ভগবন্‌, তারা কেউই আপনার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ জানে না'; *দেবা না দানবাঃ,* আপনার ব্যক্তিত্বের যথার্থ মাত্রাটিকে 'দেবতা বা দানব কেউই বুঝতে পারে না'। সর্ব অর্থেই আপনি অনন্ত।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম ।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

—'হে পুরুষোত্তম, হে সকল ভূতের পিতা, হে সকল ভূতের নিয়ন্তা, হে দেবদেব, হে বিশ্বপালক, আপনি নিজেই নিজেকে জানেন।'

আপনাকে কেউ জানতে পারে না, কিন্তু আপনি নিজে নিজেকে জানেন, *স্বয়ং এব আত্মনা আত্মানং বেত্থ ত্বম্‌,* 'আপনি নিজের দ্বারাই নিজেকে জানেন'; *পুরুষোত্তম,* 'হে পরম পুরুষ'; *ভূত ভাবন,* 'এই জগতের সকল জীবের একমাত্র পালনকারী'; *ভূতেশ,* 'সকল জীবের প্রভু'; *দেবদেব,* 'দেবতাদেরও দেবতা'; *জগৎপতে,* 'হে বিশ্ববিধাতা'। শ্রীকৃষ্ণের ঐশী মহিমা বোঝানোর জন্যই অর্জুন এই সব বিশেষণ ব্যবহার করছেন।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

—'আপনার যে দিব্য বিভূতিগুলি দ্বারা আপনি এই জগৎ পরিপূর্ণ করে রয়েছেন, তা অসংকোচে বর্ণনা করা আপনার পক্ষেই সাজে'।

আপনার যেসব ঐশী বিভূতি বা দিব্য প্রকাশ আছে, সে সম্পর্কে আমাকে খুলে বলুন; আপনার শ্রীমুখ থেকেই আমি তা শুনতে চাই। *অশেষেণ,* 'সম্পূর্ণ' ভাবে, *বক্তুম্‌ অর্হসি,* আপনিই এ সম্পর্কে আমাকে 'বলতে পারেন'। কী সম্পর্কে? *দিব্যা হি আত্মবিভূতয়ঃ,* 'আপনার নিজের দিব্য প্রকাশ' সম্পর্কে; *যাভির্বিভূতিভির্লোকান্‌ ইমান্‌ ত্বম্‌ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি,* 'যে প্রকাশের দ্বারা আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন।' সেগুলি কী? তা আমি জানতে চাই। অর্জুনের এই প্রশ্নের তাৎপর্য হলো : ঈশ্বর ইন্দ্রিয়াদির অতীত, জগতের অতীত এক তত্ত্ব; আবার তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; এই জগতে দিব্য সত্তার সেই প্রকাশগুলি কী কী? এটিই অর্জুনের জিজ্ঞাস্য। বাস্তবিক, ভক্ত কখনওই

ঈশ্বরের অপ্রাকৃত সত্তার খুঁটিনাটি অত জানতে চান না। ভক্তের আগ্রহ ঈশ্বরের ব্যক্তরূপের প্রতি, যাঁর সঙ্গে তিনি ভাব বিনিময় করতে পারেন, প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। এই হলো ভক্তের প্রকৃতি। ব্রহ্মানুভূতি অবশ্যই এক অবর্ণনীয় উপলব্ধি। কিন্তু হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান—অথবা বলা যায় সব ধর্মের ভক্তেরা একটা জিনিসই চান—মানুষ যেমনভাবে আর একজন মানুষের সান্নিধ্য ও সাহচর্য উপভোগ করতে চান, ঈশ্বরকেও সেইভাবে আস্বাদন করা। তাঁরা ঈশ্বরকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধতে চান। অর্জুন এখানে বলছেন, যে যে মহিমার দ্বারা আপনি নিজেকে এই সমগ্র জগতে ব্যক্ত করছেন, তার 'সবগুলি' সবিস্তারে আমাকে বলুন। শ্রীকৃষ্ণ পরে বলবেন, ' "সবগুলি" আমি তোমাকে কেমন করে বলব? তোমাকে কেবল কয়েকটি দৃষ্টান্তই দিতে পারি।'

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া ॥ ১৭ ॥

—'হে যোগী, কীভাবে আমি সর্বদা আপনার ধ্যান করলে আপনাকে জানতে পারব? হে ভগবন্, কোন্ কোন্ বস্তুতে আপনার ধ্যান করতে হবে?'

কথং বিদ্যাম্ অহম্ যোগিন্, 'হে যোগী, কীভাবে আমি আপনাকে জানতে পারি'; *সদা পরিচিন্তয়ন্,* 'সর্বদা আপনাকে ধ্যান করে', হে যোগেশ্বর, কীভাবে আমি আপনার যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পারি? শ্রীকৃষ্ণকে যোগীশ্রেষ্ঠ বলা হয়। *কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া,* 'এই জগতের কোন্ কোন্ বস্তুতে আমি আপনার চিন্তা করব অর্থাৎ আপনার ধ্যান করব?' যেহেতু এই সমগ্র জগৎই আপনার প্রকাশ, সেইহেতু আমাকে সেই সব রূপের কথা বলুন, যার মাধ্যমে আমি আপনার ধ্যান করতে পারি।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন ।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

—'হে জনার্দন, আপনার যোগশক্তি এবং বিভূতি সম্পর্কে আমাকে আবার বিস্তারিতভাবে বলুন, কারণ (আপনার কথার) অমৃত শুনেও আমার তৃপ্তি হচ্ছে না।'

'দয়া করে আমাকে আবার আপনার বিভূতির কথা বলুন। এগুলি শুনেও আমার আশ মিটছে না।' *যোগম্,* অর্থাৎ আপনার অসাধারণ 'যোগশক্তি', যার

দ্বারা পরম এক (ঈশ্বর) বহুরূপে প্রকাশিত হয়েছেন; সেই শক্তিই সর্বোত্তম যোগশক্তি। ঈশ্বর স্বরূপত এক হয়েও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বহু রূপ ধরেছেন। *বিস্তরেণ আত্মনো যোগম্,* 'এই যোগশক্তি সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন'; *বিভূতিং চ জনার্দন,* 'হে জনার্দন, যার দ্বারা আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়েছেন'; *ভূয়ঃ কথয়,* 'আবার আমাকে তা বলুন'; *তৃপ্তির্হি মে নাস্তি,* 'আমার সন্তোষ (পরিপূর্ণ তৃপ্তি) হচ্ছে না' আপনার কথা শুনে; যদিও তা অমৃতম্, 'আমার কাছে অমৃততুল্য।' যাঁরা একথার মর্ম বোঝেন বা একথার রসগ্রহণ করতে পারেন, তাঁদের কাছে এটি অমৃতোপম; কিন্তু যদি আপনার রসগ্রহণ করার সামর্থ্য না থাকে, তবে একথা আপনার কাছে কখনওই অমৃত মনে হবে না। যাঁদের অধ্যাত্মজীবনের প্রতি অনুরাগ আছে, ঝোঁক আছে, তাঁদের কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা অমৃতস্বরূপ। অন্যদের কাছে তার কোন মূল্যই নেই। গুণগ্রাহিতা বলে একটা কথা আছে। অর্থাৎ মহত্ত্ব চিনতে পারার ক্ষমতা, যা কেবল মানুষেরই আছে। শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন বা ধর্ম—যা-ই হোক না কেন, তার মূল্যায়নের সামর্থ্য নির্ভর করে মানুষের সাংস্কৃতিক মানের ওপর। আমরা গানবাজনা উপভোগ করি, কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা গানের নামে আঁতকে ওঠেন; গান শোনার কানই তাঁদের নেই। আবার মনে করুন, আপনি ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত; কিন্তু হঠাৎ যদি কাউকে বিদেশী গান গাইতে শোনেন, তবে তার রস আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ, ঐ সঙ্গীতের ধরনধারণ কিছুই আপনার জানা নেই। কাজেই, কোন বস্তুর মহত্ত্ব বুঝতে গেলে একটা শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক মান থাকা চাই। অধ্যাত্ম বিষয়ের মর্ম বুঝতে গেলেও তেমনি আমাদের আধ্যাত্মিক দিক থেকে কিছুটা এগিয়ে থাকা চাই।

ভারতবাসীদের একটা বিশেষ শক্তি আছে—তারা আধ্যাত্মিকতার কদর জানে। আমাদের মধ্যে যখনই কোন মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে, আমরা তাঁকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করি; দেখি কীভাবে তিনি আচরণ করছেন, তিনি যথার্থই মহৎ কিনা তাও অনুসন্ধান করি। এরপর তাঁকে আমরা যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে জীবনে বরণ করে নিই। এ দেশে ধর্মজগতের আচার্যদের হত্যা বা ক্রুশবিদ্ধ করা হয়না। অন্যান্য দেশে কিন্তু তা নয়। যিশু যদি এদেশে আবির্ভূত হতেন, তাহলে কি তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হতো? কখনও না, কারণ ভারতবর্ষে তা অসম্ভব। অসম্ভব এই কারণে যে, এইরকম মানুষ আমাদের দৃষ্টিতে ধর্মভাবের মূর্ত বিগ্রহ। যিনি শুধু পুজোঅর্চা করেন বা পণ্ডিত তাঁকে

আমরা ততটা সম্মান দিই না, যতটা দিই তাঁকে যিনি যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেন। সমাজে পণ্ডিতেরও প্রয়োজন আছে, পূজারিরও প্রয়োজন আছে; কিন্তু তাঁরা গৌণ। আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন মানুষ। ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি যে সর্বোত্তম গুণে আমাদের ভূষিত করেছে, তা হলো, যথার্থ আধ্যাত্মিক পুরুষ বা নারীকে মর্যাদা দেবার ক্ষমতা। তাঁদের মধ্যে কেউ যদি কখনও অত্যন্ত আপত্তিকর কথাও বলেন, তবুও তাঁকে আমরা সম্মান করি। শর্ত একটাই—তাঁর চরিত্রটি মহান হওয়া চাই। বুদ্ধের কথাই ধরুন। তিনি সেই সময়কার বহু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নিন্দা করেছিলেন। তবু কেউ তাঁর ক্ষতি করেনি। সে সময়ে তাঁকে আমরা শ্রদ্ধাই করেছি। সকলে তাঁকে অলোকসামান্য পুরুষ বলে বন্দনা করেছে। বর্তমান যুগের দৃষ্টান্ত বিবেকানন্দ। ভারতীয় সমাজের দুর্বলতাগুলিকে তিনি যেভাবে কশাঘাত করেছেন, ততটা আর কেউই করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি এতবড় মহাপুরুষ ছিলেন যে, তাঁর প্রশংসা না করে আমরা পারি না। নিশ্চিত জেনে রাখুন, বুদ্ধ বা বিবেকানন্দ অন্য দেশে জন্মালে মানুষ তাঁদের আস্ত রাখতো না। পৃথিবীর সর্বত্রই এই দশা। আমাদের ভিন্ন আচরণের পিছনে অবশ্য যুক্তি আছে। দুটি কারণ। প্রথম কারণটি হলো, আমরা এই শিক্ষাই পেয়েছি যে, ধর্ম শুধু বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, ধর্ম হলো অনুভূতির বস্তু, একটা উপলব্ধি। এই জন্য আমাদের বেদান্তে অবিশ্বাসীরও স্থান আছে। দ্বিতীয়ত, আমাদের মহান আচার্যরা চরিত্রবলে বলীয়ান ছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন উদার। তাঁদের মধ্যে সংকীর্ণতা, একদেশী ভাব কিছুমাত্র ছিল না। বিশ্বজনীন শিক্ষাই তাঁরা আমাদের দিয়ে গেছেন। তাঁদের ধর্ম ছিল *মানবধর্ম,* কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম তাঁরা শেখান নি।

এই পরম উদার দৃষ্টিভঙ্গি ভারতবর্ষ কোথা থেকে পেল? উপনিষদিক দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতা থেকে। হাজার হাজার বছর ধরে তা তিলে তিলে আমাদের রক্তে ও মানসিকতায় ঢুকে গেছে। আমরা মানুষের চরিত্র দেখি। তার বাইরের ঠাটবাট বা গদি নয়। আধ্যাত্মিকতা দিয়েই আমরা মানুষকে মাপি, সেটিই আমাদের একমাত্র বিবেচ্য। ভারতবাসীদের এই যে মানসিকতা, যা আমরা অতীত ঐতিহ্য থেকে পেয়েছি, তাকে বহু চিন্তাবিদ এবং লেখক স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করব ক্যাথলিক চার্চের প্রয়াত পোপ-এর কথা, যিনি কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষে এসেছিলেন—বর্তমান পোপ নন, তাঁর আগের পোপ। বম্বেতে এক জনসমাবেশ উপলক্ষ্যে তিনি একটি মন্তব্য করেছিলেন, যা রোমের রোমান ক্যাথলিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, মহামান্য পোপ তাঁর সহকারীকে প্রশ্ন করেন, 'এই যে হাজার হাজার মানুষ এখানে সমবেত হয়েছেন, এঁরা কারা? এঁরা কি সকলেই ক্যাথলিক?' সহকারী উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে, না'। 'তবে কি এঁরা সকলেই খ্রিস্টান?' 'না, তাও নয়।' সহকারী বললেন। 'অর্থাৎ এঁরা সকলেই হিন্দু! এঁদের অধিকাংশই হিন্দু!' একথার পর তিনি বলেন, 'এই হলো এই দেশের মহত্ত্ব। এই হিন্দুরা আমার মধ্যে ক্যাথলিক চার্চের প্রধানকে দেখতে আসেনি, খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিভূকেও নয়, আমাকে এরা দেখছেন ঈশ্বরের একজন ভক্ত ও অনুরাগিরূপে। এই হলো ভারতবর্ষ।'

ভারতবর্ষ সম্পর্কে এর চাইতে বড় সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে? তিনি সেই সময়ে এই যে কথাটি বলেছিলেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য। সেই কারণেই, এদেশে কোন মহান ধর্মগুরুকে হত্যা করা হয়নি অথবা তাঁদের নির্যাতিত হতে হয়নি। কথাটা অবশ্যই মনে রাখবেন। যদি তা না হতো, তবে বিবেকানন্দকে নিষ্কৃতি দেওয়া হতো না। জনসমক্ষে তাঁর আবির্ভাবের এক বছরের মধ্যেই তাঁকে হত্যা করা হতো। বুদ্ধ এবং শঙ্করাচার্য সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। একেই আমি বলি 'ভারতীয় প্রজ্ঞা'। পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও এটি মেলে না। বাহাউল্লা-কে ইরাণে প্রাণ দিতে হয়েছিল কেন? যদি তিনি ভারতবর্ষে থাকতেন তবে কি তাঁকে হত্যা করা হতো? কখনও না। [তাঁর দোষ] তিনি একটা সংস্কার শুরু করেছিলেন। ভারতবর্ষে কিন্তু তা নয়। এখানে আমরা বলি—চরিত্র দিয়ে আপনি আপনার দিব্যতা প্রমাণ করুন। তা যদি করতে পারেন, তাহলেই আমরা আপনাকে পূজা করব, সম্মান জানাব। এই হলো আমাদের মনোভাব। এর অর্থ হলো, জীবিকা বা বিশ্বাসে নয়, উপলব্ধি ও চরিত্রের মধ্যেই হিন্দুরা ধর্মকে অন্বেষণ করার শিক্ষা পেয়েছে। এই কারণে এখানে চরিত্রবান নাস্তিকও শ্রদ্ধেয়। একজন নাস্তিক হতে পারেন, কিন্তু যদি তিনি মহৎ চরিত্রের অধিকারী হন, যদি তাঁর মধ্যে মানুষকে সেবা করার প্রবণতা থাকে, তবে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি, হত্যা করি না। একথা নিশ্চিত যে, পৃথিবীতে আর কোথাও এই ধরনের মনোভাব দেখতে পাবেন না। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করুন। দেখবেন, বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই হলো ভারতবর্ষের অনুপম বৈশিষ্ট্য। আজও আমরা সেই নীতি থেকে বিচ্যুত হইনি। হিন্দু সনাতন ঐতিহ্যের এই মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত বর্তমান যুগে আমরা যে কখনও কখনও ভুলচুক করিনি, তা নয়। কিন্তু তার জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রতিকূলতাও বহুলাংশে দায়ী। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাণের সুর

ঐটাই, যে কথা এতক্ষণ বললাম। এই যে ভারতবর্ষ, একেই আমরা বলি শাশ্বত বা *অমর ভারত।*

অর্জুন এখানে যা বলেছেন, তার মধ্যে সেই কথার প্রতিধ্বনিই শুনতে পাই। তিনি বলছেন, এই শাশ্বত সত্যের কথা এত শুনেও আমার যেন আশ মিটছে না। আমি আরও, আরও শুনতে চাই। ভগবানের কথা শুনতে ভক্তের এরকমই ভালো লাগে। সে বলে, 'এই কথা আমি আরও শুনতে চাই'। কেন? না, এ কথা আমাকে প্রেরণা দেয়, উদ্দীপিত করে। এ কথা আমাদের অন্তরাত্মার ক্ষুধা মেটায়। শরীরের ক্ষুধা গৌণ। বুদ্ধির ক্ষুধাও গৌণ। মুখ্য হলো আত্মার ক্ষুধা। একবার এই ক্ষুধার উদ্রেক হলে, অন্য দুই ক্ষুধা কমে যায়। এ অভিজ্ঞতা সকলের। একজন খ্রিস্টান সাধক ঈশ্বরের জন্য, ঈশ্বরের স্পর্শ লাভের জন্য যেন বুভুক্ষু হয়ে থাকেন। দৈহিক সৌন্দর্য, শারীরিক সুখ, নাম-যশ কোন কিছুই তিনি কামনা করেন না। তিনি শুধু চান আত্মার অনির্বচনীয় স্পর্শ। সুফী সন্তদের অভীপ্সাও তাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যথার্থ ধর্মের প্রকৃতি সর্বত্রই এক। ভারতবর্ষ এই সত্য স্বীকার করে বলেই সব ধর্মকে সে শ্রদ্ধা করে। আমরা এই মানসিকতাকে রক্ষা করে, তাকে সুদৃঢ় করে তুলে তারই ভিত্তির ওপর নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তুলব। এখানেই এই শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব।

শ্রীভগবান্ উবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান বললেন—'হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি আমার দিব্য বিভূতিগুলি, তাদের প্রাধান্য অনুসারে তোমাকে বলব, কারণ আমার প্রকাশিত বিভূতির কোন অন্ত নেই।'

হন্ত তে কথয়িষ্যামি, 'বেশ, আমি তোমাকে বলব'; *দিব্যা হি আত্ম বিভূতয়ঃ,* 'আমার *আত্মবিভূতিসমূহ'*; কীভাবে? *প্রাধান্যতঃ,* 'শুধুমাত্র যেগুলি প্রধান, সেইগুলি'; কেন? *নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে,* 'এ জগতে আমার বিভূতির শেষ নেই'। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি আমার প্রধান প্রধান বিভূতির কয়েকটি নমুনা তোমাকে দেব। বাস্তবিক, ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত ঈশ্বরের মহিমা—এটি এমন একটি ভাব, যার থেকে উচ্চাঙ্গের কাব্য সৃষ্ট হয়েছে, যা বহু সাধককে উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে পৌঁছে দিয়েছে।

টেনিসন এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। এই দুই ব্রিটিশ কবি প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে থেকে বেশ কিছু অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অধিকারী হয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের কাব্যে তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কবির মুগ্ধ দৃষ্টি জগতের সৌন্দর্যের মধ্যে কিছু কিছু দিব্য মহিমা প্রত্যক্ষ করে এবং সেই মহিমাকে তাঁরা কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। টেনিসন যখন বলেন, আপনার চারপাশে প্রকৃতির যে মহিমা ছড়ানো রয়েছে, তা দেখে আপনি আনন্দে স্তব্ধ হয়ে যাবেন, তখন কীভাবে তিনি তার বিস্ময় বিমুগ্ধ অনুভূতিকে প্রকাশ করছেন? তিনি বলছেন, পৃথিবীর এই অপার রহস্যের সামনে আমি কী?

কিন্তু কে আমি? নির্বল
নিতান্ত শিশু এক কাঁদছি আঁধারে,
পেতে চাই উজ্জ্বল আলোকশিখারে।
ভাষাহীন, অশ্রুসজল।

বিরাট প্রকৃতির সামনে কবির অসহায় ভাবটি এই লাইন কটিতে কী সুন্দরই না ফুটে উঠেছে। বিশ্বের সর্বত্রই শিল্প এবং কবিতার মাধ্যমে বাহ্যজগতের আবরণ ভেদ করে সেখানে বিরাজিত ঐশী শক্তিকে দেখার চেষ্টা হয়েছে। শিল্পীমনের প্রকৃতিই এই। সার্থক সব শিল্পকর্মই অল্পবিস্তর প্রকৃতির বহিরাবরণ ভেদ করে তার ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু অধ্যাত্ম জীবন এবং অনুভূতির ক্ষেত্রে এই উন্মোচন পূর্ণাঙ্গ। তাই মহান ঋষি এবং সত্যদ্রষ্টাদের যে প্রাপ্তি, তার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। একজন গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কোন শিল্পীরই তুলনা চলে না। কেন চলে না, তা একটু বিচার করে দেখলে আপনারাও বুঝতে পারবেন।

বুদ্ধ এলেন। তার ফলে কী ঘটল? তাঁর জীবন এবং দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার শিল্পী, হাজার হাজার লেখকের আবির্ভাব হলো। যিশুর সময়েও তাই। খ্রিস্টের উপলব্ধির কথা রঙে ও রেখায় ফুটিয়ে তুলতে কত শিল্পীই না এগিয়ে এলেন। এই হলো আধিকারিক মহাপুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব। সর্বোত্তম মানুষ হলেন সেই দিব্য ব্যক্তিত্ব, যিনি লেখক, শিল্পী, নাট্যকারদের নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের দিব্যজীবনের ওপর আলোকপাত করতে উদ্বুদ্ধ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন মানুষের সংখ্যা অতি অল্পই।

শ্রীকৃষ্ণও এখানে যে ভাষায় কথা বলছেন, তাও খুব কাব্যিক। বলছেন—

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে, 'এই জগতে আমার বিস্তার বা ব্যাপ্তির কোনও অন্ত নেই'। তা অনন্ত। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তবুও আমার অভিব্যক্তির কিছু নমুনা আমি দেব, যা তোমার ধ্যানের সহায়ক হবে। প্রথম যে অভিব্যক্তিটির কথা শ্রীকৃষ্ণ এখানে আমাদের বলছেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

—'হে নিদ্রাজিৎ অর্জুন, আমি সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা; সকল জীবের আদি, মধ্য এবং অন্তও আমি।'

কী অতলস্পর্শী কথা! আমি এই পৃথিবীর সকল জীবের হৃদয়ে আত্মা হয়ে লুকিয়ে আছি। কেবল হিন্দুদের হৃদয়ে নয়! কেবল বৈষ্ণবদের হৃদয়ে নয়! *সকল জীবের হৃদয়ে।* সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, একটি সুতো যেমন বহু মুক্তোর মধ্যে প্রবেশ করে মালার মধ্যে তাদের ধরে রাখে, *ময়ি সর্বম্ ইদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব,* তেমনি এখানে বলছেন, 'আমি সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা'। *গুড়াকেশ* হলো অর্জুনের একটি নাম। *অহম্ আত্মা সর্বভূতাশয়স্থিতঃ,* 'আমি সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত'; পিঁপড়ে, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু, মানুষ—সকলের মধ্যেই। এই পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যার ভিতর এই দিব্য স্ফুলিঙ্গের সন্ধান মিলবে না। এ হলো চরম সত্য, যা আজকের সংস্কারমুক্ত পদার্থ বিজ্ঞানীদের কাছেও বরণীয় হতে পারে।

আগেই বলেছি, এই সৌরজগতে এমন কিছুই নেই, যাতে সৌরকিরণ অনুপ্রবিষ্ট হয়নি। পাথর, ফুল, পাতা থেকে শুরু করে খাদ্য, পরিপাকশক্তি—সবকিছুই সৌর প্রভায় প্রভাবিত। সেইরকম, এই জগৎ এসেছে *সত্যম্-জ্ঞানম্-অনন্তম্* ব্রহ্ম থেকে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ 'ব্রহ্ম হলো *সত্যম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্'; যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্ পরমে ব্যোমন্* । কোথায় তাঁকে খুঁজে পাবেন? বলা হচ্ছে, 'আপনার হৃদয়ে', সুদূর আকাশে, বা এই ব্রহ্মাণ্ডের পারে অন্য কোন লোকে নয়। *নিহিতং,* 'সুপ্ত'; *গুহায়াম্,* 'আপনার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে'। যেহেতু *নিহিতম্,* অর্থাৎ 'লুকিয়ে আছেন', সেইহেতু, আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে তাঁকে। এই কারণেই একটু সাধনার প্রয়োজন। *পরমে ব্যোমন্,* 'হৃদয়ের নিভৃত আকাশে', বাইরে নয়, হৃদয়ের গভীরে। আমাদের সাহিত্যে অনেক জায়গাতেই আমরা এই গুহার কথা পাই। ভেবে দেখতে গেলে আমাদের

সমগ্র আন্তর-জীবনটাই যেন একটি গুহা, যেখানে আত্মা লুকিয়ে আছেন। এই কারণেই, পরবর্তী যুগে হিন্দু, জৈন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা গুহা-প্রীতি গড়ে উঠেছিল। গুহায় বসে তাঁরা ধ্যান করতেন। এই দিক থেকে গুহার একটা স্বতন্ত্র মহিমা আছে। তাই এখানে বলা হচ্ছে, *পরমে ব্যোমন্*, 'হৃদয়ের মণিকোঠায়', অথবা হৃদয়-আকাশে; *ব্যোম* শব্দটির অর্থ মহাকাশ; অর্থাৎ আকাশ; আবার এর দ্বারা শূন্যতাও বোঝায়। বাস্তবিক, মহাকাশ কী? শূন্যতা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, যিনি হৃদয়-আকাশে এইভাবে ধ্যান করেন, তিনি এই জীবনেই সেই শ্রেষ্ঠ বস্তু বা পরম ব্রহ্মকে লাভ করেন। এখানেও বলা হচ্ছে,

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥

'আমিই এই জগতের সকলের আদি, মধ্য এবং অন্ত'। এই হলো পরম সত্যের স্বরূপ। আমি আবার বলছি, ভারতীয় দর্শন যেভাবে এই সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করেছে, তা আধুনিক যুগের যে-কোনও নভোবস্তুবিদ-এর কাছেই গ্রহণযোগ্য। কারণ, তাঁরাও এই ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর পিছনে এক পরম একত্বের কথা বলছেন। এখন বৈচিত্র্যের ছড়াছড়ি। কিন্তু সৃষ্টির আগে এসব বৈশিষ্ট্যহীন একীভূত অবস্থায় ছিল; বর্তমানে তা ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এইতো নভোবস্তুবিদ্যার বক্তব্য। বেদান্তও তাই বলে আসছে। তফাৎ শুধু এই, নভোবস্তুবিদ বলবেন মূল বস্তুটি 'জড়'। বেদান্ত বলবেন, না। মূল বস্তুটি বিশুদ্ধ চৈতন্য, অনন্ত এবং অদ্বয়—*সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম,* 'সত্য, জ্ঞান বা অনন্ত চৈতন্য—এই হলো ব্রহ্মের স্বরূপ'। এই বিশ্বের পিছনে রয়েছে সেই তৎ বা অনির্বচনীয় সত্য বা চৈতন্য। এই কারণেই আপনার এবং আমার মধ্যে চৈতন্য রয়েছে। যদি কারণের মধ্যে তা না থাকত, তবে কার্যের মধ্যে তা এল কী করে? আজকের জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে এ যুক্তি অকাট্য। কাজেই, অনেক বিজ্ঞানী এই ভাবটিকে পছন্দ করেন।

আমি এই প্রসঙ্গে 'দ্য তাও অফ ফিজিক্স' (The Tao of Physics) গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক অধ্যাপক কাপরা-র (Capra) মতামত উদ্ধৃত করছি। ঐ গ্রন্থে তিনি বলেছেন :

'এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পটভূমি সম্পর্কে আজকের পদার্থবিজ্ঞান আমাদের যে তথ্য দিচ্ছে, হিন্দুদের "ব্রহ্ম", বৌদ্ধদের "ধম্মকায়" এবং তাওবাদীদের "তাও" তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পূর্ণ।'

ভৌতবিজ্ঞান কেবল ব্রহ্মাণ্ডের জড় দিকটিরই ব্যাখ্যা দেয়। কিন্তু চৈতন্যের দিকটিও তো আছে; তার ব্যাখ্যা কী? এর ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেন না। কিন্তু আমরা দুটি দিকেরই ব্যাখা দিতে পারি। কাপরা এইটি লক্ষ্য করেই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, 'আমি সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা; আমিই সকল জীবের আদি, মধ্য এবং অন্ত'। ঈশ্বর থেকেই আমরা এসেছি, ঈশ্বরেই আমাদের স্থিতি এবং অন্তিমে সেই ঈশ্বরের কাছেই আমরা ফিরে যাব। এখানে অবশ্য ঈশ্বর শব্দটি বেদান্তের অর্থে, অর্থাৎ সর্বব্যাপী, আদি ও অদ্বয় চৈতন্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, আপনি-আমি যার মধ্যে রয়েছি—জগৎ-অতিরিক্ত কোন সত্তা অর্থে নয়। আমরাও সেই অখণ্ড সত্তার অংশ। এই কারণেই আমরা সব এক। এমনকি বাইরের জগৎ ও আমরা আলাদা নই; আমরা একই সত্যের অবিভাজ্য অঙ্গ। আমাদের দর্শন তাই প্রকৃতিকে ধ্বংস করা অনুমোদন করে না। পাশ্চাত্য দর্শন কিন্তু ভিন্ন; সেখানে দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গি। কাজেই আপনি প্রকৃতিকে ধ্বংস করেন, শত্রু মনে করে তাকে জয় করার, তার ওপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করেন। এই ভাবটিকে আমরা সমর্থন করি না। যাঁরা আজ প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বলছেন, তাঁরা কার্যত ভারতীয় মতকেই স্বীকৃতি দিচ্ছেন। বাস্তবিক, প্রকৃতি আমাদের কাছে বিজাতীয় বস্তু নয়। আমরা সব সেই অসীম পূর্ণেরই অংশ। এই পরিপ্রেক্ষিতে গীতার এই শিক্ষাটি খুবই প্রাসঙ্গিক।

এই বিরাট বিশ্বের দিকে তাকিয়ে, তার বিশালতা পর্যালোচনা করুন। সেটা খুবই ভালো। কিন্তু যে আত্মা আপনার ভিতর আত্মগোপন করে আছে, তার বিশালতার কাছে বাইরের প্রকৃতির বিরাটত্ব কিছুই নয়। আমেরিকার মহাকাশযান ভয়জার (Voyager) নেপচুনকে অতিক্রম করে, সৌর জগতের সীমা অতিক্রম করে, এখন বাইরের মহাকাশে এগিয়ে চলেছে। এ এক বিস্ময়কর ঘটনা, সন্দেহ নেই। কারণ এর দ্বারা মহাবিশ্বের সীমাহীনতার অভিজ্ঞতা আপনার হচ্ছে। কিন্তু যে সত্য আপনার অন্তরে নিহিত রয়েছে, তার তুলনায় এসব বাহ্য বস্তুর অভিজ্ঞতা কিছুই নয়! মানুষ যেদিন এই সত্য উপলব্ধি করবে, সেদিন তারা বুঝবে তাদের যথার্থ গৌরব এবং মহত্ত্ব কোথায়। ভৌতবিজ্ঞান এবং বেদান্ত—উভয়েই মানুষের এই অনন্যতা স্বীকার করে। ২ অক্টোবর ব্যাঙ্গালোরের সি.ভি.রমন ইনস্টিটিউটে গান্ধীস্মারক বক্তৃতায় আমি এই বিষয়ে বলেছিলাম। বক্তৃতার শিরোনাম ছিল, 'উপনিষদ ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষের অনন্যতা'। শ্রোতারা খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। এর পরেও আমেদাবাদে প্রয়াত পরমাণু বিজ্ঞানী বিক্রম

সারাভাই স্মারক বক্তৃতা হিসাবে আমি দুটি বক্তৃতা দিই। বিষয় ছিল 'মানুষের অনন্যতার বিজ্ঞান'। মুম্বাই-এর ভারতীয় বিদ্যাভবন তা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেছিল। প্রথম বক্তৃতায় আমি আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের অনন্যতা আলোচনা করেছিলাম এবং দ্বিতীয় বক্তৃতায় বেদান্ত অনুসারে মানুষের স্বকীয়তা বা বিশিষ্টতা কোথায়, তা ব্যাখ্যা করি। দুটি বিষয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই; একটি আর একটির পরিপূরক। মানুষ যদি একবার তার এই অনন্যতার কথা জানতে পারে, তাহলে আজ সে যে আচরণ করছে, কাল তার চেয়ে উন্নততর আচরণ করবেই করবে। আজ অজ্ঞানতাবশত আমরা হাজার রকমের ভুল করছি। কিন্তু যখন আমরা নিজেদের এই অনন্যতার কথা জানতে পারব, তখন আমাদের জীবন ও কর্মের মধ্যে তা ফুটে উঠবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ব্যবহারিক বেদান্তের যে মহান শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তার প্রভাবে ভবিষ্যতে এই প্রগতি অবশ্যই আসবে। স্বামীজীর কৃপায় বেদান্ত আজ আর সুদূর হিমালয়ের গিরিগুহায় আবদ্ধ হয়ে নেই—বেদান্ত আজ হাটে-বাজারে, গৃহস্থের সংসারে, অফিস-কাছারি সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ছে। এই কারণেই আজ এই শিক্ষা সকল মানুষের পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ। এই শিক্ষার প্রভাবে মানুষ উচ্চস্তরে উঠে যাচ্ছে। দৈহিক দিক থেকে মানুষ সীমিত হলেও, তার মধ্যে নিহিত রয়েছে এক অসীম সত্তা। এটা উপলব্ধি করতে হবে এবং এই সত্য অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করার শক্তি প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে। সেই শক্তিকে নষ্ট হতে না দিয়ে কাজে লাগান। সকল মানুষকে ডেকে ডেকে বেদান্ত এই কথাই বলছে। *মুণ্ডক উপনিষদ* (২।২।৫) বলছেন, *তমেবৈকং জানথ আত্মানম্, অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ; অমৃতস্য এষ সেতুঃ।* 'এই এক এবং একমাত্র সত্য আত্মাকে উপলব্ধির চেষ্টা কর, অন্য সব অসার কথা ছেড়ে দাও; এই হলো অমৃতত্বের সেতু'। 'অমৃতত্বের সেতু' হলো এই সত্য উপলব্ধি করা যে, 'আমি আত্মা', নিত্যমুক্ত, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ। এই হলো আমার যথার্থ স্বরূপ। কী অসাধারণ, উচ্চতম ভাব! অতি বড় অপরাধীর মধ্যেও আত্মা সদা শুদ্ধই থাকেন। কোন কিছুই এই আত্মাকে অপবিত্র করতে পারে না। কারণ তিনি স্বরূপতই পবিত্র। মানুষ সম্পর্কে এই মহত্তম দৃষ্টিভঙ্গি, উচ্চতম ধারণা বেদান্ত ছাড়া আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এই কারণে, আত্মজ্ঞানই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এরপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিভূতির বর্ণনা দিয়ে বলছেন,

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

—'আদিত্যদের মধ্যে আমি বিষ্ণু; জ্যোতিষ্কদের মধ্যে আমি কিরণদায়ী সূর্য; বায়ুদের মধ্যে আমি মরীচি; নক্ষত্রদের মধ্যে আমি চন্দ্র।'

আমাদের ধর্ম তত্ত্ব এবং প্রকৃতি থেকে এই দৃষ্টান্তগুলি নেওয়া হয়েছে। সেখানে অনেক কিছুই রয়েছে, তার মধ্য থেকে শ্রীকৃষ্ণ বেছে বেছে কয়েকটির উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো *আদিত্যানাম্ অহং বিষ্ণুঃ,* সংস্কৃতে *আদিত্য* শব্দের অর্থ সূর্য; 'আদিত্যদের মধ্যে আমি বিষ্ণু'। দ্বাদশ আদিত্যের কথা আমরা পাই এবং বিষ্ণু হলেন তাঁদের একজন। 'আদিত্যদের মধ্যে আমি বিষ্ণু' এবং *জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্,* 'জ্যোতিষ্কদের মধ্যে আমি দীপ্তিমান সূর্য'। *মরীচিঃ মরুতামস্মি,* 'বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি'। এগুলি আমাদের ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন পরিভাষা। *নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী,* 'নক্ষত্রদের মধ্যে আমি চন্দ্র।' চন্দ্র কেন? কারণ রাতের আকাশে চাঁদই সবচেয়ে উজ্জ্বল।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

—'বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ এবং দেবতাদের মধ্যে আমি বাসব (ইন্দ্র); ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে আমি মন এবং জীবদের মধ্যে আমিই চেতনা।'

বেদানাং সাম বেদোঽস্মি, 'বেদসমূহের মধ্যে আমি হলাম সামবেদ'। এই উক্তিটি কৌতূহলোদ্দীপক, কারণ অন্যান্য স্থানে আমরা দেখেছি ঋগ্বেদ বা যজুর্বেদকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে সামবেদের প্রাধান্য। এমনকি, মনুস্মৃতিতে একথাও বলা হয়েছে যে, সামবেদের উক্তিগুলি অশুদ্ধ। কিন্তু এখানে সামবেদের স্তুতি করা হচ্ছে। এই উভয় সংকটের সর্বোত্তম সমাধান দিয়েছেন লোকমান্য তিলক তাঁর *গীতারহস্য* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। সেখানে তিনি বলেছেন, ভক্তিধর্ম ভজন বা সঙ্গীতের ওপর খুব জোর দেয়। ওদিকে বেদসমূহের মধ্যে একমাত্র সামবেদেই সুরের প্রাধান্য। ভারতীয় সংগীতের ভিত্তিও এই সামবেদ। স্বভাবতই, মহাভারতের *নারায়ণীয় পর্বে,* যেখানে ভক্তির কথা বলা হয়েছে, সেখানে ভক্তি এবং ভজনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এখানে তাই ভজনকে গুরুত্ব দিতে সামবেদকে প্রধান বেদের স্থান দেওয়া হয়েছে।

দেবাণাম্ অস্মি বাসবঃ, 'দেবতাদের মধ্যে আমি হলাম বাসব, অর্থাৎ

দেবরাজ ইন্দ্র'। *ইন্দ্রিয়াণাম্ মনশ্চাস্মি,* 'ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে আমি *মনস্।'* আমাদের দেহ-মন বিশিষ্ট শারীরতন্ত্রে মনস্ এক অভিনব সত্তা। দেখা, শোনা ইত্যাদির জন্য আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টি হলো *মনস্। এই মনস্* পরিণত মন নয়, বরং তার প্রাথমিক অবস্থা। স্বামী বিবেকানন্দ মনের অস্থির অবস্থাকে *মনস্* বলেছেন। কোন একটি বস্তুকে দেখে আপনার মনে প্রশ্ন ওঠে 'এটা কি এই?' বা 'এটা কি ওই?' মনের এই *সংকল্প বিকল্পাত্মিকা* অবস্থাকেই সংস্কৃতে *মনস্* বলা হয়। এই কারণে, *মনস্* ইন্দ্রিয়পদবাচ্য, তবে একটু বেশি মার্জিত, এই যা। এই মনস্ আর পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপগুলিকে সুসমঞ্জস করে তুলতে পারে। *ভূতানাম্ অস্মি চেতনা,* 'সকল জীবের মধ্যে আমিই বুদ্ধিতত্ত্ব বা চেতনা'। চেতনা বা চৈতন্যের অর্থ হলো বুদ্ধি, জানা বা উপলব্ধির সামর্থ্য ইত্যাদি।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

—'রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর; যক্ষ এবং রাক্ষসগণের মধ্যে আমি ধনরাজ কুবের; বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্বতের মধ্যে আমি মেরুপর্বত।'

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি, 'রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর' বা শিব। এখানে যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা মূলত বৈদিক। পরবর্তী পুরাণগুলিতে এসব শব্দের ভিন্নতর অর্থ করা হয়েছে। কিন্তু, প্রথম যুগে, বেদে অনেক [একাদশ] রুদ্রের উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই অর্থে শঙ্করও একজন রুদ্র। *বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্,* 'যক্ষ এবং রাক্ষসগণের মধ্যে আমি কুবের, *বিত্তেশ,* অর্থাৎ "ধনরাজ"।' *বসূনাং পাবকশ্চাস্মি,* 'সকল বসুগণের মধ্যে, (এক ধরনের উচ্চকোটির সত্তা) আমি হলাম *পাবক* অর্থাৎ অগ্নি'। *মেরুঃ শিখরিণাম্ অহম্* এবং 'পর্বতের মধ্যে আমি মেরু।' এই মেরু হলো এক কাল্পনিক পর্বত। এই মেরুপর্বতকে কেন্দ্র করেই এই জগৎ আবর্তিত হচ্ছে। এটি পৌরাণিক ধারণা।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

—'এবং হে পৃথাপুত্র! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলে জেনো, সেনাপতিদের মধ্যে আমি স্কন্দ; এবং জলাশয়গুলির মধ্যে আমি সাগর।'

মাং বিদ্ধি, 'আমাকে জানবে'; *বৃহস্পতিম্,* 'বৃহস্পতিরূপে'; *পুরোধসাং চ*

মুখ্যম্, 'দেবপুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান'। বৃহস্পতি একজন মহান পুরোহিত। আমিই তিনি। *সেনানীনাম্ অহং স্কন্দঃ,* 'সেনাপতিদের মধ্যে আমি স্কন্দ'। সুব্রহ্মণ্য বা কার্তিক একজন মহান সেনাপতি। বস্তুতপক্ষে, তাঁর জন্মের কারণেই আমরা মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* কাব্য পেয়েছি। ঐ মহাকাব্যে শিব-পার্বতীর বিবাহের কাহিনি এবং তার ফলস্বরূপ স্কন্দ বা কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। কার্তিককে দেবসেনাপতি বলা হয়। *সরসাম্ অস্মি সাগরঃ,* 'জলাধার সমূহের মধ্যে আমি হলাম সাগর', যা সুবিশাল ও অপার।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

—'মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু; শব্দসমূহের মধ্যে আমি একাক্ষর ওঁ; যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপরূপযজ্ঞ (নীরব পুনরাবৃত্তি); স্থাবরপদার্থের মধ্যে আমি হিমালয়।'

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং, 'মহর্ষিদের মধ্যে আমি হলাম ভৃগু'। বেদে এবং পুরাণে ভৃগু ঋষির নাম পাওয়া যায়। তিনি খুব উচ্চকোটির ঋষি ছিলেন। তাই, সকল মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু। *গিরাম্ অস্মি একম্ অক্ষরম্,* 'সকল শব্দ বা বাক্যের মধ্যে আমি হলাম সেই একাক্ষর ওঁ'। *যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।* এই কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। 'সকল যজ্ঞের মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ', অর্থাৎ, কিনা ভগবানের নাম জপ। জপ-এর কী দারুন মাহাত্ম্য, তা এখানে বলা হচ্ছে। আপনি *অশ্বমেধ, অগ্নিহোত্র* এবং অন্যান্য বিভিন্ন যজ্ঞ করতে পারেন; আবার যে *কোটি অর্চনার* কথা আজকাল লোকে বলে থাকে, সে যজ্ঞও করতে পারেন। সবই যজ্ঞ। কিন্তু শ্রেষ্ঠ *যজ্ঞ* হলো *জপযজ্ঞ,* 'বারবার ঈশ্বরের নাম করা'। অতএব, সকল যজ্ঞের মধ্যে আমি হলাম জপ। তারপর, *স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ,* 'জগতে অনড় বস্তুগুলির মধ্যে আমি হলাম হিমালয়'। *স্থাবর এবং জঙ্গম*—জগতে দুরকমের বস্তু আছে। একটি হলো *জঙ্গম* যা নড়ে বেড়ায় এবং অন্যটি হলো স্থাবর, অর্থাৎ যা নড়ে না, চলে না। অনড় বস্তুগুলির মধ্যে আমি হিমালয়।

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

—'বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ এবং দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ; গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি।'

অশ্বত্থঃ সর্ব বৃক্ষাণাম্, 'সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ'। অশ্বত্থ অতি পবিত্র গাছ। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়েই দেখবেন জগৎসংসারকে এক ঊর্ধ্বমূল অশ্বত্থবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। *কঠ উপনিষদ*-এও একথা আছে। তাই, ভারতবর্ষে অশ্বত্থের বড়ই মহিমা। এই মহিমা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের আগেও ছিল। তারপর বুদ্ধদেব এলেন এবং এই গাছের নিচে বসে বোধিলাভ করলেন। তাতে এই অশ্বত্থের পবিত্রতা যেন আরও বেড়ে গেলো। তার নাম হলো *বোধিদ্রুম* অর্থাৎ 'বোধি বা জ্ঞানবৃক্ষ'। এই কারণেই অশ্বত্থ বৃক্ষকে লোকে প্রদক্ষিণ করে। ভারতবর্ষের সর্বত্রই অশ্বত্থের এই মহিমা—সকলের চোখেই সে অতি পবিত্র।

দেবর্ষীণাম্ চ নারদঃ, 'এবং দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি হলাম নারদ'। তিনরকম ঋষি আছেন—*দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষি।* তিনিই *রাজর্ষি*, যিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েও গভীরভাবে আধ্যাত্মিক—সকলের মঙ্গলের জন্যই তিনি ক্ষমতায় আসীন। রাজনীতিবিদ বা প্রশাসক, যদি আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন হন এবং সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য কাজ করেন, তবে তাকে *রাজর্ষি* বলা যেতে পারে। শঙ্করাচার্য বলেছেন, *রাজানশ্চতে ঋষয়শ্চ*, রাজর্ষি হলেন 'একাধারে রাজা এবং ঋষি'। চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনা কালে আমি একথা উল্লেখ করেছি। *ব্রহ্মর্ষি* হলেন সেই সব *ব্রাহ্মণ*, যাঁরা মহৎ ঋষির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। সব শেষে দেবর্ষি। যেমন নারদ। আমাদের অধ্যাত্ম সাহিত্যে এই তিনরকম ঋষির কথা আমরা পাই।

তারপর *গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ।* গন্ধর্বরা হলেন দেবগায়ক। 'এইসব গন্ধর্বদের মধ্যে আমি চিত্ররথ, একজন প্রধান গন্ধর্ব।' *সিদ্ধানাম্ কপিলো মুনিঃ*, 'সিদ্ধগণের মধ্যে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দিক থেকে নিখুঁত ব্যক্তিদের মধ্যে আমি মহর্ষি কপিল মুনি।' দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের জনকরূপে আমাদের সাহিত্যে কপিল মুনির স্থান অতি উচ্চে। তিনি অসাধারণ আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন ঋষি। তাই, বেদে বলা হয়েছে, 'কপিল যা কিছু বলেন, তাই পবিত্র।' তাই এখানে কপিলের কথা বলা হয়েছে। আমাদের ধর্ম সাহিত্যে অবশ্য অনেক কপিলের কথা পাওয়া যায়, যদিও তাঁরা সকলেই এক ব্যক্তি কিনা তা আমরা জানি না। এঁদের কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু যে কপিল সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা, ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে যে কপিলের উল্লেখ আছে, যিনি তাঁর জননী দেবহূতিকে উপদেশ দিচ্ছেন, তিনি যে অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন ঋষি ছিলেন, তাতে কোন সংশয় নেই। তাঁরা মানুষের দিব্যস্বরূপের কথা জানতেন। সে যাই হোক

সিদ্ধদের মধ্যে কপিলের স্থান অতি উচ্চে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'সিদ্ধগণের মধ্যে আমিই কপিল মুনি।'

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

—'অশ্বদের মধ্যে আমাকে অমৃত-জাত উচ্চৈঃশ্রবা বলে জানবে; শ্রেষ্ঠ হাতিদের মধ্যে (আমি হলাম) ঐরাবত; এবং মানুষের মধ্যে আমি রাজা'।

উচ্চৈঃশ্রবসং অশ্বানাম্। যখন *সমুদ্রমন্থন* করা হচ্ছিল, তখন দেবতা, দানব এবং মানুষ তাতে অংশ নেয়। সেই মন্থনক্রিয়ার ফলে সমুদ্রগর্ভ থেকে নানা জিনিস উঠে এসেছিল। তার মধ্যে যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞান ধন্বন্তরি ছিল, তেমনি ছিল উচ্চৈঃশ্রবা নামক ঘোড়াটিও। 'অমৃতের জন্য সমুদ্রমন্থনের ফলে উদ্ভূত যে অশ্ব, উচ্চৈঃশ্রবা, তা-ও আমি।' শুধু ঘোড়া নয়, সেই সময়ে হাতি এবং অন্যান্য নানা বস্তুও ওঠে। অশ্বের মধ্যে আমি সেই উচ্চৈঃশ্রবা। *বিদ্ধি মাম্ অমৃতোদ্ভবম্,* 'আমাকে অমৃতজাত বলে জানবে।' *ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাম্,* 'গজেন্দ্র অর্থাৎ রাজকীয় হাতিদের মধ্যে আমি ঐরাবত।' অনুরূপভাবে, *নরাণাং চ নরাধিপম্,* 'মানুষের মধ্যে আমি তাদের শাসনকর্তা, রাজা'। রাজা বা ভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাঁর সমতুল্য ব্যক্তির হাতেই সব ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। সমাজে তাঁর বিশেষ মর্যাদা। তাই বলছেন, 'নরগণের মধ্যে আমি *নরাধিপ'*। বস্তুতপক্ষে, একথা বলা হয় যে, প্রজারা যা কিছু সৎকাজ করেন, ধ্যানধারণা করেন, আধ্যাত্মিক সাধনা করেন, তার ফলের কিছুটা রাজাও পেয়ে থাকেন, কারণ তিনি সমাজকে রক্ষা করেন, সমাজের আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি বজায় রাখেন, যাতে তাঁর প্রজারা শান্তিতে বসবাস করতে পারেন। রাজা বা *নরাধিপ* শব্দটি এইভাবেই চালু হয়েছে। আজকের দিনে এর অর্থ সার্বভৌমত্ব; তিনি একজন মুকুটধারী ব্যক্তি না-ও হতে পারেন। বর্তমান যুগে রাজতন্ত্র একরকম বিদায় নিতে বসেছে। কিন্তু সার্বভৌমত্ব অব্যাহত রয়েছে। সার্বভৌম রাজা বা রানীর অস্তিত্ব লোপ পায়, কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অটুট থাকে। ব্রিটিশরা যেদিন ভারত ছেড়ে চলে গেল, সেদিন সার্বভৌম রাজা বা রানীর কর্তৃত্ব এ দেশ থেকে উঠে গেল, কিন্তু ভারতীয় সার্বভৌমত্বের কোন হানি হলো না। সার্বভৌমত্ব এলো এক নতুন প্রজাতন্ত্রের হাতে, যার প্রতীক হলেন রাষ্ট্রপতি। গণতন্ত্রে এবং প্রজাতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকও স্বাধীন।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্ ।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

'অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র; ধেনুদের মধ্যে আমি কামধুক; সন্তান জন্মের কারণসমূহের মধ্যে আমি কন্দর্প এবং সাপেদের মধ্যে আমি বাসুকি।'

আয়ুধানাম্ অহং বজ্রম্, 'অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র', যে ভয়ংকর অস্ত্র ইন্দ্রের জন্য সৃষ্ট হয়েছিল। *ধেনূনাম্ অস্মি কামধুক্,* 'গাভীদের মধ্যে আমি কামধেনু'। এই কামধেনু এক পৌরাণিক গাভী। আপনার যে-কোন ইচ্ছা এই ধেনু পূরণ করবে। *প্রজনশ্চ অস্মি কন্দর্পঃ,* 'আমি সন্তান উৎপাদনের প্রেরণা কন্দর্প, প্রেমের দেবতা'। পাশ্চাত্যে এই কন্দর্পকে বলা হয় Eros। *সর্পাণাম্ অস্মি বাসুকিঃ,* 'সাপেদের মধ্যে আমি বাসুকি'।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

—'এবং নাগদের মধ্যে আমি অনন্ত; জলচর জীবসমূহের মধ্যে আমি বরুণ; পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্যমা এবং নিয়ামকদের মধ্যে আমি যম।'

সরীসৃপ এবং নাগ, এই দু'ধরনের মধ্যে, আমি নাগরাজ অনন্ত, যার ওপর ভগবান বিষ্ণু বিশ্রাম করেন। *বরুণো যাদসাম্ অহম্,* 'যারা জলে বাস করে তাদের মধ্যে আমি বরুণ।' *পিতৃণাম্ অর্যমা চাস্মি,* 'পিতৃগণের মধ্যে আমি হলাম অর্যমা।' *পিতৃ* মানে 'মৃত পূর্বপুরুষেরা'। তাঁদের মধ্যে অর্যমা নামে একজন দেবতার উল্লেখ বেদে আছে। *যমঃ সংযমতামহম্,* 'যাঁরা সংযত করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন এবং শাসন করেন, তাঁদের মধ্যে আমি মৃত্যুর দেবতা, যম।' যম, কাল, মৃত্যু এসব শব্দ সাধারণত একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা যমকে 'কাল' বলি। কেন? বলি এই জন্য যে, সময়ই সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। সব কিছুই কালের অধীন। কালকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। তাই বলা হচ্ছে, সকল নিয়ামকের মধ্যে আমি হলাম সেই যম।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥

—'এবং দিতির সন্তানদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, পরিমাপের মধ্যে আমি কাল, পশুদের মধ্যে আমি পশুরাজ সিংহ এবং পাখিদের ভিতর আমি গরুড়।'

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাম্, 'দৈত্য বা অসুরদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ'। মানুষ, অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রীভগবানের সর্বোত্তম ভক্ত। তাঁদের সকলের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। কাজেই, দৈত্যদের মধ্যে আমি হলাম প্রহ্লাদ। *কালঃ কলয়তাম্ অহম্,* 'নিয়ন্ত্রক ও পরিমাপক বস্তুসমূহের মধ্যে আমি হলাম কাল'। বাস্তবিক, সময়ের দ্বারাই তো আমরা সব কিছু মাপি। সবকিছুই সময়ের অধীন। মহাভারতে বলা হয়েছে *কালভুক্তম্,* 'কালের দ্বারা ভুক্ত'। *মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোঽহং,* 'পশুদের মধ্যে আমি পশুরাজ', অর্থাৎ সিংহ। বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্, 'পাখিদের মধ্যে আমি *বৈনতেয়,* [বিনতা তনয়] গরুড়'। ভারতীয় পরম্পরায় গরুড় অতি শ্রদ্ধার পাত্র।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

—'বিশোধক বস্তুর মধ্যে আমি বায়ু; শস্ত্রধারী যোদ্ধাদের মধ্যে আমি রাম; মাছের মধ্যে আমি মকর; স্রোতস্বিনীসমূহের মধ্যে আমি জাহ্নবী (গঙ্গা)।'

পবনঃ পবতাম্ অস্মি, 'যে সব বস্তু পবিত্র করে, তাদের মধ্যে আমি *পবন* বা বায়ু'। বায়ু সব কিছুকে নির্মল করে, পরিষ্কার করে। তাই তো আমরা জানলা খুলে রাখতে চাই। আমরা একটু বিশুদ্ধ বাতাস চাই। *রামঃ শস্ত্রভৃতাম্ অহম্,* 'অস্ত্রধারী যোদ্ধাদের মধ্যে আমি [দশরথপুত্র] শ্রীরাম'। *ঝষাণাম্ মকরশ্চাস্মি,* 'মাছের মধ্যে আমি হাঙ্গর বা *মকর'। স্রোতসাম্ অস্মি জাহ্নবী,* 'প্রবহমান জলরাশির মধ্যে আমি জাহ্নবী, গঙ্গা'। কী অসাধারণ বর্ণনা!

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন ।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

—'সৃষ্ট বস্তুসমূহের আদি, মধ্য এবং অন্ত আমি; সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে আমি আত্মজ্ঞান এবং পারস্পরিক বিবাদসমূহের মধ্যে আমি হলাম *বাদ।'*

সর্গাণাম্, অর্থাৎ 'এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের', *সর্গ* অর্থাৎ সৃষ্টি। সাধারণত সৃষ্টি বলতে আমরা যা বুঝি বেদান্ত তা স্বীকার করে না। বেদান্ত বলে শূন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্ট হতে পারে না। ব্রহ্ম থেকেই এই জগৎ এসেছে; তাই একে আমরা বলি projection বা অভিক্ষেপ। সংস্কৃতের *সৃষ্টি* শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো projection। *সৃজ* মানে অভিক্ষেপ করা, সৃষ্টি

করা নয়। এই অভিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের 'আদি, মধ্য এবং অন্ত' হলাম আমি। এরপর, *বিদ্যানাম্‌*, অর্থাৎ 'সব বিজ্ঞানের মধ্যে', *অধ্যাত্মবিদ্যা*, 'আমি হলাম *অধ্যাত্মজ্ঞান'।* এটি আর একটি অসাধারণ মন্তব্য। জগতে বহুরকম বিজ্ঞান আছে। *বিদ্যা* মানে বিজ্ঞান বা জ্ঞান। ইংরেজিতেও সায়েন্স বলতে জ্ঞানই বোঝায়, অন্য কিছু নয়। যে জ্ঞানকে যাচাই করা যায়, যা অন্যকে দেওয়া যায়, তাকেই বিজ্ঞান বলে। কাজেই, *বিদ্যা*, জ্ঞান বা বিজ্ঞান সব একই জিনিস। আমরা এর সবগুলিকেই *বিদ্যা* বলি। বিদ্যা অনেকরকম—রসায়ন বিদ্যা, ভৌতবিদ্যা, আরও কত কী! এই সব বিদ্যার পারে রয়েছে *অধ্যাত্মবিদ্যা* বা অধ্যাত্ম বিজ্ঞান। বেদান্ত মতে, এই বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞান, আত্মজ্ঞানলাভের বিজ্ঞান, মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকশিত করার বিজ্ঞান। ভাবটি এই—বাইরের বস্তু সম্পর্কে আপনি আর কত জানবেন? নিজেকে জানুন। নিজের সম্বন্ধে তো আপনি কিছুই জানেন না। ঐ জানাটাই মহত্তম জ্ঞান। তাই ভগবান বলছেন, সকল বিজ্ঞানের মধ্যে আমি হলাম *অধ্যাত্মবিদ্যা*। অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে যদি আপনি নিছক ধর্ম বলে চালাতে চান, তবে তা কিছুটা হাস্যকর হবে। কারণ সব বিজ্ঞানের মধ্যে ধর্ম হলো শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। কিন্তু বিশ্বের ধর্মগুলি আজ এমন নিষ্প্রাণ তামাসায় পর্যবসিত হয়েছে যে, ধর্মকে বিজ্ঞান বলে কারোর আর বিশ্বাস হয় না। এ মন্তব্য স্বামী বিবেকানন্দের (বাণী ও রচনা ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২০৩)। কিন্তু যখন আপনি অধ্যাত্মবিদ্যার কথা বলেন, তখন আপনি মানবসত্তার এমন একটি নিগূঢ় দিককে স্বীকার করেন, যা থেকে সব জড়বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। এই মানবসত্তা স্বরূপত অনন্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। আজকের ভৌতবিজ্ঞান ধীরে ধীরে সেকথা টের পাচ্ছে। যে মানুষ জড় বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে পারে, তার স্থান স্বভাবতই সেই বিজ্ঞানের ওপরে। অতএব, যে বিজ্ঞান মানবসত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়, তা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্‌*, 'সকল বিজ্ঞানের মধ্যে আমি *অধ্যাত্মবিদ্যা'।* সম্ভবত এই শতাব্দীর কোন একসময়ে মানুষ এই কথাটির মর্ম উপলব্ধি করবে এবং এই সত্যকে বরণ করে নেবে। বিজ্ঞান আজ ক্রমশ সেই লক্ষ্যের দিকেই এগোচ্ছে। এছাড়া অন্য পথ নেই। বাইরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন শেষ হলে, তখন আপনি কী করবেন? হয়তো আরো বিশদভাবে, আরো খুঁটিয়ে এই জগৎকে আপনি পর্যালোচনা করতে পারেন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কারণ মূল যেসব বিষয় জানার ছিল, তা জানা হয়ে গেছে; আরো গভীরে প্রবেশ করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। এতকাল আপনি, বেদান্তে যাকে *দৃশ্যম্‌*

বা 'পরিদৃশ্যমান জগৎ' বা 'বিষয়' বলা হয়, তারই পর্যালোচনা করেছেন। কিন্তু দ্রষ্টা, পর্যবেক্ষক বা *দৃক্* -এর বিষয়ে আপনি কিছু জেনেছেন কী? জানেন নি। তাই, এখানে আধুনিক জড় বিজ্ঞানকে ভারতবর্ষের সনাতন অথচ চিরনবীন বেদান্তের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে হবে।

বেশ কয়েক বছর আগে, সিমেন্স কোম্পানীর 'ইলেক্ট্রোমিডিয়া' নামক পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম। সিমেন্স একটি বড় জার্মান সংস্থা। একজন বিজ্ঞানী সেই চমৎকার প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই আধুনিক যুগের সূচনা। আমরা চারপাশের পৃথিবীকে জানার জন্য তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েছি। প্রথমে আটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগরে জাহাজ পাঠিয়ে পৃথিবীর নানা প্রত্যন্ত প্রদেশ আবিষ্কার করেছি। তারপর আমরা এগিয়ে গেছি উত্তর মেরুর দিকে, পরে দক্ষিণ মেরুর দিকে। তারপর মহাসমুদ্রে ডুব দিয়ে তার গভীরতা আবিষ্কার করেছি। তারপর জয় করেছি মাউন্ট এভারেস্ট এবং আল্পস পর্বত। এসব করেও আমরা ক্ষান্ত হইনি, আমাদের অস্থিরতা কমেনি। আমরা আরও, আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করতে চেয়েছি। আকাশে রকেট পাঠানো শুরু হলো। প্রথম প্রথম রকেটগুলি পঞ্চাশ-ষাট মাইল উঠে মাটিতে ভেঙে পড়লো। তারপর ধীরে ধীরে আমরা এমন শক্তিশালী রকেট তৈরি করলাম যে তা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এলো। তারও কয়েক বছর পর, আমরা চাঁদে নামলাম। আর এখন তো ভয়জার-২ সৌরজগৎ ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে!

এই কথা বলার পর লেখক বলছেন যে, আর একটি বিষয়ের অনুসন্ধান কিন্তু এখনও বাকি রয়ে গেছে। সেটি হলো আমাদের চৈতন্যের পশ্চাৎপট। আমাদের এই মনের পিছনে কী আছে? আমরা যে সবকিছু জানতে চাই, বুঝতে চাই—সে কার প্রেরণায়? প্রকৃত জ্ঞাতা কে? এই সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজে পেতে হবে।

নিজেকে জানার এই যে বিজ্ঞান, ভারতবর্ষ তা বহুযুগ আগে উপনিষদগুলিতে ব্যক্ত করেছিল। অধ্যাত্মবিদ্যা বলতে আত্মজ্ঞানলাভের বিজ্ঞানকেই বোঝায়। এই দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনের পিছনে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম এক অনন্ত আত্মাকে—যা নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত এবং অনন্ত। এই হলো পরম সত্য। *ছান্দোগ্য উপনিষদ* তাই বলছেন, *তত্ত্বমসি, তত্ত্বমসি,* 'তুমিই সেই, তুমিই সেই'। সেই সত্যের ওপর ভিত্তি করেই এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম।* আধুনিক বিশ্ব খুব শীঘ্রই এই ভাব গ্রহণ করবে। গতি

সেই দিকেই। আজকের মানুষ উভয়সংকটে পড়েছে। যে প্রযুক্তিগত সভ্যতার সৃষ্টি সে একদিন করেছিল, আজ সে তারই হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে অশেষ দুঃখভোগ করছে। মানুষের আজ কী করুণ অবস্থা! মানুষের মধ্যে এমন কিছু কি নেই, যা তাদের দাসত্বের অবসান ঘটিয়ে আপন জীবনের প্রভু করে তুলতে পারে? যেদিন এই প্রশ্নটি মানুষকে ব্যাকুল করে তুলবে—এবং তার লক্ষণ এখনই দেখা যাচ্ছে—সেদিন সে এই অসাধারণ বিজ্ঞানের দিকে—মানবসত্তার গভীরতম প্রদেশটি আবিষ্কারের দিকে ঝুঁকবেই ঝুঁকবে; সেদিন সে ভিতরের প্রকৃত মানুষটিকে খুঁজবে, বাইরের মানুষটিকে নয়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে মানুষকে আমরা দেখতে পাই, তা সৃষ্টির অন্তর্গত তার অতি সামান্য খণ্ডিত রূপ। কিন্তু তার আপাতদৃশ্যমান রূপের পিছনে লুকিয়ে আছে এক মহৎ সত্য, এক অখণ্ড মাত্রা। উপনিষদের ঋষিরা সেই সত্যটিকেই উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে সফল হয়ে শাশ্বত ধর্মরূপে তা সমগ্র মানবজাতির কাছে প্রচার করেছিলেন। একটিমাত্র বস্তুই সনাতন বা শাশ্বত এবং তা হলো অনন্ত আত্মা। বাকি সব কিছুই পরিবর্তনশীল। এই জগৎও। সূর্য, তারকা যা কিছু, সবই কালের বশীভূত, পরিবর্তনের শিকার। শুধু একটি বস্তুই সনাতন, 'শাশ্বত'; তা হলো আত্মা, আমাদের সকলের পৃষ্ঠভূমি অনন্ত পরমাত্মা। এই সত্য উপলব্ধির দিকেই সমস্ত বিজ্ঞান ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞান এবং স্নায়ুবিজ্ঞান অতি দ্রুত এগোচ্ছে। পরবর্তী শতাব্দীতে [অর্থাৎ এই একবিংশ শতাব্দীতে] একটা বড় রকমের পরিবর্তন আশা করতে পারি। সেই যাই হোক, এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'যত বিজ্ঞান আছে, তার মধ্যে আমি হলাম আত্মবিজ্ঞান'।

প্রবদন মানে আলোচনা, বিতর্ক, বিচার। ভারতীয় তর্কশাস্ত্রে তিন ধরনের *প্রবদন* আছে। যখন আপনি কোন একটি বিষয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করেন, তখন আপনি তিনভাবে তা করতে পারেন। তাদের প্রথমটিকে বলা হয় *বাদ,* দ্বিতীয়টি *জল্প* এবং তৃতীয়টি হলো *বিতণ্ডা।* কী চমৎকার শ্রেণিবিভাগ! বাদ-এর ক্ষেত্রে আপনার লক্ষ্য সত্যকে খুঁজে বার করা। অতএব, সত্যান্বেষণের মনোভাব নিয়ে শান্ত, ধীর-স্থির হয়ে, আপনি আলোচনা করবেন—কখনওই মাথা গরম করবেন না। এই প্রকার সত্যান্বেষী যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় *বাদ;* বিজ্ঞান এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনে এই *বাদ*-এরই প্রাধান্য। দ্বিতীয় হলো *জল্প।* জল্পে আলোচনার উদ্দেশ্যটাই আপনি ভুলে যাবেন এবং সত্যে উপনীত হবার সৎ প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে যে-কোন উপায়ে বিপক্ষকে পরাস্ত করতে

চাইবেন। আর *বিতণ্ডায়* প্রতিপক্ষের কোন যুক্তি না শুনেই আপনি তাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করবেন। যাঁরা বিতণ্ডা করেন সত্যের প্রতি তাঁদের কোন আগ্রহই থাকে না। তাঁরা কেবল কথা কাটাকাটি করতে চান। এ যেন ঠিক আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনীতির মতো—*বাদ* -এর নামগন্ধ নেই, শুধুই *জল্প* আর *বিতণ্ডা*। সংসদে বাদ-ই প্রত্যাশিত। সেখানে জাতির কল্যাণসাধন কী করে করা যায়, তা নিয়েই আলোচনা হওয়া উচিত। সেটিই গণতান্ত্রিক রীতি ও উদ্দেশ্য। কিন্তু সে উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে আমরা *জল্প* এবং *বিতণ্ডায়* মত্ত হয়ে পড়ি। এখন আমাদের *বাদ-এ* ফিরে যেতে হবে, কারণ গণতন্ত্র মানেই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।

শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, 'তর্কাতর্কির যত পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে আমি হলাম প্রথমটি, অর্থাৎ *বাদ*।' যদি আপনি *বাদ-এ* ব্যাপৃত থাকেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। পার্লামেন্টের সদস্যরা যদি সত্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে, জনসাধারণের সুখ এবং কল্যাণবিধানের লক্ষ্য সামনে রেখে আলাপ-আলোচনা করেন, তবে স্বয়ং শ্রীভগবানও সেখানে উপস্থিত থাকেন। 'আলোচনার পদ্ধতিগুলির মধ্যে আমি হলাম *বাদ*'—এ কথার এটিই তাৎপর্য।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

—'অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অ-কার এবং সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্বসমাস; আমিই অক্ষয় কাল; আমিই (কর্ম ফলের) বিধাতা এবং সর্বাকৃতি বিশিষ্ট।'

অক্ষরাণাম্ অকারোঽস্মি, 'সকল অক্ষরের মধ্যে আমি হলাম অ'। সংস্কৃতে এটিই প্রথম অক্ষর। প্রথম যে অক্ষরটি আমরা উচ্চারণ করতে পারি, তা হলো 'অ'; 'অ' হলো মুখনিঃসৃত প্রথম ধ্বনি, কারণ আমাদের কণ্ঠের গভীরতম প্রদেশ থেকে তা উদ্গত হয়। ইংরেজির 'A' কিন্তু সংস্কৃতের প্রথম অক্ষর নয়। ইংরেজির 'A' সংস্কৃতে হয়ে যায় 'এ', যেটি এই ভাষার সপ্তম অক্ষর। সংস্কৃতে 'অ'-ই প্রথম অক্ষর, যা থেকে অন্যান্য বর্ণের জন্ম। তাই 'অ' হলো আদি অক্ষর। *দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।* সংস্কৃতে দুটি শব্দকে একত্রিত করাকে সমাস বলে। তিন-চার রকমের সমাস আছে। যেখানে একটি পদ সরাসরি অন্য আর একটি পদের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় *দ্বন্দ্ব সমাস*। ধরুন, রাম ও কৃষ্ণ। সংস্কৃতে এই দুটি শব্দ এক করলে কী দাঁড়াবে? রামকৃষ্ণৌ। একে আমরা বলি দ্বন্দ্ব

সমাস। এইরকম আরও সমাস আছে। এ হলো সংস্কৃত ব্যাকরণের ব্যাপার, যেখানে একাধিক পদকে একপদে পরিণত করা হয়। কীভাবে? প্রথম পদ বা শব্দটির শেষাংশ এবং দ্বিতীয় পদের প্রথমাংশকে সমন্বিত করে। এই সামান্য রদবদল সন্ধি এবং সমাস—উভয় ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। আর একটি সমাস হলো *বহুব্রীহি।* আরও একটির নাম *তৎপুরুষ।* এগুলি খুব মজার। বহুব্রীহির অর্থ হলো, *অন্যপদার্থ প্রধানো বহুব্রীহিঃ,* অর্থাৎ 'বহুব্রীহি সমাসে যে দুটি শব্দ মিলিত হয়ে সমাসবদ্ধ পদ গঠন করে, তাদের অর্থ ছাপিয়ে অন্য একটি অর্থ প্রাধান্য লাভ করে।' আর একটি সমাস *তৎপুরুষ।* এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প আছে। এক সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি এক রাজার সঙ্গে দেখা করলেন; রাজা সংস্কৃত জানতেন না। কিন্তু সেই ব্যক্তি রাজাকে অভিনন্দিত করার জন্য একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করলেন। তিনি বললেন, *অহং চ ত্বম্ চ রাজেন্দ্র, লোকনাথৌ উভাবপি,* 'হে রাজন, আমি এবং আপনি উভয়ই *লোকনাথ,* অর্থাৎ এই জগতের প্রভু'। এই হলো লোকনাথ কথার যথার্থ অর্থ। কিন্তু রাজা এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ভাবলেন, আমি লোকনাথ, সে কথা ঠিক; কিন্তু তুমি কে হে, বাপু! কিন্তু শ্লোকের দ্বিতীয় ছত্রে এই হেঁয়ালির ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ *বহুব্রীহি সমাসোঽহম্, ষষ্ঠী তৎপুরুষো ভবান্। বহুব্রীহি সমাসোঽহম্,* 'আমি বহুব্রীহি সমাসের *লোকনাথ।*' ঐ যে আগেই বলা হয়েছে—বহুব্রীহি হলো *অন্য পদার্থ প্রধানো।* অতএব, বহুব্রীহি সমাস অনুসারে, লোকনাথ-এর অর্থ হলো, *লোকো যস্য নাথঃ স লোকনাথঃ,* '*লোক* হলো আমার প্রভু', আমি প্রভু নই! এই হলো *বহুব্রীহি* অনুসারে কথিত *লোকনাথ।* কিন্তু *ষষ্ঠী তৎপুরুষ* অনুসারে *লোকনাথ*-এর অর্থ হলো *লোকস্য নাথঃ লোকনাথঃ,* 'আপনি এই জগতের প্রভু'। সংস্কৃতজ্ঞ সেই ব্যক্তি বলতে চেয়েছিলেন, 'আপনি হলেন *তৎপুরুষ,* আমি *বহুব্রীহি'*। 'উভয়ই লোকনাথ।' সংস্কৃতে এই রকম বহু মজার এবং সুন্দর সুন্দর সংযুক্তপদ তৈরি করা যায়। এই হলো বহুব্রীহি, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সমাসের বৃত্তান্ত। দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যবহার সাধারণত এইভাবে হয়, যেমন, *রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ রামকৃষ্ণৌ।* এইভাবে আপনি শব্দের মেলবন্ধন ঘটাতে পারেন। দুটি পদকে মিশিয়ে একটি পদে পরিণত করতে পারেন। তবে, দুটি শব্দ সমাসবদ্ধ হলে শব্দের শেষে 'ঔ' যুক্ত হয়। একে দ্বন্দ্বসমাস বলা হয়, কারণ এই সমাস কতকগুলি শব্দকে ঐক্যবদ্ধ করে। ঈশ্বরও তাই। তিনিই সকল মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত করেন। এই 'একীকরণের তত্ত্ব' অনুসারে, সমাসের মধ্যে তিনি দ্বন্দ্বসমাস।

অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালো, 'আমিই অক্ষয়, অন্তহীন কাল।' কালের গতি নিয়ত প্রবহমান। সামনে যতদূর দেখা যায়, দেখুন—দেখবেন, কাল বর্তমান। আবার পিছনে তাকিয়েও দেখুন—দেখবেন, সেখানেও কালই বর্তমান। সময়ের এই ব্যাপ্তি বিস্ময়কর। একটু সভ্য মানুষই সময়ের মূল্য বোঝে। আদিমযুগে আমরা সময়ের দ্বারা চালিত হতাম। কিন্তু সময় সম্পর্কে চিন্তা করতে পারতাম না। কিন্তু যেই আমরা একটু সভ্য হলাম, তখন আমরা সময় সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা শুরু করলাম। ভারতবর্ষ তাই সময়ের গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য দীর্ঘকাল গবেষণা করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানও কালের প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করছে। আইনস্টাইন (Einstein)-এর অবিচ্ছেদ্য স্থান-কাল তত্ত্ব সেই প্রয়াসের ফলশ্রুতি। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক ও অবিচ্ছিন্ন স্থান-কাল পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্থানকে কালের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অবিচ্ছিন্ন স্থান-কালই বাস্তব সত্য এবং স্থান-কালের এই পটভূমিতে সবকিছুই নিতান্ত এক একটি ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের নিজস্ব কোন সত্তা নেই। স্থান-কালকে অবিচ্ছিন্ন একটি ধারা বা প্রবাহ হিসাবে বুঝতে পারলে সত্তা-ভাবনা চলে যায়, যা থাকে, তা কেবল কতকগুলি ঘটনামাত্র। সময়ের বুকে অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তাগুলি একত্রিত হয়ে ঠিক যেন ছায়াছবির মতো হয়ে যায়। কালের গতি সত্তাবান সমস্ত বস্তুকে ঘটনায় রূপান্তরিত করে। স্থানের তিনটি (three dimensions) মাত্রার সঙ্গে কালের মাত্রাটি যুক্ত হয়েই এই জাগতিক বাস্তবতা; আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুসারে এই হলো চতুর্বিধ মাত্রাযুক্ত জগৎ-প্রবাহ। কালের তীর সামনের দিকে ক্রমাগত ছুটে চলেছে। অন্তহীন তার যাত্রা। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, *অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালো,* 'আমিই এই অক্ষয় কাল'। '*কালঃ অস্মি,* 'আমিই কাল'—একথা তিনি একাদশ অধ্যায়ে বলবেন। আরও বলবেন—আমি এখানকার সবকিছুই গ্রাস করব। কাল সমগ্র বিশ্বকেই আত্মসাৎ করবে। বলা হয়েছে—*কালো সর্বস্য ভোক্তাঃ,* অর্থাৎ 'সময় জগতের সবকিছুই খেয়ে নেবে।' কিছুই বাকি থাকবে না। এই হলো কালের প্রকৃতি—অকাট্য সত্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন, *ধাতা অহং বিশ্বতোমুখঃ,* আমি আবার 'কর্মফলদাতা, *ধাতা,* যার দৃষ্টি সর্বতোমুখী।'

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

—'এবং আমি হলাম সর্বগ্রাসী মৃত্যু; যাঁরা ভবিষ্যতে সমৃদ্ধ হবেন, তাঁদের

সমৃদ্ধির কারণ; নারীদের কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা—তাও আমি।'

মৃত্যু শব্দটি এখানে আবার এসেছে। কাল এবং মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য এইটুকুই যে, যখন আপনি কাল-এর কথা বলেন, তখন আপনি আবেগ দ্বারা চালিত হন না। কিন্তু যেই আপনি মৃত্যুর কথা বলেন, তখনই আবেগ আপনাকে পেয়ে বসে, তখন আর আপনি নিস্পৃহ হয়ে কথা বলতে পারেন না, কারণ মৃত্যুর সঙ্গে আপনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। প্রতিদিনই একটু একটু করে আমাদের মৃত্যু হচ্ছে; কিন্তু তা আমাদের উদ্বিগ্ন করে না। আমরা ভয় পাই চরম মুহূর্তটিকে যখন কাল মৃত্যুরূপে এসে আমাদের স্পর্শ করে। *মৃত্যুঃ সর্বহরঃ চ অহম্,* 'আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু।' আবার, ভক্তির প্রসঙ্গে আমরা বলি, যাঁরা শ্রীভগবানের চরণ স্পর্শ করতে পেরেছেন, মৃত্যু তাঁদের ছুঁতে পারে না। ভাগবতের একটি স্তবে দেবকী কংসের কারাগারে জাত তাঁর সন্তান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই অসাধারণ ঘোষণাটি করেছেন। এই স্তবের শ্লোকগুলির মধ্যে একটি হলো মৃত্যু সম্পর্কিত। *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্,* ভগবদ চরণাশ্রিত ছাড়া বাদবাকি সকলকেই আমি গ্রাস করি।' ঐ স্তবে (১০.৩.২৭) দেবকী বলেছেন ঃ

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎ পাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদ্ অপৈতি ॥

শিশু কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলছেন, 'জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু জীবকে তাড়া করে ফেরে। প্রত্যেকেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়'। বাস্তবিক, শিশু খেয়েদেয়ে বড় হলো, শিক্ষালাভ করে চাকরিতে ঢুকলো। তারপর বিয়ে-থা করে, সৎকর্ম করে, হয়তো স্বর্গেও গেল। কিন্তু কেন? মৃত্যুকে এড়াবে বলে। কিন্তু যেখানেই যাক, 'মৃত্যু সর্বদাই সকলকে তাড়া করছে', গ্রাস করার জন্য তাদের অনুসরণ করে চলেছে। এই ভীতিই মানুষকে চঞ্চল করে তোলে। *মর্ত্যঃ মৃত্যুব্যালভীতঃ,* 'মরণশীল জীব *মৃত্যুব্যাল* দেখে ভয় পায়'। মৃত্যুকে এখানে একটা সাপের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে; ব্যাল, অর্থাৎ যে সাপটি হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মানুষ সাধারণত লতানো কোন কিছুকে তাদের দিকে এগোতে দেখলে ভীত হয়। এখানে মৃত্যু হলো সেইরকম এক সরীসৃপ। *পলায়ন্,* 'মানুষ পালায়'। অর্থাৎ পিছু নেওয়া সেই

মৃত্যু-সর্পের ভয়ে মানুষ পালায়। *সর্বান্ লোকান্,* 'এই মর্ত্যলোকের সর্বত্র, এমনকি উর্ধ্ব উর্ধ্বলোকেও'। *নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ,* কিন্তু 'কোথাও সে নিরাপত্তা ও শান্তি পায় না।' *ত্বৎ পাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়া অদ্য,* 'কিন্তু, হঠাৎ যদি সে তোমার চরণপদ্মে স্থান পায়', হে কৃষ্ণ, তখন মৃত্যু আর সেই পরিমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে না। মৃত্যু তার কাছে এলেও 'চুপচাপ পালিয়ে যায়', *মৃত্যুরস্মাদ্ অপৈতি; স্বস্থঃ শেতে,* 'সে স্বস্থ ও নির্ভয় হয়'। দেবকী বন্দনা করে বলছেন, সেই পরমপুরুষ আপনিই।

সুতরাং, এই অনন্ত আত্মাই একমাত্র স্থান যেখানে মৃত্যু পৌঁছাতে পারে না, বাকি সব কিছুই মৃত্যুর অধীন। এই কথা উপনিষদে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। *সর্বম্ অন্যৎ আর্তম্,* 'অন্য আর সব কিছুই মরণশীল, দুঃখকষ্টে পরিপূর্ণ'। একমাত্র আত্মাই কষ্ট থেকে, মৃত্যু ইত্যাদি থেকে মুক্ত। উপনিষদ বারবার বলছেন, 'যারা এই জগতে ভেদ দর্শন করে, তারা বারবার মরে; যারা এই বৈচিত্র্যের পিছনে পরম এককে দর্শন করে, কেবল তারাই অমৃতত্ব লাভ করে'। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি *মৃত্যু,* এই জগতের সব কিছু সংহার করি'।

উদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্। সমৃদ্ধি কী? যারা সমৃদ্ধ হবে, আমিই তাদের সেই উদ্ভব বা সমৃদ্ধি। কেউ একজন সৌভাগ্যের অধিকারী হতে চলেছে; সেই অভ্যুদয় বা সমৃদ্ধির কারণরূপে আমি তার পিছনে আছি। *কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।* নারীদের মধ্যে বহু সুন্দর গুণ ও মাধুর্য থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তার কয়েকটি বর্ণনা করে বলেছেন, এগুলি আমিই। সেগুলি কী? *কীর্তি,* অর্থাৎ 'সুনাম'; *শ্রী* অর্থাৎ 'সৌভাগ্য'; *বাক্,* 'মধুর কথা'; *স্মৃতিঃ,* 'স্মরণশক্তি'; *মেধা,* 'বুদ্ধি', কোনকিছুকে সহজে উপলব্ধি করার ক্ষমতা; *ধৃতিঃ,* 'প্রগাঢ় সহিষ্ণুতা'; *ক্ষমা,* 'ধৈর্য'। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, নারীদের এই যে সব গুণ তা আমিই।

ঈশ্বর যে শুধু সবকিছুকে ছাপিয়ে আছেন, বাইরে আছেন, তা নয়, তিনি সবকিছুর ভিতরেও আছেন—এইটিই বর্তমান এবং পরবর্তী অধ্যায়ের মূলভাব।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

—'সামগুলির মধ্যে আমি বৃহৎসাম; ছন্দসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী; মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ; ঋতুর মধ্যে আমি পুষ্পময় বসন্ত।'

বৃহৎসাম তথা সাম্নাম্, 'সামগান অর্থাৎ সামবেদের গানগুলির মধ্যে আমি হলাম *বৃহৎসাম',* যেটি সামবেদের একটি অঙ্গ। *গায়ত্রী ছন্দসাম্ অহম্,* 'বৈদিক এবং কাব্যিক ছন্দসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী'। গায়ত্রী বেদের বহুল ব্যবহৃত ছন্দ। *ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ* — এই যে তিন পংক্তির কবিতা, তাকে গায়ত্রী ছন্দ বলা হয়। সংস্কৃত ভাষায়, ইংরেজি ভাষায়, বস্তুত সব ভাষাতেই নানারকম ছন্দ আছে। গায়ত্রীও সেইরকম এক বৈদিক ছন্দ, যার চল আজ আর বেশি দেখা যায় না। এরপর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং,* 'বারোটি মাসের মধ্যে আমি *মার্গশীর্ষ,* অর্থাৎ ডিসেম্বর-জানুয়ারি বা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত। এটিকে অগ্রহায়ণ মাসও বলা হয়। মহাভারতের যুগে বছর শুরু হতো *মার্গশীর্ষ* অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস থেকে। অগ্রহায়ণ মানে বছরের শুরু। আজও ভারতবর্ষে এটিকে অত্যন্ত পবিত্র মাস মনে করা হয়। *ঋতূনাং কুসুমাকরঃ,* 'ঋতুর মধ্যে আমি বসন্ত।' এখানে *কুসুমাকরঃ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ সেই ঋতু, যখন ফুলের শোভায় প্রকৃতি অপরূপ হয়ে ওঠে। *কুসুম* হলো ফুল। শীতে প্রকৃতি যেন ম্রিয়মান হয়ে যায়। বসন্তে আবার সেই প্রকৃতিই সৌন্দর্য এবং রমণীয়তায় পুষ্পিত হয়ে ওঠে। এই কারণেই বিভিন্ন কাব্যে বসন্তের এত প্রশংসা। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, ঋতুর মধ্যে আমি *কুসুমাকরঃ,* সংস্কৃতে যাকে বসন্ত বলা হয়।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥

—'প্রতারণাকারীদের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়া; আমি তেজস্বীদের তেজ; আমি জয়; আমি উদ্যম; সাত্ত্বিকদের সত্ত্বগুণ, সেও আমি।'

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। *দ্যূতং ছলয়তাম্ অস্মি,* 'আমি হলাম দ্যূতক্রীড়া', বা পাশা খেলা। এটি একধরনের জুয়া খেলা। মহাভারতে আপনারা দেখেছেন, পাশা খেলায় শকুনি কী ছলনাই না করেছিল! শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন—আমি হলাম জুয়াড়িদের জুয়া, ছলনাকারীদের ছলনা। অনেক মানুষ, বিশেষত যাঁরা একেশ্বরবাদী এবং ঈশ্বরের সর্বাত্মকতার কথা চিন্তা করতে পারেন না, তাঁরা এসব ভাব সমর্থন করতে পারেন না। তাঁদের বিশ্বাস, ঈশ্বর এই জগৎ থেকে ভিন্ন। কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষে, ঈশ্বর জগৎ থেকে

পৃথক কোন সত্তা নন। ঈশ্বর থেকেই এই জগতের আবির্ভাব। কাজেই ভারতীয় চিন্তায় অলৌকিক বলে কিছু নেই। এখানে যা কিছু ঘটে, সবই ঈশ্বরের এক একটি প্রকাশ। সূর্যের দৃষ্টান্তটি আমার খুবই পছন্দ। তাই বারবার বলি যে, এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুতেই সৌরশক্তি ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। ভালমন্দ, এমনকি ধূলিকণাটুকুও সেই সৌরশক্তি। তাই, সর্বাত্মক দর্শনে কেবল ভালোটুকুকেই গ্রহণ করলে চলবে না, মন্দকেও একই সত্তার অভিব্যক্তি বলে ধরতে হবে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হচ্ছে, *দ্যূতং ছলয়তাম্ অস্মি।* আবার, *তেজঃ তেজস্বিনাম্ অহম্,* 'যাঁরা তেজস্বী, আমি তাঁদের তেজ।' *জয়োঽস্মি,* বিজয়ীদের 'জয় আমি'; *ব্যবসায়োঽস্মি,* 'অধ্যাবসায়ীদের দৃঢ়সংকল্পযুক্ত উদ্যম', সেও আমি; *সত্ত্বং সত্ত্ববতাম্ অহম্,* 'যাঁরা শান্ত এবং স্থির, সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন, তাঁদের মধ্যে আমি সত্ত্বগুণস্বরূপ।' সত্ত্বগুণ মানুষকে শান্ত করে, মানসিক সমতা দেয়। মনের তিনটি অবস্থা—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

—'বৃষ্ণিগণের মধ্যে আমি বাসুদেব; পাণ্ডবদের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়; এবং মুনিদের মধ্যে আমি ব্যাস; কবিদের মধ্যে আমি ঋষি উশনা।'

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি, 'বৃষ্ণিবংশীয়দের, অর্থাৎ যাদবদের মধ্যে আমি কৃষ্ণ বা বাসুদেব'। এখানে তিনি নিজের ব্যবহারিক পরিচয় দিচ্ছেন। স্বরূপত তিনি জগদীশ্বর হয়েও, এখানে বলছেন, যাদবদের মধ্যে আমিই সেই কৃষ্ণ। বাসুদেব কেন? বসুদেবের পুত্র বলে। *পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ,* 'পাণ্ডবদের মধ্যে আমি অর্জুন।' অর্জুন তাঁর সামনেই উপস্থিত। *মুনীনাম্ অপ্যহং ব্যাসঃ,* 'মুনিদের মধ্যে আমি ব্যাস', যাঁর অত্যুজ্জ্বল চিন্তা ও মননশীলতা ভারতীয় সংস্কৃতিকে অসামান্যভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তিনিই মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণ রচনা করেছেন। *কবীনাম্ উশনা কবিঃ,* 'কবিদের মধ্যে আমি প্রাচীন বৈদিক কবি উশনা'।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

—'দণ্ডবিধানকারীদের মধ্যে আমি রাজদণ্ড; আমি বিজয়াভিলাষীদের নীতি; এবং গুহ্য বিষয়গুলির মধ্যে আমি মৌনতা; জ্ঞানীদের জ্ঞানও আমিই।'

দণ্ডো দময়তামস্মি, 'রাজনৈতিক জীবনে যে সব শক্তি মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখে, তাদের মধ্যে আমি হলাম দণ্ড, শাস্তিবিধানের নীতি।' *দণ্ড* মানে 'লাঠি'। দণ্ড হাতে থাকলেই যে আপনাকে আঘাত করতে হবে, তা নয়। কিন্তু দণ্ড থাকলে তবেই সমাজের শৃঙ্খলা বজায় থাকে। সুতরাং এ হলো আইন এবং আইন বলবৎকারী রাজনৈতিক প্রশাসনের ধারণা। এ যেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গদা। ওটিই প্রতীক। এই গদা যে কারও মাথা ফাটায় তা নয়, কিন্তু কর্তৃত্বের এই দণ্ডনীতি মানুষকে তার জীবনের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দেয়; যখনই জীবনের সাবলীলতা ব্যাহত হয়, তখনই এই দণ্ডের শক্তি কাজ করে। সমাজে আইন-শৃঙ্খলা বহাল রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন এই যে পরিকাঠামো তাকেই রাজনীতির ভাষায় রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলে। বস্তুত, রাষ্ট্রীয় দর্শনকে বা রাষ্ট্র-তত্ত্বকে সংস্কৃতে *দণ্ডনীতি* বলে। দণ্ড-বিজ্ঞান—*দণ্ড* মানে শাস্তি, শাস্তিদেবার জন্য একটা বড়সড় লাঠি। শুধু এই দণ্ডের ভয়েই সাধারণ মানুষ ঠিক পথে চলে। শতকরা ৯৯ জন মানুষের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। শুধু যাঁরা নীতিবান ও উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রকৃতিসম্পন্ন, তাঁদের কোন বাহ্য অনুশাসনের প্রয়োজন হয় না। তাঁরা আত্মসংযত; ফলে ভুলপথে তাঁরা কখনওই পা বাড়ান না। তাঁরা কখনও অন্যের ক্ষতি করেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অন্য রকম। আইন-শৃঙ্খলা না থাকলে, তারা একে অন্যের ক্ষতি করে নিজের নিজের স্বার্থ সাধন করতে সচেষ্ট হবে। তাই, রাষ্ট্রের প্রয়োজন। প্রয়োজন আইন ও নিয়ন্ত্রণের। জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) যা বলেছেন, বাস্তবজীবনে তা অতি সত্য। তিনি বলেছেন : 'পুলিশ এবং লোকনিন্দার ভয়েই মানুষ নীতি মেনে চলে, স্বেচ্ছায় নয়।' এই দুটিকে সরিয়ে নিন, দেখবেন সমাজের অধিকাংশ মানুষই পরস্পরের গলা কাটবে। তাই ভগবান বলছেন, *দণ্ডো দময়তাম্ অস্মি।* আমি রাষ্ট্রের সেই রাজনৈতিক ক্ষমতাবোধ, যা সমগ্র সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে; *দময়তাম্,* যা সমগ্র সমাজকে 'সুশৃঙ্খল করে।'

নীতিরস্মি জিগীষতাম্, 'যাঁরা জয়ের অভিলাষী, আমি তাঁদের ন্যায়নীতি'। একথা বলার কারণ, প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, একমাত্র ন্যায়েরই জয় হয়। অন্যায় সাময়িকভাবে জয়ী হতে পারে, কিন্তু যথার্থ জয় একমাত্র ধর্মের পথেই, ন্যায়ের পথেই এসে থাকে। তাই এখানে বলা হয়েছে, *নীতিরস্মি জিগীষতাম্,* যাঁরা জয় লাভ করেন, তাঁদের সে বিজয় ধর্ম বা ন্যায়পরায়ণতার পথ অনুসরণ করার জন্যই। সব দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মানুষই এই কথা বিশ্বাস করেন, যদিও প্রায়শ জগতে ঠিক এর বিপরীতটাই ঘটতে দেখা যায়। অন্যায় কখনো কখনো জয়ী

হয়। কিন্তু তা সাময়িক। আমাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি হলো এই সত্য বোঝা যে, *যতো ধর্মঃ ততো জয়ঃ*, 'যেখানে ধর্ম, সেখানে বিজয়'। এ কথাটি মহাভারতে আছে। *মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাম্।* এটি আর একটি অপরূপ চিন্তা। বলা হচ্ছে, 'সকল রহস্যের মধ্যে আমি মৌনভাব', অর্থাৎ নীরবতা। পরম সত্যকে উপনিষদে নীরবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কথায় প্রকাশ করতে গেলে, সত্যকে সংকুচিত করতে হয়, তার যথার্থ অবস্থান থেকে তাকে নামিয়ে আনতে হয়। অনন্তকে ভাষার সীমা ও বাঁধাধরা ছকে ধরবার চেষ্টা করলেও, তা আপনার নাগালের বাইরেই থেকে যাবে । একমাত্র নীরবতার মাধ্যমেই সেই পরম সত্যের স্বরূপকে আপনি যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারেন। অতএব, সর্বোত্তম রহস্য হলো নীরবতা। উপনিষদগুলিতে বলা হয়েছে, *শান্তোঽয়ম্ আত্মা*, 'এই আত্মা বিশুদ্ধ নীরবতা। একটি গল্পে আছে, এক শিষ্য আচার্যের কাছে গিয়ে বললেন— আপনি কি কৃপা করে আমাকে পরম তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন? আচার্য মৌন রইলেন। শিষ্য দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও একই প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আচার্য নীরব। এরপর যখন শিষ্য বললেন, 'আমি তিন তিনবার একই প্রশ্ন করছি, তবু আপনি উত্তরই দিচ্ছেন না। এর কারণ কী?' তখন আচার্য বললেন, 'আমি সর্বক্ষণ তোমার প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছিলাম। তুমি বুঝতে পারনি। আত্মা মৌন, প্রশান্ত, *শান্তোঽয়ম্ আত্মা।*' উপনিষদের এ এক মহান ভাব। বাস্তবিক, কোন কিছুকে প্রকাশ করতে হলেই তাকে বাক্য ও মনের গণ্ডির মধ্যে আনতে হয়। তাতে সত্য সীমিত হয়ে যায়। তাই, যে তত্ত্ব বাক্য ও মনের অতীত, তাকে আপনি কখনওই পূর্ণত ব্যক্ত করতে পারেন না। তিনি কেবল 'বিশুদ্ধ সত্তা'-রূপে আছেন। এই হলো উপনিষদ-এর ঘোষণা। তবু ভাবের আদানপ্রদান করতে গেলে ভাষার প্রয়োজন হয়। আমরা ভাষা ব্যবহারও করি, তবে একথা জেনে যে, ভাষা বা চিন্তা কেবল সত্যের আভাসটুকুই দিতে পারে। কথা বা চিন্তা দিয়ে পরম সত্যকে ধরা যায় না। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—*যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,* 'সেই সত্য যাকে আয়ত্ত করতে না পেরে বাক্য এবং মন ফিরে আসে'। এই কারণেই মন যখন খুব বিকশিত হয়, কথা কমে আসে। বৌদ্ধিক প্রকাশও ক্রমশ কমে যায়। উপলব্ধিই তখন প্রধান হয়ে ওঠে। জীবনের শুরুতে আমরা প্রচুর কথা বলি। সর্বদাই বকবক করি। কিন্তু যতই সেই পরম সত্যের দিকে আমরা এগিয়ে যাব, ততই আমাদের কথা কমে আসবে; যুক্তিতর্কের ভাব কমে আসবে। তখন শুধু বিশুদ্ধ উপলব্ধি—নীরবতা।

মৌমাছির তুলনা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এই অবস্থাটিকে বুঝিয়েছেন। তিনি

বলেছেন, যতক্ষণ সে ফুলের ওপর ওড়াওড়ি করে, ততক্ষণ সে গুনগুন করে। তার গুনগুনানি আর থামে না। কিন্তু ফুলের ওপর বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলেই তার গুঞ্জন বন্ধ হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। শুরুতে কথা, তর্ক অনেক চলতে পারে, কিন্তু যতই মানুষ সত্যের কাছাকাছি যেতে থাকে ততই ওসব কমে যায় এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হলে সেগুলি একেবারেই তিরোহিত হয়। কাজেই, মৌনতার অসাধারণ মূল্য এবং আমি মনে করি, সর্বত্রই অতীন্দ্রিয় জীবনের উচ্চতর স্তরে এই মৌনতা বেশি করে চোখে পড়ে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'সকল গুহ্য বিষয়ের মধ্যে আমি মৌনতা'। *মৌনম্* বা মৌনতার যথার্থ অর্থ হলো মুখ বন্ধ থাকবে, এমনকি ভাবনাও স্তব্ধ হয়ে আসবে। এই ভাবটিকে উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ চমৎকার ভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন :

> ... সেই শান্ত এবং সমাহিত ভাবে
> মৃদুতায় প্রীতি যেথা নিয়ে যাবে,—
> যতক্ষণ শরীর-খাঁচায় শ্বাস রুদ্ধ না হয়,
> এমনকি রক্ত প্রবাহও প্রায় থেমে যায়,
> শরীরে ঘুমিয়ে পড়ি,
> জেগে উঠি জীবন্ত আত্মায় :

অতএব, কথা ও চিন্তার সৌন্দর্য আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এগুলি ব্যবহারিক জগতে কাজে লাগে। কোন কিছুর নাম দিতে গেলে বা বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে হলে এগুলির খুবই প্রয়োজন। এদের বলা হয় প্রত্যক্ষ বিষয় এবং ধারণা। কোন দৃশ্যমান বস্তু হলো প্রত্যক্ষ বিষয় এবং সে সম্পর্কে চিন্তা হলো ধারণা। বাইরের জগতের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলেই কেবল এগুলির প্রয়োজন। কিন্তু যখন আপনার কাজ আত্মাকে নিয়ে, তখন এগুলি সব খসে পড়ে, অবান্তর হয়ে যায়। তাহলেও, আত্মাকে জানার জন্য এই বাক্য এবং চিন্তার সাহায্য আমাদের নিতেই হবে, তবে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে; শুধু শব্দ নিয়ে মাতামাতি করবেন না। শব্দ এখানে তুচ্ছ। যিশু যখন বলছেন, 'অক্ষরই সর্বনাশ করে', তখন তিনি বলতে চেয়েছেন, 'অক্ষর হত্যা করে, ভাব জীবন দেয়'। অতএব, অক্ষর বা ধারণা, দুটির কোনটার ওপরই নির্ভর করবেন না, দুটিকেই অতিক্রম করে যান। একেই সত্যোপলব্ধি, তত্ত্বানুভূতি বা ঈশ্বরানুভূতি বলে। এই হলো যথার্থ ধর্মজীবন।

জ্ঞানং জ্ঞানবতাম্ অহম্, 'যাঁরা জ্ঞান লাভ করেছেন, আমি সেই জ্ঞানীদের জ্ঞান।' জ্ঞান মানে এখানে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আমাদের স্বরূপ জ্ঞান। এই জ্ঞান যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমিই সেই জ্ঞান।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥

—'হে অর্জুন, সকল ভূতের যা বীজস্বরূপ, তাও আমি-ই। চর বা অচর, এমন কোন বস্তু নেই, আমাকে ছাড়া যার অস্তিত্ব থাকতে পারে।'

'হে অর্জুন', *যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহম্,* 'এই জগতের সকল বস্তুর মধ্যে বীজরূপে আমিই আছি, যে আমি পরম সত্তা।' শ্রীকৃষ্ণ এখানে নিজেকে সেই বিশুদ্ধ চৈতন্য, অনন্ত এবং অদ্বয় পরম ব্রহ্মরূপ চরম সত্যের সঙ্গে অভেদ জ্ঞান করে কথা বলছেন। এই জগতে যা কিছু আছে, তার উৎপত্তি সেই বিশুদ্ধ চৈতন্য পরম ব্রহ্ম থেকে। অতএব আমিই জগতের সবকিছুর বীজ বা কারণ; আমিই সেই; আমিই সেই; আমিই সেই। *ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ ময়া ভূতং চরাচরম্,* 'এই জগতে চর বা অচর এমন কিছুই নেই, আমাকে ছাড়া যার অস্তিত্ব সম্ভব হতে পারে'। এই জগতের যে কোন বস্তু থেকে আমার অস্তিত্ব মুছে দাও—দেখবে তার আর অস্তিত্ব থাকবে না। তার থাকা না-থাকা আমার ওপরই নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ শূন্যের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, কুড়িহাজার শূন্য পাশাপাশি বসালেও তার কোন মূল্য নেই, যদি না তাদের আগে একটি '১' বসানো হয়। প্রথমে '১' থাকলে তবেই প্রতিটি শূন্যের মূল্য। এই '১' হলো ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। এই জগতের সব পরিবর্তনশীল বস্তুর মধ্যে যে এক অদ্বিতীয় বস্তু রয়েছে, সেটিই একমাত্র সত্য। সেই এক, অদ্বিতীয়, অনন্ত, অবিনাশী সত্তা সবকিছুকে সত্য করে তোলে। তাঁকে সরিয়ে নিলে সবকিছুই মিথ্যা হয়ে যায়।

শঙ্করাচার্য তাঁর উপনিষদের ভাষ্যে এর উল্লেখ করে বলেছেন, *তদাত্মনা বিনির্মুক্তিঃ জগৎ অসৎ সম্পদ্যতে,* 'এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে আত্মাকে সরিয়ে নিলে এই ব্রহ্মাণ্ড একেবারে মূল্যহীন হয়ে যাবে'। গীতাও সেই একই কথা বলছে। 'বহু'র পিছনে 'এক'কে রাখলে, তবেই 'বহু'র মূল্য। না হলে তাদের কোন মূল্যই নেই। এটিই আধ্যাত্মিক অনুভূতি, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। কাজেই, এ অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যে, যা কিছু সত্য, তাই ব্রহ্ম। বেদান্ত মতে, এই ব্রহ্মাণ্ডের

সবকিছু পাঁচটি উপাদানে তৈরি। পাঁচটি উপাদান কী কী? প্রথম তিনটি হলো—সৎ, চিৎ, আনন্দ। 'সত্য বা সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ'। এই তিনটি ছাড়া আরও দুটি আছে, নাম এবং রূপ। জগতের সব কিছুই সৎ, চিৎ, আনন্দ, নাম এবং রূপ—এই পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। নাম এবং রূপের কারণেই বস্তুতে বস্তুতে ভেদ। কিন্তু আসলে সবই সৎ-চিৎ-আনন্দ। এই সৎ-চিৎ-আনন্দ অংশটিই ব্রহ্ম। নাম-রূপ অংশ হলো এই জগৎ। এই জগৎ স্বরূপত সৎ-চিৎ-আনন্দ, বৈচিত্র্য যা কিছু, তা কেবল নাম এবং রূপের জন্য। যেমন সমুদ্র। সমুদ্র এক অবিচ্ছিন্ন জলরাশি হলেও তাতে ঢেউ ওঠে। বস্তুত ঢেউটি কী? সমুদ্র এবং তার সঙ্গে একটি নাম এবং একটি রূপ। তাকেই আমরা ঢেউ বলি। ঢেউ-এরই বর্ণনা হয়। সমুদ্রকে বর্ণনা করা যায় না। বড় জোর বলতে পারেন—অনন্ত সমুদ্র। কিন্তু যখনই সমুদ্র একটি আকার পায়, তখনই আপনি তার নাম দিতে পারেন, তাকে বর্ণনা করতে পারেন। এই হলো নাম-রূপ। একটি সোনার গহনার কথাই ধরুন। গহনা বস্তুটি কী? মূলত সোনা, তার সাথে একটি বিশেষ নাম ও একটি বিশেষ রূপ, এই তো? তাকে আপনি বালা-ই বলুন বা হার-ই বলুন, আসলে তা হলো নাম ও রূপযুক্ত কিছুটা সোনা। সেইরকম বেদান্তও বলে যে, নাম ও রূপযুক্ত ব্রহ্ম বা আত্মাই হলো এই জগৎ। নাম এবং রূপ বাদ দিলে কী থাকে? শুধুই ব্রহ্ম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই বৈদান্তিক ভাব কিছু কিছু পাশ্চাত্য কবিকে প্রভাবিত করেছিল। তাই দেখি শেলীর মতো একজন ব্রিটিশ কবি তাঁর 'Adonais' নামক কবিতায় (যেটি John Keats-এর মৃত্যুতে রচিত শোকগাথা) এই সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন : ' "বহু"র পরিবর্তন ঘটে, নাশও হয়, কিন্তু "এক" অপরিবর্তিত থাকে।' অতএব, বহুর পিছনে আমাদের স্থাপন করতে হবে সেই একককে। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে এই সত্যটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, *ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বম্। ইদং সর্বম্*, 'এই সমগ্র ব্যক্ত বিশ্ব' সেই অনন্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।

আধুনিক নভোবস্তুবিদ্যায় যাকে প্রাক্‌সৃষ্টি পর্যায়ের আদি পদার্থ বলে, যা বিস্ফোরিত হয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে, তাকেই বেদান্ত এক এবং অদ্বিতীয় অনন্ত বিশুদ্ধ চৈতন্য বলে। সেই আদি বস্তুটিই বিস্ফোরিত হয়ে এই জগতের রূপ নিয়েছে। কাজেই এই পরম চৈতন্য প্রকৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে এবং জীবের, বিশেষত মানুষের মধ্যে তা বেশি করে প্রকাশিত। মানুষ নিজের ও অন্যের মধ্যে এই সত্যকে আবিষ্কারও করতে পারে। 'ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে'—এই ধারণাটি পরবর্তিকালে এসেছে শ্রীমদ্ভাগবতের

একটি শ্লোকে। সেখানে আছে যে, একটি হাতিকে কুমীরে ধরায় সে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করছিল। ফলে, যে জলাশয়ে সে পড়েছিল, সেখান থেকে একটি পদ্ম তুলে সে ঈশ্বরকে নিবেদন করে তাঁর মহিমা কীর্তন করতে লাগলো। ভগবানও আবির্ভূত হয়ে হাতিটিকে রক্ষা করলেন। এই হলো ভাগবতের *গজেন্দ্রমোক্ষ* উপাখ্যান। কাম্বোডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় এই পৌরাণিক কাহিনীর চমৎকার চিত্ররূপ আমি দেখেছি। সে যাই হোক, উপাখ্যানে আছে, গজেন্দ্র ঈশ্বরের বন্দনা করছে এই বলে ঃ

যস্মিন্ ইদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাৎ চ পরঃ তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥

ভাগবতের এটি এক বিখ্যাত শ্লোক (৮.৩.৩)। গজেন্দ্র এই স্তবে বলছেন ঃ 'হে স্বয়ম্ভূ সত্তা, আমি আপনার শরণাগত', *তং প্রপদ্যে স্বয়ংভুবম্*। এই হলো প্রথম বর্ণনা। তারপর এই সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। *যস্মিন্ ইদম্*, 'এই ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মধ্যে অবস্থিত'; *যতশ্চেদম্*, 'যাঁর থেকে এই ব্রহ্মাণ্ড এসেছে'; *যেন ইদম্*, 'যাঁর দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে'; *য ইদং স্বয়ম্*, 'যিনি স্বয়ং এই ব্রহ্মাণ্ড'। তারপর বলা হয়েছে, *যো অস্মাৎ পরস্মাৎ চ পরঃ*, 'যিনি আবার এই ব্রহ্মাণ্ডেরও অতীত'; *তং প্রপদ্যে*, 'আমি তাঁর শরণ নিচ্ছি'। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে বেদান্তের চরম তত্ত্বটি বলা হয়েছে। এখানে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, 'এই জগতের চর এবং অচর সমস্ত কিছুর প্রাণবস্তু, কেন্দ্রবিন্দু আমি। আমাকে বাদ দিলে তাদের আর সত্তা থাকে না।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৪০॥

—'হে পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নেই; আমার দিব্য বিভূতি সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি তোমাকে দিলাম।'

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ, 'হে অর্জুন, আমার দিব্যপ্রকাশ বা বিভূতির কোন অন্ত নেই।' এর কোন শেষ নেই। এই প্রকাশ অনন্ত। *এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া*, 'এই জগৎরূপে ঈশ্বরের যে অনন্ত বিভূতি প্রকাশিত আছে, তার মাত্র কয়েকটি নমুনা আমি তোমাকে দিলাম।'

এরপর আসছে গীতার একটি অতি মহৎ উক্তি, যা ভারতবাসীকে, যে কোন দেশের, যে কোন সম্প্রদায়ের, যে কোন ধর্মের, এক কথায়, যেখানেই

মহত্ত্বের প্রকাশ, তার সামনে নত হতে শিখিয়েছে। মহত্ত্ব দেখলেই আমরা প্রণত হই। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি এসেছে নিচের শ্লোক থেকে, যেখানে বলা হয়েছে ঃ

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥

—'যা কিছু মহৎ, শ্রীযুক্ত অথবা বলশালী, তাকে তুমি আমারই দিব্য শক্তির অংশসম্ভূত বলে জেনো।'

সুন্দর শ্লোক। যেখানেই আপনি দেখবেন, *বিভূতিমৎ*, 'প্রকাশের এক প্রচণ্ড শক্তি বিরাজ করছে'; *সত্ত্বম্*, 'বিশুদ্ধ তেজ বা শক্তি'; *শ্রীমৎ*, 'সৌভাগ্য'; *ঊর্জিতম্ এব বা*, 'অথবা প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন'। যেখানেই আপনি এইরকম শক্তির প্রকাশ দেখবেন, মহৎকর্মের দ্বারা, মহৎ চিন্তার দ্বারা মানবজাতির উন্নতিবিধানের চেষ্টা দেখবেন, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'জেনো, সেখানে আমারই বিভূতির একাংশ অভিব্যক্ত হয়েছে', তৎ তৎ *এব অবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্।* একথা মনে করো না যে আমি তোমার থেকে বহু দূরে রয়েছি। যেসব ধর্ম মতে—যেমন একেশ্বরবাদে ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ড-বহির্ভূত বিষয়সমূহের অন্তর্গত একটি বিষয় বলে মনে করা হয়, সেখানে [বেদান্তের] এই ভাব কখনওই আসতে পারে না। ঈশ্বরীয় সত্তা অনন্ত, সর্বব্যাপী, প্রত্যেকের মধ্যে বিরাজমান—কারও মধ্যে প্রকাশ বেশি, কারও মধ্যে কম, এই যা। যিশুর অসাধারণ পবিত্র, শুদ্ধ জীবন এবং কল্যাণচিকীর্ষু ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে-কোন ভারতীয় ঈশ্বরের বিভূতিকে প্রত্যক্ষ করে তক্ষুনি তাঁকে প্রণতি জানাবেন। কেবল যিশু কেন, আমেরিকান রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন-কেও আমরা শ্রদ্ধা করি। কারণ আমেরিকায় নিগ্রো দাসত্বের অবসান ঘটাতে তিনি অনেক অসাধারণ কাজ করেছিলেন। তাঁর সেই মহৎ কর্মের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের স্পর্শ প্রত্যক্ষ করি। সমগ্র জগতের মহৎ মানুষের প্রতিই আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি। মানবজাতির উন্নতি-বিধানকারী এই মহৎ শক্তির প্রকাশ যেখানেই ঘটুক না কেন, তাকে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা আমরা পেয়েছি—কারণ এই শিক্ষা আমাদের ঐতিহ্যের অঙ্গ। *মম তেজোঽংশসম্ভবম্*, 'সেখানে আমারই দিব্যশক্তির একটি দিক প্রকাশিত হয়েছে'। এই পরম সত্যের ধারণা এবং তার বিশ্বজনীন প্রকাশের যে ভাব—এই উভয়ের গুরুত্ব এখানেই। এই বিষয়ে একজন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নকর্তা সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না; তিনি ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'মশাই, ঈশ্বরের মধ্যে কি কোন পক্ষপাতিত্ব আছে যে, তিনি কারও মধ্যে বেশি, আবার কারও মধ্যে কম

প্রকাশিত?' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, এই জগৎ ঈশ্বরের প্রকাশ বটে, তবে তাঁর এই প্রকাশের মাত্রায় তারতম্য আছে। কারও মধ্যে তাঁর প্রকাশ বেশি, আবার কারও মধ্যে তাঁর প্রকাশ কম'। তখন বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করেন, 'তাহলে কী ঈশ্বর পক্ষপাতদুষ্ট?' শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করেন, 'পক্ষপাতদুষ্ট বলতে তুমি কী বলতে চাইছো? তোমাকে আমি কেন দেখতে এসেছি? এসেছি এই জন্য যে, অন্য পাঁচজনের চেয়ে তোমার মধ্যে আমি তাঁর অধিক প্রকাশ দেখেছি। তোমাকে আরও অনেকে দেখতে আসে এবং তোমাকে সম্মান করে। সে কি তোমার দুটো শিং বেরিয়েছে বলে? তুমি একজন মহৎ চরিত্রের মানুষ, তোমার বুদ্ধি পরিষ্কার, তোমার হৃদয় করুণায় পূর্ণ। কাজেই, অন্য পাঁচজনের চেয়ে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ তোমার মধ্যেই বেশি। তাই তো আমরা তোমাকে দেখতে আসি।' এ তো আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। এর মধ্যে পক্ষপাতিত্ব বা অন্য কিছু নেই। আপনার জীবন ও চরিত্রের মাধ্যমে আপনি আরো বেশি ঈশ্বরীয় শক্তির প্রকাশ ঘটান না কেন, কে আপনাকে বাধা দিচ্ছে? মানুষের শরীরটাই দেখুন না। শরীরের চামড়া আলো বিকিরণ করতে পারে না, কিন্তু চোখ পারে। একই চামড়া, অথচ তা থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়। এই হলো দুটির মধ্যে পার্থক্য। অতএব, ঈশ্বরের বিভূতির এই তারতম্যের পিছনে রয়েছে প্রকাশের মাত্রার তারতম্য, কারও মধ্যে বেশি এবং কারও মধ্যে কম। এই কারণেই জগৎ জগৎ। যদি সব একই ছাঁচে গড়া হতো, তাহলে এই জগৎ জগৎ থাকতো না। বৈচিত্র্য আছে বলেই জগৎকে এতো বাস্তব মনে হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে জগতে ঈশ্বরের দিব্যপ্রকাশের এই অসাধারণ তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। জগৎ 'স্বরূপত ব্রহ্ম', *ঈশাবাস্যম্*। আমাদের চোখে অবশ্য এই সত্য ধরা পড়ে না। কিন্তু মন শুদ্ধ হলে, জগতের গভীরে প্রবেশ করে বহুর পিছনে সেই পরম এককে আবিষ্কার করা সম্ভব। তখন নিজের মধ্যে যেমন আপনি এই সত্য অনুভব করবেন, তেমনি বাইরের জগতের দিকে তাকিয়েও আপনি সেই একম্ অদ্বিতীয়ম্ সত্তাকেই দেখবেন; দেখবেন, ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশিত রয়েছেন। কঠ উপনিষদের একটি কি দুটি সুন্দর শ্লোকে এই সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। কলকাতার বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার করেছিলেন। প্রথমে তিনি বেতারতরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন—তিনিই সর্বপ্রথম কলকাতায় তাঁর নিজস্ব গবেষণাগারে বেতার তরঙ্গ আবিষ্কার করেন। এরপর তিনি উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং লজ্জাবতী লতার (Mimosa pudica) ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেন যে

এই গাছেরও অনুভূতি আছে। পরে তিনি সাধারণ ধাতু নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন যে, ধাতুরও অনুভূতি আছে। ধাতুও সাড়া দেয়। এরপরই তিনি প্রকৃতির মধ্যে নিহিত ঐক্যের তত্ত্বটি বিজ্ঞানজগতের সামনে তুলে ধরেন এবং বলেন, কেবল সজীব প্রাণীদেরই সংবেদনশীলতা আছে তা নয়, যাদের অচেতন বলা হয়, তাদেরও আছে। তাঁর নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির সাহায্যেই তিনি বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঘটনাকে লক্ষলক্ষগুণ বড় করে দেখতে পারতেন। পরে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে রয়াল সোসাইটি অফ ইংল্যান্ড (Royal Society of England) এবং আরও কয়েকটি স্থানে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সামনে বক্তৃতা দেন। হাতে-কলমে তাঁর আবিষ্কৃত সত্যকে প্রমাণ করেও দেখান তিনি। কেউ কেউ তাঁকে অবিশ্বাস করলেও, অনেকেই তাঁর চমৎকার প্রদর্শনী দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। সেই সময়কার দ্য টাইম্স (The Times) পত্রিকা এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে লিখেছিল, 'আমরা পাশ্চাত্যের মানুষ যখন এই জগতের বৈচিত্র্যের ভিড়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছি, তখন প্রাচ্য ঋষি বৈচিত্র্যের পারে গিয়ে বহুর পিছনে যে এক অপরিবর্তনীয় সত্য রয়েছে, তা আবিষ্কার করেছেন।' জগদীশচন্দ্র নিজে তাঁর প্রদর্শনীর শেষে যা বলেছিলেন, তা হলো ঃ

'যখন আমি চেতন ও অচেতন বস্তুর ঐকাত্ম্যক সম্পর্কটি সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করি, তখন গঙ্গাতীরে আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের অনুভূত বৈদিক ঘোষণার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। তাঁরা এই সত্য ঘোষণা করেছিলেন ঃ "যিনি বহুর মধ্যে একককে দেখেন, তিনিই শাশ্বত শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হন; অন্য কেউ নয়, অন্য কেউ নয়।" '

এটি কঠ উপনিষদের একটি শ্লোক। আমরা কেবল বৈচিত্র্যই দেখি, বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে তাদের মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে, তা আমরা দেখতে পাই না। অথচ জ্ঞানের উদ্দেশ্যই হলো বহুর বাইরের আবরণটি সরিয়ে ভিতরের ঐক্যটিকে দেখা। প্রত্যেক বিজ্ঞানের লক্ষ্যই তাই। পদার্থবিদ্যা আজ 'ফিল্ড থিয়োরী' দিয়ে সমগ্র প্রকৃতিকে এক করার চেষ্টা করছে। পার্থক্য দেখামাত্রই মনে প্রশ্ন ওঠে, 'এই পার্থক্য কি সত্য? এ কি সত্য যে এইসব ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা? এই বৈচিত্র্যের পিছনে নিশ্চয় কোন ঐক্য লুকিয়ে আছে।' যেমন জীবনবিজ্ঞান আজ আমাদের বলছে, মানুষের মধ্যে অবশ্যই জাতিগত বৈচিত্র্য আছে; কিন্তু প্রজাতিগত ভাবে (Homo sapiens হিসাবে) তারা সকলেই এক। মানব প্রজাতি একটিই—দুটি নয়—যারা পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন

এবং পারস্পরিক ভাববিনিময় ক্ষমতার অধিকারী। এটি আধুনিক জীববিজ্ঞানের আবিষ্কার। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলিতেও এই বোধোদয় ঘটছে। কিন্তু বেদান্ত সেই কোন্ সুদূর অতীতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার করে সর্বাত্মক মিলনের সব অন্তরায় দূর করে দিয়েছে! স্বরূপত আমরা এক। আমাদের মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য থাকতে পারে, শিক্ষাগত মর্যাদার ক্ষেত্রে এবং সাংস্কৃতিক স্তরে আমাদের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক থেকে আমরা সকলেই এক। বহুযুগ আগে বেদান্ত এই ঘোষণা করে গেছে। তাই, নিচের এই শ্লোকটি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এই দশম অধ্যায় শেষ করছেন ঃ

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

—'হে অর্জুন, এই সব বৈচিত্র্যের কথা জেনে তোমার কী লাভ? আমার এক অংশ দিয়ে এই সমগ্র জগৎকে ধারণ করে আমি অবস্থিত আছি।'

ভগবান বলছেন, 'হে অর্জুন, আর বিস্তার করে বলার প্রয়োজন কী? সত্য এই যে, আমি আমার এক ক্ষুদ্র অংশ দিয়ে এই সমগ্র জগৎকে ধারণ করে আছি।' *ইদং কৃৎস্নম্,* 'এই সমগ্র বিশ্ব'; *বিষ্টভ্যাহম্,* 'আমি ধারণ করে আছি'। কীভাবে? *একাংশেন,* 'আমার এক ক্ষুদ্র অংশ দিয়ে'। এই হচ্ছে ব্যক্ত জগতের প্রকৃতি। প্রাচীন ঋগ্‌বেদের ঋষিরাও *পুরুষ সূক্ত*-এর গোড়ায় এই কথা বলেছেন ঃ *পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতম্ দিবি,* 'পরম ব্রহ্মের এক চতুর্থাংশমাত্র এই জগৎরূপে প্রকাশিত; অবশিষ্ট তিনভাগ অব্যক্ত এবং অবিনশ্বর।' অর্থাৎ বহুরূপে প্রকাশিত এই ব্রহ্মাণ্ড সেই ঐশী শক্তির সামান্য একটু অংশ থেকে উদ্ভূত। ঐ পুরুষ সূক্তেই বলা হয়েছে, *এতাবান্ অস্য মহিমা,* 'এই ব্রহ্মাণ্ডে আমরা যা দেখি, এ তাঁরই মহিমা'; কিন্তু *অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ,* 'সেই পরমাত্মা এই প্রকাশিত জগতের ঊর্ধ্বে।' তাহলে দেখা যাচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞান এবং বেদান্তের মধ্যে একটি বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে এবং তা হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাই একথা স্বীকার করে যে, পরিণামে এই বৈচিত্র্য সেই একত্বে ফিরে যাবে। বেদান্ত এবং আধুনিক বিজ্ঞান উভয়েই এই দুটি সত্য স্বীকার করে যে, এই জগৎ এসেছে সেই এক থেকে এবং সেই একেই ফিরে যাবে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, 'এই সত্য সম্পর্কে আর বেশি জানার কী প্রয়োজন?' সত্য হলো, 'আমি আমার একটি অংশের দ্বারা এই সমগ্র জগৎকে ধারণ করে আছি'। এটাই মূল ভাব।

শ্রীকৃষ্ণ আগেই বলেছেন, 'এ হলো আমার *মায়া।* যারা আমার শরণাগত হয়ে আমাতে আশ্রয় নেয়, তারা এই মায়াকে অতিক্রম করে যায়'। কোন্ মায়া? যে মায়া ভেদবোধ সৃষ্টি করে। জগতে এত যুদ্ধবিগ্রহ কেন? কেন এত অপরাধ? কেন এত হিংসা? তার উত্তর এই—ভেদবুদ্ধি। ভেদবুদ্ধি থেকেই এ সবের উৎপত্তি, এইসব কষ্টকর সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমরা যদি স্বরূপত এক, তাহলে এসব সমস্যা দেখা দেয় কী করে? কথা হচ্ছে, একত্বের সেই জ্ঞানটি তো আমাদের মধ্যে জাগ্রত হওয়া চাই। তা যদি হয়, একমাত্র তখনই পৃথিবীতে শান্তি আসবে। আমরা যে সকলে মূলত এক, এই জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। এই একত্ব আছে বলেই আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, সেবা ও কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করতে পারি। একত্বের অনুভূতি হলে আর কোন বিদ্বেষভাব আসতে পারে না। এটি উপনিষদের সিদ্ধান্ত। অতএব, এখানে এই শেষ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, 'আমি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপে নিজেকে প্রকাশ করি, তবে তা আমার একাংশের দ্বারা।'

সৌরমণ্ডলরূপে সৌরশক্তির যে প্রকাশ, তা সৌরশক্তির এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশমাত্র। অবশিষ্ট অংশটুকু সূর্যরূপেই বিদ্যমান। এইভাবে সব দৃষ্টিকোণ থেকে পরম সত্তা সম্পর্কে আমাদের ধারণাটি গড়ে উঠেছে; আমরা কখনওই জগৎ ও ঈশ্বরকে আলাদা করে দেখিনি। অনন্ত ঈশ্বরই এই জগৎরূপে ব্যক্ত হয়েছেন এবং এই বিশ্বের সব কিছুর মধ্যেই সেই দিব্য স্ফুলিঙ্গ জ্বলজ্বল করছে। এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের মনটিকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন, দরকার আমাদের জ্ঞানার্জন-সাধনাকে পরিশীলিত করা। প্রথমে বাইরের প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে, সেখানে যে ঐক্য রয়েছে, তা বুঝতে হবে এবং তার পর মানব-সম্ভাবনা বিজ্ঞান তথা বেদান্তের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এই পৃথিবীর জীবকুলের বহুত্বের পিছনে যে একত্ব রয়েছে, তা আবিষ্কার করতে হবে। পার্থিব এবং অতি-পার্থিব, এই দুটি দিকের মানবীয় চেতনা নিয়েই বেদান্তের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান। সপ্তম অধ্যায়ে সে কথা আলোচিত হয়েছে।

যখন দেহ-বোধ চলে যায়, তখনই আমরা এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি। একথা বেদান্তে *দৃক্-দৃশ্য-বিবেক* নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আছে। দৃক্-দৃশ্য-বিবেক-এর অর্থ হলো 'দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পার্থক্য বিচার'। এতদিন পর্যন্ত জড়বিজ্ঞান কেবল দৃশ্যমান জগৎকে নিয়েই চর্চা করেছে। এখন বিজ্ঞান ক্রমশ দৃশ্যমান জগতের দ্রষ্টার দিকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছে। বেদান্ত কিন্তু দুটি দিককেই একসঙ্গে পর্যালোচনা করে নিচের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল।

দৃক্-দৃশ্য-বিবেক-এর প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে,

রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্
তৎ দৃশ্যং দৃক্তু মানসম্।
দৃশ্যাঃ ধীবৃত্তয়ঃ সাক্ষী
দৃগেব ন তু দৃশ্যতে॥

—অর্থাৎ 'রূপ হলো দৃশ্য, চোখ দ্রষ্টা; চোখ হলো দৃশ্য, মন দর্শক; মনের অন্তর্বর্তী ভাবসমূহ হলো দৃশ্য, সাক্ষী হলো নিত্যদ্রষ্টা, সে কখনওই দৃশ্য নয়।'

দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি।
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ ॥

—'আপনি (শুধু) এই পার্থিব শরীর—এই অভিমান যখন দূর হয়ে যাবে এবং আপনি সেই পরম আত্মাকে উপলব্ধি করবেন', তখন আপনার কী হবে? 'মন যেখানেই যাবে সেখানেই সমাধিস্থ হবে'।

দেহাত্মবোধই সকলের থেকে আমাদের আলাদা করে। সেই অজ্ঞানতা যখন চলে যায়, তখনই আমরা বিশ্বাত্মক দৃষ্টির অধিকারী হই। পৃথিবীর সর্বত্র কবিতা, শিল্প এবং নাটকে এই সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করা হয়েছে। উচ্চতর চেতনার রাজ্যে এই একত্ববোধই আপনার পরম প্রাপ্তি। প্রকৃতির ভিতরে একত্ব রয়েছে। যত কিছু বৈচিত্র্য বা বৈষম্য, সব ওপর ওপর। অর্থাৎ বাইরে বৈচিত্র্য থাকলেও ভিতরে একত্ব ঠিকই রয়েছে। দেহাত্মবোধ চলে গেলেই এই একত্বের বোধ মানুষের মধ্যে জেগে উঠবে। দেহই আমাদের পৃথক করে। আমি একজন দেহ-মন-বিশিষ্ট মানুষ—আমি আপনার থেকে আলাদা এবং আপনিও আমার থেকে আলাদা—এই বোধ যখন চলে যায়, তখনই বিশুদ্ধ চৈতন্য জাগ্রত হয় এবং আমরা অনুভব করি যে মূলত আমরা এক। সত্যি বলতে কি, মানবসমাজের অধিকাংশ পাপ, এমনকি জাতিগত সংঘর্ষের পিছনে রয়েছে এই দেহাত্মবোধ। মস্কোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো-র একটি সম্মেলনে এই সত্যকে স্বীকৃতি দিয়ে ঘোষণা করা হয় যে, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই (*ইউনেস্কো কুরিয়ার,* এপ্রিল, ১৯৬৫)। যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধা পেলে যে-কোন জাতিই উন্নতির উচ্চস্তরে উপনীত হতে পারে। এই হলো আজকের জগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা। যতকিছু ভেদজ্ঞান—তা এসেছে কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং ভ্রান্তি থেকে। অতীতে এসব ভাব সযত্নে লালন করলেও এখন আর তাদের কোন মূল্য নেই। দশ-বারোটি অনুচ্ছেদে রচিত এই মস্কো

প্রস্তাবটির কিছুটা আমি আমার *Message of the Upanisads* (উপনিষদের সন্দেশ) গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছি। উপনিষদে বলা হয়েছে, প্রতিটি শিশুকে একত্বের শিক্ষা দাও। ওপর ওপর বৈচিত্র্য আছে ঠিকই; বৈচিত্র্যকে আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তা কেবল বাইরেই। গভীর দৃষ্টিতে বহুত্ব নয়, একত্বই সত্য। কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে (২.১.১১) ঃ

মনসৈবেদম্‌ আপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥

এই সত্যকে মনের দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নয়। কারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐক্যের ধারণা হয় না, মনের দ্বারা হয়। তাই বলা হয়েছে, *মনসা এব ইদম্‌ আপ্তব্যম্‌,* 'কেবল মনের দ্বারাই এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে'। সত্যটি কী? *নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন,* 'এই জগতে বহু বলে কিছু নেই।' কিন্তু তবুও যদি বহুত্বের ধারণা থেকে আপনি ভেদদর্শন করেন, তবে বারবার আপনার মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হতে থাকবে, *মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি।* যুদ্ধ, হিংসা, জঘন্য অপরাধ ইত্যাদি নানা অনর্থের কারণ এই জাতিগত এবং অন্য সব ভেদবোধ। তাই চারহাজার বৎসর আগে উপনিষদ ঘোষণা করেছে, *মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানা ইব পশ্যতি*। আমরা যে সকলেই স্বরূপত এক—এই বোধই আমাদের অনন্ত জীবন দিতে পারে। কিন্তু তার জন্য মনকে সচেতন করতে হবে। শিশুদেরও এই একত্বের শিক্ষা দিতে হবে। শুধু মানুষে-মানুষে নয়, প্রকৃতির সঙ্গেও আমাদের ঐক্য রয়েছে। পশুপাখী, গাছপালা, মানুষ—সবই এক সত্তা। ঐক্যই বিশ্বের ভিত্তি এবং এই সত্যের আলোকেই জীবনযাপন করতে হবে। এই হলো বেদান্তের বক্তব্য।

এই দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখালেন, ঈশ্বরই এই বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত। এইভাবে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হচ্ছে এবং শুরু হতে চলেছে একাদশ অধ্যায়, যেখানে আমরা দেখতে পাব অর্জুন ঈশ্বরের *বিশ্বরূপ* দর্শনের অভিলাষী এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই মিনতি স্বীকার করে তাঁকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাবেন। এটি গীতার প্রসিদ্ধ অধ্যায়।

ইতি বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ দর্শন

ঈশ্বরের সর্বব্যাপী রূপ দর্শন

গত রবিবার বিভূতিযোগ নামক গীতার দশম অধ্যায়ের পাঠ আমরা শেষ করেছি। বিভূতিযোগের অর্থ 'জগৎরূপে ঈশ্বরের প্রকাশ।' সেখানে ৪১ সংখ্যক শ্লোকে আমরা সমগ্র অধ্যায়টির সংক্ষিপ্তসার পেয়েছি এইভাবে ঃ

যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

—'যখনই কোন মঙ্গলজনক এবং মানবজাতির উৎকর্ষবিধানকারী শক্তির মহান প্রকাশ দেখতে পাবে, জেনো সেখানে আমি উপস্থিত আছি। সেই বিশেষ ঘটনা বা ব্যক্তির মধ্যে আমার অনন্ত সত্তার কিছুটা অংশ স্ফুরিত হয়।'

এই শিক্ষাই ভারতবাসীকে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে যে-কোন রকম মহত্ত্বকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে। সাম্প্রদায়িক মহত্ত্ব, জাতীয় মহত্ত্ব, জাতিগত মহত্ত্ব নয়—শ্রদ্ধা মানবিক মহত্ত্বের প্রতি। সেই মহত্ত্বের মধ্যে আমরা ঐশী শক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষ করি। আমি জানি না আর কোন জাতি বা ধর্মের মানুষ এই শিক্ষা পান কি-না। কিন্তু ভারতবর্ষে বরাবর আমরা এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। ফলে, যেখানেই মহত্ত্ব দেখি সেখানেই আমরা প্রণত হই। আমাদের শাস্ত্রকাররাও বলেছেন যে ম্লেচ্ছদের মধ্যেও অনেক মহান সাধক আছেন, আছেন অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যেও। সে যাই হোক, আজ আমরা প্রবেশ করছি একাদশ অধ্যায়ে, যার নাম 'বিশ্বরূপ দর্শন'—শ্রীভগবানের জগদাত্মক রূপের দর্শন। অনেক মহান ঋষি, সাধক এবং ভক্ত এটিকে গীতার অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে মনে করেন।

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

অর্জুন বললেন—'এই অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্পর্কিত পরম গুহ্য কথা, যা আমার প্রতি করুণাবশত আপনার মুখ হতে নিঃসৃত হয়েছে, তাতে আমার এই মোহ দূরীভূত হয়েছে।'

মদনুগ্রহায় পরমং যৎ ত্বয়া উক্তম্, 'আমার প্রতি প্রেম ও করুণাবশত এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যা কিছু বলেছেন'; *গুহ্যম্ অধ্যাত্ম সংজ্ঞিতম্*—কোন্ বিষয়ের উপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন? *অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্,* 'যা আধ্যাত্মিকতা নামে সুপরিচিত'। অর্জুন বলছেন, তার ফলে আমার মধ্যে কী পরিবর্তন ঘটেছে? *যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন,* 'আপনার মুখনিঃসৃত সেই বাণীর দ্বারা'; *মোহঽয়ং বিগতো মম,* 'আমার এই মোহ দূরীভূত হয়েছে'। এখন আমি বুঝতে পারছি যে, আপনার অনন্ত সত্তাই এই বিশ্বরূপে প্রকাশিত। 'আমি' এবং 'তুমি'-র ভ্রান্ত ভেদবোধ সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে গেছে। অর্জুন এখানে স্বীকার করেছেন, 'আমার এই মোহ বা ভ্রান্তি দূরীভূত হয়েছে।' অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৭৩ সংখ্যক শ্লোকে তিনি এই কথাটির পুনরাবৃত্তি করে বলবেন, 'আমি আমার সকল মোহ এবং অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হয়েছি। এখন আপনি আমাকে যা বলবেন, আমি তাই করব'। ওই অধ্যায়ের ৬৩ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'আমি যা বলেছি, সেসব বিবেচনা করে, যা তুমি সঠিক বলে মনে কর, তাই কর। আমি তোমার হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না। তোমার সিদ্ধান্ত তুমি নিজেই নাও'। তারই উত্তরে অর্জুন শেষবারের মতো আগের ঐ কথাগুলি বলেছিলেন। সুন্দর ভাব! আপনাকে এখানে আচার্যের উপর নির্ভরশীল হতে বলা হচ্ছে না। নিজের ওপরই ভরসা রাখুন। আচার্য যা বলেন, তা গ্রহণ করুন, সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন, তারপর আপনার সিদ্ধান্ত নিন এবং সেই সিদ্ধান্তের দায়িত্বও নিজে গ্রহণ করুন। এই হলো পরিণত মনুষ্যত্বের পরিচয়। শ্রীকৃষ্ণ এটাই চান। এখানে প্রথম বাক্যে অর্জুন বলছেন, 'আপনার কাছ থেকে আমি যে সমস্ত কথা শুনলাম, তা হলো অধ্যাত্মবিষয়ক', *অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্,* 'অধ্যাত্ম-নামক'; *সংজ্ঞা* মানে নাম। 'তা আমার মোহ দূর করেছে'।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

—'হে কমললোচন, আপনার কাছ থেকে আমি জীবের উৎপত্তি এবং বিলয় সম্পর্কে এবং সেই সঙ্গে আপনার অফুরন্ত মাহাত্ম্যও সবিস্তারে শুনেছি।'

এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং বিলয়, *ভব* এবং *অপ্যয়; ভব* মানে *প্রভব* অর্থাৎ 'উৎপত্তি'; *অপ্যয়* মানে এই জগতের 'প্রলয়'; *শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া,* 'আপনার কাছ থেকে আমি সবিস্তারে শুনেছি।' *ত্বত্তঃ,* 'আপনার কাছ থেকে'; *কমলপত্রাক্ষ,* শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় 'পদ্মপলাশলোচন'। *মাহাত্ম্যম্ অপি চ অব্যয়ম্,* 'এবং আপনার অনন্ত মাহাত্ম্য', সে সম্পর্কেও আমি আপনার শ্রীমুখ থেকে শুনেছি।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

—'হে পরমেশ্বর, আপনি আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে আমাকে যা বলেছেন, তা যথার্থ; (তবুও) হে পুরুষোত্তম, আমি আপনার ঐশ্বরিক রূপ দর্শনের অভিলাষী।'

অর্জুন বলছেন, নিজের সম্পর্কে আপনি আমাকে যা বলেছেন, তাতে আমি তৃপ্ত নই। কেবল শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না; আমি আপনার সেই বিশ্বাত্মক রূপ বা বিশ্বরূপ দর্শন করতে চাই। বাস্তবিক, শুধু শুনলেই মন ভরে না। তার জন্য দুটিই প্রয়োজন—দর্শন এবং শ্রবণ। তাই অর্জুন ঈশ্বরের সেই বিশ্বাত্মকরূপ দেখার জন্য অধীর হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে আমরা পাই, তিনটি বা চারটি ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ঐশ্বরীয় রূপ দেখিয়েছিলেন। একবার ধৃতরাষ্ট্রের তথা কৌরবদের রাজসভায়, যেখানে শিশুপাল কটুকথা বলে বিবাদ সৃষ্টি করেন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঐশ্বরীয় রূপ দেখান এবং শিশুপালকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী অক্রূরও একবার এই দর্শনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শিশুকালে মাটি খেয়ে অস্বীকার করলে মা যশোদা তাঁকে মুখ খুলে দেখাতে বলেন। শিশু কৃষ্ণ মুখ খুললে যশোদা দেখেন, সমগ্র বিশ্ব তো বটেই, তিনি নিজেও ঐ মুখের মধ্যে রয়েছেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে অর্জুন যা দেখেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সেখানে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্তরূপ প্রত্যক্ষ করেন। *এবম্ এতৎ যথা আত্থ ত্বম্ আত্মানং পরমেশ্বর,* 'যা কিছু আপনি বলেছেন, তা সবই সত্য বলে আমি বিশ্বাস করি'। তবুও, *দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি তে রূপম্ ঐশ্বরং পুরুষোত্তম,* 'আমি আপনার সেই "দিব্যরূপ" দর্শন করতে চাই।'

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

—'হে প্রভু, যদি আপনি মনে করেন, আমি সেই রূপ দর্শন করতে পারব, তবে হে যোগেশ্বর, আমাকে আপনার অক্ষয়স্বরূপ দেখান।'

যদি আপনি আমাকে সেই রূপ দর্শন করার যোগ্য বলে মনে করেন, *ময়া দ্রষ্টুম্*, 'আমার দ্বারা দৃষ্ট হতে'; *মন্যসে যদি*, 'যদি আপনি মনে করেন'; *তৎ শক্যম্*, 'সেই বিশ্বরূপ দর্শনের যোগ্য'; তা হলে, *যোগেশ্বর*, 'হে যোগেশ্বর'। অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণকে *যোগেশ্বর* বলে সম্বোধনটি লক্ষণীয়। শুধু এখানেই নয়, গীতার অন্তিম শ্লোকেও এই 'যোগেশ্বর' শব্দটি আসবে। *ততো মে ত্বং দর্শয় আত্মানম্ অব্যয়ম্*, 'অতএব, হে যোগেশ্বর, দয়া করে আমাকে আপনার অনন্তরূপ দর্শন করান।' এখানে যোগের প্রসঙ্গ এসে গেছে। যোগেশ্বর মানে, 'কীভাবে এই বিশ্বে তিনি এক থেকে বহু হলেন।' এইটিই হলো যোগশক্তি। এই হলো ঈশ্বরের সর্বোত্তম যোগ ঃ এক থেকে বহুতে পরিণত হওয়া, বহুরূপে প্রতিভাত হওয়া এবং তা সত্ত্বেও এক অনন্ত ঈশ্বররূপে নিত্য বিরাজমান থাকা। একেই ঈশ্বরের যোগশক্তি বলা হয় এবং তিনি স্বয়ং হলেন যোগেশ্বর। গীতা একথা বারবার বলেছেন। মহাভারতের অন্যান্য অংশেও ঈশ্বরের এই যোগশক্তির বহু উল্লেখ রয়েছে।

শ্রীভগবান্ উবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান বললেন—'হে পৃথাপুত্র, নানা বর্ণ এবং নানা আকৃতিবিশিষ্ট আমার এই শত-সহস্র বিচিত্র দিব্যরূপ তুমি দর্শন কর।'

শ্রীভগবান বলছেন, হে অর্জুন, আমার অনন্ত রূপ দর্শন কর। *পশ্য*, 'দেখ'; *শতশোঽথ সহস্রশঃ*, 'শত শত, হাজার হাজার'; *নানা বিধানি দিব্যানি*, 'বিভিন্ন দিব্যরূপ'; *নানাবর্ণ*, অর্থাৎ 'বিভিন্ন বর্ণের'; *(নানা) আকৃতীনি চ*, 'এবং নানা আকৃতির'। ভাষায় যতটা প্রকাশ করা সম্ভব, এখানে তা বলা হয়েছে। পরে অবশ্য আরও বিস্তারিতভাবে বলা হবে। তবে সে পরের কথা। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'হে অর্জুন, এস, দেখ।' সঞ্জয় পরে বলবেন, 'শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঐশ্বরিক রূপ দেখিয়েছিলেন।'

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

—'হে ভরতকুলজাত অর্জুন, তুমি আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুৎগণকে দর্শন কর; অদৃষ্টপূর্ব বহু বিস্ময়কর বস্তু অবলোকন কর।'

এই সব দিব্যরূপ তুমি দর্শন কর। সেগুলি কী? আদিত্যাদি। আমাদের পুরাণে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং [ঊনপঞ্চাশ] মরুৎ-এর কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—হে অর্জুন, অদৃষ্টপূর্ব এবং বিস্ময়কর বহু বস্তু তুমি আমার মধ্যে দেখ। *আশ্চর্যাণি অদৃষ্টপূর্বাণি,* এমন আশ্চর্য সব দৃশ্য মানুষ আগে কখনও দেখেনি। আমরা দুচোখ দিয়ে এই ব্যক্ত বিশ্বকেই দেখতে পাই। সেও কম বিস্ময়কর নয়। কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর আরও কিছু আছে, যা আমি, শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকে দেখাতে চলেছি। কিন্তু এর জন্য তোমার মধ্যে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। কী পরিবর্তন? তা অষ্টম শ্লোকে বলা হবে। এখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

—'হে জিতনিদ্র অর্জুন, এখন তুমি আমার এই দেহে সমাবিষ্ট স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র বিশ্ব এবং অন্য যা কিছু তুমি দেখতে চাও—দেখ।'

ইহ, 'এখানে, ঠিক এই স্থানে'; *মম দেহে,* 'আমার এই শরীরে' এবং *অদ্য,* 'এখনই, আমার এই দেহে'; *জগৎ কৃৎস্নম্,* ব্যক্ত 'সমগ্র বিশ্বকে'; *সচরাচরম্,* 'যা চলমান ও অচল বস্তুসমূহকে নিয়ে গঠিত'; *গুড়াকেশ,* 'হে জিতনিদ্র অর্জুন'; *যৎ চ অন্যৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি,* 'এবং অন্যান্য সব বস্তু যা তুমি দেখতে চাও।' এই সব কিছুই তুমি দেখতে পাবে।

ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যান্য স্থানে অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র এবং ভাস্কর্য আছে, যাতে শ্রীমদ্ভাগবতের বালক শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা-ভক্ষণ কাহিনীটি দেখানো হয়েছে। যশোদা শিশু কৃষ্ণকে মুখ খুলে দেখাতে বললেন। কিন্তু সেখানে যা দেখলেন, তাতে তিনি ভয় পেলেন। ভাবলেন, এ কী কাণ্ড? এ আমার শিশু সন্তান, অথচ এর মুখের ভিতর এ আমি কী দেখছি! এ যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড! পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন ঃ

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা ।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

—'কিন্তু তোমার এই চোখ দিয়ে তুমি আমাকে দেখতে পাবে না; আমি তোমাকে দিব্য বা অপ্রাকৃত দৃষ্টি দিচ্ছি; [তার সাহায্যে] আমার পরম যোগশক্তি দর্শন কর।'

এই সাধারণ চর্মচক্ষু দিয়ে তুমি আমার ঐশী মাহাত্ম্য দেখতে পাবে না। একথার ভিতর এক গভীর সত্য নিহিত রয়েছে। *দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ,* 'আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিচ্ছি।' তার সাহায্যে তুমি *পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্,* 'আমার *ঐশ্বরং যোগম্,* অর্থাৎ ঐশ্বরিক যোগশক্তি দর্শন কর' ঃ দেখ, কীভাবে আমি এই জগতের সার্বভৌম সত্তা হয়েও এই জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েছি; দেখ, আমি ব্যক্ত হয়েও অপরিবর্তনীয় সেই দিব্য অনন্ত সত্তাই আছি। এই যে এক-এর অনির্বচনীয় বহুবিধ প্রকাশ, তা সম্ভব হয় *মায়া* শক্তি তথা *যোগমায়া*-র মাধ্যমে।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

সঞ্জয় বললেন—'এই কথা বলে, হে রাজন, মহাযোগেশ্বর হরি পৃথাপুত্র অর্জুনকে তাঁর পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখালেন।'

রাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরে তাঁর প্রাসাদে বসে আছেন, আর সঞ্জয় তাঁর কাছে বসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যা ঘটছে, তার বিবরণ দিয়ে চলেছেন এই বলে, 'হে রাজন, শ্রীকৃষ্ণ *মহাযোগেশ্বর,* যোগের মহেশ্বর'। তিনি হলেন *হরিঃ*। হরি, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ, একই কথা। *দর্শয়ামাস পার্থায়,* 'তিনি পার্থকে দেখালেন', *পরমং রূপম্ ঐশ্বরম্,* 'তাঁর পরম দিব্য বিশ্বরূপ'। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে আমরা এই দিব্য বিশ্বরূপের বর্ণনা পাব।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥

—'অসংখ্য মুখ এবং চক্ষুবিশিষ্ট, অদ্ভুত বহু রূপবিশিষ্ট, নানা দিব্য অলংকারে ভূষিত, অসংখ্য উদ্যত দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত।'

কথায় যতটুকু প্রকাশ করা সম্ভব, এই শ্লোকে সঞ্জয় সেই দিব্যরূপের কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনা করছেন এইভাবে ঃ 'অসংখ্য মুখ এবং চক্ষুবিশিষ্ট, অদ্ভুত বহু রূপবিশিষ্ট, নানা দিব্য অলংকারে ভূষিত এবং নানাপ্রকার উদ্যত দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত'। বাস্তবিক, আপনি যদি সমগ্র বিশ্বকে একনজরে দেখতে পারেন, তাহলে আপনি এইসবই দেখবেন। ভেবে দেখুন, ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবীর বিভিন্ন

প্রান্তে কী ঘটছে! কেউ মারা যাচ্ছে, কেউ জন্মাচ্ছে, কেউ যুদ্ধ করছে, কেউ ভালো কাজ করছে। এইসব ঘটনা একই সময়ে অগণিত মানুষের জীবনে ঘটে চলেছে। সাধারণ চোখ দিয়ে এই সব ঘটনা এক নজরে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু দিব্যচক্ষু দিয়ে তা দেখা যায়। এই পৃথিবীতে কত ঘটনাই না ঘটে যাচ্ছে। বাস্তবিক, এই বিশ্ব এক পরম রহস্য! আধুনিক বিজ্ঞানের উপর রচিত তাঁর 'মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স' (Mysterious Universi) বা রহস্যময় বিশ্ব নামক গ্রন্থে স্যার জেমস্ জীনস্ (Sir James Jeans) ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করেছেন। সত্যই রহস্যময় এই বিশ্ব।

এইমাত্র আমি বলেছি যে, পৃথিবীতে কত আশ্চর্যজনক ঘটনা যুগপৎ ঘটে চলেছে। ভেবে দেখুন, সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু, যা অতি সূক্ষ্ম, তা-ও ঘটে চলেছে। কিন্তু এই চর্মচক্ষু দিয়ে এইসব সূক্ষ্ম ঘটনাবলী আমরা দেখতে পাই না। এই কারণেই ৮ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, 'এই রহস্য যাতে তুমি দেখতে পার, তার জন্যই আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিচ্ছি।' এই প্রাকৃত চোখ দিয়ে হয়তো আমরা সেই রহস্যের অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করতে পারি, তবে তা যথেষ্ট নয়। দেখা এবং বোঝার অনেক কিছুই বাকি থেকে যায়, যা এই সাধারণ দৃষ্টির নাগালের বাইরে। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, যাতে তুমি আমার ভিতরে সব কিছু দেখতে পাও, তার জন্য আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিচ্ছি।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

—'দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্র শোভিত, দিব্যগন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত, সেই বিস্ময়কর দিব্যপুরুষ, উজ্জ্বল বিভাযুক্ত, অসীম এবং সর্বত্র মুখ বিশিষ্ট।'

সেই দিব্যপুরুষ দিব্যমাল্য ভূষিত, দিব্যবস্ত্র শোভিত ও দিব্যগন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত, বিস্ময়কর, অত্যুজ্জ্বল, অসীম এবং সর্বত্র মুখবিশিষ্ট। *সর্বাশ্চর্যময়ম্,* 'অতি বিস্ময়কর'; *দেবম্,* 'সেই দিব্যপুরুষ, অতি উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত'; *অনন্তম্,* 'অনন্ত, অসীম'; *বিশ্বতোমুখম্,* 'সর্বত্র মুখবিশিষ্ট', 'সব দিকে চেয়ে আছেন', 'বিশ্বের সর্বত্র তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত', সূর্যের মতো। এই সর্বত্র প্রসারিত দৃষ্টির কথা ভাবলে আমার সূর্যের কথা মনে পড়ে যায়। সূর্যের দৃষ্টি চতুর্দিকে প্রসারিত। এ আমাদের দেখা দৃষ্টান্ত। সূর্যের দৃষ্টি সামনের দিকেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর দৃষ্টি সব দিকেই ছড়ানো। জাগতিক বস্তু সম্পর্কেই যদি একথা সত্যি হয়, তবে সেই সত্তা, যাঁর ভিতর থেকে লক্ষ লক্ষ সূর্যের সৃষ্টি হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে তাহলে

এ কথা কতখানি সত্য! এই অসাধারণ ব্যাপার, যা শুধুমাত্র দিব্যচক্ষু দিয়েই দেখা যায়, তা প্রসিদ্ধ ১২ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার অব্যবহিত পূর্বে প্রখ্যাত পরমাণুবিজ্ঞানী ওপেনহাইমার (Openheimer) যখন আমেরিকায় প্রথম পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটান, তখন এই শ্লোকটিই তাঁর মনে উদিত হয়েছিল। বিরাট বিস্ফোরণের সেই চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল দীপ্তি আকাশে ছড়িয়ে পড়তে দেখে, সেই কান-ফাটানো আওয়াজ শুনে আত্মগতভাবে তিনি এই শ্লোকটিই আবৃত্তি করেছিলেন।

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

—'যদি সহস্র সূর্য আকাশে একসঙ্গে ওঠে, তবে সেই প্রভা এই মহাত্মার প্রভার কিঞ্চিৎ তুল্য হতে পারে।'

আকাশে সহস্র সূর্য একসঙ্গে উঠলে যে দীপ্তি হয়, তার সঙ্গে সেই মহাত্মার *ভাস* অর্থাৎ মহিমা বা উজ্জ্বলতার কিছুটা তুলনা হতে পারে। *দিবি সূর্য সহস্রস্য,* 'আকাশে এক সহস্র সূর্যের'। একটি সূর্যেরই কী প্রচণ্ড দীপ্তি। তার ওপর এক হাজার সূর্য! *যদি ভবেৎ যুগপৎ,* 'যদি তারা একসঙ্গে'; *উত্থিতা,* আকাশে 'উদিত হয়'; *সা ভাঃ,* 'সেই প্রভা'; *স্যাৎ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ,* 'শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রকাশের এই উজ্জ্বলতার তুল্য হতে পারে'। ওপেনহাইমার *গীতা* পড়েছিলেন। তাই প্রথম আণবিক বিস্ফোরণ দেখে তাঁর এই গীতার শ্লোকটিই মনে পড়েছিল। সেই *মহাত্মন্‌-এর ভাস* অর্থাৎ 'সেই মহিমময় পুরুষের দীপ্তি' আকাশে যুগপৎ উত্থিত সহস্র সূর্যের উজ্জ্বলতার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় হতে পারে। অতএব,

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা ।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

—'তখন পাণ্ডুপুত্র অর্জুন বহু ভাগে বিভক্ত সমগ্র বিশ্ব একত্রে সেই দেবাদিদেবের দেহে অবস্থিত দেখলেন।'

তখন অর্জুন দেখলেন, *তত্রৈকস্থম্,* 'একস্থানে'; *জগৎকৃৎস্নম্,* 'সমগ্র বিশ্ব'; *প্রবিভক্তম্ অনেকধা,* 'বহুধাবিভক্ত'—এক ও অদ্বিতীয় সত্তা অনন্ত প্রকাশের মাধ্যমে খণ্ডিত। *অপশ্যৎ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবঃ তদা,* 'তখন অর্জুন দেখলেন সেই দেবাদিদেব অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শরীরে'।

**ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥**

—'তখন ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট, রোমাঞ্চিত হয়ে সেই মহান দেবতার প্রতি নতমস্তকে পরম শ্রদ্ধায় করজোড়ে বললেন।'

ধনঞ্জয়, অর্থাৎ 'অর্জুন'; *বিস্ময়াবিষ্টঃ,* 'বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে', *হৃষ্টরোমা,* 'রোমাঞ্চিত হয়ে'; *প্রণম্য শিরসা দেবম্,* 'সেই দিব্যপুরুষকে নতমস্তকে প্রণাম করে'; *কৃতাঞ্জলিঃ,* 'করজোড়ে'; *সঃ অভাষত,* 'তিনি বললেন'। এখন দিব্য সত্যস্বরূপ সেই পরম পুরুষকে অর্জুন স্তুতি করবেন। শত শত বছর ধরে ভক্তরা এই স্তুতি প্রার্থনা হিসাবে আবৃত্তি করে আসছেন। অন্যান্য ধর্মসাহিত্যেও এইরকম কিছু অংশ আছে—খুব কম হলেও আছে—যেখানে ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপ্ত রূপের কথা বলা হয়েছে। যেমন, Old Testament। সেখানকার প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলিতে অতি সুন্দর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব রয়েছে। বিশেষ করে একটি অংশ আমার খুব পছন্দ। যেখানে (The Holy Bible, Psalms, 138. 8-10, Published by Harwin Press LTD. 1959) বলা হয়েছে ঃ

'যদি আমি স্বর্গে যাই, তুমি সেখানে *আছ;* যদি আমি নরকে যাই, সেখানেও তুমি *বিরাজ করছ*।

'যদি আমি ভোরের ডানা হয়ে উড়ে যাই, অথবা সমুদ্রের সুদূর প্রান্তে থাকি;

'সেখানেও তোমার হাত আমাকে পথ দেখাবে এবং ডান হাত দিয়ে তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে থাকবে।'

এই স্তবে ঈশ্বরের বিশ্বরূপের কল্পনা প্রচ্ছন্ন আছে, যদিও অতিলৌকিক একেশ্বরবাদী কোন ধর্মে এই ধরনের কল্পনা দেখতে পাওয়া যায় না। সেখানে ঈশ্বর এবং জগৎ—দুটি পৃথক বস্তু। কিন্তু এসব ধর্মেও যখন অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হয়, তখন এই কাল্পনিক পার্থক্যের প্রাচীর তাঁরাও ভেঙে ফেলেন। এই সিদ্ধ অতীন্দ্রিয়বাদী সাধকেরা তখন উপলব্ধি করেন, এক অনন্ত ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। সাম্প্রদায়িক ধর্মের ঘেরাটোপে আবদ্ধ সাধারণ মানুষদের সঙ্গে এঁদের তুলনা চলে না; এঁরা আলাদা থাকের মানুষ। এসব ধর্মের সাধারণ মানুষ মনে করেন, ঈশ্বর একটি এবং জগৎ আর একটি। তাঁরা মনে করেন ভগবান আমাদের থেকে অনেক দূরে আছেন। কী করা উচিত এবং কী নয়, সে সম্পর্কে পুঁথিগত নির্দেশ-এর উপর তাঁরা নির্ভর করেন। ঐটিই তাঁদের ধর্ম। ঈশ্বর সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁদের নেই। কিন্তু সেই অনুভূতি যখন হয়,

তখন আপনার কাছে সত্যের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হতে শুরু করে। ভারতবর্ষে দিব্য অনুভূতিলাভের ক্ষেত্রে ধরাবাঁধা বিধিনিষেধ কোন কালেই ছিল না। সবরকম অধ্যাত্ম অনুভূতিকেই এখানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই, এখানে ভক্তদের বিভিন্ন রকম আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিবরণ পাওয়া যায়। আচার্যরা এদেশে কোন দৃষ্টিভঙ্গি বা দর্শনের কণ্ঠরোধ করেননি। কিন্তু অন্যান্য দেশে ঐ সমস্যাটি প্রবল। সেখানে ধর্মীয় নেতারা একটি পথই সকলের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন, এক বিশেষ ধরনের উপলব্ধিলাভের বিধিই দিয়ে থাকেন। তাঁদের ভাবটা এই—একটা বিশেষ পথ তৈরি করে দেওয়া হলো; কিন্তু এর বাইরে কোনমতেই যাওয়া চলবে না। কাজেই, ঐসব ধর্মের কোন কোন সন্ত-মহাপুরুষ গতানুগতিক বিধিনিষেধের বেড়া অতিক্রম করে উচ্চ অনুভূতি লাভ করলেও সেইসব অভিজ্ঞতা খুব সাবধানে, ঠারেঠোরে প্রকাশ করেছেন, যাতে তাঁদের শাস্তি পেতে না হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর জার্মান মরমিয়া সাধু মেইস্টার একহার্ট (Meister Eckhart)-এর কাহিনিটিই একবার স্মরণ করুন। ধর্মবিশ্বাসে রোমান ক্যাথলিক হয়েও ব্যক্তি-ঈশ্বরের পিছনে তিনি ঈশ্বরের নৈর্ব্যক্তিক সত্তাটিকে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বে শুধু ব্যক্তি-ঈশ্বরের কথাই আছে, নৈর্ব্যক্তিক কোন কিছুর স্থান সেখানে নেই। ফলে, শাস্তি নেবার জন্য রোমের ক্যাথলিক বিচারসভা তাঁকে ডেকে পাঠায়। তাঁর কপাল ভালো। কারণ বিচারের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। বেশ কিছু মুসলিম সুফী অতীন্দ্রিয়বাদীও ঈশ্বরের অনন্ত মাত্রাটিকে উপলব্ধি করে, তাঁর সঙ্গে নিজেদের একত্ব অনুভব করেছিলেন। এক সুফী সিদ্ধসাধক বলেছিলেন, *অন্ অল্-হক্*, 'আমি হলাম আল্লা'। এই দুঃসাহসিক সত্য বলার জন্য তাঁকে বধ করা হয়েছিল। তুমি আল্লা! কী করে এই কথা তুমি মুখে আনতে পারলে? মুসলিম ইমাম ও মৌলবীরা তাঁর কথা বুঝতে বা সহ্য করতে পারেন নি।

ভারতবর্ষে কিন্তু এই কাণ্ড হয়নি। এদেশে সবরকম অধ্যাত্মসাধনা ও অনুভূতিই সসম্মানে স্বীকৃত হয়েছে। ঈশ্বর সম্পর্কে যাঁদের নানাধরনের অনুভূতি হয়, তাঁদের আমরা বধ করি না। ঈশ্বর অনন্ত; অনন্ত তাঁর ভাব; তাঁকে অনুভব করার পথও বহু। কাজেই, কেউ সাম্প্রদায়িক ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করলে তাঁকে হত্যা করার ঘটনা ভারতবর্ষে কখনও ঘটেনি। অন্যান্য দেশে কিন্তু এই ঘটনা ঘটেছে, এমনকি গ্রীস ও রোমেও। অতএব, যে দেশে আমরা বাস করি, তার অনন্যতা, যে দর্শন শত শত বছর আমাদের পথ দেখাচ্ছে, তার স্বকীয়তা এবং ব্যাপকতা আমাদের মনে রাখতেই হবে। তাই ঈশ্বর সম্বন্ধে যে-কোন

অনুভূতিকেই আমরা শ্রদ্ধা করি। আমাদের স্বীকৃতির একটাই শর্ত—ঈশ্বরানুভূতির এই সৌন্দর্যকে নিজের চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা চাই। আপনি যদি পবিত্র ও মহৎ চরিত্রের মানুষ হন, তাহলে আপনার অভিজ্ঞতাকে আমরা স্বীকার করব। ঈশ্বরদর্শন করে আপনার চরিত্র কতটা রূপান্তরিত হলো, সেটিই আপনার দিব্য অনুভূতির সত্যতা যাচাই করার একমাত্র মানদণ্ড। আমরা তাই খুঁটিয়ে লক্ষ্য করি। সাধক যদি খাঁটি এবং মহৎ চরিত্রের মানুষ হন, তাহলে বুঝি তাঁর দর্শন যথার্থই দিব্য এবং সঠিক। আমরা তাঁকে পূজা করি, প্রণাম করি। না হলে তাঁকে আমরা উপেক্ষা করি। অনেকে অনেক রকম দর্শনের কথা বলেন, কিন্তু তাঁদের জীবনে সেই দর্শনের কোন প্রভাব না দেখলে আমরা ওসব কথাকে আমল দিই না। কিন্তু আমল না দিলেও আমরা তাঁদের হত্যা করি না। এই হলো ভারতীয় ঐতিহ্য। এর পিছনে উপনিষদ-এর প্রভাব রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি। এই অধ্যাত্মবিজ্ঞান বলে যে, অনুভূতিই ধর্মের প্রাণ, ধর্মকে যাচাই করার কষ্ঠিপাথর—সাম্প্রদায়িক বা বিশেষ কোন মতবাদ নয়।

গীতার এই শ্লোকটিতে আমরা দেখছি, অর্জুন বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়েছেন, বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। হওয়ারই কথা। ঈশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শন করলে মানুষ কি বিহ্বল না হয়ে থাকতে পারে?

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

অর্জুন বললেন—'হে দেব, আমি আপনার দিব্য দেহে সকল দেবতাকে, সকল ভূতসমূহকে, কমলাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে, সকল ঋষিদের এবং দিব্য সর্পসমূহকে দেখছি।'

হে দেব, আমি আপনার মধ্যে সব বিস্ময়কর প্রকাশ দেখছি। সেগুলি কী? সমস্ত দেবতারা 'দিব্যদেহধারীরা', এই জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, যিনি বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে উদ্গত পদ্মের ওপর উপবিষ্ট, সকল ঋষি এবং বাসুকির মতো দিব্যসর্পসমূহ। এঁদের সকলকেই আপনার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। অন্যান্য সংস্কৃতিতে অন্যান্য কিছু দিব্যবস্তু থাকতে পারে। কিন্তু ভারতীয় পরম্পরায় এই বস্তুগুলিকেই অতি পবিত্র মনে করা হয়, কারণ এগুলি স্থূল বা প্রাকৃতিক স্তরের বহু উর্ধ্বে। সেই কারণেই এখানে এঁদের উল্লেখ করা হয়েছে।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্ ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

—'হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, বহু হাত, বহু উদর, বহু মুখ এবং বহু নেত্রবিশিষ্ট, অনন্ত রূপসম্পন্ন আপনাকে আমি সর্বদিকে প্রত্যক্ষ করছি; আমি আপনার আদি, মধ্য বা অন্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

এখানে অর্জুন কয়েকটি শব্দে তাঁর সুগভীর বিস্ময়কে প্রকাশ করতে চাইছেন। এরকমই হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরকম পরিস্থিতিতে আপনার বাক্ রুদ্ধ হয়ে যায়। আপনি স্তব্ধ হয়ে যান। অর্জুন তবুও তাঁর সামনে দণ্ডায়মান সেই দিব্যরূপের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে তাঁর বিস্ময়কে কিছুটা প্রকাশ করেছেন। এরপর তিনি বলছেন,

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

—'কিরীট, গদা এবং চক্রধারিরূপে অপ্রমেয় আপনাকে দেখছি; আপনার দুর্নিরীক্ষ্য তেজোরাশি সর্বত্র জাজ্জ্বল্যমান, চারদিক যেন অগ্নি ও সূর্যের প্রভায় প্রদীপ্ত।'

ভগবান বিষ্ণুর মূর্তিতে দেখবেন, মাথায় মুকুট, চারটি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধারণ করে আছেন এবং তাঁর দেহ থেকে উজ্জ্বল তেজোরাশি বিচ্ছুরিত হচ্ছে—সেই তেজ এত উজ্জ্বল যে চেয়ে থাকা কঠিন। এক সূর্যের দিকেই চেয়ে থাকা যায় না; তার ওপর যদি আবার সহস্র সূর্য হয়, তাহলে সেই পুঞ্জীভূত জ্যোতির দিকে কেমন করে আমরা চেয়ে থাকবো? তাই বলা হয়েছে—ঐ প্রভা দুর্নিরীক্ষ্য। সূর্য এবং অগ্নির লেলিহান শিখার মতো তা জ্বলজ্বল করছে। এই রূপের কোন পরিমাপ করা যায় না। অর্জুন বলছেন, সর্বত্র আমি এইরূপ দেখছি।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

—'আপনিই অক্ষর পুরুষ, পরম ব্রহ্ম, একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়। আপনি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়; আপনিই সনাতন ধর্মের শাশ্বত রক্ষক এবং আপনিই চিরায়ত পুরুষ—এই আমার অভিমত।'

এ এক অতি সুন্দর আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা। *ত্বম্ অক্ষরম্,* 'আপনি অবিনশ্বর'; *ক্ষর* মানে 'নশ্বর', *অক্ষর,* অর্থাৎ 'অবিনশ্বর'। *পরমম্* অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ'; *বেদিতব্যম্,* 'জ্ঞাতব্য বিষয়'। যদি জানার কিছু প্রকৃষ্ট বিষয় থাকে, তবে তা আপনিই। মানুষের জ্ঞানের সর্বোচ্চ বিষয় হলেন ঈশ্বর, যিনি সকলের এবং এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা। *ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্,* 'আপনিই এই সমগ্র বিশ্বের পরম অবলম্বন এবং আশ্রয়', কারণ একমাত্র ঈশ্বরেই এই বিশ্ব চরাচর অবস্থিত। এই কারণেই ঈশ্বরকে *নিধানম্* অর্থাৎ 'আশ্রয়' বলা হচ্ছে। অনুরূপভাবে, *ত্বম্ অব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্মগোপ্তা,* 'আপনি অবিনাশী, *অব্যয়'; ব্যয়* অর্থাৎ 'ক্ষয়' এবং *অব্যয়* অর্থাৎ 'অক্ষয়'। নিরন্তর খরচ করা সত্ত্বেও যখন ভাণ্ডার নিত্যপূর্ণ থাকে, তখন তাকে বলা হয় *অব্যয়।* অব্যয় এই জন্য যে ঐ ভাণ্ডার ফুরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। সংস্কৃত ভাষায় *অব্যয়* তাই এক অতি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। *শাশ্বত ধর্মগোপ্তা; গোপ্তা* মানে 'রক্ষক'। কার রক্ষক? *শাশ্বত ধর্ম,* অর্থাৎ 'সনাতন ধর্মের'। ভারতবর্ষ তার ধর্মকে এই নৈর্ব্যক্তিক নামে ডেকে থাকে। মহাজাগতিক নিয়ম এই সনাতন *ধর্মের* একটি দৃষ্টান্ত। সূর্য রয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি আবর্তিত হয়। পৃথিবীও তার নিজের মেরুরেখা বা অক্ষরেখার চারিদিকে ঘূর্ণায়মান। এইভাবে ছায়াপথগুলিও আবর্তিত হচ্ছে। এই ভাবেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। *শাশ্বত ধর্ম* কথাটির অর্থ হলো 'মহাজাগতিক বা ঐশী *ধর্ম*'। মানুষের জীবনেও এক *শাশ্বত* বা সনাতন ধর্ম রয়েছে। অন্যান্য সব ধর্ম আসে, আবার যায়; কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক এই ধর্মগুলি বরাবর থাকে। তাকেই *সনাতন ধর্ম* বলা হয়।

আমাদের ঐতিহ্যে ধর্মের দুটি দিক আছে ঃ একটি হলো *সনাতন ধর্ম* এবং অন্যটি *যুগধর্ম।* একটি বিশেষ যুগে, একটি বিশেষ দেশের জন্য, এক বিশেষ মানবগোষ্ঠীর জন্য যে ধর্ম, তাকে বলা হয় *যুগধর্ম।* এই যুগধর্মগুলি পরিবর্তনশীল। একটি যুগ চলে যায়, আর একটি আসে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তনও হয়। কিন্তু এসবের মধ্যেও একটি বিশ্বজনীন ধর্ম অব্যাহত থেকে যায়। তা কখনওই পরিবর্তিত হয় না এবং একেই বলা হয় *সনাতন,* 'শাশ্বত' ধর্ম। অন্যটিকে বলা হয় *যুগধর্ম।* দু'ধরনের ধর্মের এই পার্থক্যটুকু আমরা বুঝি বলেই যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগধর্মের পরিবর্তনকে আমরা মেনে নিয়েছি, আর তাই আমাদের সংস্কৃতি এখনও সপ্রাণ। জাতি হিসাবে তাই আমাদের মৃত্যু হয়নি। আমরা জানি, কীভাবে নতুন পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে হয়। প্রায় একশ বছর আগে প্রতিটি হিন্দু পুরুষ

মাথায় শিখা বা টিকি রাখতেন। একজন হিন্দুর পক্ষে এটি অপরিহার্য ছিল। তারপর আধুনিক যুগ আসতেই আমরা শিখা কেটে ফেলতে শুরু করলাম। তখন, কিছু কিছু প্রাচীনপন্থী মানুষ প্রমাদ গুনলেন, ভাবলেন এই শিখাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন ধর্মও বুঝি গোল্লায় গেল। আসলে তাঁরা *সনাতন ধর্ম* এবং *যুগধর্মের* পার্থক্য বুঝতেন না। তাই ঐ কথা বলতেন। এটি বোঝা খুবই জরুরী যে, যুগধর্ম পরিবর্তনশীল; কাজেই তাকে পরিবর্তিত হতে দিন। 'কালাপানি পার হয়ো না'—এই ছিল এক সময় যুগধর্ম। সে যুগ শেষ হয়েছে, তাই আমরাও এখন সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশে যাচ্ছি।

এইভাবে, আমাদের যুগধর্মে শত শত পরিবর্তন এসেছে। এখন আবার এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। ফলে বহু প্রাচীন আচার আচরণের আজ আর কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। নতুনকে অবশ্যই জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি মোক্ষম কথা বললেন। বললেন, 'মোগল-আমলের টাকা (ইষ্ট-ইণ্ডিয়া) কোম্পানীর আমলে চলে না'। সেই টাকার স্বর্ণ-মূল্য আছে বটে, কিন্তু মুদ্রা-মূল্য নেই। তাই, ঐ সোনা দিয়ে নতুন ট্যাকশালে নতুন মুদ্রা তৈরি করতে হবে। যুগধর্মও তাই। এর পরিবর্তন অবশ্যই কাম্য। যদি এর পরিবর্তন না করা হয়, তবে সমাজ বিকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, এখন নতুন নতুন ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে, নতুন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। এই নতুন ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতেই হবে। আর তা চললে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু সেই পরিবর্তনের মধ্যেও এমন কতকগুলি সনাতন মূল্যবোধ থেকে যায়, যাদের কোন পরিবর্তন হয় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ সত্যের কথাই ধরা যাক। সত্য এবং সত্যবাদিতার গুরুত্ব কোন দিনই কমে না। 'সত্যনিষ্ঠা হলো *শাশ্বত ধর্ম; এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।* গীতা বলবেন, 'আমাদের যথার্থ প্রকৃতি যে আত্মা, তিনিও *সনাতন।'* ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সনাতন সম্পর্ক। আমি হয়ত সে সম্পর্কের কথা জানি না, কিন্তু সেই সম্পর্ক সত্য এবং *সনাতন,* তা পরিবর্তিত হতে পারে না। এইভাবে আমাদের *সনাতন ধর্ম* এবং *যুগধর্ম*—দু'রকম ধর্মই রয়েছে। সনাতন ধর্ম উপনিষদ বা বেদভিত্তিক এবং যুগধর্মের উৎস স্মৃতি এবং পুরাণ। এই স্মৃতি ও পুরাণগুলি কালে বদলে যায় এবং এই পরিবর্তন অবশ্যই কাম্য; তারা বদলেছেও বহুবার। বহু শতাব্দী ধরে স্মৃতির অনুশাসন ছিল : 'নিম্নশ্রেণির কোন মানুষ হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ

করতে পারবে না।' সেটি সনাতন ধর্ম নয়। সেটি ছিল যুগধর্ম। সেই যুগ গত হয়েছে। তাই আজ আমরা মন্দিরগুলি জাতি, বর্ণ নির্বিচারে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। কিন্তু এই পরিবর্তনের জন্য কেউ কষ্টভোগ করেনি, কোন গৃহযুদ্ধ ঘটেনি। অন্য কোন দেশে এই পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতো। কাজেই, মনে রাখতে হবে, সনাতন ধর্ম এবং যুগধর্মের মধ্যে এই পার্থক্যবোধ থাকায় আমরা শান্তিপূর্ণভাবেই এই পরিবর্তন আনতে পেরেছি। কিছু হৈচৈ অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু কোন ঘোরতর সংঘাত ঘটেনি। কারণ আমরা জানি *সনাতনধর্মই* মুখ্য, আর এই *যুগধর্ম* হলো গৌণ। উপনিষদগুলি চিরন্তন ধর্মের প্রতিভূ, যা থেকে সর্বদা অনুপ্রেরণা লাভ করা যায়। বিবাহ, উত্তরাধিকার, খাদ্য, পানীয়, যেগুলি যুগধর্মের উপজীব্য—তা নিয়ে উপনিষদের কোন মাথাব্যাথা নেই। এগুলি রয়েছে স্মৃতি এবং পুরাণে। সেখানে পাওয়া যাবে 'কী করা উচিত', 'কী করা উচিত নয়'। কিন্তু শ্রুতিতে পাবেন কেবল উচ্চাঙ্গের ভাব এবং চরম সত্যগুলি। যেমন, ঈশ্বর ও মানুষের প্রকৃত স্বরূপ কী? ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সত্যিকারের কী সম্পর্ক? বেদান্তেও সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে আজ এক প্রচণ্ড সামাজিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। সে পরিবর্তন অবশ্য আমাদের বাইরের জীবনে। এইরকম আরও পরিবর্তন ঘটবে এবং আমরা তাদের স্বাগত জানাব। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা ধরে থাকব শ্রুতি, উপনিষদ বা বেদান্তের সনাতন মূল্যবোধগুলিকে।

বাস্তবিক, এই প্রথম বৈদান্তিক অনুপ্রেরণার উপর ভিত্তি করে এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ে উঠছে। আমাদের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের দিকে তাকান। সেখানে সুন্দর সুন্দর বৈদান্তিক ভাব এবং শাশ্বত মূল্যবোধগুলি দেখতে পাবেন। কিন্তু স্মৃতির বৈষম্যমূলক ভাবধারাগুলি, যা বহু বছর ধরে আমরা লালন করেছিলাম, সংবিধান সেগুলি বর্জন করেছে। অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রথা এই সংবিধানে নিষিদ্ধ হয়েছে। এই নতুন সংবিধান যেন আমাদের এক নতুন *যুগধর্ম*, এক নতুন *স্মৃতি* উপহার দিয়েছে। তাকে অনুসরণ করুন। পুরনো অনুশাসনগুলিকে অনুসরণ করার আর কোন প্রয়োজন নেই। গণতান্ত্রিক সংবিধান চালু হওয়ার দিন থেকেই প্রাচীন স্মৃতির অনেকগুলিই সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। সংবিধান অমান্য করে সেগুলি আর চলতে পারে না। *আমাদের এই পুণ্যভূমির সংস্কৃতি ও দর্শনের এই হলো মহত্ত্ব।* কারণ, আমরা জানি সময়ের সঙ্গে তাল রেখে কীভাবে চলতে হয়। সেই ঋগ্বেদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কী বিরাট সামাজিক পরিবর্তন আমাদের এই ভারতবর্ষে ঘটে গেছে!

কিন্তু তবুও আমরা একইরকম রয়ে গেছি। এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের স্রোত আমাদের সকলের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। এই কথাটি আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে। আরও বহু পরিবর্তন আসবে। আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটবে। নারী জাতির অবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটবে। পূর্ণ সমতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বিরাজ করবে সেই সমাজে, কাউকে দাবিয়ে রাখা চলবে না। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন। শ্রমজীবী মানুষই যথার্থ মহৎ। যে সামন্ত প্রভু আরাম কেদারায় বসে মহাসুখে তামাকু সেবন করছেন, তার আবার মহত্ত্ব কী? ভারতবর্ষে এই সামন্ত প্রভুদের একাধিপত্যের দিন শেষ হয়ে এসেছে। অতএব, আরো সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হন। তবে এই পরিবর্তন আসবে ধীরে ধীরে, অহিংস পথে এবং কোনরকম বিদ্বেষ ছাড়াই। এই হলো ভারতীয় সমাজের ধরনধারণ এবং সমাজবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি, যার পিছনে রয়েছে যুগসঞ্চিত প্রজ্ঞা। আমাদের রক্ষণশীল জাতীয় ঐতিহ্যেই বলা হয়েছে, *শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সি*, '*শ্রুতি* এবং *স্মৃতির* বিরোধে একমাত্র শ্রুতিকেই প্রাধান্য দিতে হবে'। তাই যতই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আসুক না কেন, আমাদের ভারতবর্ষ একই থাকবে, আমাদের আধ্যাত্মিক ধারাবাহিকতাও একইভাবে বজায় থাকবে। এটিই ভারতীয় সংস্কৃতির সৌন্দর্য—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, পরিবর্তন এবং নিত্যতা—দুই-ই এখানে হাতধরাধরি করে চলে।

অতএব, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলছেন, *শাশ্বত ধর্ম গোপ্তা*, 'আপনি এই শাশ্বত ধর্মের, এই সনাতন ধর্মের রক্ষাকর্তা'। এই ধর্ম যুগ যুগ ধরে চলছে, কিন্তু তবু আজও সতেজ। কল্পনা করুন, এই দেশ ৫০০০ বছরের পুরনো হয়েও আজও কত নবীন। রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের দিক থেকে, এ দেশ খুবই তরুণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখতে দেখতে এর বয়স ৫০০০ হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-এর মন্তব্যটি খুবই সত্য। তিনি বলেছিলেন: 'ভারতবর্ষের বয়স বাড়ছে, তবু সে বুড়িয়ে যাচ্ছে না'। এই হলো 'চিরতরুণ ভারতবর্ষ'। আমরা আজকাল বলি 'ইয়ং ইন্ডিয়া'; এ শুধুই কথার কথা নয়। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম বলতে শুরু করেন—চিরনবীন ভারতবর্ষ—সেই অর্থে আমরা সকলেই তরুণ। এই যে *শাশ্বত ধর্ম* তাকে রক্ষা করছেন এক পরম দিব্যপুরুষ। এই *শাশ্বত ধর্ম* কোরাণ, *বাইবেল* তথা প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই আছে। শুধু তাঁরা এই *শাশ্বত ধর্ম* এবং *অশাশ্বত ধর্ম* বা যুগধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। ধর্মের এই দুটি দিককে তাঁরা মিশিয়ে ফেলেছেন। এখানে, এই

ভারতবর্ষে কিন্তু আমরা সেই পার্থক্যটি বুঝেছিলাম। এইটুকু যা তফাৎ। এইখানেই আমাদের বিশেষত্ব। যুগধর্মকে বদলাবার সাহস আমাদের ছিল। তাই নির্ভয়ে আমরা অদ্ভুত সব পরিবর্তন এনেছি। কিন্তু তাতে আমরা ভালোই আছি। ক্রমশ আরও ভালোর দিকে যাচ্ছি। আমাদের সনাতন ধর্মের অভিজ্ঞতা থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এই একটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ইসলাম ধর্মকেও একদিন না একদিন এই শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। সেখানে সনাতন ধর্ম ও যুগধর্ম মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। এই কারণেই তাঁরা বলেন, আমাদের ধর্ম এবং রাজনীতি এক; তাদের পৃথক অস্তিত্ব নেই। কাজেই, তাঁদের ধর্ম সহজেই রাজনীতিতে পরিণত হয়। ইসলামী সনাতন ধর্ম তার যুগধর্মের কাছে হার মানে। এইসব ধর্মে এরকমই হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মই যুগধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে চালিত করে। এই বিশেষত্বটি ভালো করে লক্ষ্য করবেন। এই সনাতন ধর্ম এবং যুগধর্মের পার্থক্যটি বুঝতে পারলে আপনারা ভারতবর্ষকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।

যে সংবিধানে সংস্কার বা সংশোধনের কোন সুযোগ থাকে না, তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। আশা করা যায়, অন্যান্য ধর্মগুলিও এই সঙ্কট, এই সমস্যাকে ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠতে শিখবে এবং আমি নিশ্চিত যে, ঐসব ধর্মের অনুগামীরাও এই ভারতীয় প্রজ্ঞাদৃষ্টিকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি ঘটাবেন। তাতে ধর্মের মূলভাবটি কখনওই ব্যাহত হবে না; সত্য কখনওই বিনষ্ট হবে না; সনাতন ইসলামিক ধর্মের কোনও হানি হবে না। সুফি সম্প্রদায় সনাতনধর্ম ও যুগধর্মের পার্থক্যটি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তার জন্য তাঁদের প্রচণ্ড খেসারৎ দিতে হয়েছিল। আধ্যাত্মিক অনুভূতিহীন গোঁড়া মৌলবীদের হাতে তাঁদের অনেককেই প্রাণ দিতে হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। তা এই যে, পরিবর্তনের ধারণাটি আধুনিক কিছু নয়; কিংবা তা আধুনিক শিক্ষার ফলও নয়। সনাতন ধর্মের ঐতিহ্যেও এই সংস্কারের ধারণাটি স্বীকৃত হয়েছে। তাই, আজ আমরা বলি, অস্পৃশ্যতা *শ্রুতি*-অনুমোদিত প্রথা নয়; এটি কেবল *স্মৃতিতেই* আছে। শ্রুতি বলে, সকলেই স্বরূপত সেই এক আত্মা। তাই সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষত এদেশের শিক্ষিত মানুষ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের পক্ষে তাঁদের রায় দিয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেননি যে, এর ফলে তাঁদের ধর্ম বিনষ্ট হবে। এগুলি আমাদের

সাধারণ মানুষের জানা দরকার। তাতে প্রচণ্ড শক্তির অভ্যুদয় হবে। এই প্রসঙ্গে গীতার এই অভিব্যক্তিটি খুবই সুন্দর ঃ শ্রীভগবানই হলেন এই শাশ্বত ধর্ম-এর রক্ষাকর্তা—কেবল হিন্দুধর্মের নয়, মুসলমান, খ্রিস্টান সকল ধর্মেরই। তিনি এই শাশ্বত ধর্মকে রক্ষা করেন। কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, ধর্মের একটি বাহ্যিক দিকও আছে—আপনি কীরকম পোশাক পরবেন, কী খাবেন ইত্যাদি। এক বিশেষ ধরনের জলবায়ুতে, যেমন ধরুন কেরালায়, কোচিনের মহারাজা পর্যন্ত কেবল একটি ধুতিই গায়ে জড়িয়ে থাকেন। পোশাক বলতে ঐ একটি ধুতি। কল্পনা করা যায়! অথচ কাশ্মীরে গেলে আপনাকে অনেক জামাকাপড় পরতে হবে। কারণ, সেখানকার জলবায়ু আলাদা। বিভিন্ন জায়গায় সব মানুষের জন্য সব কালে আপনি একই নিয়ম চালাতে পারেন না। এই পরিবর্তনশীল নিয়মগুলিকেই যুগধর্ম বলা হয়। যুগে যুগে অবশ্যই এর পরিবর্তন দরকার। ভারতীয় মন, ভারতের ঋষিরা বহুযুগ আগেই একথা বুঝে আমাদের সংস্কৃতিতে তাঁদের প্রজ্ঞার সাক্ষর রেখে গেছেন। এক যুগের ধর্মের সঙ্গে অন্য একটি যুগধর্মের বিরোধ বাধে। এ স্বাভাবিক সমস্যা। কিন্তু সনাতন ধর্মের সঙ্গে অন্য কোন সনাতন ধর্মের বিরোধ বাধে না—তা সে ইসলামিক সনাতন ধর্ম হোক, খ্রিস্টীয় সনাতন ধর্ম হোক বা হিন্দু সনাতন ধর্মই হোক। কিন্তু যুগধর্মগুলি সর্বদাই পরস্পরের বিরোধিতা করে। তাদের মধ্যে নানা পার্থক্য দেখা দেয়। সে যাই হোক, আমাদের দেশের মানুষ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এই জ্ঞান লাভ করেছে। এই কারণেই, নানারকম রাজনৈতিক ভাঙাগড়া এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যা সত্ত্বেও পাঁচ হাজার বছর ধরে আমরা বেঁচে আছি। অতএব, শ্রীভগবানই শাশ্বত ধর্মের রক্ষাকর্তা।

সনাতনস্ত্বং পুরুষো, 'আপনি হলেন *সনাতন,* শাশ্বত পুরুষ'; একমাত্র শাশ্বত সত্যই শাশ্বত ধর্মকে রক্ষা করতে পারে। 'আপনি হলেন সেই *সনাতন পুরুষ,* শাশ্বত সত্তা', যিনি এই জগৎকে রক্ষা করেন, যিনি জগতের আধ্যাত্মিকতাকে রক্ষা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-এও কোন কোন স্থানে বলা হয়েছে যে, সেই দিব্যপুরুষ এই সমগ্র পৃথিবীর আধ্যাত্মিক জীবনকে রক্ষা করেন। ভারতবর্ষে, সেই দিব্যপুরুষ নারায়ণ হিমালয়ের বদ্রীনাথ মন্দিরে তপস্যা করে এ দেশের আধ্যাত্মিকতাকে রক্ষা করছেন।

সনাতন এবং শাশ্বত কথাদুটির অর্থ একই। *সনাতনস্ত্বং পুরুষো,* 'আপনি হলেন সেই *সনাতন পুরুষ*' এবং *শাশ্বত ধর্ম গোপ্তা,* 'আপনি হলেন শাশ্বত ধর্মের রক্ষক।' *মতো মে,* অর্জুন বলছেন, 'এই হলো আমার উপলব্ধি'।

সাধারণ ধর্ম বা সম্প্রদায় আসে যায়, কিন্তু শাশ্বত ধর্ম একটিই, যার রক্ষাকর্তা স্বয়ং ভগবান। মানুষের তৈরি ধর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট ধর্ম চিরস্থায়ী। শাশ্বত ধর্ম বা সনাতন ধর্মের এই হলো অর্থ। ভারতবর্ষে আমরা মানুষের তৈরি ধর্মকে ঈশ্বর-রচিত বিশুদ্ধ ধর্মের থেকে পৃথক করে দেখি। কারণ এই বিশুদ্ধ ও চিরন্তন ধর্মের ভিত্তি হলো অন্তর্জীবনের সত্য। বিশেষ ধর্মমত বা সাম্প্রদায়িক মতগুলি মানুষ সৃষ্টি করতে পারে বটে; কিন্তু তারা কখনওই সকলকে তৃপ্ত করতে পারে না। আজ তারা মানুষের তৃপ্তিবিধান করলেও, আগামিকাল আর তা পারবে না। কাজেই বিভিন্ন ধর্মমত আসে, আবার চলেও যায়। কিন্তু এরই মধ্যে বেঁচে থাকে এক চিরন্তন ধর্ম, যার ভিত্তি হলো মানুষের সত্যিকার স্বরূপ, যার ভিত্তি হলো মানব-সম্ভাবনা বিকাশের বিজ্ঞান। একেই আমরা *সনাতন ধর্ম* বলি। পৃথিবীর সব ধর্মের মধ্যেই এই সনাতন ধর্মের অস্তিত্ব রয়েছে। শুধু তারা জানে না কোন্‌টি *সনাতন* এবং কোন্‌টি সাময়িক। আমরা কিন্তু জানি যে, আমাদের ধর্মের সাময়িক দিকগুলি যুগধর্মের অন্তর্গত, অর্থাৎ সেগুলি এক বিশেষ স্থানের, এক বিশেষ কালের উপযোগী; যুগের সঙ্গেই তাদের আসা-যাওয়া। তাই, সেই ধর্ম নষ্ট হলে আমরা শোক করি না। যেটি সনাতন ধর্ম সেটি ঠিক টিকে থাকে। যুগধর্ম মানবজীবনের খুঁটিনাটিগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সব কিছুকে নিয়ম ও নির্দেশের বাঁধনে বাঁধে। এই ধর্ম বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু যেটি শাশ্বত ধর্ম, তা অনির্বাণ, কারণ তার ভিত্তি হলো মানুষ সম্পর্কে পরীক্ষিত কিছু সত্য যার রক্ষাকর্তা স্বয়ং শ্রীভগবান। এই হলো *শাশ্বত ধর্মগোপ্তা* অর্থাৎ, 'সনাতন ধর্মের রক্ষাকর্তা'-র অর্থ।

এই *শাশ্বত ধর্মগোপ্তা* এবং *পুণ্যভূমি* ভারতবর্ষের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ষষ্ঠ শতকের মহাগ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবত* বলেছেন ঃ

'এই নয়টি বর্ষে (মহাদেশে), ভগবান নারায়ণ (যিনি হরি নামেও পরিচিত), এই মহাদেশগুলির অধিবাসীদের প্রতি করুণাবশত আজও নানারূপে আবির্ভূত হন।'(৫.১৭.১৪),

আবার 'এই ভারতবর্ষে, শ্রীভগবান যুগপৎ নর ও নারায়ণ রূপে সকলের অগোচরে বিচরণ করেন। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতি পরম অনুকম্পাবশত তিনি উচ্চ নৈতিকতা, প্রজ্ঞা, ত্যাগ, শক্তি, আত্ম-সংযম এবং অহংশূন্য তপোময় জীবনচর্যার মাধ্যমে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করার জন্য এই কল্পের (ব্রহ্মার একদিন) শেষ পর্যন্ত বিরাজিত থাকবেন।' পুনরপি (৫.১৯.৯),

আবার ঃ 'দেবতারা (স্বর্গের) ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন এইভাবে ঃ

'অসাধারণ পুণ্যকর্মের দরুন, নাকি তাদের ওপর শ্রীহরির অহেতুক কৃপাবর্ষণের কারণেই এই জীবেরা (জীবাত্মারা) ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছেন, যে স্থান শ্রীহরির পূজা-অর্চনার জন্য সর্ব বিষয়ে অনুকূল? আহা, আমরাও যেন এই ভারতে জন্মাবার সুযোগ পাই!' (৫.১৯.২১),

আবার ঃ 'যদি এই স্বর্গসুখ ভোগ করার পরেও আমাদের কিছু পুণ্যকর্ম অবশিষ্ট থাকে, তবে তারই পুণ্যফলে, আপনার প্রতি ভক্তিতে অনন্যমনা হয়ে, আমরা যেন মহাপবিত্র অজনাভ (ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন নাম) নামক এই দেশে জন্মগ্রহণ করতে পারি।' (৫.১৯.২৮)

গীতার পরবর্তী শ্লোকে অর্জুন বলছেন ঃ

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

—'অনন্ত বীর্য, অনন্ত বাহুবিশিষ্ট, আদি-মধ্য-অন্তহীন আপনাকে আমি দেখছি; চন্দ্র এবং সূর্য আপনার দুটি চোখ, প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ আপনার মুখ, তার তেজে সমগ্র জগৎকে তপ্ত করছে।'

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের দেখানো বিশ্বরূপের স্তব করছেন। *অনাদি-মধ্য-অন্তম্*, দেখছি আপনি 'আদি, মধ্য এবং অন্তহীন'; *অনন্ত বীর্যম্*, 'অনন্ত শক্তিসম্পন্ন'; এবং *অনন্ত বাহুম্*, 'অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট'; *শশি সূর্য নেত্রম্*, 'চন্দ্র এবং সূর্য আপনার দুটি চোখ'; *দীপ্ত হুতাশ বক্ত্রম্*, 'প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ আপনার মুখ'; *স্বতেজসা বিশ্বম্ ইদং তপন্তম্*, 'তার তেজরাশি দ্বারা জগৎকে তপ্ত করছে'।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥

—'স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী স্থান এবং সব দিক আপনার দ্বারাই পরিপূর্ণ হয়ে আছে; হে মহাত্মা, আপনার এই বিস্ময়কর এবং ভয়ংকর মূর্তি দেখে ত্রিলোক ভয়ে কাঁপছে।'

আপনার এই রূপ সব কিছুকে পূর্ণ করে রয়েছে; এই পৃথিবী থেকে অতিদূর

মহাশূন্য পর্যন্ত সকল দিক একমাত্র আপনার দ্বারাই পূর্ণ। শ্রীভগবানের এই অতি অদ্ভুত এবং ভয়ংকর রূপ দর্শন করে ত্রিলোক ভয়ে কাঁপছে।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

—'দেবতারাও আপনার ভিতরেই প্রবেশ করছেন; কেউ কেউ ভীত হয়ে যুক্ত করে আপনার স্তব করছেন; "কল্যাণ হোক" বলে মহর্ষি এবং সিদ্ধরাও চমৎকার স্তবের দ্বারা আপনার স্তুতি করছেন।'

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি, 'এই সব দেবতারা দলে দলে আপনার মুখ গহ্বরে প্রবেশ করছেন'। মুখের মধ্যে প্রবেশ করার অর্থ মৃত্যু ওঁদের উদরস্থ করছে। *কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি,* 'কেউ কেউ ভীত হয়ে করজোড়ে আপনার স্তুতি করছেন।' *স্বস্তি ইতি উক্ত্বা মহর্ষি সিদ্ধ সঙ্ঘাঃ,* ' "জগতের কল্যাণ হোক", "জগতের কল্যাণ হোক" বলে মহর্ষি ও সিদ্ধগণ'; *স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ,* 'চমৎকার স্তবের দ্বারা আপনার স্তুতি করছেন।'

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২ ॥

—'রুদ্র, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎগণ, উষ্মপাগণ এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর এবং সিদ্ধগণ, সকলেই স্তব্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আপনাকে দর্শন করছেন।'

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে—রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ, উষ্মপা (পিতৃগণ), প্রভৃতি দিব্যসত্তাগুলি ছাড়াও গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর এবং সিদ্ধগণের কথাও বলা হয়েছে। *বীক্ষন্তে ত্বাং,* 'তাঁরা সকলেই আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন,' *বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে,* 'গভীর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে।'

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩॥

—'হে মহাবাহো, আপনার অসংখ্য মুখ এবং চোখ, অসংখ্য বাহু, উরু ও চরণ, অসংখ্য উদর এবং অসংখ্য দন্তবিশিষ্ট ভয়ানক এই বিরাট রূপ দর্শন করে সর্বলোক এবং আমিও অত্যন্ত ভীত।'

'আমিও!' একক বিশ্ব দর্শন করে যাঁরা ভীত, তাঁদের সঙ্গে অর্জুন নিজেকেও যুক্ত করলেন। যেহেতু, আমাদের সকলেরই দুটি চোখ এবং পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রাণী আছে, সেইহেতু সব মিলিয়ে কোটি কোটি চোখও আছে। তাই বলা হচ্ছে 'বহু মুখ, বহু চোখ' ইত্যাদি। এখানে সমগ্র বিশ্বকে একটি সত্তারূপে দেখা হচ্ছে। সংস্কৃতে এই সত্তাকে আমরা বলি *বিরাট স্বরূপ। বিরাট* মানে বিশ্বজনীন। এর ঠিক বিপরীত হলো *ব্যক্তি,* বা 'ব্যষ্টিরূপ'। আমরা কেবল গুটিকয়েক ব্যক্তিকেই দেখি; আমাদের দৃষ্টি সমষ্টি বিশ্বের ধারণা করতে পারে না। এখানে অর্জুনকে সেই দৃষ্টিশক্তি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমষ্টিরূপ তাঁকে ভীত করেছে। কী ভয়ানক দৃশ্য রে বাবা! সমগ্র বিশ্ব এই একটি শরীরে! তাই অর্জুন বলছেন, 'আমিও ভীত হয়েছি'। *দৃষ্টা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ,* 'যা দেখে সমগ্র জগৎ ভীত'; *তথা অহম্,* 'আমিও তদ্রূপ'; 'আমিও খুব ভয় পেয়েছি'।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্টা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

—'হে বিষ্ণু, আপনাকে গগনস্পর্শী, বহুবর্ণপ্রদীপ্ত, বিস্ফারিত মুখবিশিষ্ট এবং বিশাল অগ্নিপ্রভ চক্ষুযুক্তরূপে দর্শন করে আমার হৃদয় ত্রস্ত হয়েছে এবং আমি সাহস ও শান্তি পাচ্ছি না।'

নভঃস্পৃশম্, 'গগনচুম্বী'। গীতার এই বিশেষ শব্দসমষ্টি ভারতীয় বায়ুসেনা তার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে। *দীপ্তম্,* 'উজ্জ্বল'; *অনেক বর্ণম্,* 'বহু বর্ণরঞ্জিত'; *ব্যাত্ত আননম্,* 'বিস্ফারিত মুখবিশিষ্ট'; *দীপ্ত বিশালনেত্রম্,* 'আয়ত এবং দীপ্ত চক্ষুবিশিষ্ট'; *দৃষ্টা হি ত্বাং প্রব্যথিত অন্তরাত্মা,* 'আপনাকে দর্শন করে আমার অন্তরাত্মা ভীত হচ্ছে'; *ধৃতিং ন বিন্দামি,* 'আমি মনে সাহস পাচ্ছি না'; *শমং চ,* 'আমি শান্তিও পাচ্ছি না'; *বিষ্ণো,* 'হে বিষ্ণু'।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

—'আপনার ভয়াল দন্তবিশিষ্ট (লেলিহান) প্রলয়াগ্নিতুল্য মুখগুলি দেখে আমি দিশাহারা, শান্তি পাচ্ছি না; হে দেবেশ, হে জগতের আশ্রয়, প্রসন্ন হন।'

'প্রলয়-অগ্নির মতো উজ্জ্বল'—একথার বিশেষ তাৎপর্য আছে। প্রলয়ের সময়ে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হবে। সেই আগুন সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করবে।

আজকের নভোবস্তুবিদ্যাও বলে, এই সূর্য ক্রমশ প্রসারিত হয়ে সৌরজগতের সব গ্রহগুলিকে খেয়ে ফেলবে। কেবল সৌরজগতেরই যে এই ভবিতব্য তা নয়, সমগ্র বিশ্বেরই একই দশা হবে। প্রলয়ের সময়, *কাল অনল*, 'কালের অগ্নি' জ্বলে উঠবে এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু আত্মসাৎ করবে। অর্জুন বলছেন, পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, 'কোনকিছুই আমি ঠাহর করতে পারছি না, আমি দিগ্‌ভ্রান্ত' এবং 'আমি শান্তিও পাচ্ছি না, আপনি প্রসন্ন হন।' অর্জুন ভীত হয়েছেন, তাই শ্রীভগবানের কাছে শান্তি প্রার্থনা করছেন।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাঽসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥

—'ধৃতরাষ্ট্রের এই সকল পুত্ররা ভীষ্ম, দ্রোণ, সূতপুত্র ও রাজন্যবর্গ এবং আমাদের পক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরেরা...'

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

—'দ্রুতবেগে আপনার করাল দন্তবিশিষ্ট ভীষণদর্শন মুখগহ্বরে প্রবেশ করছেন। তাঁদের কারও কারও মস্তক চূর্ণিত হয়ে আপনার দন্তসন্ধিস্থলে সংলগ্ন হয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে।'

এই শ্লোকে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করা হয়েছে। এই যুদ্ধে কী ঘটবে, এখানে তারই পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে। অর্জুন বলছেন, রাজন্যগণ এবং যুদ্ধনায়কেরা আপনার মুখগহ্বরে প্রবেশ করার জন্য দ্রুতবেগে ধাবমান। *দংষ্ট্রাকরালানি*, 'গজদন্ত' এবং অন্যান্য দন্তে পূর্ণ'; *ভয়ানকানি*, অর্থাৎ 'ভীষণদর্শন'। এই দাঁত সব কিছুকে চিবিয়ে ফেলবে। কোন কিছুই বাদ যাবে না। *কেচিৎ বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ*, 'তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ চর্বিত হয়ে দাঁতের ফাঁকে লেগে আছেন। এখানে-সেখানে সেই পরাক্রান্ত বীরদের শরীরের দুই-এক টুকরো লেগে আছে মাত্র'। একথা বলার অর্থ এই যে, তাঁরা সব মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছেন। জ্বলন্ত মানবিক ভাষায় মানুষের ভবিতব্যের ছবিটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে মহাভারতে একটি শ্লোক আছে ('উদ্যোগপর্ব', ১২৬.৩১ ভাণ্ডারকার সংস্করণ)। সংকটময় পরিস্থিতি দেখে শ্রীকৃষ্ণকে ভীষ্ম

বলছেন, 'হে কৃষ্ণ, আমি দেখতে পাচ্ছি কৌরবরা এবং অন্যান্যরা সকলেই কাল অর্থাৎ মৃত্যুর মুখে ধেয়ে যাচ্ছেন। এ থেকে তাদের পরিত্রাণ নেই বলেই আমার মনে হচ্ছে।' সম্ভবত দিল্লী দূরদর্শনে যে 'মহাভারত' সিরিয়ালটি দেখানো হচ্ছে, এই মন্তব্যটি সেখানেও উদ্ধৃত করা হয়েছে। ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন—সমগ্র কৌরব বংশ ধ্বংস হতে চলেছে। তার কারণ, আমরা পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়েছি। এই বিনাশের হাত থেকে কৌরবদের রক্ষা নেই। একথা চিন্তা করে ভীষ্ম খুবই উতলা হয়ে পড়লেন। দুর্যোধনের প্রতি অন্ধ আসক্তিতে ধৃতরাষ্ট্রের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। ভীষ্ম তাই বলছেন, *কালপকম্ ইদং মন্যে সর্ব ক্ষত্রং জনার্দন,* 'হে জনার্দন! সমগ্র ক্ষত্রিয়জাতি *কাল পকম্,* অর্থাৎ কালগর্ভে বিলীন হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে'। কাল এবার তাদের খাবে।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥

—'নদীসমূহের বহু জলধারা যেমন সমুদ্র অভিমুখে প্রবলবেগে ধাবিত হয়, ঠিক সেইরকম নরলোকের ঐ বীরেরা আপনার ভয়ংকর জ্বলন্ত মুখগুলিতে প্রবেশ করছেন।'

ঠিক যেমন সাগরে বিলীন হবার জন্য নদীগুলির জলপ্রবাহ দুরন্ত গতিতে ছুটে যায়, তেমনি নরলোকের এই বীররা আপনার লেলিহান মুখবিবরে প্রবেশ করছেন। এই মুহূর্তে, ঠিক তাই ঘটছে। কেউ এই ঘটনার গতি রোধ করতে পারে না। নিত্যই এরকম ঘটে চলেছে।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

—'পতঙ্গরা যেমন কেবল বিনষ্ট হবার জন্যই দ্রুতবেগে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনি এইসব জীবরাও মৃত্যুর জন্যই দ্রুতগতিতে আপনার মুখে প্রবেশ করছে।'

এখানে আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। পতঙ্গরা আগুন দেখলেই মরার জন্য তার দিকে ধেয়ে যায়। তেমনি, এই জীবরাও কেবল মরার জন্যই আপনার মুখে প্রবেশ করছে। ঈশ্বরের দুটি দিক—পালন করা এবং সংহার করা। জীবন এবং মৃত্যু—একই। দুটিই ঈশ্বরের প্রকাশ। আমরা একটির কথা ভুলে গিয়ে

কেবল জীবনের কথাই ভাবি। কিন্তু জীবন এবং মৃত্যু একই পারমার্থিক সত্যের দুটি দিক। তাই, এই সব জীবন্ত প্রাণীই এখন প্রবলবেগে মৃত্যুর দিকে ধেয়ে চলেছে। কেউ এর গতিরোধ করতে পারে না।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥

—'আপনার প্রজ্বলিত মুখগুলি দ্বারা চতুর্দিকের সকল জগৎকে গ্রাস করে আপনি আপনার ওষ্ঠদ্বয় লেহন করছেন। হে বিষ্ণু, আপনার তীব্র প্রভা সমগ্র জগৎকে তেজে পূর্ণ করে দগ্ধ করছে।'

এখানে এক ভীষণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। *গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্,* 'চতুর্দিকের সকল জগৎকে গ্রাস করে'; *বদনৈঃ জ্বলদ্ভিঃ লেলিহ্যসে,* 'আপনার জ্বলন্ত মুখগুলি দিয়ে, আপনি আপনার ঠোঁটদুটি চাটছেন।' কেউ ঠোঁট কামড়ে ফেললে যেমন নিজের রক্ত নিজেই চোষেন, ঠিক সেইরকম। এরপর অর্জুন বলছেন, *তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসঃ তব উগ্রাঃ,* 'আপনার তীব্র প্রভা সমগ্র জগৎকে তেজে পূর্ণ করে'; *প্রতপন্তি বিষ্ণো,* 'হে বিষ্ণু, তাকে দগ্ধ করছে।'

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

—'এই উগ্রমূর্তি আপনি কে, আমাকে বলুন। হে পরমদেব, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি প্রসন্ন হোন। হে আদি পুরুষ, আমি আপনাকে জানতে ইচ্ছা করি। আপনার উদ্দেশ্য কি—আমি তা প্রকৃষ্টরূপে জানি না।'

অর্জুন এখন খুব নম্র হয়েছেন। তিনি শ্রীভগবানকে অনুনয় করে বলছেন, *আখ্যাহি মে কো ভবান্ উগ্ররূপো,* 'হে প্রভু, আপনি কে? আপনার এই অসাধারণ ভয়ংকর উগ্রমূর্তি সম্পর্কে দয়া করে আমাকে কিছু বলুন।' *নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ,* 'হে দেবশ্রেষ্ঠ, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি প্রসন্ন হোন।' *বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি ভবন্তম্ আদ্যম্,* 'আমি আপনার আদি জানতে ইচ্ছা করি।' *ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্,* 'আপনার কার্যকলাপ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না'। আপনার কার্য বুদ্ধির অগোচর।

এরপর শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথা আসছে—

শ্রীভগবান্ উবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান বললেন—'আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল। লোকসমূহকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আমি এখানে প্রকাশিত হয়েছি। এমনকি তোমাকে ছাড়াই [তুমি যুদ্ধ না করলেও] বিপক্ষ দলের সমবেত যোদ্ধারা কেউই জীবিত থাকবেন না।'

আমি হলাম সেই কাল যা সব কিছুকে গ্রাস করতে আসে। *লোকক্ষয়কৃৎ*, 'যা সমগ্র জগৎকে গ্রাস করে'; তাকেই বলা হয় কাল। এখন, *প্রবৃদ্ধঃ*, এই মহাকাল 'অত্যন্ত সক্রিয় হয়েছেন'; *ইহ প্রবৃত্তঃ*, এই মহাকাল 'এখানে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন'; *লোকান্ সমাহর্তুম্*, 'এই জগৎকে সংহার করতে।' *ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে*, 'তুমি যুদ্ধ না করলেও এরা কেউ জীবিত থাকবেন না'; *যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ*, 'এখানে অবস্থিত বিপক্ষদলের সৈন্য'। মৃত্যু তাদের গ্রাস করবে, সে জন্যই তারা চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

—'অতএব, [যুদ্ধার্থে] উঠে পড় এবং যশলাভ কর। শত্রু জয় করে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। হে অর্জুন, আমার দ্বারা তারা পূর্বেই নিহত হয়ে আছে; তুমি কেবল নিমিত্ত হও।'

মনে রাখবেন, যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ শুরু হবার আগে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাগুলি বলছেন। অর্জুন যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে চেয়েছিলেন। তিনি দুর্বল এবং শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে তা আমরা দেখেছি এবং সে সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোকে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ আবার অর্জুনকে শক্তির বাণী শুনিয়ে বলছেন, *তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ*, 'অতএব, উঠে দাঁড়াও', নিজেকে অসহায় দুর্বল ভেবে ভেঙে পড়ো না। হে অর্জুন, তুমি উঠে দাঁড়াও! *যশো লভস্ব*, 'যশ লাভ করো', যে যশে প্রতিটি যথার্থ মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার। বাধা, বিঘ্ন এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জীবনে মহৎ কিছু করার চেষ্টা কর—এই হলো গীতার বাণী। মহৎ কাজ করেই, আপনি যশের অধিকারী হন। হয়তো তার

জন্য মৃত্যুর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হতে পারে; কিন্তু তাতে কী? আমরা জানি মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তবুও তার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করি। আমরা যুদ্ধ করতে করতে হয়তো মৃত্যুমুখে পতিত হব; কিন্তু সংগ্রাম করার ফলে পৌরুষের মহিমা আমাদের করায়ত্ত হবে। এই দর্শন সমাজে বীরের জন্ম দেয়, যা আরাম, আয়েশ ও কুঁড়েমির দর্শন পারে না। এই হলো ট্র্যাজেডির মহত্ত্ব। এই জীবনটাই বিয়োগান্ত; সমস্যা ও সংগ্রামের রক্তক্ষয়ী নাটক। কিন্তু এই নাটকে যিনি বীর, তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে জীবনের সবরকম চাপ এবং সমস্যার মুখোমুখি হন। মহৎ কিছু করতে গিয়ে তিনি মৃত্যুকে বরণ করতেও কুণ্ঠিত হন না। এই হলো বীরের দর্শন। এই পৃথিবীকে মৃত্যুলোক বলা হয়। এই জীবন এক রণক্ষেত্র। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তেই এখানে সেখানে মানুষের মৃত্যু ঘটছে। কিন্তু মৃত্যুই যদি আমাদের অবধারিত পরিণতি, তবে মহৎ কিছু করতে করতে মৃত্যুকে বরণ করি না কেন? এটিই চ্যালেঞ্জ। বিছানায় শুয়ে মরবো কেন? শয্যা-মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের শোভা পায় না। প্রাচীন ভারতে এটাই নিয়ম ছিল। মরতে হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা কর্মক্ষেত্রে অথবা অসহায় ও দুর্বল মানুষের সেবা করতে গিয়ে মরাই বাঞ্ছনীয়। এই বীরত্বব্যঞ্জক দর্শনই ভারতবর্ষ আমাদের শিখিয়েছিল। কিন্তু গুটিকয়েক ব্যতিক্রমী মানুষ ছাড়া বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে আমরা তা ভুলে গিয়েছিলাম। সুখ এবং আরামের জীবন খুঁজতে গিয়ে আমরা হীন এবং মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলাম। মৃত্যু তো একবার আসবেই, কিন্তু তার আগে আবার আর এক মৃত্যুকে আহ্বান করা কেন? শেক্সপীয়ার তাঁর জুলিয়াস সিজার নাটকে (২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) বলেছেন ঃ

'কাপুরুষেরা মৃত্যুর আগেই বহুবার মরে; কিন্তু বীরপুরুষ একবারই মারা যান।'

এই বীরোচিত দৃষ্টিভঙ্গিই গীতার মূল বাণী। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বীর হয়ে উঠুন। বীর হওয়ার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার প্রয়োজন নেই। সাধারণ নাগরিকও বীর হতে পারেন। মহৎ কাজের মধ্য দিয়ে বীরত্ব বা যোদ্ধার মনোভাব ফুটিয়ে তুলতে পারেন। সেই বালকের কথা ভাবুন, যে ডুবন্ত আর একটি ছেলেকে জল থেকে উদ্ধার করে। ভারত সরকার তার এই বীরত্বের জন্য তাকে পুরস্কৃতও করেন। ঘটনাটি কত সুন্দর, একবার ভেবে দেখুন তো! জীবনের অজস্র ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের বীর্যবত্তা দেখাতে পারি। কিন্তু বহুযুগ আগেই এই দর্শনকে জলাঞ্জলি দেওয়ায় আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণমনা হয়ে পড়েছি।

আমরা সুখকর, আরামপ্রদ জীবন চেয়েছি, আর তাতেই আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। হাজাররকম পথে মৃত্যু আমাদের আক্রমণ করছে। কিন্তু বীর হলে মৃত্যু একবারই আপনার কাছে আসবে। মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই আপনি করুণরসের বীর নায়ক হয়ে যাবেন। গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলি এই বীরেরই জয়গান করেছে। মহাভারতেও এরকম বহু চরিত্র আছে, যাঁদের জীবনে বীরত্ব অথচ করুণরসের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সঙ্কট আসন্ন জেনেও তাঁরা পালিয়ে যাননি—বীরত্বের সঙ্গে সেই দুর্যোগের মোকাবিলা করেছেন। 'মৃত্যু আসুক। মৃত্যুকে আমরা গ্রাহ্য করি না। আমরা আমাদের আদর্শেই অবিচল থাকব।' এই ছিল তাঁদের মনোভাব। মহাবীর কর্ণ শেষদিকে জানতে পেরেছিলেন তিনি পাণ্ডবদের ভাই। কিন্তু জীবনে তিনি দুর্যোধনের প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন বলে তাঁর দৃঢ়সংকল্প ছিল যে, তিনি একমাত্র দুর্যোধনের পক্ষ নিয়েই যুদ্ধ করবেন। 'মৃত্যুকে আমি ভয় করি না'—এই ছিল তাঁর প্রত্যয়। আমাদের জীবনেও এমন অনেক কঠিন পরিস্থিতি আসে যখন অন্তরের যথার্থ শক্তির পরিচয় দিতে হয়।

খাওয়াপরা, সন্তান উৎপাদন, তারপর একদিন মরে যাওয়া—এ হলো পশুর জীবন। এতে বীরত্বের স্পর্শ কোথায়? স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদাই জোরের সঙ্গে বলতেন যে, ভারতবর্ষের উচিত এই বীরভাব জাগিয়ে তোলা। তিনি বারবার বলেছেন, 'তোমাদের দেশে আজ বীরের প্রয়োজন। অতএব, বীর হও।' এই যে বীরত্বের দর্শন, এতে দুঃখভোগ কোন সমস্যাই নয়। এই দর্শনের ভাব হলো—আমরা সবরকম কষ্টের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। একজন সৈনিক যদি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে, তবে সেই তেজ কেন প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে জেগে উঠবে না? কেবল সৈনিকের মধ্যেই বীরত্বের ভাব থাকলে হবে না। সাধারণ মানুষের মধ্যেও ঐ ভাব জাগ্রত হওয়া দরকার। তবেই জাতি হিসাবে আমরা মহত্ত্বের অধিকারী হতে পারব। কেবল আরাম ভোগ করে কোন জাত কখনওই বড় হতে পারে না।

অতএব, শ্রীকৃষ্ণের এই কথাগুলি যদি আজকের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা হয়, তবে তার অর্থ হবে : *তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ,* 'ভারতের সকল নাগরিক, তোমরা উঠে দাঁড়াও'। *যশো লভস্ব,* 'অর্জন করো সেই পৌরুষ, যা নিয়ে মানুষ গর্ব করতে পারে'। ওই পৌরুষ ছাড়া জীবনের মহিমা কোথায়! সেক্ষেত্রে আমাদের জীবন হয়ে উঠবে তুচ্ছ পশুর মতো, ভেড়ার মতো, সর্বদাই যে ভ্যা ভ্যা করে। এমনটি হয়ে আমাদের কাজ নেই। আমাদের প্রয়োজন শক্তিমান

সিংহের, যে গর্জন করে অরণ্য কাঁপিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কী ভাবে তা সম্ভব? *জিত্বা শত্রূন্,* 'শত্রুদের জয় করে'। অর্জুনের শত্রু ছিলেন কৌরবরা। আমাদের শত্রু হলো দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা, সামাজিক অবিচার। এইগুলি আমাদের শত্রু। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। প্রতিটি নাগরিককে অবশ্যই জেগে উঠতে হবে, এদের মুখোমুখি হয়ে এদের পরাস্ত করতে হবে। তারপর? *ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্,* 'আমাদের এই সমৃদ্ধ দেশে জীবন উপভোগ করুন।' যদি আমরা দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা, অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি দূর করতে পারি, যদি আমাদের গ্রামগুলি সুচারু এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে এবং যদি আমরা অর্থনৈতিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হই, তবে এরকম সমাজে বাস করা কত আনন্দেরই না হবে! কল্পনা করুন—আবর্জনাপূর্ণ বস্তিগুলি আর নেই; সেখানকার বাসিন্দাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে; তাদের কর্মসংস্থানও হয়েছে! যদি সম্মিলিত চেষ্টায় আমরা সমাজের এরকম উন্নতি করতে পারি, তাহলে বাঁচার আনন্দটাই কত বেড়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, *ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্,* 'সমৃদ্ধিশালী দেশকে উপভোগ কর'। এরই নাম সুখী, গৌরবময় পার্থিব মানবজীবন, যা স্বর্গসুখের তুলনায় অনেক ভালো। গীতায় এই কথাই বারবার বলা হয়েছে। এরপর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বম্ এব,* দেশের 'এই শত্রুদের আমি আগেই ধ্বংস করে রেখেছি।' মহাকালের এই কথার মর্মবাণী হলো—ভারতবর্ষ আধুনিক যুগে মহান হয়ে উঠবে। *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্,* 'এই যে বাস্তব উন্নতি ঘটতে চলেছে, তুমি কেবল তার নিমিত্ত হও'। নিয়তি বলছেন, 'ভারতবর্ষ উঠবে। সে তার দারিদ্র্য এবং অনগ্রসরতাকে জয় করবে।' এই হলো আধুনিক যুগে বিধির বিধান। শ্রীভগবান আগেই সেকথা বলেছেন। যন্ত্রস্বরূপ হয়ে এই মহান ধর্মযজ্ঞে অংশ নিয়ে আপনিও মহান ও যশস্বী হোন। *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্,* এই কথাটি আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ভারতবর্ষের অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতিকে প্রগতিশীল করে গড়ে তুলে, এক সুস্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটানোর মহৎ কর্মে আপনি যন্ত্রস্বরূপ হোন এবং বিশ্বশান্তির জন্য মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করুন। তা যদি করেন, তাহলে আর আমাদের জীবনে সুখের সীমা পরিসীমা থাকবে না। তখন আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কও কত না মধুর হবে। তখন আর অপরাধ, দুর্নীতি থাকবে না, প্রত্যেকেই দেহে-মনে সুস্থ। তখন আপনি আপনার বাড়ির দরজা হাট করে খুলে রাখতে পারবেন। কারণ চোরের উৎপাত নেই। এগুলি কিন্তু আকাশকুসুম কল্পনা নয়। এককালে এদেশ এরকমই ছিল। ভারতের ভাগ্যবিধাতা আজ প্রত্যেক

নাগরিকের কানে কানে এই কথাই বলছেন, এই নির্দেশই দিচ্ছেন। অতএব আমাদের সকলকেই এই নব অভ্যুদয়ের নিমিত্ত হতে হবে।

এই আহ্বান সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই। এই আধুনিক যুগ আমাদের সকলের কানে অস্ফুটস্বরে বলছে, 'প্রতিবেশিসুলভ আচরণের বাধাগুলিকে ভেঙে ফেলো; এমন এক ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব সৃষ্টি কর, যেখানে প্রত্যেক মানুষ একে অন্যের সঙ্গে একত্ব অনুভব করবে। সুখী বিশ্ব গড়ে তোলা চাই-ই চাই'। পাঁচহাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ যে-কথা বলেছিলেন, আজকের মানুষের কাছে সে কথার তাৎপর্য এই। একথা মোটেই বলবেন না যে, আমার দুর্ভাগ্য, আমি এক ছন্নছাড়া দেশে বা পৃথিবীতে জন্মেছি। কখনও না! উত্তিষ্ঠ! 'উঠে দাঁড়াও!' এই হলো শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা। অতএব উঠে পড়ে লাগুন। দিনরাত চোখের জল না ফেলে উঠে দাঁড়ান। আমাদের দেশের সত্যাগ্রহীরা কেন বিদেশী শাসকের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন? দিয়েছিলেন, তার কারণ সেই নির্ভয় আত্মত্যাগই তাঁদের কাছে গৌরবজনক মনে হয়েছিল। আজ আমরা তাই তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সেই তেজ আজ কোথায় গেল? আপনার আসল শত্রুরা বাইরে নেই, তারা আপনার নিজের ভিতরেই আত্মগোপন করে আছে। ভেবে দেখুন, কত অবিচার, আগাগোড়া কী দুর্নীতি, কত প্রবঞ্চনা এবং শতরকমের পাপ আজ আমাদের জীবনে প্রবেশ করেছে। এই সব পাপাচারের মুখোশ খুলে দিতে হবে, শুধরে দিতে হবে এইসব অসৎ প্রবণতা। তবে তার জন্য প্রয়োজন সুস্থ জনমত তৈরি করা। মহিলারা যদি রাত্রে স্বাধীনভাবে এবং নির্ভয়ে রাস্তায় চলাফেরা করতে না পারেন, যদি তাঁরা অফিস কাছারিতে নিরাপদে, উৎপীড়িত না হয়ে এবং আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে কাজ করতে না পারেন, তাহলে কোথায় গণতন্ত্র? স্বাধীনতাই বা কোথায়? স্বাধীনতা থাকবে তাঁদেরই, যাঁরা ক্ষমতাবান। তাই যদি হয়, সে ভারত হবে কলঙ্কিত ভারতবর্ষ। যদি সাধারণ মানুষ এর প্রতিবাদ না করেন, তবে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও জঘন্য হতে বাধ্য। মহাভারতের একটি শ্লোকে সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থার একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে (শান্তিপর্ব, ১২.৬৮.৩২, ভাণ্ডারকার সংস্করণ)। শ্লোকটি এই:

স্ত্রিয়শ্চাপুরুষা মার্গং সর্বালঙ্কারভূষিতাঃ।
নির্ভয়াঃ প্রতিপদ্যন্তে যদা রক্ষতি ভূমিপঃ ॥

—'যেখানে সুস্থ রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা চালু থাকে'—ভাষাটি লক্ষ্য করুন, এক *সুস্থ রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা*—'সেখানে বহু অলংকারে ভূষিতা মহিলারা

পুরুষ সঙ্গী ছাড়াই নগরের, শহরের এবং গ্রামের গলিতে ও রাজপথে নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারেন।'

একেই সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা বলা হয়। মহিলাদেরও স্বাধীন ব্যক্তি বলে গণ্য করা উচিত। তাঁদের অধিকারগুলিকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। তাঁরা কী করবেন না করবেন, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তাঁদের আছে। যদি সমাজে এই ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন বেশ কিছু মানুষ থাকে, তবেই সে সমাজ সুস্থ বলে পরিগণিত হতে পারে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বর্তমান অবস্থা সেরকম নয়। সেই অবস্থা থেকে আমরা অনেক, অনেক দূরে পড়ে আছি, কারণ ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ নিষ্ক্রিয়, মূল্যবোধহীন এবং সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবসম্পন্ন। 'সমস্যা আমার কাঁধে চেপে বসুক, তখন দেখা যাবে। যতক্ষণ সমস্যা অন্যকে পীড়িত করছে, ততক্ষণ আমার মাথাব্যাথা নেই'। হাজার বছর ধরে আমরা এইভাবেই চিন্তা করে এসেছি। যখন কোন বিদেশী হানাদার আমাদের কোন রাজ্য আক্রমণ করেছে, তখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের তাড়ানোর পরিবর্তে আমরা ভেবেছি 'আমার রাজ্য আগে আক্রান্ত হোক, তখন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে'। আমরা কখনওই আক্রান্ত প্রতিবেশী রাজ্যের পাশে গিয়ে দাঁড়াইনি। দু-একবার ছোটখাট চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই বলছিলাম, এ হলো ধ্বংসাত্মক মনোভাব। এর জন্য আমাদের দুর্ভোগও কম ভুগতে হয়নি। এখন কিছুটা গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। তাই, কোনরকম অন্যায়-অবিচার হলে, অনতিবিলম্বে আমাদের সম্মিলিত প্রতিবাদ জানাতে হবে। তার ফলে অবিচার নির্ঘাৎ অনেকটা কমে আসবে। প্রতিবাদ ছাড়া অবিচার বন্ধ করা যায় না। ভাববেন না যে, একা সরকারের পক্ষে অবিচার বন্ধ করা সম্ভব। কখনওই না। তাছাড়া বর্তমানে দুষ্কৃতিকারী এবং দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের রক্ষা করার প্রবণতাই সরকারের মধ্যে প্রায়শ দেখা যায়। এ অবস্থার প্রতিকার করতে হলে আমাদের গণতন্ত্রকে আরো বেশি সতেজ, সতর্ক এবং সক্রিয় হতে হবে। তা যদি হয়, তবেই আমরা সুস্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থা আশা করতে পারি।

বহু দেশেই আজ এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিন্তু জনগণ যদি একবার সচেতন হয়ে ওঠে, খুব কম সরকারই সেই চাপকে প্রতিরোধ করতে পারে। পাশ্চাত্যে গণতন্ত্রগুলির একটা সুবিধা এই, সেখানকার জনগণ শিক্ষিত। ফলে কেউ তাদের বড় একটা ক্ষতি করতে পারে না। সরকারি স্বৈরতান্ত্রিক অত্যাচারের কবল থেকে

ভারতবাসীর তুলনায় তারা অনেক বেশি মুক্ত। আমাদের সাধারণ মানুষকে তাই অতি অবশ্যই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে; অন্তত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। তাহলেই তারা তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে, তাদের নিজেদের ক্ষমতাকে, তাদের নিজেদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মর্যাদাকে উপলব্ধি করতে পারবে। তখন আর সরকার যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে না। কিন্তু বর্তমানে তারা তা করতে পারে, কারণ দেশের ভিতর কোনরকম বলিষ্ঠ, ব্যাপক ও স্বাধীন জনমত গড়ে ওঠেনি। তাই, সকল মানবজাতির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাণী দিয়েছেন, যে-বাণী আজকেও মানুষের কাছে প্রাসঙ্গিক। এখন পরিস্থিতি আরো ঘোরালো। অর্জুনকে একটি মাত্র ভয়ানক যুদ্ধই করতে হয়েছিল। কিন্তু এখানে দুর্নীতি, অবিচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন যুদ্ধ চলছে। কিন্তু বাণী সেই একই ঃ ওঠো, জাগো, তোমার শত্রুদের পরাস্ত করে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষে সুখে জীবনযাপন কর—*জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।*

শ্রীকৃষ্ণের বাণী সর্বদাই আমাদের পবিত্র করে, ভিতরের শক্তি জাগিয়ে দেয়। এটিই বেদান্তের বৈশিষ্ট্য। এই বাণী আমাদের নির্ভীক এবং শক্তিমান করে তোলে। আর কোন দর্শনেই এই ভাব আপনারা দেখতে পাবেন না। এই হলো বেদান্ত, যার মূল কথা *অভয়ম্* অর্থাৎ 'নির্ভীকতা'। গীতার পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ দৈবী সম্পদ অর্থাৎ 'মানুষের দিব্যগুণগুলি'র কথা আলোচনা করেছেন, সেখানে প্রথমেই তিনি *অভয়ম্*, অর্থাৎ 'নির্ভীকতা'র উল্লেখ করেছেন।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথাঽন্যানপি যোধবীরান্ ।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

—'দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য সকল বীর যোদ্ধা আগেই আমার দ্বারা হত হয়েছেন—এখন তুমি সেই মৃতদের বধ কর। ভীত ও ব্যথিত হয়ো না; যুদ্ধ কর এবং শত্রুদের জয় কর।'

শেষকালে শ্রীকৃষ্ণ নির্দিষ্ট করে দেখিয়ে বলছেন, এই দ্রোণ, এই ভীষ্ম, এই কর্ণ—এবং এই জয়দ্রথ, যিনি সিন্ধুদেশের অত্যন্ত শক্তিধর রাজা এবং বহু দুষ্কর্ম করেছেন। জয়দ্রথ প্রসঙ্গে একটু বলে রাখি। ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র এবং একটি কন্যা ছিল। জয়দ্রথ ছিলেন কুরুবংশের সেই একমাত্র কন্যার স্বামী। এই জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে অপহরণ করেছিলেন এবং তার জন্য পাণ্ডবদের কাছ থেকে শাস্তিও পেয়েছিলেন।

তথাঽন্যানপি যোধবীরান্, 'এবং যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যান্য মহান বীরেরা'; *ময়া হতান্*, 'তারা আমার দ্বারা আগেই হত হয়েছেন।' অর্থাৎ আমি পরমেশ্বর, কালরূপে তাদের ইতোমধ্যেই গ্রাস করেছি। *ত্বং জহি*, 'তুমি তাদের জয় কর'; *মা ব্যথিষ্ঠা*, 'ভয়ে ব্যথিত হয়ো না'; *যুধ্যস্ব*, 'যুদ্ধ কর'; *জেতাসি রণে সপত্নান্*, 'এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত শত্রুদের তুমি জয় করবে।'

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী ।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

সঞ্জয় বললেন—'কেশবের (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) এই কথা শুনে, কিরীটধারী (অর্জুন) যুক্ত করে, কম্পিত কলেবরে, নতমস্তকে এবং ভয়ে ভয়ে প্রণাম করে গদগদ স্বরে আবার শ্রীকৃষ্ণকে বললেন।'

এতৎ শ্রুত্বা বচনং কেশবস্য, 'শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনে'; *কৃতাঞ্জলিঃ বেপমানঃ কিরীটী*, 'কিরীটী অর্থাৎ অর্জুন কাঁপতে কাঁপতে জোড় হাতে,' *নমস্কৃত্বা*, তাঁকে 'নমস্কার করে'; *ভূয় এব আহ কৃষ্ণম্*, 'আবার শ্রীকৃষ্ণকে বললেন'; *সগদ্‌গদম্*, 'গদগদ স্বরে।' আপনি যখন আবেগে আপ্লুত হন, তখনই আপনার কণ্ঠস্বর এইরকম গদগদ হয়। তখন আপনি যা বলবেন, তা অর্জুনের মতো গদগদভাবে *সগদ্‌গদম্। ভীতভীতঃ*, 'ভয়ে ভয়ে'; *প্রণম্য*, 'তাঁকে প্রণাম করে'।

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জুন বললেন—'হে হৃষীকেশ, জগৎ যে আনন্দিত ও অনুরক্ত হয়ে আপনার বন্দনা করে এবং সকল সিদ্ধগণ শ্রদ্ধাবনত হয়ে আপনাকে প্রণাম করে, তা খুবই যুক্তিযুক্ত।'

অর্জুন বললেন, 'হে কৃষ্ণ, এই জগৎ যে আপনার গুণকীর্তন করে তৃপ্ত এবং আনন্দিত হয়, তা খুবই যুক্তিযুক্ত। রাক্ষসরা ভয়ে চতুর্দিকে পালাচ্ছে'। রাক্ষস বলতে বোঝায় সেইসব মানুষকে যাদের নৈতিকতার বালাই নেই। তাদের কর্মশক্তি আছে, ক্ষমতা আছে, কিন্তু কোনও নীতিবোধ নেই। যে-কোন দুষ্কর্ম তারা করতে পারে। এটাই রাক্ষস জাতির প্রকৃতি। তাই, মানুষ যখনই অন্যের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে, তাদের সুখ-সমৃদ্ধি ধ্বংস করতে প্রয়াসী হয়, তখনই

সে রাক্ষসপদবাচ্য। এখানে বলা হচ্ছে—হে কৃষ্ণ, তোমার ভয়ে রাক্ষসরা চতুর্দিকে পালাচ্ছে। কিন্তু সিদ্ধরা কী করছেন? তাঁরা ভীত হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রণাম করছেন। এই সিদ্ধরা দিব্যগুণসম্পন্ন সত্তা। তাঁদের শুভ সংস্কার আছে। এই কারণেই তাঁরা আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছেন।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ॥ ৩৭॥

—'হে মহাত্মা, হে অনন্ত, হে দেবপতি, হে জগতের আশ্রয়, আপনি ব্রহ্মার থেকে গরীয়ান, আপনি আদি কারণ—কেন সকলে আপনাকে নমস্কার করবেন না? আপনি হলেন অক্ষর ব্রহ্ম, সৎ এবং অসৎ (এবং সেই সঙ্গে) (তাদের) অতীত যা কিছু, তা-ও আপনি।'

অর্জুন প্রশ্ন করছেন, *কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্,* 'কেনই বা তাঁরা আপনাকে প্রণাম করবেন না, হে মহাত্মন্?' *মহাত্মন্,* মানে মহাত্মা। *গরীয়সে,* 'আপনি মহত্তর'; *ব্রহ্মণোঽপি আদিকর্ত্রে,* 'এমনকি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও আদি কারণ।' *অনন্ত দেবেশ,* 'সকল জীব এবং দেবতাদের অনন্ত প্রভু'; *জগন্নিবাস,* 'জগতের আশ্রয়।' তিনি কেবল বাইরেই নেই, তিনি ভিতরেও রয়েছেন। হে কৃষ্ণ, আপনি এই জগতের আধার। *ত্বম্ অক্ষরম্,* 'আপনি হলেন অবিনাশী ব্রহ্ম'; *সৎ অসৎ তৎপরং যৎ,* 'আপনি কারণ, আপনিই কার্য এবং আপনিই আবার সকল কার্য-কারণের অতীত'; *সৎ* হলো কার্য, *অসৎ* হলো কারণ। যাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, যা অব্যক্ত, তা হলো *অসৎ।* কারণকে দেখা যায় না, তাই কারণ *অসৎ* এবং কার্যকে দেখা যায়, তাই কার্য হলো *সৎ*। সুতরাং, 'আপনি কার্য এবং কারণ এবং এই কার্য-কারণের অতীত যা, তা-ও আপনি।'

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥ ৩৮॥

—'আপনি আদিদেব, সনাতন পুরুষ, আপনি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। আপনি জ্ঞাতা এবং জ্ঞাতব্য (বিষয়)। আপনিই পরম লক্ষ্য। হে অনন্তরূপ, এই বিশ্ব আপনার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত।'

ত্বম্ আদিদেবঃ পুরুষঃ, 'আপনিই আদিদেবতা পরমপুরুষ'; সকল দেবতাদের মধ্যে প্রথম দেবতা আপনিই। *আদিদেব* অর্থাৎ 'অনাদি পুরুষ';

আপনিই সেই *পুরুষ*। *পুরাণঃ,* অর্থাৎ 'প্রাচীন'। *ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্,* 'আপনি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়'; *বেত্তাসি বেদ্যং চ,* 'আপনি জ্ঞাতা এবং আপনিই জ্ঞেয়'। ভাষাটি লক্ষ্য করুন। *বেত্তা* মানে 'জ্ঞাতা'। *বেদ্যং* মানে 'জ্ঞেয়'। আপনি জ্ঞাতা, আপনিই জ্ঞেয়। একমাত্র সেই অবস্থাতেই এই উপলব্ধি হতে পারে যে, আমি এই জগতের জ্ঞাতা, কিন্তু আমি এই জগৎ নই। কিন্তু আমার সত্য স্বরূপে আমি জ্ঞাতা এবং জ্ঞাতব্য দুই-ই। *পরং চ ধাম,* 'সেই পরম অবস্থাটিও আপনিই'। *ত্বয়া ততং বিশ্বম্* 'আপনার দ্বারাই এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত।' *অনন্তরূপ,* অর্থাৎ 'অনন্ত রূপের আধার'—এই হলো আপনার সত্য পরিচয়।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

—'আপনিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ। প্রণাম, আপনাকে প্রণাম, সহস্রবার এবং বারবার প্রণাম, আপনাকে প্রণাম করি।'

আপনি হলেন বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ। ব্রহ্মা হলেন পিতামহ এবং পরমেশ্বরকে বলা হয় প্রপিতামহ। আপনাকে প্রণাম করি, সহস্রবার প্রণাম করি! বারবার প্রণাম করি, আপনাকে প্রণাম জানাই! সহস্র বার প্রণাম এবং বারবার প্রণাম! ভক্তিতে গদগদ অর্জুন তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই কেবলই বলছেন, 'আপনাকে সহস্র প্রণাম।'

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব ।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০ ॥

—'হে সর্বস্ব, সামনে এবং পিছনে আমি আপনাকেই নমস্কার করি, সব দিকেই আমি আপনাকে নমস্কার করি। অনন্ত বীর্য এবং অনন্ত শৌর্যের অধিকারী আপনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাই আপনিই সর্বস্বরূপ।'

নমঃ পুরস্তাৎ, আমার 'সম্মুখস্থ আপনাকে নমস্কার।' কিন্তু তিনি কেবল সামনেই আছেন তা নয়। *অথ পৃষ্ঠতস্তে,* 'এবং পিছনেও আপনাকে' নমস্কার। *নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব,* 'সর্বত্র এবং সর্বরূপে আপনাকে নমস্কার।' *অনন্তবীর্য অমিত বিক্রমস্ত্বম্,* 'আপনি অনন্ত বীর্যের অধিকারী এবং অমিত বিক্রমশালী'। *সর্বং সমাপ্নোষি,* 'আপনি সব কিছু আবৃত করে আছেন';

ততোঽসি সর্বঃ, 'তাই, আপনিই সব'। আহা কী কথা! আপনি সব কিছু ছেয়ে আছেন; অতএব, আপনিই সব। তাৎপর্য এই, এই ব্যক্ত বিশ্ব পরম ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। মুণ্ডক উপনিষদ-এর একটি শ্লোকে (২.২.১১) আছে *ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্* অর্থাৎ 'এই প্রত্যক্ষ জগৎ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই'।

পরের শ্লোকটি অতি সুন্দর। অর্জুন এখন টের পেয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব তিনি সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন নি; এতদিন পর্যন্ত কৃষ্ণকে তিনি তাঁর সখারূপেই জানতেন। কিন্তু এখন তিনি দেখছেন যে তাঁর সখা তো সামান্য নন; বস্তুত তিনি একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব—কী বিরাট, কী দিব্য মহিমা তাঁর! তাই পরবর্তী দুটি শ্লোকে অর্জুন অনুশোচনা প্রকাশ করে বলছেন ঃ

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥

—'আপনার এই মাহাত্ম্য না জেনে, শুধু আমার সখা মনে করে, অসাবধান বা প্রণয়বশত অশোভনভাবে আপনাকে "হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা", এইরকম যেসব সম্বোধন করেছি।'

এতগুলো বছর বন্ধুর মতো আমি আপনার সঙ্গে মিশেছি। *সখেতি মত্বা*—আমি 'আপনাকে সখা ভেবে' কত কি করেছি! *প্রসভং যদুক্তম্,* ' নির্বোধের মতো বলেছি; *হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে,* 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে বন্ধু!' কী করে আমি এমন সব কথা বলতে পারলাম? *অজানতা মহিমানং তবেদম্,* 'আপনার এই [বিশ্বরূপের] মহিমা বা মহত্ত্বের কথা না জেনে।' আপনার এই প্রচণ্ড মহিমা সম্পর্কে আমি একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম। আমি আপনাকে আমারই মতো এক সাধারণ মানুষ মনে করেছিলাম; অথবা *ময়া প্রমাদাৎ,* 'আমার ভ্রমবশত'; অথবা *প্রণয়েন বাপি,* 'প্রণয়বশত'; বন্ধুর মতো ভালবেসে, আপনার সঙ্গে আমি ইচ্ছামতো ব্যবহার করেছি।

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

—'হে অচ্যুত, ভ্রমণকালে, শয়নে, উপবেশনে, অথবা ভোজনকালে, একাকী (আপনার সঙ্গে) অথবা আত্মীয় বন্ধুগণের উপস্থিতিতে, যেভাবেই হোক, আমি আপনার প্রতি কৌতুকছলে যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছি, সেজন্য, হে অপ্রমেয়, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

অর্জুন বলছেন, তৎ *ক্ষাময়ে ত্বাম্,* এইসব কিছুর জন্য 'আমাকে মার্জনা করুন'। এই সব কিছু বলতে কী বোঝাচ্ছেন? *যৎ চ অবহাসার্থম্ অসৎকৃতোঽসি,* 'পরিহাসছলে এবং কৌতুকছলে যা আমি আপনাকে বলেছি'; আপনার মহিমা না জেনে কখনও কখনও আমি আপনার সঙ্গে কৌতুক করে আপনার অমর্যাদা করেছি। অর্জুন এখানে সরল স্বীকারোক্তি করছেন। বলছেন—*বিহার শয্যা আসন ভোজনেষু,* 'বেড়াতে গিয়ে, শুয়ে, বসে অথবা খাওয়াদাওয়ার সময়'; *একঃ অথবা অপি,* 'আবার যখন একাকী আপনার সঙ্গে থেকেছি, তখনও'। সব পরিস্থিতিতেই আমি আপনাকে বন্ধু মনে করেছি এবং সেই মতোই আচরণ করেছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমি কী ভুল করেছি! আপনি যে এত বিশাল, মহিমময় তা একটু আগে পর্যন্ত আমি টের পাইনি। হে অপ্রমেয়, হে অনন্ত, আপনার প্রতি আমার এই শিশুসুলভ আচরণ ক্ষমা করুন। অর্জুন মহান ছিলেন, সন্দেহ নেই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মহত্তম। তবুও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মতো আচরণ করতেন। এটিও দেখার মতো। মহাভারতের নানা জায়গায় ওঁদের দুজনের বন্ধুত্বের বর্ণনা পাবেন। অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ যেন হরিহর আত্মা। তাঁদের দুজনার মধ্যে এইরকম সম্পর্কই ছিল। কিন্তু এখন অর্জুন দেখছেন, ব্যাপারটা তো ঠিক তা নয়!

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্ ।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩॥

—'আপনি এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের পিতা; আপনি পূজ্য এবং মহতের থেকেও মহত্তর। এই ত্রিলোকে আপনার সমকক্ষ কেউ নেই; তাহলে হে অতুলনীয় শক্তিধর, আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কে থাকতে পারেন?'

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য, 'আপনি এই চরাচর বিশ্বের পিতা'; *ত্বমস্য পূজ্যশ্চ,* এই বিশ্বে 'আপনিই পরম পূজনীয়'; *গুরুগরীয়ান্,* 'আপনি এই জগতের মহাগুরু'। *ন ত্বৎ সমো অস্তি,* 'আপনার সমকক্ষ কেউ নেই'; *অভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো,* 'আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে হতে পারে?' আপনার সমকক্ষই কেউ নেই; তাহলে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে হতে পারে? *লোকত্রয়েঽপি,* 'ত্রিভুবনে', আপনিই শ্রেষ্ঠ। *অপ্রতিমপ্রভাব,* 'আপনার শক্তি ও মহিমা অতুলনীয়'। আপনি অদ্বিতীয়।

অর্জুন এখন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রমেয় দিকটি অনুভব করছেন। এই অনুভবের

কথা আমরা এই একাদশ অধ্যায়ে পাচ্ছি। বস্তুতপক্ষে অর্জুন এখন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করছেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এই বিরাট রূপ সংবরণ করে নেবেন এবং অর্জুনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক আবার সেই আগের মতোই চলতে থাকবে। এ যেন সাময়িক বিরতি। কারণ, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মহাভারতের 'উদ্যোগপর্ব' শুরু হবে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হবে। ঠিক যে সময়ে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষের দূত হয়ে কৌরবদের রাজসভায় যাবেন, সেই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাঠালেন পাণ্ডবশিবিরে, সেখানকার ব্যাপার-স্যাপার দেখে আসার জন্য। সঞ্জয় অর্জুনের শিবিরে প্রবেশ করে অবাক হয়ে দেখলেন, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কোলে পা তুলে দিয়ে শুয়ে আছেন! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের অন্তরঙ্গতা বোঝার জন্য এর থেকে ভালো ছবি আর কী হতে পারে? এই চমকপ্রদ দৃশ্য দেখে সঞ্জয় ফিরে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন, 'আপনার পুত্র দুর্যোধনের আর এই যুদ্ধে জেতার কোন আশা নেই। ওর পরাজয় অনিবার্য। অমিত শক্তিধর শ্রীকৃষ্ণের কোলে যদি অর্জুন পা তুলে দিতে পারেন, তাহলে আর কৌরবদের জেতার আশা কোথায়?'

এরকম দৃষ্টান্ত পরেও দেখা যাবে। বিশ্বরূপ দর্শনের ঘটনাটি কেবল মাঝখানে ঘটে গেল। যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে অর্জুন দেখতে চাইলেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁর ভাগবতীরূপ দেখালেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর এই অর্জুনই বলবেন, 'আমি আর আপনার এই বিশাল, ভয়ংকররূপ দেখতে চাই না! আপনার যে রূপের সঙ্গে আমি পরিচিত সেই রূপটিই দেখতে চাই!' তখন আবার শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অসাধারণ রূপ সংবরণ করে সাধারণ রূপেই দর্শন দিলেন। এরকমই হয়। প্রায়ই দেখা যায় আমরা দিব্যদর্শনের উপযুক্ত নই। ভগবানকে দেখার আগ্রহ নিয়েই শুরু করি। কিন্তু কোনক্রমে একবার দর্শন পেলে, তখন আবার বলি 'কৃপা করে এই অনুভূতি ফিরিয়ে নিন'। আজও মানুষ দিব্য দর্শনের গুরুত্বের কথাটি বোঝে না বলেই বলে, 'আমি ঈশ্বরদর্শন করতে চাই'। কিন্তু, একবার এই ঈশ্বরদর্শন হলে কাজকর্ম সব লাটে ওঠে। এই অবস্থায় আপনি জাগতিক কোন কাজ করতে পারবেন না। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পরিচালক, রানী রাসমণির জামাই মথুরবাবুও শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এরকম প্রার্থনা করে বলেছিলেন, 'দয়া করে আমাকে ঈশ্বরদর্শন করিয়ে দিন। আমি আপনার এত সেবা করি'। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বোঝালেন, 'সময় হলে ওসব হবে'। কিন্তু মথুরবাবু নাছোড়বান্দা। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বারবার একই অনুরোধ করতে থাকেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'মা, ওকে কিছু অনুভূতি দাও'। হলোও তাই।

কিছুদিনের মধ্যেই এক দৈব আবেশ মথুরবাবুকে গ্রাস করল। তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, সর্বদাই যেন কিছু দেখছেন। দিন কয়েক এইভাবে কাটল। তাঁর কাজকর্ম সব বন্ধ। কোন কাজই এগোয় না। মথুরবাবুও ব্যাপারটি বুঝলেন। তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে বললেন, 'বাবা, তোমার এইসব ভাবটাব ফিরিয়ে নাও। আমার কাজকর্মের ক্ষতি হচ্ছে। আমার আর এই ভাবের দরকার নেই।' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম। সময় হলে এইসব ভাবটাব আপনিই হয়। জোর-জবরদস্তি করে কিছু হয় না'। এরপর থেকে মথুরবাবুর দর্শন-টর্শন বন্ধ হলো। ধর্ম জীবনে এরকম প্রায়শই ঘটতে দেখা যায়। সাধারণ মানুষ না বুঝেই বলে বসে 'আমার এটা চাই, ওটা চাই'। আমরা বুঝি না যে, সময় হলে অনুভূতি আপনিই আসে। ধাপে ধাপে অধ্যাত্মজীবন গড়ে তুলতে হয়। দিব্য অনুভূতি সহ্য করবার উপযুক্ত করে স্নায়ুগুলিকে শক্ত-সমর্থ করে গড়ে তুলতে হয়। তা না হলে, দেহ-মন ভেঙে পড়বে। এসব পরীক্ষিত সত্য। তাই, সব থেকে ভালো, দৃঢ় অচঞ্চল পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া। কেউ কিছু দেখেছেন, অতএব আমাকেও তা দেখতে হবে— এই মানসিকতা ঠিক নয়। এখানে অর্জুনেরও সেই অবস্থা।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ ।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্ ॥ ৪৪ ॥

—'হে পূজনীয় দেব, শ্রদ্ধার সঙ্গে দণ্ডবৎ হয়ে তাই আমি আপনার ক্ষমাভিক্ষা করছি! পিতা যেমন পুত্রকে ক্ষমা করেন, বন্ধু যেমন বন্ধুকে, প্রেমিক যেমন তার প্রেমাস্পদকে (ক্ষমা করে), সেইভাবে, আপনিও আমাকে মার্জনা করুন।'

শেষে অর্জুন আত্ম-নিবেদন করছেন এই বলে, 'হে পরম প্রভু, আমার দেহকে শ্রদ্ধাবনত করে আমি আপনার মার্জনা প্রার্থনা করছি। পিতা যেমন পুত্রকে মার্জনা করেন, সখা যেমন তার প্রিয় সখাকে মার্জনা করে, প্রেমিক যেমন তার প্রেমাস্পদকে মার্জনা করে, তেমনি করেই, হে দেব, আপনি আমাকে মার্জনা করুন।' ভারী সুন্দরভাবে অর্জুন এখানে তাঁর মনের ভাবটি তুলে ধরেছেন।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

—'অদৃষ্টপূর্ব [আপনার এই রূপ] দর্শন করে আমি অত্যন্ত পুলকিত, তবুও আমার মন ভয়ে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। হে দেব! আপনি আমাকে কেবল আপনার

সেই (পরিচিত) মূর্তিই দেখান। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আপনি প্রসন্ন হন।'

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা, 'এই অদৃষ্টপূর্ব রূপ দর্শন করে আমি অত্যন্ত পুলকিত'; *ভয়েন চ প্রব্যথিতম্ মনো মে,* 'তা সত্ত্বেও আমার মন ভয়ে ব্যথিত হচ্ছে।' সমস্ত ব্যাপারটাই আমার মনে ভীতির সঞ্চার করছে। *তদেব মে দর্শয় দেবরূপম্,* 'আমাকে কেবল আপনার সেই আগের সৌম্যরূপটি দেখান'; *প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস,* 'হে জগতের আশ্রয়, আপনি প্রসন্ন হন।' *দেবেশ* অর্থাৎ যিনি 'দেবতাদের প্রভু'। *প্রসীদ* অর্থাৎ 'প্রসন্ন হন'। অর্জুন আবার কোন্ রূপ দর্শন করতে চাইছেন?

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬ ॥

—'আমি আপনাকে আগের মতো মুকুট ও গদাচক্রধারী [রূপে] দেখতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহু, হে বিশ্বমূর্তি, আপনি সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করুন।'

বিশ্বমূর্তে, 'হে বিশ্বমূর্তিধারী'; *সহস্রবাহো,* 'হে সহস্রবাহু'; দয়া করে আপনার এই রূপ লুকিয়ে আগের রূপ দেখান। সেই আগের রূপটি কীরকম? *কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্,* 'মুকুটশোভিত, গদা এবং চক্রধারী' শ্রীবিষ্ণুর পরিচিত প্রসন্ন রূপ। *ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুম্ অহং তথৈব,* 'আমি এই মূর্তিই দেখতে চাই', *সহস্রবাহো,* 'হে সহস্রবাহু'! *তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন,* 'সেই চতুর্ভুজ রূপেই আপনি আমাকে দর্শন দিন।'

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবান বললেন, 'হে অর্জুন, তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমার যোগশক্তির দ্বারা তোমাকে আমার এই পরম তেজোময়, আদি, অনন্ত বিশ্বরূপ দেখালাম, যা এর আগে কেউ কখনও দেখেনি।'

আমার *আত্মযোগের* মাধ্যমে, আমি তোমাকে আমার এই দিব্যরূপ দেখালাম। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন ছিলাম। *ময়া প্রসন্নেন,* 'আমার প্রসন্নতাহেতু' আমি তোমাকে তা দেখিয়েছি। *তেজোময়ম্,* 'তেজঃপূর্ণ'; *বিশ্বম্ অনন্তম্ আদ্যম্,* 'আদি,

অনন্ত এবং সামগ্রিক।' *যৎ মে ত্বৎ অন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্,* 'তুমি ছাড়া আর কেউ আগে কখনও এই রূপ দর্শন করেনি।'

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

—'হে কুরুপ্রবীর, বেদ (পাঠ) এবং যজ্ঞের দ্বারা, দানক্রিয়া, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন এবং কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারাও আমাকে এভাবে, তুমি ছাড়া মনুষ্যলোকের আর কেউ কখনও দেখেনি।

আগে কেউ কখনও এই রূপ দেখেনি। কোন রকম যাগ-যজ্ঞ, লৌকিক ক্রিয়া বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা আমার এই রূপ দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'হে কুরুপ্রবীর, তুমি ছাড়া এই মনুষ্যলোকের আর কেউ কখনও বেদ (পাঠ), যজ্ঞ, দান, আনুষ্ঠানিক কর্ম, এমনকি কঠোর তপস্যার দ্বারাও আমাকে এই রূপে দেখতে পায়নি।' তুমিই একমাত্র ভাগ্যবান ব্যক্তি, যে আমাকে এই রূপে দেখতে পেলে।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌মমেদম্ ।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

—'আমার এই ভীষণরূপ দর্শন করে তুমি ভীত বা বিমূঢ় হয়ো না। ভয় দূর করে এবং উৎফুল্ল হৃদয়ে তুমি আবার আমার এই আগের রূপ দেখ।'

মা তে ব্যথা, 'তুমি ভীত বা দুঃখিত হয়ো না'। *মা চ বিমূঢ় ভাবঃ,* 'তুমি বিমূঢ় হয়ো না'। *দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরম্ ঈদৃঙ্‌মমেদম্,* 'আমার এই ঘোর ভয়ঙ্কর রূপ দেখে,' সকল ভয় এবং মূঢ়তা ঝেড়ে ফেল। *ব্যপেতভীঃ,* 'সকল ভয় থেকে মুক্ত'; *ব্যপেত* অর্থাৎ 'মুক্ত'; *প্রীতমনাঃ,* অর্থাৎ 'প্রসন্নচিত্ত'; *পুনঃ,* অর্থাৎ 'আবার'; *তদেব মে রূপম্ ইদম্ ত্বং প্রপশ্য,* তোমার কাঙ্ক্ষিত 'আমার এই পূর্বরূপ তুমি দর্শন কর।'

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

সঞ্জয় বললেন—'তাই, বাসুদেব, অর্থাৎ মহাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

এইকথা বলে, তাঁর আগের সৌম্যমূর্তি ধারণ করে ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন।'

তাই, বাসুদেব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এইকথা বলে আবার তাঁর রূপ দেখালেন। সৌম্যমূর্তি ধারণ করে মহাত্মা ভীতসন্ত্রস্ত অর্জুনকে শান্ত ও আশ্বস্ত করলেন। তিনি অর্জুনকে তাঁর *সৌম্যবপু* অর্থাৎ 'প্রসন্নমূর্তি' দর্শন করালেন।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন ।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

অর্জুন বললেন—'হে জনার্দন, আপনার এই সৌম্য মানবমূর্তি দর্শন করে এখন আমি তৃপ্ত ও প্রকৃতিস্থ হয়েছি।'

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং, 'আপনার এই সৌম্য মানবমূর্তি দর্শন করে'। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার জিনিস এটিই যে, ঈশ্বর যদি মানুষের কাছে মানুষ রূপে আসেন, তবেই তাঁকে বোঝা একটু সহজ হয়। ঈশ্বরের দিব্য অথবা ভয়ংকর রূপ মানুষ আদৌ সহ্য করতে পারে না। এই কারণেই ভগবান কখনও সখনও ভক্তদের অনুগ্রহ করতে অবতার হয়ে আসেন। অর্জুনেরও সেই অবস্থা। তিনি ভগবানের সৌম্যরূপ দেখে বলছেন—'হে জনার্দন, আমার মন এখন শান্ত হয়েছে। আমি প্রকৃতিস্থ হয়েছি।' অর্জুনের কথায়—'আমি এখন তোমার মনুষ্যরূপ দর্শন করছি। আমার সব ভয় চলে গেছে।

শ্রীভগবান্ উবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম ।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীভগবান বললেন—'তুমি আমার যে রূপ দেখলে, তা অতি দুর্লভ। এমনকি দেবতারাও এই রূপ দর্শনের জন্য সর্বদা ব্যাকুল।'

সুদুর্দর্শম্ ইদং রূপম্, যেরূপ আমি তোমায় দেখিয়েছি, 'সেই রূপের দর্শন পাওয়া অত্যন্ত কঠিন'। 'এমনকি স্বর্গের দেবতারাও এই রূপ দেখার জন্য নিত্য লালায়িত', *দেবা অপি অস্য রূপস্য নিত্যং দর্শন কাঙ্ক্ষিণঃ।*

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

—'যে রূপে তুমি আমাকে দর্শন করলে, বেদের সাহায্যে, তপস্যার সাহায্যে, দানের সাহায্যে, যজ্ঞের সাহায্যে আমার সেই রূপ দর্শন করা যায় না।'

এবার শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *নাহং বেদৈঃ,* 'না বেদপাঠের সাহায্যে'; *ন তপসা,* 'না তপস্যার সাহায্যে'; *ন দানেন,* 'না দানের সাহায্যে'; *ন চ ইজ্যয়া,* 'এবং না যজ্ঞ বা পূজার সাহায্যে'; *শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুম্,* 'আমাকে এইরূপে দর্শন করা যায়'; *দৃষ্টবান্ অসি মাং যথা,* 'যেরূপে তুমি আমাকে দর্শন করলে।' তাহলে কী উপায়ে তোমার দর্শন লাভ করা যায়? পরবর্তী শ্লোকে এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া হয়েছে।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

—'হে শত্রুতাপন অর্জুন, একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমাকে এইরূপে জানা, এইভাবে দর্শন করা এবং (আমাতে) স্বরূপত প্রবেশ করা সম্ভব।'

একমাত্র ভক্তির দ্বারাই সাধক আমাকে এইভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু সে ভক্তি কীরকম? *ভক্ত্যা অনন্যয়া,* 'একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারা'। *জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ,* '(আমাকে) জানতে এবং দর্শন করতে'; *তত্ত্বেন,* 'আমি স্বরূপত যেমন, সেইভাবে'; *প্রবেষ্টুং চ,* 'এবং আমাতে প্রবেশ করতে', আমার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করতে। এ ব্যাপারে একমাত্র অন্যনা ভক্তিই তোমাকে সাহায্য করতে পারে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ আগেই বলেছেন, *তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত,* 'তাঁদের মধ্যে জ্ঞানী হলেন নিত্যযুক্ত, ঈশ্বরের প্রতি সদা অনুরক্ত।' তাঁর জ্ঞান ঈশ্বরেই নিবিষ্ট বা প্রতিষ্ঠিত। *ভক্তের ভক্তি,* এই রকম *একান্ত ভক্তি, অনন্যা ভক্তিও* সর্বদা ঈশ্বরেই নিবদ্ধ। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

এখন এই অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকটি আসছে। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে এই শ্লোকটির উপর আলোচনা শুরু করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন,

অধুনা সর্বস্য গীতা শাস্ত্রস্য সারভূতো অর্থো নিঃশ্রেয়সার্থো অনুষ্ঠেয়ত্বেন সমুচ্চিত্য উচ্যতে।

উচ্চতে, শ্রীকৃষ্ণ 'এই কথা বলছেন', *অধুনা,* 'এখন'; অর্থাৎ এই অধ্যায়ের

এই অন্তিম শ্লোকে; *সর্বস্য গীতা শাস্ত্রস্য সারভূতো অর্থো,* 'সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সার কথাটি'; *নিঃশ্রেয়সার্থো,* 'যা আমাদের চরম *মোক্ষ* বা আধ্যাত্মিক মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে'; *অনুষ্ঠেয়ত্বেন,* 'যা জীবনে অভ্যাস ও আচরণ করতে হবে'; *সমুচ্চিত্য,* 'তার সার সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে'।

গীতাকে সকল উপনিষদের সার বলা হয় এবং এই শ্লোকটি হলো সেই গীতার সারাৎসার, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন করতে হবে। আমরা যদি শুধু এই ৫৫তম শ্লোকের বাস্তবসম্মত নির্দেশক'টি মেনে চলি, তাহলে আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। এই নির্দেশগুলিও অতি সহজ-সরল। বাস্তবিক, ভক্তি সর্বদাই সহজ-সরল—তার মধ্যে কোন মারপ্যাঁচ নেই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এমনই যে, অধিকাংশ মানুষ সরল বস্তু চান না। বিষয়টিকে যত জটিল করে তুলবেন, তারা তত বেশি খুশি হবে। সে যা হোক, যে-কেউ এই সরল শিক্ষাগুলি অনুসরণ করতে পারেন। এই শিক্ষাগুলি কী?

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

—'হে পাণ্ডব, যিনি একমাত্র আমার উদ্দেশ্যে কর্ম করেন এবং যিনি মৎপরায়ণ —আমিই যাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—যিনি আমার ভক্ত, সবরকম ইন্দ্রিয়াসক্তি থেকে মুক্ত এবং যিনি কারও প্রতি শত্রুভাব পোষণ করেন না, তিনি আমাকেই লাভ করেন।'

এ খুব সহজ শ্লোক। বলছেন—*মৎকর্মকৃৎ,* 'আমার জন্য যে কাজ করে'। অর্থাৎ, ভগবান বলছেন : যে কর্মই তুমি কর না কেন, তা আমার পূজা জ্ঞানে কর। আপনি হয়তো অফিসে কাজ করছেন, মনে করুন আপনি ঈশ্বরেরই সেবা করছেন। যখন আপনি সংসারের কাজ করছেন, তখনও ঈশ্বরেরই সেবা করছেন। এটি বাস্তব সত্য। যদি এই গোটা বিশ্ব তাঁরই শরীর হয়, তবে যে কাজই এখানে করা হোক না কেন, তা তাঁরই সেবা। *মৎ পরমো,* 'আমাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে কর'; অন্য আর সব কিছুই গৌণ। একমাত্র ঈশ্বরই পরম লক্ষ্য। এই কারণেই যাঁরা ঈশ্বরকে পরম লক্ষ্য জ্ঞান করেন, তাঁরা সামান্য প্রশংসায়, সামান্য খেতাব পেয়ে বা সামান্য পদোন্নতিতে উচ্ছ্বসিত হন না; এগুলি তাঁদের কাছে কিছুই নয়। মহত্তম বস্তু হলো ভক্তি। তাই বলছেন, *মদ্ভক্তঃ,* 'আমার ভক্ত হও'; তোমার-আমার মধ্যে যে সম্পর্ক, তা কেবল শুদ্ধ প্রেমের সম্পর্ক। *সঙ্গবর্জিতঃ,* 'ইন্দ্রিয়ের প্রতি আসক্তি থেকে

মুক্ত'; অতএব, মনকে নানারকম আসক্তি থেকে মুক্ত কর। আসক্তি চলে যাবে, কিন্তু ভালবাসা থাকবে। বন্ধুর প্রতি আপনার মোহ থাকবে না, কিন্তু বন্ধুকে আপনি ভালবাসবেন; পত্নীর প্রতি আসক্তি থাকবে না, কিন্তু তাঁকে ভালবাসবেন, তাঁর সেবা করবেন। এই যে আসক্তিযুক্ত মোহ এবং অনাসক্ত ভালবাসা এই দুয়ের প্রভেদটুকু অবশ্যই জানতে হবে। অনাসক্তি মানে, চারপাশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে উদাসীন হওয়া নয়। 'বাচ্চা কাঁদছে, কাঁদুক! তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তাদের প্রতি আমার কোন আসক্তি নেই'। এইরকম মনোভাবকে অনাসক্তি বলে না। ঠিক ঠিক অনাসক্ত হলে ভালবাসা থাকবে, কিন্তু আসক্তি থাকবে না। তখন আমার শিশু এবং অন্যের শিশু দুই-ই সমান। প্রয়োজন হলে আমি অন্য শিশুটিরও দেখাশোনা করব। কাজেই, অনাসক্তির অর্থ সংকোচন নয়, প্রসারণ। সেখানে আসক্তি নেই, আছে কেবল বিশুদ্ধ প্রেম। *এরপর আসছে জ্ঞান ও ভক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার কথা ঃ নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু,* 'সকল জীবের প্রতি বিদ্বেষহীন ভাব।' নির্বৈর ভাবের সাধনা কঠিন কিছু নয়। কেন আমি ঘৃণা করব? একই আত্মা তো সকল জীবের মধ্যেই আছেন। একটু চিন্তা করলেই আমাদের এই সত্য সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় হবে। *যঃ,* 'যিনি' এই ধরনের মানুষ; *সঃ মাম্ এতি পাণ্ডব,* 'হে অর্জুন, এইরকম ভক্ত আমাকে লাভ করেন।' এই হলো শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গীকার এবং সমগ্র গীতার যে শিক্ষা, তার সার।

আজ ভারতবাসীকে, তথা সমগ্র বিশ্বের মানুষকেই এই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, বুঝতে হবে ধর্মের মূল কথা মহৎ চরিত্র গঠন। কারও প্রতি কোন বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি কেবল নিষ্কাম ভালবাসা। কী অপূর্ব এই ভাব! আমরা ভালো কাজ করব, কিন্তু তার ফল অর্পণ করব ঈশ্বরকে। আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না। অতএব, গীতার এই শিক্ষা খুবই বাস্তবসম্মত এবং তা কাজে পরিণত করা সম্ভব। আমি আশা করি, ক্রমশ আরও অধিক সংখ্যক মানুষ এই শ্লোকে যে কথা বলা হয়েছে, সেই আলোয় ধর্মকে বুঝবেন ও আচরণে ফুটিয়ে তুলবেন। এটি এই মহান অধ্যায়ের মহত্তম শ্লোক, যা ভগবানের শ্রীমুখে উচ্চারিত হয়েছে। সমগ্র অধ্যায়টি শেষ হচ্ছে অন্তিম শ্লোকে এই ভক্তির কথা দিয়ে। পরবর্তী অধ্যায়ের উপজীব্য ভক্তি। সেখানে ভক্তি-যোগের কথা বলা হয়েছে।

ইতি বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

'এখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপদর্শন নামক একাদশ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি।'

বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী

(আদিচরণ-ক্রমে)

নির্ঘণ্ট